গিরিশ-প্রতিভা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা ঃ

১৩৩৫।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

[মূল্য—৫৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
গ্রন্থকার,
৩১, হালদারপাড়া রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

Printed by—
P. Bhattacharyya,
KALITARA PRESS,
16, Townshend Road, Bhowanipur.

উৎসর্গ—

জননী—

চরণে—

সেবক—

হেমেন্দ্র—

নিবেদন

গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রচনার প্রভাব আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' প্রথমে আমাকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁহার সামাজিক, ধর্ম্মমূলক ও নৈতিক আদর্শ বরাবর আমার হৃদয় স্পর্শ করে এবং তাঁহার 'মিরকাশিমে' পরিকল্পিত জাতীয় নেতৃত্বের পূর্ণাদর্শও প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। গিরিশের সহিত আমার এই নিবিড় সম্বন্ধই "গিরিশ প্রতিভা" রচনায় আমার প্রধান সহায় ও উদ্দীপনা।

দ্বাদশ বৎসরের কথা—আমি যখন মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জীবনী লিখিবার সঙ্কল্প করি, তখন জনশ্রুতি ভিন্ন আমার কিছুই সম্বল ছিল না। এইজন্য আমাকে গিরিশচন্দ্রের গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের আশ্রয় লইতে হয়। আমার স্বর্গগত বন্ধু শোকহরণ মজুমদার মহাশয়ই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে উদ্বোধন মঠে স্বামিজীর কাছে লইয়া যান। স্বামিজী আমাকে গিরিশচন্দ্রের পিতৃস্বসা-পুত্র প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। দেবেন্দ্রবাবু যে গিরিশচন্দ্রের নিকট আত্মীয়, কেবল তাহাই নহে, বয়সের অনেক পার্থক্য থাকিলেও, শুনিয়াছি—গিরিশচন্দ্র ইঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। দেবেন্দ্র বাবু আমাকে সস্নেহে ও সযত্নে সহায়তা করিতে স্বীকার করেন, কিন্তু তিনিও প্রথমেই 'এমারসনের' কয়েকটী কথা আবৃত্তি করিয়া আমাকে বলেন :—

"Great geniuses have the shortest biographies, their cousins can tell you nothing about them. They live in their writings."

ঐ দিন হইতে দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ ও সম্পূর্ণ সহায়তায় "গিরিশ-প্রতিভা" লিখিতে আরম্ভ করি। অনুসন্ধানে যে সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি তাহা গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি গিরিশচন্দ্রকে প্রধানতঃ

খুঁজিয়াছি তাঁহারই রচনার মধ্যে। এই বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবুর উপদেশ এবং পরামর্শ আমি সাধ্যানুসারে যথাসম্ভব মানিয়া চলিয়াছি। "গিরিশ-প্রতিভা" নামটিও তাঁহারই প্রদত্ত। তাঁহার নিকটে আমার ঋণ চিরদিনই অপরিশোধনীয় থাকিবে।

গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে মতামত এবং "রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান"—এই দুইটী অধ্যায় আমাকে "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর" কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া তৈয়ার করিতে হইয়াছে। লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অর্দ্ধেন্দু-নাট্য-পাঠাগার, অমৃতবাজার পত্রিকা, মীরার ও 'রেইশ ও রায়ত' প্রভৃতি সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণও এ বিষয়ে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন।

যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে নানা ভাবে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

আজ "**দেশবন্ধু**" জীবিত থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ আনন্দিত হইতেন। তিনি জেলে থাকিতেই সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ঋষিকল্প স্বামী সারদানন্দ মহারাজেরও গ্রন্থখানি দেখিবার জন্য তুল্য আগ্রহই ছিল। এই মহাপুরুষদ্বয়ের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়াই পাঠকের সম্মুখে আমি উপস্থিত হইলাম। গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ভক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, দেবেন্দ্রবাবুর সুযোগ্য একমাত্র পুত্র পার্ব্বতীনাথ বসু ও বন্ধুবর শোকহরণ জীবিত থাকিলেও বিশেষ আনন্দিত হইতেন। কয়জনের স্মৃতিই আজ আমায় মর্ম্মপীড়া দিতেছে।

গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও গ্রন্থাদির আলোচনা ইতিপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল ও শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে আমি সাহায্য পাইয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমার দুইজন বন্ধুর সহায়তা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। একজন কবি-সমালোচক শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর, আর একজন "গিরিশ স্মৃতির" সুদক্ষ লেখক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু

সেন। গ্রন্থের শৃঙ্খলা ও সৌকর্য্য সাধনার্থে ইঁহাদের পরামর্শ ও আনুকূল্য আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছে।

"কালীতারা" প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, প্রুফ ইত্যাদি সংশোধন বিষয়ে আমাকে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ও মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, আলিপুরের উকীল, আমার আবাল্য সুহৃদ শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ দাস (বেসিন) লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠা-আন্দোলনের প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দে (চন্দননগর) কোন কোন বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

বঙ্গ-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের ঋণ স্বীকার করেন না, এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ সাহিত্যসেবিগণ ও সাহিত্য-রসজ্ঞগণ গিরিশচন্দ্রকে যুগ প্রবর্ত্তক মহাকবি, বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যের গুরু ও নাট্যমন্দিরের জনক বলিয়া স্বীকার করেন। গ্রন্থখানি তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিলেই আমি সকল শ্রম সফল মনে করিব।

অনিবার্য্য কারণে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি আছে—পাঠক নিজগুণে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

৩১, হালদারপাড়া রোড,
কালীঘাট।
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভূমিকা

[শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিত]

গিরিশচন্দ্র জীবনী লিখিবার বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। বলিতেন, 'ওতে কেবল ওকালতী করা হয়। আমি চাই paint me as I am—আমি যেমন, তেমন ভাবে চিত্রিত কর। তারও দরকার নেই, যে আমাকে জান্তে চাইবে, আমার লেখার মধ্যেই সে আমাকে পাবে'। শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত মহাশয় সেই ভাবেই গিরিশচন্দ্রের জীবন চরিত আলোচনা করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের জীবনী লিখিবার প্রকৃত অধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন। ইঁহারা তিনজনেই তাঁহার অসীম স্নেহভাজন এবং শেষ জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার পুত্রপ্রতিম স্নেহের পাত্র অবিনাশ ছিলেন তাঁহার কর্ম্মচারী এবং সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। ১৩১০ সালে ইনি যখন "গিরিশ গীতাবলী" প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে কবির একটি অসম্পূর্ণ জীবনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ইহাই গিরিশ জীবনীর প্রথম উদ্যম। অতঃপর গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত হইবার প্রায় একবৎসর পরে শ্রীযুক্ত মতিলাল সুপ্রসিদ্ধ "উদ্বোধন" পত্রিকায় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশ করেন। ইহাই দ্বিতীয় উদ্যম। তারপর শ্রীমান অবিনাশ "গিরিশচন্দ্র" শীর্ষক গ্রন্থ লইয়া পুনরায় আসরে অবতীর্ণ হন্। ইহাতে "গীতাবলী" পুস্তকে প্রকাশিত জীবনীর পরিশিষ্ট, গিরিশ-প্রসঙ্গ ও কবির জীবন-সংক্রান্ত অন্যান্য কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই তৃতীয় উদ্যমের পর অবিনাশ পুনরায় একখানি সুবৃহৎ সম্পূর্ণ জীবন-চরিত প্রকাশিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে "বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় (অধুনা বিলুপ্ত) শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় কর্তৃক গিরিশচন্দ্রের কয়েকটী স্মৃতিচিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গিরিশচন্দ্রের জীবনী নহে, কবির ভাবময় জীবনের প্রতিচ্ছবি।

গিরিশ জীবনী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথের উদ্যম ষষ্ঠ উদ্যম।

এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে কেহ গিরিশজীবনীর আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়খানিই প্রধান, এবং ইঁহাদের প্রত্যেকেরই আলোচনার একটী একটী নির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত মতিলালের বৈশিষ্ট্য গিরিশের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস। অবিনাশ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার রঙ্গালয়-সংক্রান্ত কর্ম্মজীবন। কুমুদবন্ধু প্রদান করিয়াছেন কবির ভাবময় জীবনের চিত্র। হেমেন্দ্রনাথের প্রয়াস গিরিশ-প্রতিভার পরিচয়।

হেমেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে কখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন নাই; তবে কি অধিকারে ইনি এই বহু আয়াস-সাধ্য প্রয়াসে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? সাধক ভক্ত যে অধিকার লইয়া আরাধ্য দেবতার গুণকীর্ত্তন করেন, গিরিশচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, অচলাভক্তি ও তাঁহার রচনার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ হেমেন্দ্রনাথকে সেই অধিকার প্রদান করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনা করিবার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইনি আমার সহায়তা চাহিয়াছিলেন, তখন ইঁহাকে আমি কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিবার অনুরোধ করি। প্রথম গিরিশচন্দ্রের রচনার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের, তথা শ্রীবিবেকানন্দের প্রভাব। সর্ব্বশেষে বঙ্গ রঙ্গশালার একটী ধারাবাহিক ইতিহাস। শেষোক্ত অনুরোধটী পালন করিতে হেমেন্দ্রনাথ স্বার্থত্যাগী হইয়া যে উৎকট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা 'অমানুষী' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশের আহ্বানে সময় সময় ইঁহাকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে এবং তন্মধ্যে এক সময় ইঁহাকে কারাবরণ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই ইঁহার একচিন্তা ছিল "গিরিশ-প্রতিভা" ও বঙ্গ রঙ্গশালার ইতিহাস। জেল হইতে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এরূপ একনিষ্ঠ ঐকান্তিক সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। তাহার ভুল-ভ্রান্তিও দেবতার বরে সার্থক হইয়া উঠে।

"গিরিশ-প্রতিভা" গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়। হেমেন্দ্রনাথ বহুভাবে তাঁহাকে পাঠকের মানস-চক্ষুর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ছায়া-চিত্র যে কোথাও মলিন, অস্পষ্ট বা বিকৃত হয় নাই, সে কথা

বলা দুঃসাহসিকতা। প্রথম পরিচয়ে হেমেন্দ্রনাথ যে আমার সহায়তা চাহিয়াছিলেন এবং স্বামী সারদানন্দ (এক্ষণে নিত্যধাম গত) মহারাজের আদেশ রক্ষা করিতে আমি তাঁহাকে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম নানাকারণে তাহা পালন করিতে পারি নাই। যে সময় "গিরিশ-প্রতিভা" রচনার সূচনা হয়, তাহার পর যুগ বহিয়া গিয়াছে। স্বদেশের কল্যাণ এবং দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের আহ্বান হেমেন্দ্রনাথকে মহত্তর কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাঁহার জীবনে বৃহত্তর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। ইতিমধ্যে বলহরা জরা আসিয়া ধীরে ধীরে আমার দেহ অধিকার করিয়া আমার উৎসাহ, উদ্যম, সকলই হরণ করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ সহস্র কর্ম্মের ভিতরেও তাঁহার জীবনের সাধনা বিস্মৃত হন্ নাই। আমার ন্যায় জরাজীর্ণ, রোগশীর্ণ, শক্তি সামর্থ্যহীন বৃদ্ধের মুখাপেক্ষী না হইয়া অবিচলিত চিত্তে দৃঢ়পদে তিনি তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন। কখন যে বিপথগামী হন্ নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা হইলেও দীর্ঘকাল-ব্যাপী তাঁহার এই একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও উদ্যমের যে কিছু কৃতিত্ব ও প্রশংসা, একমাত্র তিনিই তাহার অধিকারী।

হেমেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের প্রত্যেক নাটকের মর্ম্মোদ্ঘাটন ও চরিত্রবিশ্লেষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়াছেন। অনেক স্থলেই তাঁহার সহিত আমার মতের মিল নাই। হইতেও পারে না। তাঁহার স্বাধীন মতামতের উপর আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই।

সাধারণ পাঠক কি ভাবে এ পুস্তক গ্রহণ করিবেন, বলিতে পারি না। কিন্তু যিনি এই আখ্যায়িকার নায়ক, যাঁহার উদ্দেশে এই ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইয়াছে, তিনি এখন যে লোকেই থাকুন, এই একনিষ্ঠ ভক্তের শ্রদ্ধার অঞ্জলি যে তাঁহার পরম প্রীতিপ্রদ হইবে এবং তিনি যে প্রসারিত-করে পরমাদরে তাহা গ্রহণ করিবেন সে সম্বন্ধে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি আমি একান্তচিত্তে কামনা করি, হেমেন্দ্রনাথের এই স্বার্থশূন্য আয়াস-পূর্ণ প্রয়াস সাফল্য-মণ্ডিত হউক্!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

২৬।৫।২৮

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—"গার্হস্থ্য জীবন" ১—৫৩

গিরিশের পূর্ব্ব পুরুষের কলিকাতায় আগমন, জন্ম, পিতামাতা, শ্রীধর-সেবা, বাল্যে পুরাণ-প্রসঙ্গ, পিতৃবিয়োগ, সত্যপ্রিয়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ঈশ্বর-গুপ্ত, চাকুরী জীবন, অধ্যয়ন-স্পৃহা, সখের যাত্রা ও থিয়েটার, লোকসেবা ও হোমিওপ্যাথি শিক্ষা, পত্নীবিয়োগ ও কবিতা, ভাগলপুরের ঘটনা—দ্বিতীয় বার বিবাহ—রঙ্গালয়ে **পরমহংসদেবের সহিত মিলন**—বিজ্ঞান-চর্চ্চা, দ্বিতীয় পত্নীর বিয়োগ, শিশু-পুত্রের শোক, ষ্টার থিয়েটারে কর্ম্মচ্যুতি, গণিতালোচনা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গালয়ে, পীড়া ও মৃত্যু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—"নট-জীবন" ৫৫—৭৬

রঙ্গালয়ে অনুরাগ, গীতরচনা, ঠাকুর বাড়ীতে থিয়েটার, বাগ্‌বাজার এ্যমেচিয়ার থিয়েটার, গিরিশের শিক্ষকতা, সধবার একাদশী অভিনয়, দীনবন্ধুর অনুরোধে লীলাবতী, রাজেন্দ্রপালের বাড়ীতে স্থায়ী ষ্টেজ, ন্যাসনাল থিয়েটার ও নীলদর্পণ, দলত্যাগ, উষাহরণ, কৃষ্ণকুমারীতে ভীমসিংহ, দুইদল ও পুনর্ম্মিলন, ভুবন নিয়োগী, নাট্যকার গিরিশ, পার্কারের কর্ম্মত্যাগ ও বৈতনিক ভাবে প্রতাপ জহুরির থিয়েটারে অধ্যক্ষতা, গুর্ম্মুখ রায় ও ষ্টার, অভিনেতা স্বত্বাধিকারী, গোপাল শীল ও এমারেল্ড, ষ্টার রঙ্গালয় নির্ম্মাণে শিষ্যদিগকে ১৬০০০৲ দান।

ষ্টারে নসীরাম, এমারেল্ডে পূর্ণচন্দ্র বিষাদ, ষ্টারে প্রফুল্ল হারানিধি, মিনার্ভায় ম্যাকবেথ্ জনা, ষ্টারে নাটাচার্য্য, ক্লাসিকে, মিনার্ভায় সীতারাম, পুনরায় ক্লাসিকে, মিনার্ভায় বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, কোহিনুরে, মিনার্ভায় শাস্তি কি শাস্তি, শঙ্করাচার্য্য, অশোক ও তপোবল, গিরিশের সহিত গ্যারিকের তুলনা, নটের সাধনায় গিরিশের অভিমত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—**ধর্ম্মজীবন**—৭৭—১২৯

যৌবনে নাস্তিকতা, নানারূপ অবস্থা ও তারকনাথের শরণাপন্ন,

গুরুলাভে ব্যাকুলতা, চৈতন্যলীলা, গুরুর সহিত মিলন, গুরুর নানাদর্শন, বকলমা প্রদান, গুরুভক্তি ও গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান, পরমহংসদেবের স্নেহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—**গিরিশ-নাটকে রামকৃষ্ণ-প্রভাব**—১৩০—২১৮

বিল্বমঙ্গল, রূপ সনাতন, পূর্ণচন্দ্র, বিষাদ, নসীরাম, কালাপাহাড়ে চিন্তামণি, মনের মতনে ফকির, স্বপ্নের ফুল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—**জাতীয়তায় গিরিশচন্দ্র**—২১৮—২৪০

স্বদেশপ্রেম, গরুড়, জাতীয়তা প্রচার, হিন্দুমুসলমান একতা, রিলিজিয়স-ইউনিটি, সৎনাম, আত্মত্যাগ, চণ্ড, মহাপূজা, শেষকথা ও তারা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—**গিরিশ ও বিবেকানন্দ**—২৪১—২৫৩

সেবাধর্ম্মে কালীকিঙ্কর, রঙ্গলাল, কিশোর, মন্মথ, হরমণি। অনাথ-আশ্রম বা মাতৃ-মন্দির।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—**ঐতিহাসিক নাটক**—২৫৪—২৮৮

সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাসিম সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের পত্র, উপক্রমণিকা—ঐতিহাসিক তত্ত্ব, সিরাজ চরিত্র, বাঙ্গলার অবস্থা, ইংরাজের গুণ, মিরকাসিম ও জহরা, করিম চাচা, অন্যান্য চরিত্রালোচনা, শিবাজী, ভ্রান্তি, চণ্ড, সৎনাম, আনন্দরহো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—**সামাজিক নাটক**—২৮৯—৪৩৫

বিভিন্ন চরিত্র গঠন, সামাজিক বিয়োগান্ত কেন? নায়ক চরিত্র, যোগেশ, হরিশ, কালীকিঙ্কর, করুণাময়, প্রসন্ন কুমার ও উপেন্দ্র নাথ। বিধবাবিবাহ, নানা যুক্তি, উচ্চ লক্ষ্য। বরপণ ও কিশোর, কন্যাসমস্যায় আমাদের কর্ত্তব্য। আদর্শ বিধবা—নির্ম্মলা, অন্নপূর্ণা ও বিরজা।

গৃহিণীগণ—জ্ঞানদা, হৈমবতী, সরস্বতী ও পার্ব্বতী। প্রফুল্ল, জ্যোতি, হরমণি, ফুলী, রঙ্গিণী। ব্যবহার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, Medicine, সুরেশ, শৈলেন, রমেশ, মোহিনী, নীরদ, নীলমাধব, ভজহরি, অঘোর, হলধর, অবধূত, হেবো, সুশীলা, সরোজিনী, কিরন্ময়ী ও বিন্দু।

উপসংহার ও গিরিশের সামাজিক নাটকে বৈশিষ্ট্য।

নবম পরিচ্ছেদ—**গিরিশ-বিশ্লেষণ**—৪৩৬—৪৭৯

গিরিশচন্দ্রের নৈতিক আদর্শ ও অমূল্যবাণী, স্ত্রীশিক্ষা—জ্যোতির্ম্ময়ী, চন্দ্রা ও রঙ্গিণী। **প্রেম**—লীলা, বিষাদ (সরস্বতী), মুকুল মুঞ্জরা, অন্নদা, দুলাল চাঁদ, চঞ্চলা, জহরা, গুলসানা, রঙ্গিণী, ফুলী, মেনকা, বিল্বমঙ্গল, অনাথ নাথ, ইমান। চৈতন্য লীলায় প্রেমতত্ত্ব, সনাতন, নিত্যানন্দ প্রেমের ভিখারী।

নারী চরিত্র—পুতলা বাই, সুন্দরা, সুনেত্রা, অভিমানিনী চন্দ্রা, মাতৃত্বে জনা, জিজিবাই। স্বদেশ প্রেমে তারা। পতিতার প্রেম—কাদম্বিনী, সোণা, গঙ্গা। সুভদ্রা—নবীনচন্দ্র ও পাণ্ডবগৌরব।

দশম পরিচ্ছেদ—**পৌরাণিক নাটক**—৪৮০—৫৪৯

পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব, পৌরাণিক নাটক জাতীয়তা প্রণোদিত। রাবণ—দর্প, মনুষ্যত্ব, গুণে দোষে বিরাট, মধুসূদন ও সীতাহরণে। শ্রীরাম, বালীবধ, Mission। সীতাত্যাগ ও লক্ষ্মণবর্জ্জনে—রামের মানবত্ব। লক্ষ্মণ ও প্রেমের শক্তি। সীতার লক্ষ্মণকে তিরস্কার, বাল্মিকী ও মধুসূদন। মন্দোদরী—নির্ভকতা ও সতীত্বগৌরব। মহাভারত—দক্ষযজ্ঞে Theory of utility হিতবাদ, শ্রীবৎসচিন্তায় ফরাসী-বিদ্রোহ, জনা, ভীম, শঙ্করাচার্য্য, দর্শনের উদ্দেশ্য। অদ্বৈত জ্ঞান, সোণা লোহার বন্ধন উভয়ই মায়া—মায়ালোপে ব্রহ্মজ্ঞান।

তপোবল, বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র, ফলপুষ্প সৃষ্টি ও নবস্বর্গ, জড়শক্তি—তপোবলে ব্রহ্মশক্তি—বশিষ্ঠের ক্ষমায় বিশ্বামিত্রের জ্ঞান। অশোক, তৃতীয় নয়ন, সদানন্দ, বাতুল, আকাল, জগন্নাথ ও মায়ায় আত্মজ্ঞান।

একাদশ পরিচ্ছেদ—**নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে মতামত**—৫৫০—৫৬৮

নিমচাঁদে জষ্টিশ সারদা মিত্র। "বুদ্ধে" Sir Edwin Arnold, মেঘনাদ বধে "সাধারণী," বিল্বমঙ্গলে বিবেকানন্দ, চৈতন্যলীলায় শম্ভু মুখার্জ্জি ও কর্ণেল অলকট, ম্যাকবেথে ইংরাজী সংবাদপত্র, মিঃ এন্ এন্ ঘোষ বলেন ফরাসী সংস্করণ অপেক্ষাও গিরিশের বঙ্গানুবাদ প্রশংসনীয়। রঙ্গমঞ্চে মীরার, ষ্টার ও মিনার্ভার প্রফুল্লে মীরার।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—**রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান**—৫৬৯—৬২৮

১৮৭৫খৃষ্টাব্দের "ছদ্মবেশ" হইতে ১৯২৮খৃষ্টাব্দের "যাজ্ঞসেনী"* পর্য্যন্ত প্রত্যেক নাটকাভিনয়ের তারিখ, স্থান ও অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—**গিরিশচন্দ্রের অভিনয়শিক্ষা**—৬২৯—৬৩৮

শিক্ষায় বিশেষত্ব ও পতিতার উচ্চলক্ষ্য।

উপসংহার ও

চিত্তরঞ্জনের বাণী।

*৬২৮ পৃষ্ঠায় ১৭ লাইনে 'অর্জ্জুন' স্থানে 'যুধিষ্ঠির' হইবে।
৫৮ পৃষ্ঠায় ২৭ লাইনে পড়িতে হইবে—
"প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।"

গিরিশচন্দ্র (প্রৌঢ়ে)

গিরিশচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

গার্হস্থ্য-জীবন

গিরিশচন্দ্রের গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। বাঙ্গলার সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ যেভাবে জীবনযাপন করেন, গিরিশের জীবনও সেইভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। আমাদিগের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার নায়ক যে ঘোষ-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাঁহাদের আদিনিবাস ছিল হরিপালে। কি সূত্রে গিরিশের প্রপিতামহ রামলোচন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করেন, তাহা জানা নাই। কথিত আছে রামলোচনের মাতা, কার্ত্তিকচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, গিরিশচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহী সহমৃতা হইয়াছিলেন। হরিপাল হইতে স্থানান্তরিত হইয়া কিছুকাল বাগবাজারে বাস করিবার পর গিরিশের পিতামহ রামরতন বসুপাড়ায় একখানি বসতবাটী ক্রয় করেন। এই বাটীতে সন ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন (১৮৪৪ খৃঃ অঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী) সোমবার গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়।

গিরিশের পিতা নীলকমল সওদাগরী আফিসে বুককিপারি করিতেন। ইঁহার পরোপকারিতা ও সাংসারিক বিচক্ষণতার অনেক কাহিনী আছে। তন্মধ্যে দুই-একটি এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

কোন সময়ে এক ব্যক্তি দুরবস্থায় পতিত হইয়া নীলকমলের নিকট একটি কর্ম্মপ্রার্থী হয়। নীলকমল কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার প্রকৃতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি বুঝিয়া লইয়া তাহাকে নিজ আফিসে একটি কর্ম্ম করিয়া দিতে স্বীকৃত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে তাহার মাসিক বেতন হইতে পাঁচ টাকা করিয়া কাটিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে। এই অদ্ভুত প্রস্তাবে সে ব্যক্তি অগত্যা স্বীকৃত হইয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিল। নীলকমল তাহার বেতন হইতে মাসিক পাঁচ টাকা কাটিয়া লইতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য ঐ ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন নীলকমলের নিন্দা করিতে ত্রুটি করিল না। এইরূপ পরোপকার ত ব্যবসা মাত্র। কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়া ঐ ব্যক্তি মারা গেল, এবং তাহার পরিবারবর্গ একেবারে নিরুপায় ও নিঃস্ব হইয়া পড়িল। নীলকমল তখন তাহার পরিবারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার স্বামী আমার নিকট মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া জমা রাখিয়াছে, এত বৎসরে এত টাকা হইয়াছে এবং তাহার স্থদ এত" বলিয়া হিসাব করিয়া তিনি বিধবাকে সমস্ত টাকা অর্পণ করিলেন।

অন্য কোন সময়ে এক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের পিতা আসিয়া নীলকমলকে বলে যে, "ছেলেটা মোটেই মানুষ হ'ল না, দু'পয়সা আনা চুলোয় যাক্, সংসারের দু-একটা কাজ কর্ম্ম করে' যে আমার উপকার করবে, তা'ও নয়, কেবল মাছ ধরে' বেড়ায়।" নীলকমল বলিলেন, "তুমি এক কাজ কর না কেন? ওকে গোটা কয়েক পুকুর জমা করে' দাও; তা'তে মাছ ধরবার সখও মিটবে, আর মাছ বিক্রী করে' দুপয়সা ঘরেও আসবে।" এই ব্যবসায়ে ঐ উচ্ছৃঙ্খল যুবক কালে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। প্রবৃত্তি অনুযায়ী ব্যবসার নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বিচক্ষণ নীলকমল সময় সময় বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিত এবং ভাড়াটে গাড়ীর আস্তাবলে গিয়া দিনের অধিকাংশ সময় ঘোড়ার তদ্‌বির করিত। নীলকমল উহার পিতাকে অনুরোধ করিয়া ভাড়া খাটাইবার জন্য গাড়ী-ঘোড়া করিয়া দেন। এ ব্যক্তিও কালে উক্ত ব্যবসায়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

গিরিশের মাতা সিমুলিয়ার বিখ্যাত ভক্তবংশোদ্ভব গোবিন্দরাম বসুর কন্যা। গিরিশের প্রমাতামহ চূণিরাম গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করিবার জন্য হরিসঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছিলেন। গিরিশ বলিতেন, "তখনকার কেতামত চূণিরাম আয়নার সামনে বসে' হাতে বাঁধা পাগড়ী পরছিলেন। হঠাৎ একটা উকি উঠে একটুখানি জল উঠল, তা'তে তিনি রোজ যে গিরিধারীর প্রসাদ খেতেন তার একটি ভাত ছিল। চালটি তুলে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে তখনই মাথায় রাখলেন, তারপর বললেন, 'এ শরীরে যখন গিরিধারীর প্রসাদ জীর্ণ হয়নি, তখন এটাও জীর্ণ হয়েছে, আর টিঁকবে না। আমার আর দেরী নাই, চল।' " গিরিশের জননীও এই অব্যভিচারিণী ভক্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যখন 'জনা' নাটকে বিদূষকের মুখে, "খুব ভাঙ্গ শালগ্রাম—গিরিধারী" এই উক্তির আরোপ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তাঁহার মনে তাঁহার মাতুলবংশের এই গৃহ-দেবতার কথাই উদয় হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের পিতৃকুলের গৃহ-দেবতা 'শ্রীধরে'র নিত্য-সেবার ভার গিরিশচন্দ্রের মাতার হস্তে ছিল। একদিন 'শ্রীধর'কে ভোগ দিবার নিমিত্ত তিনি একটি কাঁঠাল অতি যত্নে রক্ষা করেন। পরদিন নৈবেদ্যে ঐ কাঁঠালটি দিবার সময় প্রকাশ হয় যে তাহার কয়েকটি কোয়া অপহৃত হইয়াছে। অগ্রভাগ ভুক্ত হইয়াছে দেখিয়া গিরিশের জননী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং উচ্ছিষ্ট দ্রব্য দেবতাকে অর্পণ করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু ঐ রাত্রেই স্বপ্নে দেখিলেন যেন এক অতি মনোরম নীল শিশু আসিয়া হাসিয়া বলিতেছে, "আমি কাঁঠাল ভালবাসি, তুমি আমায় কাঁঠাল দাওনি কেন? হলই বা উচ্ছিষ্ট, আমিও ত তোমার ছেলে-পুলের মধ্যে, ঐ কাঁঠাল কাল আমায় দিও।" গিরিশচন্দ্র 'বিষাদে' এই অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন— "মার কথা মিথ্যা নয়, জান ত? মাকে দেখেছো ত? গোপালজী তাঁর কাছে কথা কয়ে লাড়ু চাইতেন।"

তৎকালীন প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু গিরিশচন্দ্রের মাতুল ছিলেন। গিরিশের সহোদর অতুলকৃষ্ণ বলিতেন, "মামা খুব বিদ্বান

ছিলেন, তাঁর বিবেক বুদ্ধি অতি আশ্চর্য্য রকমের ছিল। এক সময়ে দুটি রোগী তাঁর হাতে আসে। তার মধ্যে তিনি যেটি বাঁচবার আশা করেছিলেন, সেটি মারা যায়, আর যেটির জীবনের কোন আশা ছিল না, সেটি বেঁচে উঠে। মামা বল্‌লেন 'এরূপ অনিশ্চিত ব্যবসায়ে টাকা রোজগার করা মহাপাপ'—এই ঘটনার পর তিনি ডাক্তারী ছেড়ে দেন।" ইহার পর তিনি Sir Richard Temple কর্ত্তৃক নাগপুরে Extra Assistant Commissioner নিযুক্ত হন।

নীলকমলের প্রথম এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম নৃত্যগোপাল। ইনি এক সময়ে সাময়িক উন্মত্ততা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং আরোগ্য লাভ করিবার কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। নৃত্যগোপালের পর ছয় কন্যা জন্মে। তৎপরে অষ্টম গর্ভে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গিরিশের পর আর তিনটি পুত্র হয় এবং অবশেষে এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়া গিরিশচন্দ্রের জননী তাঁহার অনন্য-আশ্রয় কুলদেবতা 'শ্রীধর'-চরণে দেহ-বিসর্জ্জন করেন।

দুঃখ গিরিশচন্দ্রের আজন্ম সহচর ছিল। 'শ্রীবৎস-চিন্তায়' বাতুলের মুখ দিয়া তিনি আপনার জীবন-কথাই বলিয়াছেন, "মহারাজের দুঃখের সঙ্গে নূতন আলাপ—আমার বহুদিনের প্রণয়, দুটো একটা ঠাট্টা বোট্-কেরা চলে।" 'মায়াবসানে' এই ভাব আরও পরিস্ফুট, "জীবনে দুঃখই সার্থক। ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ, মরণে দুঃখ।" বিধাতা গিরিশচন্দ্রকে কোমল হস্তে লালিত করেন নাই। নিয়তি তাঁহাকে যাহা কিছু ভোগ্য-বস্তু দিয়াছিলেন, কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব-নিকাশ করিয়া তাহার সুদ পর্য্যন্ত কাটিয়া লইয়াছিলেন।

এক পুত্র ছয় কন্যার পর অষ্টম গর্ভের পুত্র-সন্তান জন্মিতে 'দান বাদ্য হুলি রবে' গৃহে মহোৎসবের সূচনা হইল। গিরিশের খুল্লপিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত একরূপ কল্পতরু হইয়া উঠিলেন। জীবনের শেষভাগে গিরিশ 'গৃহলক্ষ্মী' লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্মৃতির একটু উল্লেখ আছে, "তুমি যে দিন জন্মাও, দাদা দেশে ঢাক-ঢোল রাখেন নাই, তুমিও খুব ঢাক-ঢোল বাজালে"। কিন্তু যে অভ্যাগত আগন্তুকের

অভ্যর্থনার জন্য এত আনন্দ উচ্ছ্বাস, প্রসূতির সূতিক পীড়া হেতু তাহার ভাগ্যে জননীর স্তন-সুধা শুকাইয়া গেল। মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শিশু বাগ্দিনীর স্তন্যপানে পালিত হইতে লাগিল। গিরিশ এই শৈশব-স্মৃতি তাঁহার 'গোবরা' নামক ছোট গল্পে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "বৃদ্ধ বয়সে চাটুর্য্যে একটি পুত্র-সন্তান লাভ করিল। জন্মদিনে বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা নাই। বাজনা-বাদ্যি, হিজ্ড়েরা আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিল।.................কিন্তু গৃহিণীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অসুখ। জাত-শিশুর নিমিত্ত মাইদিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগ্দিনী, মণি তাহার নাম—সেই মাইদিউনী হইল। মণি বাগ্দিনী বড় দজ্জাল; কিন্তু সন্তান প্রতিপালনে মণি সাক্ষাৎ জননী রূপ ধারণ করিয়াছে।"

অতঃপর এই আনন্দ-কোলাহল-মুখর-ভবনে দণ্ডপাণি শমন আবির্ভূত হইলেন। যে খুল্লপিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত গিরিশচন্দ্রকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসারে রাজাধিরাজ রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের নয়ন-পুত্তলিকে ছয় মাসের শিশু দেখিতে দেখিতে অতৃপ্ত নয়ন চিরতরে নিমীলিত করিলেন। করুণ ক্রন্দনরোল শিশুর তরুণ শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু শোকসন্তপ্ত পরিবারে পাছে নবীন অতিথির কোনরূপ যত্নের ত্রুটি হয়, তাই নীলকমল তাহাকে পরম আদরে হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন।

পিতার আদরের সন্তান ক্রমে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশ দেখিলেন একদিকে পিতার যেমন প্রচুর আদর, অন্যদিকে মাতার তেমনি কঠোর তাড়না। এই সময়ে নীল-কমলের সংসারে আবার হাহাকার উঠিল, পিতা-মাতার বক্ষে নিদারুণ শেল হানিয়া গিরিশের জ্যেষ্ঠ সহোদর লোকান্তরিত হইলেন। এই দুর্ঘটনার পর গিরিশের উপর মাতা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিলেন। এক বিন্দু আদরের জন্য লালায়িত হইয়া ক্ষুব্ধ বালক যদি কখনও মাতার অঞ্চল ধরিত, জননী নিরতিশয় নিষ্ঠুর হইতেন—দূর্ দূর্ করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। দুর্দ্দান্ত অশান্ত বালক যদি কাহাকে কখনও কটুবাক্য বলিত, তাহা হইলে তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকিত না। বাল্যাবধি

গিরিশের স্বভাব ছিল, অপরাধ করিয়া তাহা লুকাইতে পারিতেন না। মাতা প্রথমে গিরিশকে নিজমুখে ত্রুটি স্বীকার করাইয়া লইতেন, তৎপরে বিধিমত শাসন করিয়া অবশেষে বালকের গালের ভিতর গোময় পূরিয়া দিতেন। মাতার এই অভিনব শাসন প্রথা গিরিশ বার্দ্ধক্যেও বিস্মৃত হন নাই। 'গৃহলক্ষ্মী'তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বিরজা সরোজিনীকে তাড়না করিতেছেন, "দেখ্ আবাগী, মুখে গোবর টিপে দেবো।"

এইরূপে পিতামাতার অপরিমিত আদরে ও শাসনে, হর্ষে-বিষাদে গিরিশের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে দেখিতে পাই তিনি বিখ্যাত গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি'তে ভর্ত্তি হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষাকার্য্য বাঞ্ছিতরূপে অগ্রসর হইতেছে না। গিরিশের কারণ-অনুসন্ধিৎসু মন একটু তলাইয়া না দেখিয়া কোন বিষয় বুঝিতে পারিত না। প্রশ্নের পর প্রশ্নে শিক্ষককে উত্যক্ত করিয়া তুলিত। শিক্ষক মনে করিতেন ইহা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা, বালকের সুমিষ্ট স্বভাব শিক্ষকের স্নেহ আকর্ষণ করিলেও তিনি গিরিশকে নির্ব্বোধ বলিয়া তাড়না করিতেন। গিরিশচন্দ্রের 'কমলে-কামিনী'তে এইরূপ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরের একটি সুন্দর চিত্র আছে। শ্রীমন্ত গুরুকে বলিতেছেন—"কি বুঝালে বল আরবার।" ইতিপূর্ব্বেই গুরুর মেজাজ রূক্ষ হইয়া উঠিতেছিল, এখন আর ধৈর্য্য রহিল না, বলিয়া উঠিলেন, "হতচ্ছাড়া ব্যাটা কি বুঝালেম ? বকে' বকে' মুখে ফেকো উঠে গেল।" প্রাপ্ত বয়সে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "যদি তাঁহারা আমাকে তাড়না না করিয়া মিষ্ট কথায় আমি যেরূপ বুঝিতে পারি সেইরূপ বুঝাইয়া দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আমি শিখিতে পারিতাম।" 'নল দময়ন্তী'তে তিনি সুরসিক বাক্-চতুর বিদূষকের মুখে এই কথারই আভাষ দিয়াছেন, "গুরুমশায় যে কানমলে দিলেন, নইলে 'ক' 'খ' শিখতুম।" এই 'ক' 'খ' শিক্ষায় গিরিশের মন বিফলকাম হইয়া বয়সোচিত ক্রীড়া অভিমুখে নিরতিশয় আগ্রহে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিদ্যালয় এবং পল্লীবালকগণের সহিত বিবিধ পৌরুষ ক্রীড়ায় একদিকে যেমন তাহার চঞ্চল প্রকৃতি অধিকতর উদ্দাম হইয়া উঠিল,

অন্যদিকে তাহার দৈহিক বল ও গঠন তেমনি পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। এ সময়ে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় শৈথিল্য, ক্রীড়ায় একাগ্রতা ও উদ্দাম চাঞ্চল্য দেখিলে অষ্টম গর্ভের সন্তানকে যে জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্লপিতামহ বংশের গৌরব বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন, বোধ করি তাঁহারাও লজ্জায় অধোমুখ হইতেন। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগমে ইহার বিপরীত চিত্র আমাদের নয়ন-পথে পতিত হয়। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন বাড়ীর বৃদ্ধা গৃহিণীগণ তুলসী-মঞ্চে দীপদান করিয়া মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া বালক-বালিকাগণকে একত্র করিয়া পুরাণ-প্রসঙ্গে তাহাদের সুকুমার চিত্তে নীতিরসোজ্জ্বল আদর্শ চিত্র সকল অঙ্কিত করিতেন। গিরিশের এক খুল্লপিতামহী ছিলেন ; কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। বৃদ্ধার বাচনিক চিত্র-নৈপুণ্যে পৌরাণিক কাহিনী সকল যেন অভিনয়ের সজীবতা লাভ করিত।* এই দৈনন্দিন সান্ধ্য-বাসরে গিরিশকে দেখিলে মনে হইত যেন দিনের সেই দুর্দ্দান্ত দানবের দেহে সমবেদনাময় ভাবপ্রবণ হৃদয় লইয়া এক কুসুম-সুকুমার দেবশিশুর আবির্ভাব হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের ভাব-প্রবণ হৃদয়ের আভাষ দিবার নিমিত্ত আমরা এই সকল সান্ধ্য-দৃশ্যের একটি চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিব। সে দিন অক্রুর সংবাদের কথা হইতেছিল। ক্রুর অক্রুর কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য রথ আনিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের আজ বড়ই দুর্দ্দিন। গোকুলচন্দ্রের আসন্ন বিরহে ব্রজপুরী আচ্ছন্ন। আজ তরুপত্রে মর্ম্মর নাই, কুঞ্জবনে গুঞ্জন নাই, বিহগ-বিহগী নিস্তব্ধ। লতা আজ ফুলের সাজ খুলিয়া ফেলিয়াছে, গাভী তৃণ ছাড়িয়াছে, ব্রজবাসীগণের হাহাকারে ও তপ্তশ্বাসভারে বাতাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল যমুনা গুন্ গুন্ স্বরে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নন্দ-যশোদার হৃদয়, রাধিকার প্রেম, গোপ-গোপীগণের অশ্রুপিচ্ছিল পথ দলিত করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া অক্রুরের রথ গভীর ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া গেল। গিরিশের বৃদ্ধ খুল্লপিতামহী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। রুদ্ধ শ্বাস,

* 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে সমাজ-স্রষ্টার উপর শিক্ষিতা ঠাকুরমার প্রভাব শিশুকাল হইতেই কিরূপ বিস্তার করে।

অশ্রুসিক্ত বালক প্রশ্ন করিল, "কৃষ্ণ চলে গেলেন, আবার কবে এলেন ?" খুল্ল পিতামহী বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "আর ভাই এলেন না।" গিরিশ ব্যথিত স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কখনও এলেন না ?" বৃদ্ধা তেমনি কাতর-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "না ভাই।" আবার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন হইল "আর মোটে না ?" কোন উত্তর না পাইয়া মর্ম্মাহত বালক কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল। তিন দিন আর পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিতে আসিল না। গিরিশ বলিতেন, "বুড়ীর গল্পে আমার মনে এমন গভীর বেদনার উদয় হয়েছিল যে এখনও মনে হলে আমার মনে গভীর দুঃখ হয়। আমি মাথুরলীলা এখনও পড়তে পারি না। ছেলেবেলা এই পুরাণ-প্রসঙ্গ আর বড় হয়ে দিগম্বর কথকের কথকতা শুনে পৌরাণিক নাটক লেখা আমার এমন সহজসাধ্য হয়েছিল। রসের অবতারণায় দিগম্বর অদ্বিতীয় ছিল।"

বাল্য ও যৌবনের এই পুরাণ-প্রসক্তি গিরিশচন্দ্রের উপর যে কিরূপ জীবনব্যাপী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তিনিই বুঝিবেন, যিনি গিরিশের মুখে কখনও পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিয়াছেন, এবং তদালোচনায় তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা ও উন্মাদনা দেখিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের বসতবাটীর মজলিসে যেদিন কেদারনাথ চৌধুরী * উপস্থিত হইতেন

* ইনি ডায়মণ্ড-হারবার এলেকার যাটেশ্বর গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার দাস চৌধুরীদের বংশোদ্ভব। অনুমান ১৮৫০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজি ইতিহাস ও বাঙ্গলার পুরাণ সাহিত্যে ইঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। সঙ্গীত বিদ্যার সুরতালেও ইনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত কলানুরাগী গিরিশ বলিতেন, "আমি অনেক আসরে উৎকৃষ্ট গীতবাদ্য শুনিয়াছি, কেদারনাথের ন্যায় তালবোধ খুব অল্প লোকেরই দেখিয়াছি।" ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কেদারনাথ কিছুদিন ন্যাশনাল থিয়েটারের 'লেসী' হইয়াছিলেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ইঁহার অধ্যক্ষতা কালে ইঁহার 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন' নাটক ও এমারেল্ড থিয়েটারে অধ্যক্ষতা কালে ইঁহার রচিত 'ছত্রভঙ্গ' নাটক অভিনীত হয়। কেদারনাথ অতি সুরসিক, সুপণ্ডিত, সুকবি, সদালাপী ও সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' 'বসন্তরায়' নাম দিয়া অভিনয়ার্থে নাটকাকারে পরিণত করিয়া দেন। এই সকল নাটকে কেদারনাথ অনেকগুলি গীত যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বসন্তরায়' নাটকে সংযোজিত প্রসিদ্ধ গীতখানি তাঁহারই রচিত।

সেদিন পুরাণ, ইতিহাস ও নাট্য-প্রসঙ্গে গিরিশের বসিবার কক্ষ যেন আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। মনে হইত কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বাঙ্গলার মহাকবিগণ যেন এই দুই রস-পাগলকে আবিষ্ট করিয়া তাঁহাদের সম্মোহন বিদ্যার পুনঃ পরিচয় দিতেছেন। দুই জনের হাতেই হুঁকা, হাত হইতে নামিতেছেনা অথচ মুখেও উঠিতেছে না। কলিকার পর কলিকা বদল হইতেছে, মনক্ষোভে তামাক আপনি পুড়িতেছে, কিন্তু ধূমপান আর হইতেছে না, অবসর কোথায়? বগ্‌নোর পর বগ্‌নো ভরিয়া পান উজাড় হইতেছে, পৌরাণিক চরিত্রের বিশ্লেষণ চলিতেছে ও কবিতার আবৃত্তিতে উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না ভুলিয়া শ্রোতৃবর্গ নিশ্চল হইয়া শুনিতেছেন। যাইবার সময়ে সকলেই বলিয়া যাইতেন, "এ কর্ম্মনাশা ঘর, এখানে এলে ওঠবার যো নেই, আর কোন কাজ হবারও যো নেই।" *

কেহ পুরাণের নিন্দা করিলে গিরিশ বলিতেন, "তুমি কি বল্‌ছ তুমি নিজেই তা জাননা।" পুরাণ সম্বন্ধে গিরিশের আর এক দক্ষতা ছিল, তাঁহার অদ্ভুত কথকতা শক্তি। কেদার বাবুর বাসায় একদিন কথকতার কথা উঠে। তখন শ্রীধর, ধরণী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কথকগণ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; কথকতার উপর শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধারও অভাব হইয়াছে। একজন বলিলেন, "হাজার ক্ষমতাবান

"মুখের হাসি চাপলে কি হয়
প্রাণের হাসি চোখে খেলে;
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়
প্রাণের তুফান ঢেউয়ে চলে
লাজের শাসন মানে কি মন
সরম ভূষণ নারীর বলে;
ব্যথায় ব্যথী হয়লো যে জন,
তারে কি ভুলাবি ছলে?"

* গিরিশচন্দ্রের নিকট-আত্মীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কেদারনাথের সহিত গিরিশচন্দ্রের পুরাণ-প্রসঙ্গ আলোচনার চিত্র আমার নিকট এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

কথক হ'ন, এক আসনে বসিয়া একজনে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিনয়, নানা রসের অবতারণা, চরিত্র আর ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন কি সম্ভবপর?" তথায় উপস্থিত গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "পারা যায় কিনা আমি কাল তোমাদের কথকতা করে' শোনাব।" পরদিন কেদারনাথের বাসায় গিরিশচন্দ্র 'ধ্রুব-চরিত্র' প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কথকতা শক্তিতে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। গিরিশের 'ধ্রুব-চরিত্র' নাটক ঐ দিনের কথকতার ধারায় রচিত।

গিরিশচন্দ্রের বাল্য-জীবন ছাড়িয়া কথায় কথায় আমরা অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক দেখিয়াছেন পিতার আদরে এবং মাতার হতাদরে তাঁহার অন্তরে এক বিষম দ্বন্দ্ব চলিতেছে। পুরাণ-কাহিনী শ্রবণে কৌশল্যা, যশোমতী প্রভৃতির অপরিসীম পুত্রবাৎসল্য যে ভাব-প্রবণ হৃদয়ে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল, নিজ জননীর অনাদরে সে হৃদয় অনুক্ষণ ব্যথিত হইতেছিল, সে কথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যিনি অলক্ষ্যে বসিয়া গিরিশের কবিচিত্ত গঠন করিতেছিলেন, তিনি অকস্মাৎ একদিন মাতৃহৃদয়ের অপার করুণা ও অতুলনীয় মহিমা সম্বন্ধে অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন। সে দিন গিরিশচন্দ্র কর্ণমূল স্ফীতি জনিত জ্বরে অঘোর অচৈতন্য। যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তাঁহার কাণে গেল মাতা পিতাকে বলিতেছেন, "তুমি কোনো রকমে গিরিশকে রক্ষা কর।" গিরিশের সম্বন্ধে জননীর বাহ্যিক উপেক্ষা বিচক্ষণ নীলকমলও বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার এই আকস্মিক ব্যাকুলতায় বিস্ময় বিহ্বল নীলকমল বলিলেন, "গিরের জন্য আজ হঠাৎ তুমি কাতর হচ্ছ যে?" উত্তরে মাতা বলিলেন, "কি জান আমি রাক্ষুসী, গোপালকে খেয়েছি; গিরে আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান, পাছে আমার কুদৃষ্টিতে ওর অমঙ্গল হয় তাই ভয়ে আমি ওকে কাছে আসতে দিতুম না। বাছা একবিন্দু আদরের জন্য আমার কাছে এসেছে, আমি দূর দূর করে' তাড়িয়ে দিয়েছি,—ওর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে গেছে তবু আমি এক দিনের তরে কোলে করিনি, একটি মিষ্টি কথা বলিনি, আমার হেনেস্তায় কত ক্লেশ পেয়েছে। আর আমি সইতে পারছিনি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।"

মাতৃত্বের এই আত্মত্যাগনিষ্ঠ কল্যাণ মূর্ত্তি গিরিশের হৃদয়ে যে অনৈসর্গিক ভাবের বিকাশ করিয়াছিল, তাহার পরিস্ফুট চিত্র আমরা 'জনা' 'পূর্ণচন্দ্র' প্রভৃতি বহু নাটকে দেখিতে পাই, বিশেষতঃ 'অশোকে'। অশোকের মাতা সুভদ্রাঙ্গী আশোককে বলিতেছেন—

"বুঝিবা জানিতে মোরে মমতা-বর্জ্জিত
বুঝিবা ভাবিতে মম আদরের ত্রুটি ;
কিন্তু শোনো বৎস,
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে,
রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার
দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ,
স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু।" [১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক]

কিন্তু বিধাতা গিরিশচন্দ্রের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে এই মঙ্গল সমুজ্জল মাতৃ-মূর্ত্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া তাঁহার বহিশ্চক্ষুর অগ্রভাগ হইতে তাহা চিরদিনের মত অন্তর্হিত করিয়া দিলেন। উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই নীলকমল-গৃহিনী একটি মৃত-কন্যা প্রসব করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, সহসা নীলকমলের গৃহের দীপ নিভিয়া গেল। গিরিশের বয়স তখন একাদশ বৎসর। এই দিনের এই নিদারুণ স্মৃতি তিনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। 'বুদ্ধদেব' নাটকে বুদ্ধদেবের জন্ম ও তাঁহার প্রসূতি মহামায়ার মৃত্যু বর্ণনাচ্ছলে রাজমন্ত্রীর মুখে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"মহারাজ, জন্মেছে নন্দন ;
কিন্তু হে রাজন্,
জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ,
মূর্চ্ছাগত রাজরাণী,
রাজ-বৈদ্যগণে
সযতনে চেতন করিতে নারে।"—[১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক]

গিরিশচন্দ্রের মাতৃ-স্মৃতির পরিচয় আমরা 'গোবরায়'ও এইরূপ পাই।—"আসন্ন সময়ে গিন্নি কর্ত্তাকে বলিলেন—'বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই। কিন্তু বাছা সকলের কাছেই দুরন্ত শুনিতে পাই; আমার তাড়নায় কেঁদেছে মাত্র, কখনও মুখ তুলে চায় নাই। আমার পুত্র-স্নেহ আমি তোমায় দিয়া গেলাম।' উমাচরণ শুনিল, 'মা' 'মা' রবে উচ্চশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই দিনেই ব্রাহ্মণীর গঙ্গালাভ হয়।"

কঠোরতার অন্তরালে কোমল মমতাময় জননী-হৃদয়ের পরিচয় পাইবার পরই মাতৃবিয়োগ গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত করিল। কিন্তু স্মৃতি চিরস্থায়ী হইলেও শোক এ বয়সে চিরস্থায়ী হয় না। গিরিশ ধীরে ধীরে আবার বয়স্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রীড়া-কৌতুকে মন দিলেন।

বিপত্নীক নীলকমল মাতৃহারা পুত্রকন্যাগণকে অধিকতর যত্নে পালন করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ গিরিশকে। তিনি জানিতেন এই দুর্ব্বোধ বালককে তাহার সংসারের কেহই বুঝে না। শান্ত হইতে বলিলে বালক অধিকতর দুরন্ত হয়।* জুজুর ভয় দেখাইলে জুজু দেখিবার জন্য বিষম আগ্রহ করিয়া ছুটে; বারণ ইহার প্রেরণার কার্য্য করে। নিষিদ্ধ ফল চয়ন করিবার নিমিত্ত ইহার ব্যগ্র কর নিরন্তর উত্থত হইয়া রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্র 'জনায়' স্বাহার মুখে নিজ চরিত্রের একটু আভাষ দিয়াছেন, "বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তার পণ।" একমাত্র নীলকমল বুঝিয়াছিলেন এই স্বেচ্ছাচালিত বালককে সাবধানে শিক্ষা দান না করিলে ইহার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হইবে না। নীলকমল গিরিশকে

* প্রাপ্ত বয়সে গিরিশচন্দ্র 'পূর্ণচন্দ্রে' পূর্ণচন্দ্রের মাতা ইচ্ছার মুখে নিম্নলিখিত ভাবে মাতৃশাসন বর্ণনা করিয়াছেন:—

"অশান্ত হইতে যবে বালক-বয়সে,
বুঝালে না মানিতে বচন,
তব ইষ্টকামনায় করেছি পীড়ন,
তাড়নায় করেছ রোদন—
এবে দেখ সে সকল মঙ্গলের তরে।"—[১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক]

কখনও দমন করিতেন না, একান্ত অন্যায় আবদার হইলেও তাহা পারৎপক্ষে পূর্ণ করিতেন। একদিন গিরিশ খিড়কীর বাগানে গিয়া দেখিলেন শশা গাছে একটি শশায় খড় বাঁধা রহিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঐ ফলটি গৃহ-দেবতা 'শ্রীধর'কে দিবার নিমিত্ত ঐরূপে স্বতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। এ ফল স্পর্শ করিতে জ্যাঠাইমার নিষেধ। তখনকার মত স্থির হইয়া বালক মনে মনে বলিল, বারণ, তবেত ঐ শশাটিই খাইতে হইবে। অপরাহ্নে নীলকমল কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন গিরিশ কাঁদিতেছে। পিতা ব্যস্ত হইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরে কাঁদছিস্ কেন রে?" পুত্র তাহাতে অধিকতর কাঁদিয়া উঠিল। নীলকমলের গলা পাইয়া গিরিশের জ্যাঠাইমা তথায় উপস্থিত হইলে নীলকমল জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরে কাঁদছে কেন বড় বউ?" জ্যাঠাইমা বলিলেন, "কি জানি ঠাকুর পো, বলছে তেষ্টা পেয়েছে, জল দিলে খাচ্ছে না।" পিতা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে?" গিরিশ বলিলেন, "জল খাবার তেষ্টা নয় বাবা, শশা খাওয়ার তেষ্টা।" নীলকমল হাসিয়া বলিলেন—"এই কথা?" তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে বাজার হইতে শশা কিনিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু গিরিশ বলিলেন, "বাজারের শশা নয়।" নীলকমল আরও আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি শশা?" "খিড়কীর বাগানের যে শশায় খড় বাধা আছে সেই শশা।" দেবর পুত্রের উত্তর শুনিয়া জ্যাঠাইমা একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, "হতভাগা ছেলে, ঠাকুরকে দেবার জন্যে আঁক বেঁধে রেখেছি সেই শশা না খেলে তোমার তেষ্টা ভাঙ্গবে না। আমি বলি জল দিতে যাই খায়না কেন? ঠাকুর পো কক্ষনো তুমি ও শশা দিতে পারবে না।" নীলকমল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বড় বউ, বালক যার জন্য এত করে' কাঁদছে, ঠাকুর কি সেই শশা তৃপ্তি করে' খাবেন?" "ঠাকুর-বামুন মানে না, কায়েতের ছেলে, আদরে আদরে ধিঙ্গি করে' তুলেছে" ইত্যাদি বলিতে বলিতে জ্যাঠাইমা চলিয়া গেলেন। গিরিশ সেই কুটো বাঁধা শশা খাইয়া শান্ত হইলেন।

কিন্তু এই মাতৃ-হৃদয়-সম্পন্ন মমতা-কোমল পিতার অন্তরালে যে

কঠোর শিক্ষক লুকাইয়াছিল সহসা একদিন তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গিরিশ অসহ্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন চতুর্দ্দশ বৎসর।

পুত্রশোক-কাতর, পত্নীবিয়োগ-বিধুর নীলকমল শোকের উপর্য্যুপরি শেলাঘাত অনেকদিন সহ্য করিতে পারিলেন না। অচিরেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। এবং ভগ্নদেহ লইয়াই কর্ম্মস্থলে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেহ আর বয় না, তাহার উপর পুরাতন রক্ত আমাশয় পীড়ার প্রকোপ। চিকিৎসকগণ কিছুদিন নদীবক্ষে বেড়াইবার উপদেশ দিলেন। নীলকমল শিশু পুত্রগণ সমভিব্যাহারে বজ্‌রা ভ্রমণে বাহির হইলেন। বজ্‌রা যেদিন নবদ্বীপের কাছে উপস্থিত হইয়াছে, সেই দিন অকস্মাৎ তুফান উঠিল। নদীবক্ষে বজরা টল্‌-টলায়মান। তরঙ্গভঙ্গে ভীষণ দুলিতে লাগিল। ভয়ে গিরিশচন্দ্র পিতার হাত ধরিলেন। দক্ষ মাঝি ছিল। অতিকষ্টে খোড়ে নদীর (জলঙ্গীর) খাঁড়ির ভিতর ঢুকাইয়া কোনরূপে বজ্‌রা বাঁচাইল। জীবন রক্ষা হইলে নীলকমল তীক্ষ্ণস্বরে গিরিশকে বলিলেন, "তুই আমার হাত ধরেছিলি যে। বজ্‌রা যদি ডুবতো আমি কি তোকে বাঁচাতুম? আমার কাছে তোর প্রাণ বড় না আমার? তোকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আপ্‌নি বাঁচবার চেষ্টা করতাম্।" গিরিশ বলিতেন, "অতি কঠোর শিক্ষা! কিন্তু জানলুম বিপদে ডুব্‌বার সময় হাত ধর্‌বার কেহ নাই।"

সে দিনকার সে বিপন্ন-তরণী, আসন্ন মৃত্যুছায়া, পুত্রের ভয়ার্ত্ত মুখচ্ছবি নীলকমলের শঙ্কিত চিত্তে তাঁহার সংসারের ভাবীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল কি না কে বলিবে! কিন্তু বিচক্ষণ নীলকমলের তাৎকালিক আচরণ দেখিলে মনে হয় তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার বিপর্য্যস্ত সংসার-তরণীর কর্ণ এই চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের হস্তে ন্যস্ত হইবে। গিরিশ বলিতেন, "বাবা এমনি বিচক্ষণ ছিলেন যে *মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদের বিষয়-আশয় সম্বন্ধে যে কিছু বিপদাশঙ্কা আছে, যা* কিছু করতে হবে একখানি খাতায় সব এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রেখে

গেছ্‌লেন যাতে স্ত্রীলোক বালকেও তা দেখে বিষয়-রক্ষা করতে পারে।" তারপর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী বিধবা জ্যেষ্ঠ কন্যাকে নাবালকগণের অছি নিযুক্ত করিয়া শোকসন্তপ্ত নীলকমল সতী সাধ্বী পত্নীর উদ্দেশে মহাপ্রস্থান করিলেন। গিরিশচন্দ্রের স্কন্ধে সংসারের গুরুভার প্রদত্ত হইল। প্রাপ্ত বয়সে তিনি 'পূর্ণচন্দ্রে' সংসারের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

"অকূল পাথার সম ভীষণ সংসার,
ক্ষুদ্রতরী নর তাঁহে ভাসে ;
ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে করিছে খেলা
কখন সে ক্ষুদ্রতরী গ্রাসে !"—[১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক]

সমগ্র ভারতে তখন মহা হুলস্থুল। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে প্রায় বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজ্য টলমল করিতেছে। সিপাহী সৈন্য বিদ্রোহী হইয়াছে ; মুসলমানগণ তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। গিরিশ বলিতেন, "সে ভয়ঙ্কর দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। বাহিরে যেমন বিভীষিকা আমার অন্তরেও তেমনি ঘোর বিভীষিকা। এই বিভীষিকা নিয়ে সংসারে আমার প্রথম প্রবেশ।"

পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পরে কালাশৌচান্তে কলিকাতাস্থ শ্যামপুকুর নিবাসী নবীনচন্দ্র দেব (সরকার) মহাশয়ের একমাত্র কন্যার সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হইল। বিবাহের দিন আমোদ-আহ্লাদ হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল নিমতলার কাঠের গোলায় আগুন লাগিয়াছে ; অগ্নিদেবতা প্রতি পদক্ষেপে আপনার চরণ-চিহ্ন রাখিয়া ক্রমে ঈশান কোণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোথায় পরিণয়ের আমোদ-প্রমোদ আর উৎসবের উল্লাস। কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ যাঁহাদের আবাস অগ্নির সঞ্চারপথের অভিমুখে, তাঁহারা ত্রস্ত হইয়া বিবাহের আসর ত্যাগ করিয়া গেলেন। অগ্নি ক্রমে বাগবাজার পল্লীর নিকটস্থ হইলে, প্রতিবাসীগণও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। উৎসব ভবনের দীপ্তি যেন নিভিয়া গেল। অবশেষে গিরিশচন্দ্রের বাটীর পশ্চিমস্থ এক সুবৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষ ভস্মীভূত করিয়া নির্ব্বাণের পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রকে যেন তাঁহার আশ্রয় স্বরূপ সংসার বৃক্ষের ভাবী চিত্র ইঙ্গিতে দেখাইয়া গেল।

পিতার অবস্থা বিপর্য্যয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মহাকবি সেক্সপিয়র সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাল্য ও যৌবনের এই বয়ঃসন্ধি সময়েই পিতার মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্রকেও সংসারের কণ্টকাকীর্ণ কঙ্কর পথে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "কর্ম্মক্ষেত্রে যাকে যে কাজ করতে হবে, যার যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, ভগবান তাকে তেমনি শিখিয়ে পড়িয়ে নেন্। চোদ্দ বছর বয়সে আমার বাপ মরে' গিয়েছিল। তা না হ'লে সংসারে স্বাধীনভাবে বেড়াতে পারতুম না। যাত্রা-থিয়েটারের দলেও মিশতে পারতুম না। মাথার উপরে কেউ ছিল না বলে' আমাকে সর্ব্বদাই লোক চিনে চল্‌তে হ'ত।" গিরিশচন্দ্র তাঁহার সংসারগত শিক্ষা সম্বন্ধে 'অশোক' নাটকের অকাল চরিত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। দীনবেশী অকাল অর্থহীন, আবাসহীন—সংসারে অভাগা অবস্থায় দীক্ষিত হইয়াও সত্যকথা বলিতে তিনি ভীত নহেন। অশোক তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—"তোমার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতের ন্যায়।" অকাল—"দীন পিতামাতা বাল্যকালেই মরে গেলেন, সেই হতেই আজীবন শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছি।"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"বাবা মারা যেতে আমার প্রথম ভাবনা হয়েছিল ভাইগুলিকে মানুষ করব কেমন করে'; তাই দিদিকে বলেছিলুম বিকেলে আর জলখাবার কর' না, আমাদের দুটি-দুটি মুড়ি দিও। কিন্তু বাবা মোটা ভাত মোটা কাপড়ের যোগাড় করে' রেখে গিয়েছিলেন। নইলে কি সখ্ নিয়ে মেতে বেড়াতে পারতুম্?"

আমরা দেখিয়াছি গিরিশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই স্বেচ্ছাচালিত। নীলকমল তাঁহাকে কখনও বাধা দেন নাই। বালক আসিয়া বলিল, "ও-স্কুলের মাষ্টার মারে, ওখানে আর পড়া হবে না।" নীলকমল বলিলেন, "বেশ।" এইরূপে পিতার অনুমতি সহকারে এবং পরে আপন ইচ্ছায় বিদ্যালয়ের পর বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন করিয়া গিরিশ আঠার বৎসর বয়সে বন্ধুবান্ধবগণের বিশেষ অনুরোধে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। এরূপ অবস্থায় ফল যেরূপ হইতে পারে তাহাই হইল। নিষ্ফল হইয়া গিরিশ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সাঙ্গ করিলেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাবস্থায় গিরিশচন্দ্রের জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা অবগত হইতে পারি নাই। কিন্তু সহপাঠিগণের সহিত মিষ্টালাপ ও সহৃদয় ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহারই সতীর্থ পরলোকগত জষ্টিস্ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় গিরিশ-স্মৃতি-সভায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। "যখন স্কুলে পড়িতাম গিরিশচন্দ্রের মিষ্ট আলাপ, বাক্‌পটুতা ও সহৃদয় ব্যবহার বড় ভাল লাগিত; তার কথা শুনিবার জন্য আমরা সকলে তাহাকে ঘিরিয়া বসিতাম।"

জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অভিভাবকতায় সংসার নির্ভাবনায় চলিতেছে। শাসন-ভয়ে সংযত হইয়া চলিতে হইবে এমন কেহ নাই; চিরদিন স্বেচ্ছাচালিত গিরিশচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতা দিনে দিনে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু নিজ পল্লীতে তিনি উপকার ব্যতীত কাহারও অপকার সাধন করেন নাই। সে সময় একদল ভণ্ড সন্ন্যাসী ছিল। দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহস্বামীগণ কর্ম্মস্থলে গমন করিলে তাহারা কুলমহিলাদিগকে ভয় দেখাইয়া মাশুলের মত ভিক্ষা আদায় করিত। গিরিশ বলিতেন, "এদের এক বুলি ছিল, শাঁক বাজিয়ে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করবে।" গিরিশ ইহাদিগকে পাড়ায় দেখিলেই তাড়া করিতেন এবং বিশেষ লাঞ্ছনা না করিয়া ছাড়িতেন না। গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার দল পাড়ায় থাকিতে ইহারা যেন যাদুবিদ্যাবলে অন্তর্হিত হইয়া যাইত। কিন্তু অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর ভাবাপন্ন হইলেও গিরিশের কোমল চিত্তবৃত্তির পরিচয় আমরা এই সময় হইতেই পাইয়া থাকি। পাড়ার কোথায় পীড়িতের সেবা হইতেছে না, গিরিশ তাহার ঔষধ-পথ্য ও সেবা-শুশ্রূষার বিধান করিতেছেন। মৃতের সৎকার হইতেছে না, গিরিশ সদলে অগ্রসর। এইরূপে কেবল পর-কার্য্যে কালক্ষেপ করার জন্য গৃহে যে সময় সময় তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কারণে পল্লীর কর্ত্তৃপক্ষগণ একদিকে তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন অন্যদিকে আবার তেমনি ভয়ও করিতেন, বিশেষ পল্লীর গৃহিণীগণ। ইঁহারা দেখিতেন পাড়ায় সাপুড়ে সাপ খেলাইতে আসিয়াছে, আর এই দুর্দ্দান্ত ষণ্ডা গুণ্ডা তাহার সহিত বাণ

খেলিতেছে। গিরিশ বলিতেন, "বাণ খেলা যে যো (যোগ ?) সাজোসে চলে পাড়ার গিন্নীরা তা বুঝতেন না। পাছে রাগের মাথায় কাউকে বাণ মেরে ফেলি এই ভয়ে তাঁরা তাঁদের বাড়ীর ছেলেদের আমার সঙ্গে মিশতে বারণ করতেন। সে এক বিপদ—কেউ কাছে ঘেঁসে না।" 'মায়াবসানে' গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই বাল্য-স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্নপূর্ণা হলধরকে প্রশ্ন করিতেছেন—"হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, চিরকাল বাউণ্ডুলেগিরি ক'রে বেড়াবে ?" তাহাতে তাহার আশ্রিতা বিন্দু বৈষ্ণবী উত্তর দিতেছে—"কেন বৌঠাকৃরুণ, তোমার দেওর যে সব বিত্তে শিখেছে ; তুবড়ীওয়ালাদের সঙ্গে বাণ খেলে, আমায় ডাইনীর মন্ত্র দিতে আসে ; একটা বৈরাগীকে তোমাদের খিড়কীর পুকুরে দশরথ ক'রে রেখেছে, আমায় বলে, বৈষ্ণবী ক'রব।" প্রত্যুত্তরে অন্নপূর্ণা দেবরকে স্নেহের তিরস্কার করিতেছেন—"হ্যাঁরে তুই বাণ খেলিস্ ? কালামুখো, এই ক'রে কোন্ দিন মরবি, তার ঠিক নাই। লেখাপড়া শিখ্লিনে, একটা কাজকর্ম্ম কর, তা নইলে বেটাছেলে বাড়ীতে ব'সে থাক্লে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমি কত দিন বলেছি…………তা হতাক্কেল ছোঁড়া এ কান দিয়ে শোনে, ও কান দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়।"

দৃশ্য কাব্যের এই চিত্র হইতে গিরিশের গৃহ-চিত্র আমাদের মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠে। এই সব বয়াটে বাউণ্ডুলে বৃত্তির জন্য গিরিশচন্দ্রের জেঠাইমা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অনুযোগ যেন আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহার প্রতি তিরস্কার বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে সে 'হতাক্কেল ছোঁড়া এ কান দিয়ে শোনে আর ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়'। সংসারের অভিভাবিকা হইলেও ইঁহারা দুর্দ্দান্ত বালককে সংযত করিয়া রাখিতে পারিতেন না। * কৈশোর ও যৌবনের মধ্যে ঠিক কোন্ সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয়

* কথিত আছে মহাকবি সেক্সপিয়র 'ট্রয়লাস্ ও ক্রেসিডা' নাটকে তাঁহার কৈশোর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—"My thoughts were like unbridled children grown too head strong for their mother."
—*Life of Shakespeare* by *Oliphant Smeaton.*

করা দুঃসাধ্য। তবে তাঁহার 'অতীত' শীর্ষক কবিতায় এ সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"অতীত শৈশবকাল আগত যৌবন,
সলিল কর্দ্দমময়, খর সমীরণ বয়,
ভীষণ তরঙ্গমালা দিল দরশন।"

যৌবনের এই উচ্ছৃঙ্খলতা গিরিশ পূর্ব্বোক্ত 'গোব্‌রা' আখ্যানেও বিষদ্‌রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"এ দিকে উমাচরণ দিগ্‌গজ হইয়া উঠিয়াছে। অসামান্য বুদ্ধিবলে কিছু শিখিতে পারে বটে; কিন্তু মাষ্টার পণ্ডিতকে ঘুষ দিয়া বশ করিয়াছে।······সৃষ্টির অকার্য্য কুকার্য্য পাড়ার ছেলেরা যত করে, তার সর্দ্দার উমাচরণ। কুসংসর্গের ভয়ে চাটুর্য্যে মহাশয় স্কুলে দেন নাই। সে স্কুলের পক্ষে মঙ্গল; স্কুলে গেলে সকলকে 'বয়াটে' করিত।"

এই সময়ের আর একটি ঘটনা গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের উপর প্রগাঢ় ছায়াপাত করিয়াছিল। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কোন একটি সম্পত্তি হস্তগত করিতে না পারায় নির্ব্বোধ আহাম্মুখ বলিয়া ঘরে-পরে তাঁহার বিস্তর লাঞ্ছনা ঘটে এবং লোকের কাছে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার অন্তর উত্তেজিত হইয়া উঠে। সত্যের প্রতিষ্ঠা যে মানবের অন্তরে, লোকমুখে নয়, সে কথা বুঝিবার বয়স তখনও গিরিশ-চন্দ্রের নয়। জননীর নিকট দণ্ডভয় সত্ত্বেও যে-বালক কখনও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিত না, অভিমান ও গর্ব্বের প্ররোচনায় তাহার সে সত্যনিষ্ঠ হৃদয় সহসা আহত হইয়া এখন হইতে কুটিল পন্থা অবলম্বন করিল। কিন্তু তাঁহার এই ভ্রান্তি চিরজীবনের জন্য তাঁহাকে অনুতপ্ত ও ব্যথিত করিয়া রাখিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত 'অতীত' শীর্ষক উচ্ছ্বাসে তিনি লিখিয়াছেন—

"ফুরাইল সরলতা স্বর্গীয় ভূষণ,
জড়িত হীরকমালে, মুকুট পরিয়ে ভালে,
পাব কি প্রফুল্ল আঁখি অন্তর দর্পণ?"

তারপর অপ্রত্যয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"যে আদরে তোরে—তার সুচতুর নাম,
বারাঙ্গনা সম তব বিমোহিনী ঠাম ;
জ্বালায় জ্বলিয়ে মরে, তবু তোরে যত্ন করে,
নির্ব্বোধ বলিয়ে খ্যাতি তুমি যারে বাম,
নর-হৃদি বিনা তব আছে কিহে ধাম ?"

'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ আহত অভিমানে বলিতেছেন, "সে দিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি বলে আমায় লোকে জান্‌তো।" মিথ্যার উপর গিরিশের স্বাভাবিক ঘৃণা তাঁহার রচনার বহু স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং 'মায়াবসান' নাটকে কালীকিঙ্করের উক্তিতে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাষ আছে ঃ—"উন্মাদ ! উন্মাদ ! উন্মাদ ভিন্ন এ সংসারে সত্য কথা কে বলতে চায় ! মিথ্যা সাক্ষী দিতে কে নারাজ হয় ? ব'য়ে লেখা আছে, সত্যকথা বলতে হয় ; পরামর্শ দিতে হয়, সত্যকথা বলতে হয় ; ছেলেদের শেখাতে হয়, সত্যকথা বলতে হয় ; বড় হলে সত্যকথা বলতে নেই, বিষয়-কর্ম্মে সত্যকথা বলতে নেই ; পাগলে বলে, পাগলে বলে—বুঝলে ?" কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নৈতিক অবস্থা ও চরিত্র সঙ্গদোষে এবং স্বীয় হৃদয়ের উত্তেজনায় দিন দিন স্খলিত হইলেও তাঁহার অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তি সকল একেবারে উন্মূলিত হয় নাই। 'নলদময়ন্তী'তে বিদূষকের কথায়, "গুরুমশায় যে কানমলে দিলেন, নইলে 'ক' 'খ' শিখতুম্"—লোক-শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, তাহা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষকের তাড়নায় দেবী সরস্বতীকে রাক্ষসীজ্ঞানে যে বালক দূরে পরিহার করিত, গুরু মহাশয়ের কানমলা ভয়ে মুক্তি পাইয়া চিরকাল স্বেচ্ছাচালিত গিরিশচন্দ্র যৌবনের এই দুর্ম্মতির ও দুর্নীতির দুর্দ্দিনেও তাহাকে স্বেচ্ছায় সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। ব্রজবিহারী সোম নামে গিরিশের এক প্রতিবেশী এবং সহৃদয় সতীর্থ তাহাকে দিন দিন কুপথগামী হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া এক দিন বলেন, "ঘরে ভাত থাক্‌লেই কি উচ্ছন্ন যেতে হয় ?" গিরিশচন্দ্রের চিরদিন স্বভাব ছিল তাঁহার হিতার্থে প্রযুক্ত তিরস্কার বাক্যও তিনি

আদরে ও অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেন। এখন হইতে ব্রজবিহারীর প্ররোচনায় ও উৎসাহে গিরিশচন্দ্র ইংরাজি ও বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন। উত্তর কালে এই ব্রজবিহারী সোম সব্‌জজের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার বাল্যপ্রীতি ও বাল্য-ব্যবহার চিরদিন বিদ্যমান ছিল। গিরিশও ব্রজবিহারীর বন্ধুপ্রীতি এবং হিতৈষণা জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। বার্দ্ধক্যে জীবনের মেঘাবৃত দিনে আমরা দেখিতে পাই যৌবনের এই প্রীতিস্মৃতি গিরিশের হৃদয়ে ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকবৎ চকিত হইতেছে। 'বলিদান' নাটকে কিশোর করুণাময়কে বলিতেছে, "আপনি আমাকে ধম্‌কে বলেছিলেন, বড়মানুষের ছেলে হলে কি পড়াশুনো করতে নাই?"

গিরিশচন্দ্র জন্মিবার পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। বাংলার ঘরে ঘরে তখন গুপ্ত-কবির অসীম সম্মান, 'কবি' 'হাফ্‌ আখ্‌ড়া' প্রভৃতির আসরে তাঁহার অসীম প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন স্বর্গারোহণ করেন তখন গিরিশচন্দ্রের বয়ক্রম পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। গিরিশ বলিতেন, "পাড়ায় ভগবতী গাঙ্গুলীদের বাড়ীতে একদিন হাফ্‌-আখড়াই শুনতে যাই, গিয়ে দেখি এত ভিড় যে বড় বড় লোক সব কল্‌কে পাচ্ছেন না—আমাদের কে আমল দেয়! এমন সময় সামান্য কাপড়-চোপড় পরে' একটি লোক এল, আর অম্‌নি সভার সব বড় বড় লোক তাঁকে আপ্যায়িত করবার জন্য ছুটে এল। অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস্ করলুম 'লোকটা কে?' শুন্‌লুম ঈশ্বর গুপ্ত—হাফ্‌ আখড়ার গান বাঁধতে এসেছে। সমস্ত লোক যেন তাঁকে এক সঙ্গে অভ্যর্থনা করলে!" কবির এত আদর! সেই জনতার গুঞ্জনে ভাবী কবির শ্রবণে বাণীর আহ্বান ধ্বনিত হইল।

একবার কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়া গেলে গিরিশচন্দ্র তাঁহার পরিণতি সাধন না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তিনি গুপ্ত-কবির সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'র গ্রাহক হইলেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কয়খানি পুস্তক তৎকালে

প্রচারিত হইয়াছিল সে সকলও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি বঙ্গ কবিগণের রচনা পুনঃ পুনঃ পাঠে তাঁহার একপ্রকার কণ্ঠস্থই হইয়া গিয়াছিল। শব্দ সম্পদে অতুল অপরিমিত ভাঁণ্ডার তাঁহার করগত ; ভাব ও ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য গিরিশ বাছিয়া বাছিয়া ইংরাজি কবিতার বঙ্গানুবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই একনিষ্ঠ সাধনা সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাব দিনে দিনে স্খলিত হইতে লাগিল। তাঁহার শ্বশুর নবীন বাবু জন্ এটকিন্‌সন্ কোম্পানির বুককিপার ছিলেন ; জামাতার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দর্শনে আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে শিক্ষানবিশ্ রূপে নিজের আফিসে বাহির করিলেন।

এখন হইতে ন্যূন্যাধিক পঞ্চদশ বৎসর গিরিশ সওদাগরি আফিসে চাকুরী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের এই সময়ের ইতিহাস ধারাবাহিক রূপে নিরূপণ করা অতীব দুরূহ। একদিকে যেমন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যদিকে তেমন বাণীর সাধনা ও অধ্যয়ন-নিষ্ঠা। গিরিশের মাতুল নবীনকৃষ্ণ বসু এই অধ্যয়ন-স্পৃহায় ইন্ধন প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার পদ্ধতিও অভিনব প্রকারের ছিল। গিরিশ যুক্তি-বিচার না করিয়া কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি-বিশেষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন না। মাতুলের সহিত এইরূপ কোন কোন সিদ্ধান্ত লইয়া সময় সময় তাঁহার তর্ক বিতর্ক হইত। কিন্তু প্রবীণ বিদ্যাবিশারদের সহিত তর্ক বিচারে অনভিজ্ঞ অল্প বিদ্যালব্ধ শিক্ষার্থীর যে দুর্দ্দশা হয়, গিরিশেরও তাহাই ঘটিত। গিরিশ জিজ্ঞাসিতেন, "আপনি এসব কথা কোথায় পেলেন ?" মাতুল বলিলেন, "তুই এই-এই বই পড়, তা হলেই পাবি।" গিরিশ ভাবিতেন এই কয়খানা পুস্তক পড়িলেই এ সম্বন্ধে মাতুলের বিদ্যা আয়ত্ত করিব। পুস্তক কয়খানি পাঠ করিয়াই গিরিশ মাতুলের নিকট উপস্থিত হইতেন। কিন্তু মাতুল অভিনব ধারায় তর্ক তুলিতেন। বিস্মিত গিরিশ জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনি যে-সব বইয়ের নাম করেছিলেন, তার ভিতর ত এসব কথা নাই ?" উত্তরে নবীনকৃষ্ণ আরও কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া ভাগিনেয়কে পাঠ

করিতে অনুরোধ করিতেন। এইরূপ উত্তরোত্তর আলোচনা-চর্চ্চায় গিরিশের শিক্ষার পসার দিন দিন বাড়িতে লাগিল ; এবং তাঁহার অধ্যয়ন-অনুরাগ ক্রমে নেশায় পরিণত হইল। একদিকে যেমন একনিষ্ঠ অধ্যয়ন, অন্যদিকে তেমনি উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির আকর্ষণ—এই দুই আকর্ষণে এখন গিরিশের চিত্ত দোদুল্যমান, উভয়েই সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কিন্তু যখন যে আকর্ষণ যতই প্রবল হউক না কেন, প্রভুর কার্য্য গিরিশ চিরসতর্কতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের আফিসে শিক্ষালাভ করিয়া আর্জ্জেন্টি সিলিজি কোম্পানির অধীনে তিনি সহকারী কেসিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। এবং তথায় কিছুকাল কর্ম্ম করিয়া পুনরায় এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের আফিসে সহকারী বুক্‌কিপার রূপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময় একদিন আফিস হইতে গৃহপ্রত্যাগমনের পর গিরিশ দেখিলেন, পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে মেঘ সঞ্চার হইতেছে ; তাঁহার মনে পড়িল, ঐ দিন আফিসের ছাদে নীল শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। নীল যদি ভিজে, সাহেবের অর্দ্ধলক্ষ টাকা লোকসান হইবে। গিরিশ আর কালবিলম্ব করিলেন না, আফিসে ছুটিলেন এবং কুলী ডাকাইয়া নীল গুদামজাত করিলেন। তিনি যখন ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত, সেই সময় স্বয়ং এট্‌কিন্‌সন্ আসিয়া উপস্থিত। গিরিশকে দেখিয়া সাহেব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "গিরিশ তুমি এমন সময়ে এ বেশে এখানে?" গিরিশ উত্তর দিলেন, "সাহেব, নীল শুকাইতে দেওয়া হয়েছিল, বৃষ্টির আশঙ্কায় আমি তাই গুদামে তুল্‌তে এসেছি।" গিরিশ বলিতেন, "আমি যখন নীল তুলে' আফিস থেকে বেরুলুম তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পরদিন আফিসে গিয়ে অতিরিক্ত কুলীখরচার বিল করলুম। ছোট সাহেব তা পাশ করলেন না, আমি বড় সাহেবের সুমুখে ধরলুম। এট্‌কিন্‌সন্ তৎক্ষণাৎ সই করে' দিয়ে উঠে লোহার সিন্দুক খুল্‌লেন তারপর আমায় বল্‌লেন 'গ্রীস্, রুমাল বার কর, এর ভেতর থেকে তিন আঁজলা টাকা তুলে নাও।'" এই তিন অঞ্জলি মুদ্রা গিরিশের প্রশংসনীয় সতর্কতা ও কার্য্যতৎপরতার পুরস্কার।

সাহিত্য সাধনায় গিরিশচন্দ্র এখনও প্রধানতঃ অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী। এই সময় তাঁহার কোন বন্ধু বলেন, "ইংরাজির সব ভাব বাঙ্গলায় অনুবাদ হওয়া অসম্ভব।" কোন দুঃসাধ্য বা অসাধ্য কার্য্যের উল্লেখ মাত্রে তাহা সম্পাদন করার জন্য গিরিশ নিরতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" বন্ধু বলিলেন, "আমাদের ভাষায় শব্দের অভাব। এই ধর ম্যাক্‌বেথের উইচ্ (witch) অনুবাদ করবার মতন আমাদের ভাষা কোথায়?" কেহ বঙ্গভাষার দৈন্যের কথা বলিলে গিরিশ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। সম্ভবতঃ বন্ধুর এই মন্তব্যটি স্মরণ করিয়া তিনি উত্তরকালে রঙ্গালয়ের কোন প্রস্তাবনায় বলিয়াছিলেন,

দেবভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার
কোন্ ভাষে বাক্যে ভাবে হেন সংযোজন।

*　　*　　*　　*

মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমলে কলি
কোন্ ভাবে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে,
কালের করাল হাসি, দলকে দামিনী রাশি
নিবিড় জলদ জাল ঢাকে বা অম্বরে॥

অসম্ভব শুনিয়া গিরিশচন্দ্র ম্যাক্‌বেথের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সারাদিন আফিসে থাকা, সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব সমাগম, আমোদ-প্রমোদ গৃহে অনুবাদ কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইত না। কিন্তু আফিসে তিন জনের কর্ম্ম করিয়াও হাতে অনেক সময় থাকিত; সেই অবসর সময়ে অনুবাদ কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের সহিত তাঁহার অংশীদার বেইনক্রফট্ সাহেবের মনোমালিন্য ঘটায় এট্‌কিন্‌সন্ স্বদেশে চলিয়া গেলেন। বেইনক্রফট্ আফিস চালাইতে পারিলেন না; আফিস ফেল হইয়া টেবিল চেয়ার সমেত সব বিক্রয় হইয়া গেল। নিজের রচনা সযত্নে সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা কোন কালেই গিরিশের ছিল না। আফিস হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ কালে অনুবাদের পাণ্ডুলিপিখানি তিনি সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। যে টেবিলে তাহা থাকিত টেবিলের সঙ্গে তাহাও গেল। এই অনুবাদ তিন অঙ্ক অবধি সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

কোন্ সময় যে গিরিশচন্দ্র মৌলিক রচনায় প্রবৃত্ত হন প্রমাণাভাবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে তখনকার দিনে নিধুবাবু শ্রীধর কথক প্রভৃতি বিশিষ্ট রচয়িতাগণের সঙ্গীতের বিশেষ আদর ছিল। বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে কখনও বা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইঁহাদের আদর্শে গীত রচনা করিতেন। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিপথে আনিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। অবশেষে যখন ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে গিরিশের প্রধান উদ্যোগে বাগবাজারে একটি সখের যাত্রা-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া কবিবর মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনীত হয়, গিরিশ তাহাতে কয়েকখানি গীত রচনা করিয়া দেন। ইহাই গীত রচয়িতা বলিয়া সাধারণে গিরিশের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা। তারপর 'সধবার একাদশী', 'নীলদর্পণ', 'অভিমন্যু-বধ', 'উষাহরণ' প্রভৃতির গীত রচনায় এই প্রতিষ্ঠা অধিকতর প্রসার লাভ করে। এই সকল সঙ্গীতের কয়েকখানি মাত্র সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'গিরিশ গীতাবলী'তে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। রচনা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র কোন কালেই রক্ষণশীল ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যাহা রাখিবার উপযুক্ত, কাল তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখে। বলিতেন, "এখন লোকে ভাল বলুক মন্দ বলুক তাতে কান দেবার দরকার নাই। ভাল-মন্দের বিচার হবে পরে। সময়ের উপর ভার দিয়ে কাজ ক'রে চলে যাও, লোকের মুখের প্রতিষ্ঠা তার নিশ্বাসের মতই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, কাল যা রাখে তাই থাকে।"

'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয়কারী দল হইতে অভিনেতা নির্ব্বাচন করিয়া গিরিশ বাগবাজার সখের থিয়েটার সম্প্রদায় গঠিত করেন। ইহাই অনতিকাল পরে পেশাদারী থিয়েটারে পরিণত হইয়া এখন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। এই নাট্যশালার ইতিহাস যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। গৃহে অন্নাভাব ছিল না, মাথার উপরে অভিভাবক কেহ নাই, গিরিশ অসীম উৎসাহে একনিষ্ঠ চিত্তে যাত্রা থিয়েটারের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার উপর অধ্যয়ন ও বন্ধুবর্গ সম্মিলনে উচ্ছৃঙ্খল আমোদ। তাঁহার স্বভাব ছিল, কায়মনোপ্রাণ সম্পূর্ণ সমর্পণ না করিয়া আধা-খেঁচড়া কোনো কাজই করিতে পারিতেন না। তাই অধ্যয়নের সময় অতিপ্রিয়

সুহৃদকেও তাঁহার রুদ্ধদ্বার হইতে নিরাশচিত্তে ফিরিতে হইত। আবার উচ্ছৃঙ্খলতার উৎসবে দুই তিন দিন গৃহে তাঁহার ছায়াপাত পর্য্যন্ত হইত না। *কিন্তু যে অনুষ্ঠানে যে মুহূর্ত্তে আমোদের অভাব অনুভূত হইত,* সেইক্ষণেই তাহা হইতে বিরত হইতেন।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখনকার আদর্শ কবি লর্ড বায়রণের ঝাঁজ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত।—

"Man being reasonable must got drunk.
The best of life is but intoxication."

দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় ইহার যে চরমচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, গিরিশ কেবলমাত্র তাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সুরার মোহিনী আকর্ষণ এ সময় তাঁহাকে বিশেষরূপে সংযমভ্রষ্ট করিয়াছিল। তার উপর অতিরিক্ত আমোদ-প্রিয়তায় সময় সময় শিষ্টাশিষ্টের সীমা লঙ্ঘন করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইত না। বাস্তবিক ইয়ং বেঙ্গল সমাজে সে সময় পানাসক্তির এতদূর প্রাবল্য ঘটিয়াছিল যে সুরাপান সভ্যতা ও শিক্ষার অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ পরিগণিত হইত। এই ভয়াবহ অধঃপতনের জন্য এক-দিকে প্রবীণ প্রাচীনগণ যেমন হায় হায় করিতেছিলেন, অন্যদিকে সামাজিক কবির কণ্ঠেও তেমনি হাহাকার উঠিতেছিল—

"খেওনা, খেওনা, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা,
মদ বদ্ জিনিষ ভাইরে॥"

—প্যারীমোহন কবিরাজ

বায়রণ বলিয়াছিলেন—"Oh, pleasure you are indeed a pleasant thing." জীবন-সায়াহ্নে, রোগ শোক বিষাদ অবসাদ যখন গিরিশের হৃদয়ে নিবিড় ছায়াপাত করিয়াছিল, যখন তাঁহার সংসার-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ শান্তিলুব্ধচিত্ত শ্রীভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল—

একক বান্ধবহীন প্রবাসে নিবাস
কেহ আর নাহি আপনার,

বার্দ্ধক্যে অশক্ত দেহ—কৃপার প্রয়াস,
হৃদে সদা আতঙ্ক সঞ্চার ;
কাটে দিন নাহি রহে, স্মৃতিমাত্র কথা কহে
গোধূলি আলোক পিছে, সম্মুখে আঁধার
শূন্যপ্রাণ—কিছু নাহি আর !

সে সময়েও তিনি হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার চির-বাঞ্ছিতকে বলিয়াছেন—

আমোদ তুমি আমোদ বটে সমান কোমল কঠিনে,
এস, সরল-হৃদয় হৃদয়-নিধি বিফল সব তোমা বিনে।

বাস্তবিক তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, সকল আকাঙ্খার প্রয়োচনা ছিল আমোদ। বলিতেন, "যাতে আমোদ পাইনি, এমন কাজ আমি কখনও করিনি ; যদি ভগবান্‌কে খুঁজে আমোদ না পেতুম, পরমহংসদেবের সঙ্গ যদি আমোদ না দিত, তা হলে সে দিকে ঘেঁস্‌তুম না।" 'বিষাদে' আমোদের কথা এইরূপ বলিয়াছেন—

"অলর্ক—তবে কি তুমি আমোদ করবে ম'লে ? ছেলেবেলা আমোদ কর নি কেন—বিদ্যা হবে না। যুবা বয়সে আমোদ কর নি কেন—অর্থ হবে না। বুড়ো বয়সে আমোদ করবে না কেন—ভাল দেখায় না।

শিব—মহারাজ ! আমোদ করুন, আমি আপত্তি করি না। কিন্তু দিবারাত্র আমোদ, রাজার শোভা পায় না। আমোদের একটা সময় করুন।

অলর্ক—আমোদ করলেও না, আমোদের ধাতও বুঝলে না। আমোদ ক'রবো মনে কল্লেই যদি আমোদ হতো, তা হলে তুমি যা বলেছ, সময় ক'রে আমোদ করতেম। আমোদের উপাসনা ক'রতে হয় ; আমোদের যদি সখ হোলো তবে আমোদ এল, না হ'লে কেন মাথা খোঁড়ো না, দুশো নাচওয়ালী আন না, আমোদ আর হচ্ছে না।"

আবার 'অশোকে' তিনি হীন আমোদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"এ আমোদ না ছাই।"

কিন্তু সুরাপানজনিত আমোদ গিরিশকে অপরিমিত রূপে আকর্ষণ করিলেও তিনি সাধারণ মদ্যপায়ীর ন্যায় সুরার দোষ-গুণ সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ বলিতেছেন—"একি জান?—বিষ বল বিষ, অমৃত বল অমৃত।" 'মায়াবসানে' কালীকিঙ্কর বলিতেছেন, "একি জান?—এ অনেকের জীবন রক্ষা করেছে, আর অনেকের অট্টালিকা মাঠ করেছে। দেবাসুর উভয়েই এ পান করে।"

বাস্তবিক সাধারণ মদ্যপায়ীর ন্যায় গিরিশ সুরাকে কেবল মত্ততা জননীরূপে ব্যবহার করিতেন না। 'মদিরা' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

"সরলা তরলা আমি মানব-মোহিনী,
সঙ্গমত রঙ্গ মম কত ;
বাসনার অনুগামী আনন্দদায়িনী,
যে চাহে যে ভাবে তাহে রত।

যোগাসনে উচ্চ ধ্যানে উচ্চ কামনায়,
আমি তাঁর হৃদি-আমোদিনী ;
বিরাগী বাসনা তুচ্ছ করে যে হেলায়,
উন্মাদের আমি উন্মাদিনী।

শূর ধরি তরবারি শত্রুমাঝে ধায়,
নৃত্য যার অস্ত্র ঝন্‌ঝনে ;
তৃণজ্ঞান করে প্রাণ বীর গরিমায়,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী রণাঙ্গনে।

বিলাসী নেহারে হাসি রমণী-অধরে,
রসবতী দূতী আমি তার ;
ভাসাই মাতাই মন রসের লহরে
রঙ্গে খেলে তরঙ্গের হার।

নীচ সঙ্গে নীচ রঙ্গে করি নীচ সেবা,
তরলাঙ্গী ভাবের অধিনী ;
মনে মনে বুঝে দেখ নিন্দ মোরে যেবা
মত্ততার মঞ্চ এ মেদিনী।"

হীন সাহচর্য্যেও গিরিশচন্দ্রের মুখে কেহ কখনও নীচ প্রসঙ্গ শুনে নাই। উন্নত কায়, প্রশান্ত ললাট, বৃহৎ চক্ষু, বিশাল বক্ষ গিরিশ-চন্দ্রের অন্তরে বাহিরে কোথাও ক্ষুদ্রত্ব ছিল না। গুণেও নহে, দোষেও নহে। কিন্তু সে সকল ত্রুটি তাঁহার নশ্বর দেহের সঙ্গে ভস্মীভূত হইয়া-গিয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখন অনাবশ্যক, তবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, গিরিশ নিজেই বলিতেন "Speak of me as I am—আমি ঠিক যা, তাই বোলো, কিছু লুকিও না।"

যে লোক-হিতৈষণার প্রেরণায় গিরিশ ইতিপূর্ব্বে পীড়িতের শুশ্রূষায় ব্রতী হইয়াছিলেন, শ্যালক ব্রজনাথের উৎসাহে ও উত্তেজনায় তাহাই এখন তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি আলোচনা ও চিকিৎসায় নিযুক্ত করিল। বন্ধু-মণ্ডলীতে বিদ্যাবত্তার সুখ্যাতি, লোক-সমাজে সঙ্গীত-রচয়িতা ও সুনট বলিয়া সুনাম, দীনদরিদ্র ও অসমর্থ ভদ্রগৃহস্থগণের মধ্যে সুচিকিৎসক বলিয়া সুযশ ধীরে ধীরে গিরিশচন্দ্রকে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। কেবল এক অন্তরায়, তাঁহার অসংযত সুরাসক্তি ও সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতা। তাহাও তখন অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। গুণের আধিক্যে লোক দোষ ভুলিত।

কিন্তু দিন চিরদিন সমান যায় না। ষড়চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরকাল গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক ইতিহাস যেমন বিঘ্নবিপদময় অন্তরের ইতিহাসও তেমনি ঝটিকাসঙ্কুল।

এই চতুর্দ্দশবর্ষ ব্যাপী ইতিহাস ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ছায়ালোক সম্পাতে অতীব বৈচিত্র্যময়। সুখ ও দুঃখ যেন পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার জীবন লইয়া অক্ষক্রীড়া করিয়াছে। সুনট, সুকবি, সুচিকিৎসক বলিয়া একদিকে যেমন তাঁহার দুর্লভ সুনাম, চরিত্রস্খলন হেতু অন্যদিকে তেমনি দুরপনেয় দুর্নাম। আবার একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার

যেমন দুর্দ্দমনীয় প্রভাব, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার তেমনি অলৌকিক আবির্ভাব।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে গিরিশের এক ভগ্নী লোকান্তরিত হইলেন এবং অচিরে করাল টাইফয়েড্ জ্বরে তাঁহার অব্যবহিত অনুজ, বাল্যসহচর এবং সুহৃদ্ কানাইলাল বালিকা বধূ ফেলিয়া সংসারে শোক হাহাকার তুলিয়া ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। আবার এই হাহাকারের ভিতরই তাঁহার শোক-সমাচ্ছন্ন ভবনে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। গিরিশের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) জন্মগ্রহণ করিলেন। * সুরেন্দ্রনাথের জন্মের অনতিকাল পরেই মতভেদ হেতু নাট্য সম্প্রদায়ের সহিত গিরিশের সংস্রব শেষ হইয়া গেল। বাগবাজারের সখের দল পেশাদারী থিয়েটারে পরিণত হইল। অবশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর স্বত্বাধিকারিত্বে বিডন্ ষ্ট্রীটে গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটার নাম দিয়া উক্ত সম্প্রদায় পাব্লিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বৎসর গিরিশের একটি কন্যা-সন্তান জন্মে।

এই সময় হইতে বিপদের পর বিপদ পাতে গিরিশচন্দ্রের জীবন ক্রমে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। প্রথম বিসূচিকা রোগে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর ক্ষীরোদচন্দ্রের অকাল মৃত্যু। ব্যাধির করাল আক্রমণ যখন সর্ব্বপ্রকার প্রতীকার নিষ্ফল করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে শমনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে সময় শুনা যায় মুমূর্ষু সহোদরের মৃত্যু-ম্লান মুখচ্ছবি দর্শনে ভ্রাতৃবৎসল গিরিশচন্দ্র পথের পথিকদিগের নিকটও একান্ত অধীর ভাবে দৈব-ঔষধি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু লৌকিক বা অলৌকিক কোন উপায়েই ক্ষীরোদচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হইল না। এই তীব্র শোকানল নিবিতে না নিবিতে গিরিশের এক ভগ্নীর মৃত্যু হইল। গিরিশ এই সহোদর-শোক 'প্রফুল্লে' ভজহরির মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, "ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে পড়লো আর মলো।" অবশেষে ১৮৭৪-৭৫ খৃঃ অব্দে শিশু পুত্রকন্যার জননীকে শ্মশান অনলে ডালি দিয়া গিরিশ শোকে পরিপূর্ণ পাত্র পান করিলেন। তার উপর

* ২৮শে কার্ত্তিক, ১২৭৫ সাল; শক ১৭৯০।

অনুতাপ আসিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। কিশোর বয়সে এই স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া অবধি তিনি আফিস, থিয়েটার, অধ্যয়ন, উচ্ছৃঙ্খলতায় কালক্ষেপ করিয়াছেন। হয়ত দাম্পত্য-জীবনে সুখী না হইয়া এই অনাদৃতা, উপেক্ষিতা রমণী মূক মর্ম্মপীড়ায় সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন ; কিন্তু দিন ত আর ফিরিবার নয়। বিয়োগ-ব্যথার উপর তীব্র জ্বালা গিরিশকে অহরহ দগ্ধ করিতে লাগিল। এই সময় তাঁহার উর্ব্বর কল্পনা দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। অগণিত কল্পিত ভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিল। গৃহ শ্মশান ; তাহাতে স্মৃতির চিতানল অহরহ ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আলোকে কল্পনা শত চিত্র প্রতিফলিত করিতেছে। গিরিশ এক প্রকার উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। এই কাল্পনিক নির্ব্বেদ ও দুর্ব্বহ শোকের অবস্থায় তিনি 'শৈশব বান্ধব' ও 'আঁধার' রচনা করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুঃখ গিরিশচন্দ্রের চির-সহচর। সেই দুঃখজনিত মনোবিকারে তাঁহার 'শৈশব বান্ধব' রচিত হয়। পাঠকবর্গকে নবীন শোকমগ্ন কবির সাময়িক চিত্ত-বিকারের কথঞ্চিৎ আভাষ দিবার নিমিত্ত এই কবিতাটি আমরা সমগ্র উদ্ধৃত করিব। এই কবিতায় যে সকল দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কোথায়ও মাধুর্য্য নাই। সকল দৃশ্যই কল্পনা, বিকৃতি, বিষাদ, বিরাগ ও নৈরাশ্যের নিবিড় কালিমায় ব্যাপ্ত। এই বাল্য-সখাকে চিরতরে বরণ করিয়া কবি বলিয়াছেন :—

থাকরে অন্তরে তুমি চিরদিন তরে
শৈশব বান্ধব !
ভালবাস এস এস শূন্যময় ঘরে
শব সম সকলি নীরব।
আনন্দের উপহাস, আশার চঞ্চল ভাষ,
অভিলাষ প্রেমোচ্ছ্বাস কিছু নাহি আর,
হয়েছে হয়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে ঘোর,
গিয়েছে গিয়েছে চলে স্বপন সোনার।

তুমি আমি দুই জনে, বসিয়ে বিরলে
তটিনীর তীরে,
কেঁদে কেঁদে ধারাগুলি ধীরে ধীরে যাবে চলে
ঢেলে দিতে আপন শরীরে,
বসে রব মগ্ন মনে, কাঁদিব না কার সনে,
অনেক কেঁদেচি আমি কাঁদিব না আর,
সেই দিন হতে কত, কাঁদিয়াছি ক্রমাগত,
দেখিলাম যেই দিন প্রথম সংসার।

তুমি আমি দুই জনে পর্ব্বত শিখরে
বিজন প্রদেশ,
নাহি পাখী, নাহি শাখী, অলি না বিহরে
কেবল তুষার শুভ্র বেশ,
বিচিত্র বরণ ঘটা, ইন্দ্রধনু সম ছটা,
অকস্মাৎ খ'সে পড়ে কোথা চলে যায়,
খসিবে ভৈরব রবে, সলিল সলিল হবে,
নীরবে হেরিব বসি তোমায় আমায়।

বালির উপরে বসি হেরিব সাগর
নীলিমা বিশাল,
উঠিবে, ডুবিবে, দুলে চলিবে লহর
জটা ঘটা হেরিব করাল ;
গৌরবের সমাধান, পরমায়ু অবসান,
জলে ঝাঁপ দিতে হেথা আসিবে মিহির,
কত ছায়া রবি তায়, নীরবে ডাকিবে 'আয়',
অবিরল দুলে যাবে স্বচ্ছ নীল নীর।

গোধূলি গ্রাসিয়ে মুখে আসিবে তিমির
লটপট্ট কেশ,

একাকিনী উলঙ্গিনী গতি অতি ধীর
বিভাবরী ভয়ঙ্কর বেশ ;
পাগলিনী পুলকিত, নীরবে গাইবে গীত,
নীরব বিকট হাঁস, নৃত্য ধেই ধেই ;
সঙ্গীত বাড়িবে যত আনাগোনা হবে কত,
নীরব ভৈরব তাল তাথেই তাথেই।

ঝিম্ ঝিম্, ঝম্ ঝম্ ঝম্ রণ্ রণ্
ত্রিযামা গভীর,
অযুত অযুত মেঘ আঁধার বরণ
গজ গতি দলিয়া সমীর,
রণমত্ত বজ্রমুখে, রঙ্গিনী খেলিবে বুকে
দলকে দলকে চক্ চমকে চপলা,
রঙ্গেভঙ্গে বায়ুঘূর্ণ উচ্চশাখী শির চূর্ণ
শ্রীহীনা প্রকৃতি ঘোরা তিমির অঞ্চলা।

বিজন বিপিনে যথা বিহরে বিষাদ
প্রেতি বায়ু সনে,
নীলিমায় ভেসে যায় আধখানি চাঁদ
পাণ্ডুবর্ণ মলিন কিরণে,
সেই ক্ষীণ রশ্মি ধরি, প্রেতকুল ধরা 'পরি
নামিবে ভ্রমিবে কেঁদে, হেরিব দুজনে।
এক সঙ্গে সঙ্গীহারা, জাগিয়া দেখিবে তারা
কেহবা পড়িবে খসি জীর্ণ পত্র সনে।

তুমি আমি দুইজনে হেরিব শ্মশান,
বিভূতি ভূষিত
ধক্ ধক্ চিতানল ভালে দীপ্তিমান
গণ্ডগোল শিবার সঙ্গীত ;

বিবসা ভূতলে সতী, চিতানলে জ্বলে পতি
পিতা-মাতা মৃত পুত্র-মুখপানে চায়,
বিচ্ছিন্ন লতিকা প্রায় ধূলায় ঢালিয়া কায়
যুবক চাহিয়া দেখে প্রাণপ্রতিমায়।

তুমি আমি মরুভূমে করিব গমন
বালুময় দেশ,
কেবল অনল ভার বহে সমীরণ
দিনকর প্রাণহর বেশ;
বালির তুফান উঠে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটে
প্রাণীশূন্য তবু যেন সদা হাহাকার,
ধূধূ ধূধূ ধূধূকার, দূর চক্র সীমা তার
উপমার স্থল মাত্র হৃদয় আমার।"

অপর কবিতা আঁধার। এই কবিতায় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ের সময়োপযোগী চিত্র অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। কবির বর্ণিত 'আঁধার' বিস্মৃতির নামান্তর মাত্র। মানব জীবনে কখনো কখনো যে ক্ষণিক বিস্মৃতির উদয় হয়, সে বিস্মৃতি নহে, মৃত্যু যে বিস্মৃতি প্রদান করে, এ সেই বিস্মৃতি। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মৃত্যু সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"Our birth is a sleep and a forgetting
The soul that rises with us, our life's star,
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar."

সে মৃত্যু নহে। এ মৃত্যু স্বপ্নশূন্য; পুনর্জাগরণবিহীন চিরনির্ব্বাণ।

"শুইয়ে তোমার কোলে, অভাগা সকল ভোলে.
ঘুমায় জাগে না আর দেখে না স্বপন;
অনলে সলিল পড়ে আর নাহি ঝড়ে নড়ে,
সংসার-সাগর-রোল করে না শ্রবণ।"

যে অভাগার চক্ষে রবিশশীতারকার আলোক নিবিয়া গিয়াছে, বসন্তের

বিনোদ সম্পদ তরুলতা ফুল্লফল কোকিলকূজন ভৃঙ্গগুঞ্জন যাহার হৃদয় রঞ্জন করে না, রমণীর হাসিমুখ যাহার চিত্তে কেবল পূর্ব্ব-স্মৃতির উদ্রেক মাত্র করিয়া তীব্রদাহন উৎপাদন করে, সে'ই কেবল এই নিরুপম আঁধারের 'শান্ত ভীমপরাক্রম' উপলব্ধি করিতে সক্ষম। যাহার হৃদয় হইতে ভালবাসা, সুখের আশা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে, শমন যাহার গৃহ শ্মশান করিয়াছে, অলবণ ব্যঞ্জনের ন্যায় সংসার যাহার স্বাদহীন, বাসনা যাহার বিড়ম্বনা, জীবন মৃত্যু, মরণ পরিত্রাণ—সেই হতভাগ্যই বলিতে পারে—

"তোমায় জানে না নরে, তাই ত তোমারে ডরে
অসময়ে তুমি সখা কেহ নাহি আর,
একক বান্ধবহীন আশার উচ্ছ্বাস লীন
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার ;
জ্বলে শুধু স্মৃতি, চিতে চিতানল প্রায়,
তখন অভাগা তব মুখপানে চায়।"

সৃষ্টি নিরুদ্দেশ্য। সংসার অভিপ্রায়শূন্য পরমাণুপুঞ্জের আকস্মিক সংযোগে এই বিশ্বের উদ্ভব, বিয়োগে বিলয়—

"পঞ্চভূত ধরি করে, মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ-বিয়োগ নিত্য ছেলেখেলা প্রায়,
একত্র যখন বাঁধে, পঞ্চভূত হাসে কাঁদে
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায় কোথায় মিশায়।"

তথাপি বিলাস লালসায়, সুখের আশায় মানব উন্মাদ, তাহার সাধ অবসাদ-বিহীন ; ঐহিক ভোগে অতৃপ্ত কামনায় কল্পনায় অম্লান আলোক-পুলকিত কাম্যলোক সৃষ্টি করে—

"পাইয়ে নশ্বর দৃষ্টি, হেরে সৃষ্টি করে সৃষ্টি,
আলোক যথায় তব নাহিক গমন
একবার নাহি ভাবে, সে স্বপন ভেঙ্গে যাবে,
ক্রমে মহাকাল যবে খুলিবে বন্ধন,

তোমার উদরে থেকে তোমায় ডরায়
শিহরিয়া উঠে হেরি আপন ছায়ায়।"

প্রত্যক্ষবাদী কম্‌টে (Compte) পর্য্যন্ত কল্পনার মায়ায় বিমুগ্ধ। অপূর্ণ সংসার নানা দুঃখ প্রতারণার আধার। তাহার কল্পনা যে আদর্শ সংসার গঠন করিয়াছে কবি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"আমি না বুঝিতে পারি, সৃজে কত নরনারী,
তবু ভাবে তথা নাহি রবে প্রতারণা,
দুখ-সুখ মাঝে দোলে, না জানি কেমনে ভোলে,
নাহি সুখ যত দিন সুখের বাসনা।
উন্মাদ সতত সাধ যেন না ঘুমায়,—
বিস্মৃতি বিমল বারি বারেক না চায়।"

এই 'আঁধার' কবিতা সম্বন্ধে বিখ্যাত 'বান্ধব'-সম্পাদক ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন, "গিরিশ বাবুর আঁধার কবিতা অতুলনীয়।"

কথিত আছে 'নাইটিংগেল' পক্ষী বক্ষস্থলে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া বিলাপ-সুরের আলাপ করে। শোকের কণ্টকবিদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্রের হৃদয় যে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল, কবিতার স্রোতে প্রবাহিত হইয়াও তাহার তীব্র জ্বালা প্রশমিত হইল না। মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যাদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে পত্নী-বিয়োগের প্রায় সমসময়ে এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের সওদাগরী আফিস ফেল হইয়া গেল। * শোক ও অনুতাপ এখন অবলম্বনহীন গিরিশচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল। যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিরিশ

* গিরিশ যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রতী হইয়াছিলেন নানা কারণে তাহাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিশ আধাখেঁচড়া কোনো কাজ করিতে পারিতেন না। যাহা যখন করিতেন সম্পূর্ণ মনপ্রাণ সংর্পণ করিয়া করিতেন। "The patient dies where the physician sleeps." [Shakespeare]—গিরিশ এই প্রকৃতির চিকিৎসক ছিলেন না, তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীর সংবাদের নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতেন। কিন্তু একদিকে চিকিৎসকের যেমন আগ্রহ, অন্যদিকে রোগীর তত্ত্বাবধারকগণের তেমনি শৈথিল্য। গিরিশ হতাশ হইয়া চিকিৎসা কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

রাজপ্রাসাদেও স্বচ্ছন্দে বাস করিতে চাহিতেন না, সেই গৃহ ক্রমে তাঁহার দুঃসহ হইয়া উঠিল। এই সময় ফ্রাইবারজার কোম্পানী তাঁহাকে বুক-কিপার নিযুক্ত করিয়া মাল খরিদ করিবার জন্য ভাগলপুর পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। গৃহমেধী গিরিশ তাহাতে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। সংসারের অভিভাবিকা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর হস্তে মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যাদ্বয়কে সমর্পণ করিয়া গিরিশ ভাগলপুর চলিয়া গেলেন। কিন্তু হায় স্মৃতি সঙ্গে যায়!

প্রভুর কার্য্যে আলস্য বা অবহেলা কর্ম্মকুশল গিরিশচন্দ্রের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বিদেশে আত্মবিস্মৃতির উদ্দেশে গিরিশ দ্বিগুণ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। দিবসে গ্রামে গ্রামে গিয়া দাদন দিয়া মাল খরিদ করিবার বন্দোবস্ত করিতেন। কিন্তু দিবালোকের সঙ্গে কর্ম্মকোলাহল যখন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিত, দীন শ্রমজীবিগণের গৃহাগমে মিলন-মুখর কুটীরে কুটীরে দীপকলি ফুটিয়া উঠিত, সেই সময় বিজন সঙ্গিনী স্মৃতি গিরিশচন্দ্রের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিত। নির্জ্জন প্রদেশে এমনি এক নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় দূর বংশী-ধ্বনির করুণ উচ্ছ্বাস শ্রবণে 'বাঁশরী' কবিতা রচিত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে জন-বিরল সন্ধ্যায় গিরিশ যে কয়টি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিই বিষাদাচ্ছন্ন। তাঁহার বিধুর জীবনের স্মৃতি উল্লিখিত 'বাঁশরী' কবিতায় স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ কবিতাটি পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি ঃ—

"সন্ধ্যার বরণঘটা ধূসর অঞ্চলে
ক্রমে ক্রমে ঢাকিল তিমির,
সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনাদে চলে,
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর;
মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ
হলে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি
এ হ'তে মধুর স্বর শুনিতাম বাঁশী।

স্বভাব নীরব যবে গভীরা যামিনী
শিশু হেরে সোণার স্বপন,
চন্দ্রমা চকোরের কথা শুনে বিরহিণী
ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন ;
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ
এ হতে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন
ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাত বদন।

ফুল-ভূষা হাসে ঊষা দুকূল বসনা
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী,
বিদায় চুম্বন নাহি পূরিল বাসনা
পতিমুখ নেহারে কামিনী।
তব তান উঠে যত আকুল অন্তর তত
উথলিত প্রাণে শত সুধার লহরী
যবে ধীরে সে আমারে জাগাত বাঁশরী।

প্রখর নিদাঘ তাপে তাপিতা মেদিনী
ক্ষিপ্তবায়ু ধূলামাখে গায়,
কুলায় লুকায় নাহি গায় বিহঙ্গিনী
জাগি যামি যুবতী ঘুমায় ;
আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে সুধাদান
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন,
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ ?

প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়
প্রিয়মুখ মনে কত উঠে,
অনিমেষ নেত্রে হেরে চন্দ্রমা উদয়
একে একে দেখে তারা ফুটে ;

বিরহ-বিধুর গান শুনে আন্দোলিত প্রাণ,
মৃদু পূর্ব্ব স্মৃতি জাগে শীতল মাধুরী
আশা আঁখি নীরে ভাসে প্রিয়জন স্মরি।"

'শশী' কবিতায়ও সেই পত্নীস্মৃতি, সেই বিয়োগ কাতরতা। প্রাণের গভীর শোকগাথা নিঃসঙ্গ প্রবাসে জাগিয়া উঠিয়াছে--

"পাতার আড়েতে বসি, মৃদু মৃদু হাস শশী,
হেরে মম মনে হয় সে বিধুবদন।
ওই-রূপ সে বদন, কেশ অর্দ্ধ আবরণ,
দোলাতো উড়াতো তায় প্রফুল্ল পবন
পাতাগুলি দোলায় যেমন।
জাগিয়া এখন সে কি দেখিছে তোমায়,
আমার হৃদয়-শশী রয়েছে কোথায়?

ধূসর নীরদ মাঝে, ভ্রমিছ উন্মাদ সাজে,
শিলাসনে দুইজনে হেরেছি তোমায়,
আজি সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি এ বিজন দেশে
দেখেছ সে দিন, আজি দেখ কি দশায়,
আছে মাত্র প্রাণশূন্য কায়,
তারে কি এখনো তুমি দেখিতেছ শশী,
আছে কি সে বিনোদিনী শিলাতলে বসি?"

'আজি' নামক কবিতায়ও গিরিশচন্দ্রের এই সময়ের জীবন-স্মৃতি পাঠক দেখিতে পাইবেন,—

"তিন দশ পূর্ণ কায় অতীত যৌবন,
তিন দশ পূর্ণকায়, জীবন-প্রবাহ ধায়,
মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন।

শৈশব-সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন।
যৌবন ঢালিয়া কায়, পেয়েছিনু প্রমদায়,
ম'লে কি ভুলিব আর প্রথম চুম্বন !"

যে মাতৃহারা শিশু পুত্র-কন্যাকে রাখিয়া তিনি দেশান্তরে গিয়াছিলেন, কাহালগার পর্ব্বত দর্শনে রচিত 'গিরি' কবিতায় আপনার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ—

"অটল অশনি-পাতে নিবাস গহন !
তোমায় শুধাই গিরি, কি কারণে ধীরি ধীরি
অবিরল আঁখিজল নির্ঝর পতন,—
তোমারো কি ভাঙ্গিয়াছে সুখের স্বপন ?

তোমার হৃদয়ে কারু জাগে কি অধর,
মধুর শিশুর বোল, নূপুর কিঙ্কিণী রোল
কখনও কি শুনিয়াছ নারী-কণ্ঠস্বর ?
তাই কি পাথর তব অন্তর কাতর ?"

গিরিশ বলিতেন, "শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে বিপত্নীক হওয়ার দুঃখ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।"

গিরিশ-প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার অন্তরের ইতিহাস এ সময়ে যে ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বিদিত হওয়া প্রয়োজন। এই নিমিত্ত তাহার বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইল।

ছয় মাসে মাল খরিদ কার্য্য শেষ হইয়া গেল। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে, গিরিশ কলিকাতায় ফিরিয়া অসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাঁহার যা কিছু ছিল সমস্ত অপহৃত হইয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া দেখিলেন পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত তাঁহার কোনই সম্বল নাই। অর্থের জন্য বাড়ীতে টেলিগ্রাম করা ত দূরের কথা ষ্ট্যাম্প কিনিবার সঙ্গতির পর্য্যন্ত অভাব। গিরিশচন্দ্রের প্রতিবাসী এক ব্যক্তি আইন ব্যবসায়ে ভাগলপুরে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন

হইয়া উঠিয়াছিলেন। গিরিশ তাঁহার নিকট আপনার বিপন্ন অবস্থা জানাইয়া দশটি টাকা ধার চাহিলেন। সঙ্গতিপন্ন আইন ব্যবসায়ী উত্তর দিলেন, "তোমাকে দশ টাকা ধার দিতে ইচ্ছা করি না, পাঁচটি টাকা দান করিতে পারি।" নিরুপায় গিরিশ টাকা কয়টি হাত পাতিয়া নিতে বাধ্য হইলেন। গিরিশ বলিতেন, "আত্ম শোকেও কখনো আমার চক্ষে জল পড়েনি, কিন্তু এই পাঁচটা টাকা হাত পেতে নিতে আমার চোখ্ ফেটে জল এলো।" পরে সঙ্গতিপন্ন আইন ব্যবসায়ী যখন বিদেশ হইতে বাটী আসেন, গিরিশ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ পাঁচটি টাকা প্রত্যর্পণ করিলে তিনি বলিলেন, "আমি টাকা দান করেছি, ফিরে পাবার জন্য দিই নি।" "এর উত্তর" গিরিশ বলিতেন "আমার ঠোঁটের কাছ পর্য্যন্ত এসেছিল কিন্তু গিলে ফেল্‌লুম্।—একবার উপকার পেয়েছি—।"

ভাগলপুরে অবস্থান কালে গিরিশ একটি আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে থাকিতেন, সেখান হইতে কিছু দূরে ক্ষুদ্রকায় কোন পাহাড়ের উপর রেলওয়ে লাইনের একটি distant signal ছিল। পাঠক অবগত আছেন এই সঙ্কেত-স্তম্ভের শীর্ষদেশে লাল ও সবুজ বর্ণের কাঁচ সংলগ্ন থাকে। রাত্রিতে ঐ কাঁচের পশ্চাতে আলো জ্বালিয়া ষ্টেশনমুখে আগন্তুক রেল গাড়ীকে সঙ্কট বা নিরাপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন করা হয়। সঙ্কটের সঙ্কেতে লাল আলো দেখিলে গাড়ী আর অগ্রসর হয় না। কিছুদিন যাবৎ ঐ সঙ্কেত স্তম্ভে সময় সময় লাল ও সবুজ আলো অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ষ্টেশন যখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, দূর হইতে ট্রেণ আসিতেছে, সেই সময় হঠাৎ হয়ত লাল আলো জ্বলিয়া উঠে। পথিমধ্যে গাড়ী থামিয়া যায়। এইরূপে রেল চলাচলের বিভ্রাট ঘটিতে লাগিল, আবার ষ্টেশনে যখন অন্য ট্রেণ উপস্থিত থাকায় পথ বন্ধ তখন হয়ত নিরাপদ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সবুজ আলো জ্বলিয়া ট্রেণকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করে। এই খামখেয়ালী সঙ্কেতের কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া তদানীন্তন রেলকর্ম্মচারিগণ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। দুই একজন কর্ম্মচ্যুত হইল, কিন্তু এই অদৃশ্য রহস্যকারীর

সন্ধান কিছুতেই পাওয়া গেল না। পাছে অন্য ট্রেণের সহিত সংঘর্ষ ঘটে এই আশঙ্কায় এঞ্জিনচালক ও ট্রেণরক্ষক সাবধানে গাড়ী চালাইতে লাগিল। অবশেষে কিছুদিনে এই আলোক ক্রীড়া আপনা আপনি নিবৃত্ত হইয়া গেল। ঐ স্থানের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বলিত উহা ভৌতিক আলোক। ঐ স্তম্ভে যে ব্যক্তি সঙ্কেত-আলোক জ্বালিত সে লোকান্তরিত হইয়াও রেলওয়ে কোম্পানিকে ভুলিতে পারে নাই। গিরিশ বলিতেন, "সম্ভবতঃ দূরের পাহাড়ে বনে আগুন লাগিয়া কাঁচে তাহার আভা প্রতিফলিত হইত।"

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর গিরিশ ফ্রাইবারজার কোম্পানীর আফিস পরিত্যাগ করিয়া অমৃতবাজার-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে তৎপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান্ লীগ নামক সভার হেড ক্লার্কের পদ ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে গ্রহণ করেন। এই সময় জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য ও বন্ধু-বান্ধবগণের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিতে হইল। কলিকাতার খ্যাত্যাপন্ন লালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী বিহারীলাল মিত্রের কন্যা তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা।

প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পর দেখিতে পাওয়া যায় একদিকে যেমন গিরিশের হৃদয় দুঃসহ শোক-সন্তাপ নিরাশায় ভগ্ন, অন্যদিকে তাঁহার জীবন তেমনি উৎসন্ন উচ্ছৃঙ্খলতার অগাধ পঙ্কে নিমগ্ন। বুদ্ধি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, বিবেক ঘন মেঘাচ্ছন্ন, গিরিশচন্দ্র এ সময় আপনার কর্ম্মবিপাকে আপনি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই নৈতিক অবনতির অনতিকাল পরেই তাঁহার জীবনে ধর্ম্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হয়।

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার প্রায় ছয় মাস পরে গিরিশ বিসূচিকা রোগে অক্রান্ত হইলেন। তাঁহার শরীরে মত্ত হস্তীর ন্যায় শক্তি ছিল। দিনের পর দিন অপরিমিত সুরাপান ও অত্যাচারেও তিনি কখনো অবসন্ন হন নাই। কিন্তু এই ব্যাধির করাল আক্রমণে অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। চিকিৎসকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত গিরিশ যন্ত্রণায় বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে

লাগিলেন। এই চরম অবস্থায় ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু জীবনদান করিয়া দেবতা অতি কঠোর শিক্ষকের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। কার্য্য কারণের জটিল রহস্যে ঠিক এই সময়ে গিরিশ আত্মকৃত কর্ম্মফলে নিরতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। স্বাস্থ্য ভগ্ন, বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত, চারিদিকে শত্রুর রক্তচক্ষু, রুদ্ধশ্বাস হতাশের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ব্যতীত কোনোদিকে আর কিছু নাই। গিরিশ ভীরু ছিলেন না। শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে কখনো পশ্চাৎপদ হইতেন না। কিন্তু বিপদ বন্ধুর বেশে উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষা করা দুষ্কর। যে বুদ্ধির দম্ভে গিরিশ বলিতেন—"আমার চেয়ে যে অধিক বুদ্ধিমান, সে একের নম্বর চৌরঙ্গীতে * বসে' আছে" † —দেখিলেন সেই বুদ্ধিই তাঁহাকে বিপাকের শতপাকে বেষ্টন করিয়াছে। তাঁহার চির ভরসা পুরুষকার তাহা ছিন্ন করিতেও অসমর্থ। গিরিশের আত্মনির্ভর শিথিল হইয়া পড়িল। বুঝিলেন চেষ্টায় কিছুই হয় না। প্রফুল্ল নাটকে যোগেশও ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছে, "আমার মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধা মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম?" জীবন যদি কেবল জড় শক্তিতেই চালিত হইত তাহা হইলে কিছুদিন পূর্ব্বে আসন্ন মৃত্যু-মুখ হইতে তাঁহার মুক্তি হইত না। জীবনের চরম দুর্দ্দিনে দুর্গমপথে দিশাহারা পান্থ বিপন্নের পরম সহায় শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। গিরিশ বলিতেন, "যে প্যাঁচে জড়িয়েছিল, ঠিক যেন তার উল্টো পাকে খুলতে আরম্ভ হল।" বিপদজাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

অলৌকিক উপায়ে আসন্ন-মৃত্যু ও প্রচ্ছন্ন-বিপদ হইতে পরিত্রাণ

* তখনকার প্রেসিডেন্সি জেল।

† অঘোর—আমার চেয়ে যে ব্যাটা সেয়ানা, তারতো ধ্রুবলোকের উপরে বাস। কিন্তু সেয়ানাগিরি দেখিয়ে কি আদায় ক'রলুম জান?

—[হারানিধি ৪র্থ অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক]

লাভ করিয়া গিরিশের জীবন এখন হইতে অভিনব ধারায় প্রবাহিত হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার জীবনে অপর পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। ইণ্ডিয়ান্ লীগ উঠিয়া গিয়াছে। গিরিশ পার্কার সাহেবের আফিসে বুককিপার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ভার্য্যার অধিকার লইয়া নবীনা বধূ গিরিশচন্দ্রের গৃহ প্রবেশ করিলেন; কিন্তু স্বামীর হৃদয়-দ্বার তাঁহার পক্ষে এখনও অবরুদ্ধ। গিরিশ কিছুদিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু ক্রমে এই পতিব্রতা দৃঢ়-অধ্যবসায় সহায়ে আপনার হৃদয়বলে, একনিষ্ঠ আত্ম-নিবেদনে গিরিশচন্দ্রের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কোন আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ গমন করিয়া বধূ শুনিলেন, কোন রমণী উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বলিয়া গিরিশের নিন্দা করিতেছেন। বধূ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং বিশেষ সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গিরিশ এই ক্ষুদ্র ঘটনার স্মৃতি 'হারানিধি' নাটকে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"সুশীলা—তাঁর নিন্দা আমি শুন্‌বো কেন? যেখানে তাঁর নিন্দা,
সে স্থান ত্যাগ করবো, যদি আবশ্যক হয়, প্রাণত্যাগ করবো।"

এই নারীরত্নের ঐকান্তিক যত্নে গিরিশের শ্রীহীন গৃহ আবার ধীরে ধীরে বিনোদমন্দিরে পরিণত হইল। আঁধারে আলোক ফুটিল। শ্মশানে অমৃতধারা ছুটিল। উচ্ছৃঙ্খল গিরিশ ক্রমে সংযত হইলেন। শিশুর কলহাসে আবার তাঁহার শূন্য কক্ষ, শূন্য বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁহাকে প্রসন্ন হাস্যে বরণ করিলেন।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দ গিরিশচন্দ্রের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর হইতে রঙ্গভূমি তাঁহার জীবিকাস্থল হয়। এই বৎসর প্রতাপচাঁদ জহুরী "গ্রেট ন্যাশনেল" থিয়েটারের স্বত্ব ক্রয় করিয়া "ন্যাশনেল" থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এই বৎসর হইতে রঙ্গভূমি গিরিশচন্দ্রের জীবিকাস্থল হয়। নটকবির নাট্য-জীবন সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিব। নাট্য-জীবন অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র অভিনয়ো-

পযোগী নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন এবং ভক্তি-রসাত্মক পৌরাণিক নাটক সকল প্রণয়নে তাঁহার যশ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া 'চৈতন্য-লীলা' রচনায় ক্রমে মধ্যাহ্ন তপনের গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত 'চৈতন্য-লীলা' রচনার সমসময়াবধি একদিকে গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মজীবন যেমন অখণ্ড উদ্যমময়, অন্যদিকে তাঁহার ধর্ম্মজীবন তেমনি ঘোরতর তরঙ্গসঙ্কুল। সংশয় এবং বিশ্বাসের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুজাতির চিরন্তন সংস্কার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষ জনিত হৃদয়-দ্বন্দ্বে গিরিশচন্দ্র আকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে আত্ম-সমর্পণে তাঁহার তীব্র যন্ত্রণার অবসান হয়। তাঁহার এই অশান্ত যন্ত্রণা এবং প্রশান্ত শান্তির চিত্র তাঁহারই ভাষায় আমরা "ধর্ম্মজীবন" অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রসঙ্গে রচিত কবিতায় পরিস্ফুট করিব। কয়েকটি ছত্র এইখানে প্রদত্ত হইল।

"ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর
অজ্ঞান আঁধারে,
সত্য-তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর
অসহায় বুদ্ধিবলে নারে,
তর্ক দ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে—
সন্দেহ উদয় বারে বারে ;
দিতে স্নিগ্ধ-পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া
ঐক্য-জ্ঞান প্রচার সংসারে
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্দ, বিশ্বাস সঞ্চারে।"

১৮৮৪ খৃঃ অব্দ গিরিশচন্দ্রের জীবনের আর একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার সম্মিলন ঘটে। এবং এই পুরুষ-প্রবরের প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের চিন্তার ধারা অভিনব প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার ভাবী রচনা নিয়ন্ত্রিত হয়। গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন আমরা পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে 'চৈতন্য-লীলা' প্রণয়ন হইতে সাতচল্লিশ বর্ষ

বয়সে 'প্রফুল্ল' নাটক রচনাবধি ছয় বৎসর কাল গিরিশচন্দ্রের জীবনে সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন-দীপ্তি প্রকটিত। অর্থ, পরমার্থ, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি, কীর্ত্তি, খ্যাতি, দাম্পত্যপ্রীতি প্রভৃতি যাহা কিছু মানব-জীবনে অভিলষিত সে সমস্তই স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া এই সময় তাঁহাকে বরণ করিল। এই সময়েই পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার সম্মিলন ও ইষ্টলাভ। এই সময়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ষ্টার রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা; এই সময়ে যোগ্যতার সম্মান স্বরূপ বিশ সহস্র মুদ্রা 'বোনাস' প্রাপ্তি। এই সময়ে তাঁহার ভক্তিরসাশ্রিত শ্রেষ্ঠ দৃশ্য-কাব্য 'চৈতন্য-লীলা', 'বিল্বমঙ্গল'; শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' এবং শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'বেল্লিক বাজারে'র রচনা।

ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সমসময়ে গিরিশচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কন্যার বিবাহ হয়। ইতিমধ্যে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহাকে দুইটি কন্যা এবং একটি পুত্র-সন্তান উপহার দিয়াছেন। শান্তি ও সুখ-স্বপ্নে দিন বহিতে লাগিল। চিরদিন গিরিশের জ্ঞান-পিপাসা প্রবল ছিল। এখন নিশ্চিন্ত সময় পাইয়া প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভায় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিজ্ঞানানুরাগ, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, কবিত্ব-শক্তি এবং সর্ব্বাপেক্ষা সরলতা দর্শনে ডাক্তার সরকার দিন দিন তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হায়, আজন্ম-বঞ্চিতকে বাঞ্ছিত রত্নরাজি দান করিয়া নিয়তি যেন আপনার উদারতায় আপনি ঈর্ষিত হইয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে গিরিশের অদৃষ্টাকাশে আবার কালমেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় পক্ষে তাঁহার যে কন্যাদ্বয় জন্মিয়াছিল, নিষ্ঠুর কাল অকালে সে সহাস কুসুমকলি দুইটিকে ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল। হৃদয়ভেদী শোকে স্বাস্থ্য হারাইয়া তাহাদিগের প্রসূতি পুত্র প্রসব করিবার পর সূতিকা রোগে শয্যাগ্রহণ করিলেন, আর উঠিলেন না। এই তীব্র শোক ক্রমে প্রশমিত হইলেও গিরিশের অবশিষ্ট জীবনের উপর যে গোধূলিরাগ বিস্তার করিয়াছিল সুদীর্ঘ কালান্তে রচিত 'শূন্যপ্রাণ' কবিতায় তাহার ছায়াচিত্র আমরা দেখিতে পাই,—

"আমোদিনী প্রমোদিনী জীবন-সঙ্গিনী
ক্ষুদ্র গৃহ নাট্যশালা প্রায়,
সোহাগ হৃদয়রাগে রজনী-রঙ্গিনী
সোনার স্বপন বয়ে যায়
কালের কুটিল রঙ্গ, 	চমকিয়া স্বপ্নভঙ্গ
শূন্যগৃহ নহে ত উজ্জ্বল নাট্যাগার
শূন্যপ্রাণ—শূন্য এ সংসার।"

দ্বিতীয়বার জায়াশোকে গিরিশ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এবং ক্রমে পাঠক দেখিতে পাইবেন এই নিদারুণ ভার্য্যা শোক তাঁহার একাধিক নাটকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু যে নিরীশ্বর নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রথমা পত্নীর শোক তাঁহাকে একান্ত আত্মবিস্মৃত করিয়াছিল, তখন আর এখন অনেক প্রভেদ। তখন পূর্ণ যৌবন, আর এখন প্রৌঢ় বয়স, বিশেষ ইতিপূর্ব্বেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বকলমা' দিয়া নিঃশেষে আত্মদান করিয়াছেন। তাঁহার সুখ দুঃখ, সুকৃতি দুষ্কৃতির সকল ভার শ্রীভগবানের চরণে সমর্পিত হইয়াছে। "তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী" বলিয়া সংসারের সকল আঘাত এখন মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। গিরিশ বলিতেন, "সুখ, দুঃখ, শোক, সবই জড়ের ধর্ম্ম। যতদিন জড়দেহ আছে সে আপনার প্রভাব বিস্তার করবেই।" দ্বিতীয়বার দারুণ শোক পাইয়া গিরিশ গুরুতর ব্যথিত হইলেও অতি বেদনায় তাঁহাকে অধীর করিতে পারিল না। সতী-সাধ্বীর শেষদান শিশু পুত্রটিকে হৃদয়ে লইয়া তিনি অতি যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, কিন্তু তাহার এক আশ্চর্য্য স্বভাব ছিল। রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে অথবা দুগ্ধপান করিতে কাঁদিতেছে, সে সময় কেহ হরিধ্বনি করিলে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। রোদন নিবৃত্তি হইয়া যাইত এবং শান্ত হইয়া দুগ্ধপান করিত। কিন্তু পিতার অক্ষুণ্ণ যত্ন, সতর্ক তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও শিশুর পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় গিরিশ স্বয়ং কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থ হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের

নিমিত্ত পুত্রসহ মধুপুর গমন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না। পিতার স্নেহের শিকল কাটিয়া মাতৃহারা শিশু মাতার ক্রোড়ে চলিয়া গেল। গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার "সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।" এই সময় ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারীগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

কর্ম্মচ্যুতির পর গিরিশচন্দ্র তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু শিশুর মৃত্যু তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে অতীব চঞ্চল করিয়া তুলিল। গিরিশ এই মানস-চাঞ্চল্য দূর করিবার নিমিত্ত অঙ্ক-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—"চিত্ত-স্থৈর্য্য এ বিদ্যার মূল।" * সে এক বিচিত্র ব্যাপার! বিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রের ন্যায় প্রবীণ কবিকে শ্লেট-পেনসিল লইয়া নিবিষ্টমনে Quadratic equation ও জ্যামিতির problem কষিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন। গিরিশ কোন কাজই আধাআধি করিতে পারিতেন না। ব্যাস, বাল্মিকী, ভবভূতি, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, Shakespeare, Byron, Milton প্রভৃতির কাব্যালোচনায় যে কক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, Euclid, Tod Hunter এখন সেথায় একাধিপত্য করিতে লাগিল। কলেজের ছাত্র পাইলে অভিনব আলোক প্রাপ্তির আশায় প্রশ্নের পর প্রশ্নে গিরিশ তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ক্রমে গিরিশচন্দ্রের চিত্ত চাঞ্চল্য আয়ত্ত হইল। অতঃপর তিনি মিনার্ভা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজনে নিমগ্ন হইলেন। এখন হইতে গিরিশ-চন্দ্রের নাট্য-জীবন অবাধে প্রবাহিত হইলেও, নূতন নূতন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কার্য্যস্থলের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। রোগে, শোকে, স্বাস্থ্যভঙ্গে অকালবৃদ্ধ নাট্যাচার্য্যকে যৌবনের অভিনব উৎসাহে কার্য্যপরায়ণ দেখিয়া গিরিশচন্দ্রের সহকর্ম্মীগণের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না।

এই সময় তিনি পুনরায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রতী হইলেন। বলিতেন, "থিয়েটারে এখন আর আমায় আগের মতন খাট্‌তে হয় না।

* নলদময়ন্তী ৪র্থ অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক।

হাতে অনেক সময়। নিষ্কর্ম্মার হয় আত্মচিন্তা, নয় পরচর্চ্চা অবলম্বন। চিকিৎসা নিয়ে থাক্‌লে এসব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর গরীব-গুর্ব্বোদেরও উপকার হয়।" 'ভ্রান্তি' নাটকে রঙ্গলালের মুখে আমরা এই ভাবের কথাই শুনিতে পাই,—"পরের দায় মাথায় নিলে আপনার দায়ে নিশ্চিন্ত হবো, অন্ততঃ ঘোর থাক্‌বে না।" 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে পাগলও এই কথাই বলিতেছে, "কাপুরুষে পরের জ্বালা ভুলে আপনার জ্বালা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।" গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বে যে কারণে চিকিৎসা কার্য্য পরিত্যাগ করেন তাহা বলিয়াছি। যে ঘটনায় তাহাতে পুনরায় প্রবৃত্ত হন, তাহা অতীব মর্ম্মস্পর্শী। তিনি তখন অমরেন্দ্রনাথ সংস্থাপিত ক্লাসিক থিয়েটারে। রিহার্সালান্তে এক রাত্রি ২৷৷০টার সময় গৃহে ফিরিতেছেন, বাটীর অতি সন্নিকটে একটা করুণাসূচক স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অনুসন্ধানান্তে জানিলেন এক হিন্দুস্থানী বিষম জ্বরে কাতর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তখন শীতকাল। রোগী অনাবৃত গাত্রে শীত ও হিম নিবারণের জন্য একখানি খাটিয়ার নীচে পড়িয়া আছে। গিরিশ বলিতেন, "অতরাত্রে আর কি উপায় কর্‌ব। বিছানায় গিয়ে শুলুম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। কেবলই মনে হয়, আমি গরম বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, আর এ ব্যক্তি খোলা মাঠে খালি গায়ে ছট্‌ফট্‌ করছে।" সারারাত্রি গিরিশচন্দ্র শয্যায় পড়িয়া রোগীর সঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র কম্বল ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার বাটীর পার্শ্বে তাঁহার বেতনভোগী পরামাণিকের কলেরা হয়। গিরিশচন্দ্র তাহাকে দেখিতে গেলে তাঁহার দর্শনমাত্রে সে হতভাগ্য, "বাবু ওষুধ, বাবু ওষুধ" বলিয়া কাতরোক্তি করিতে থাকে। তখন তাহার আসন্নকাল উপস্থিত। গিরিশ বাড়ীতে ঔষধ রাখিতেন না। কিনিয়া আনিবারও সময় নাই। তিনি ডাক্তার আনাইতে পাঠাইলেন, কিন্তু রোগী রক্ষা পাইল না। গিরিশ মর্ম্মাহত হইয়া চিকিৎসায় পুনরায় ব্রতী হইলেন। তিনি স্থির করিলেন—"মরবার সময় পর্য্যন্ত যদি হাত উঠে, একটা পরের কাজ ক'রে যাব, আমি পরের জন্য বেঁচে

আছি।"* কাশীধামে রামকৃষ্ণসেবাশ্রম সংশ্লিষ্ট কত শত কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগী তাঁহার সুচিকিৎসায় নিরোগ হইয়াছেন, পাঠক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পঠিত সেবাশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠে অবগত হইবেন।

ক্লাসিকের পর গিরিশচন্দ্র যখন মিনার্ভায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেই সময় তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্যার কাল হয়। এই পতি-পুত্রবতী, সৌভাগ্যশালিনী দুহিতা জীবনের প্রায় আসন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন, " 'বাপী' † যদি নিজে গিয়ে আমাকে বাবা তারকনাথের চরণামৃত এনে দেয়, আমি ভালো হই।" মুমূর্ষু দুহিতার অন্তিম ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য গিরিশ অবিলম্বে তারকেশ্বর গমন করিলেন। কিন্তু সেখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি ভরসা লইয়া ফিরিতে পারিলেন না। গৃহে আসিয়া দেখিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। এই নিষ্ঠুর মর্ম্মভেদী শোকে তাঁহার একটি দীর্ঘ শ্বাস পর্য্যন্ত কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। কেবল স্বাস্থ্যভঙ্গে এই মূক শোক আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এই ঘটনার পরে করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভা রঙ্গালয়ে দর্শন করিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাই এই মূক শোকের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকিবেন।

ষ্টার থিয়েটারের সহিত সংস্রব ত্যাগের পর গিরিশ যে মিনার্ভা প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই মিনার্ভাই তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল। এই রঙ্গালয় অধিষ্ঠিত ভূমির উপরেই প্রথম গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে উহা হস্তান্তরিত হইয়া ন্যাশনেল থিয়েটার নাম ধারণ করে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশ এই রঙ্গালয়কেই উপজীবিকারূপে অবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ,
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবনযাপন।"

* ভ্রান্তি ৫ম অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

† গিরিশচন্দ্রের পুত্রকন্যা তাঁহাকে এই নামে সম্বোধন করিত।

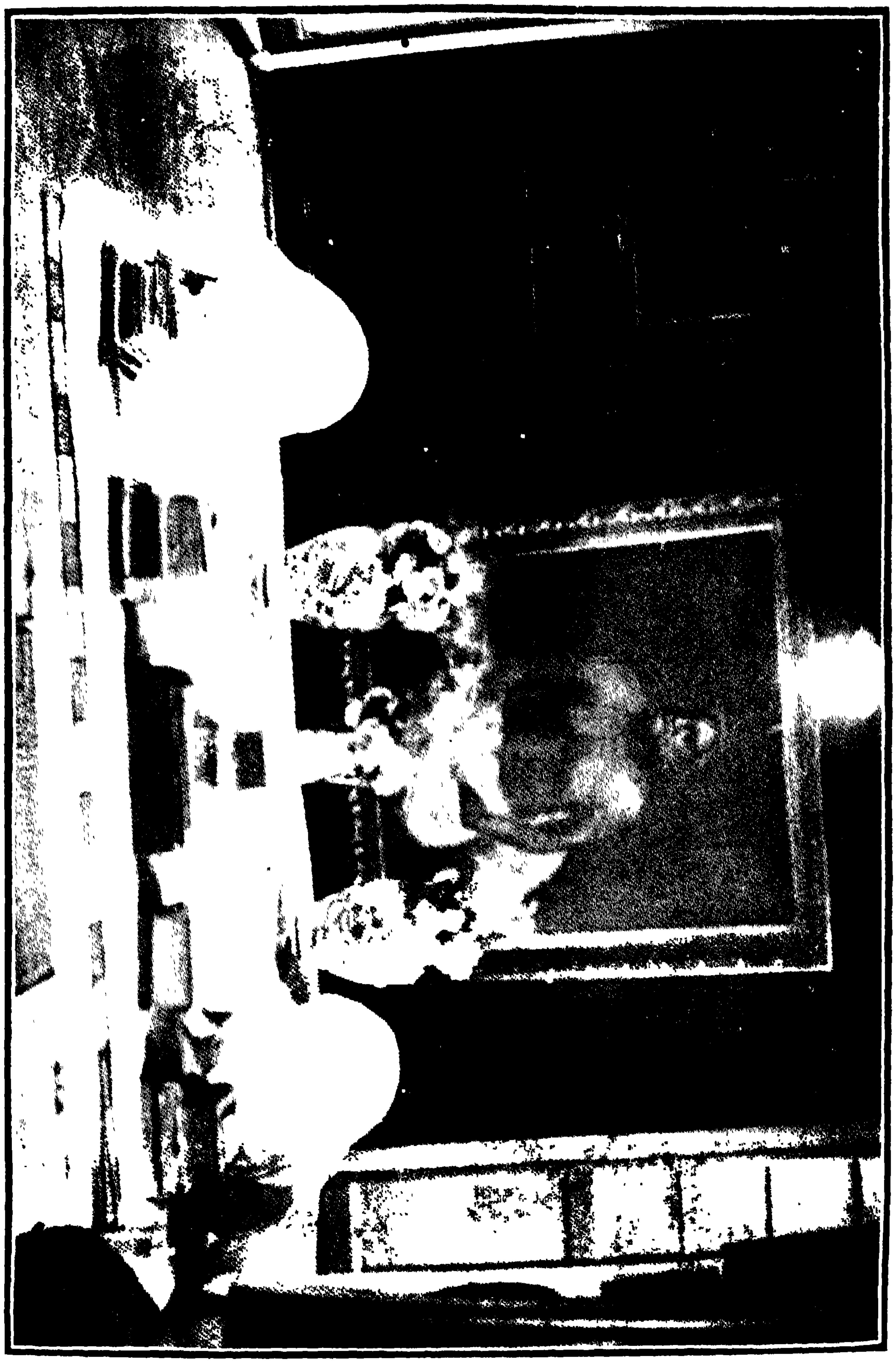

ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার আয়ুসূর্য্য যখন অস্তাচল অভিমুখে অভিসার করিয়াছে, জীবনের ঘোর ঝঞ্জাবাত, শিলাপাত, বারিবর্ষনান্তে রোগ শোক দুর্দ্দিনের তুষার পাতে ধবলকেশ বৃদ্ধ সেই রঙ্গমঞ্চে পুনর্দ্দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন—

"পিতার স্থানীয় যাঁরা, রঙ্গালয়ে আসি তাঁরা
কতবার এ দাসেরে দেছেন উৎসাহ।
সমান বয়স্ক জন বান্ধব স্বজনগণ
করেছেন অভিনয় দর্শনে আগ্রহ।
পুত্রসম বয়ক্রমে, তাঁরাও দর্শক ক্রমে
ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁরা জনক এখন ;
করে কর পুত্রলয়ে, এবে হেরি রঙ্গালয়ে
অবিরাম বহে মম শ্রমের জীবন।
হৃদে সাধ বলবান, সম উৎসাহিত প্রাণ
করিতে দর্শকবৃন্দ মানস রঞ্জন।
কিন্তু এ বার্দ্ধক্যে হায়, দিন দিন ক্ষীণকায়
বিফল প্রয়াস জন মন বিমোহন।
অঙ্গ নহে ইচ্ছাধীন, কণ্ঠস্বর রসহীন
পূরাইতে মনোসাধ ঘটে বিড়ম্বনা ;
ত্রুটী হবে অভিনয়ে, তাই রস ভঙ্গ ভয়ে
ক্ষণেকের তরে হয় যৌবন কামনা
ভরসা কেবল মম শ্রোতার মার্জ্জনা।"

মহাপথযাত্রী নটকবির জীবনে "আশার নেশা" আর নাই। কিন্তু রঙ্গভূমি ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ে চির-তরুণ, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের পরও এই সকরুণ উক্তির ভিতর দিয়া সমভাবে বহিয়া যাইতেছে। ১৯০৬ খৃঃ অব্দ হইতে গিরিশচন্দ্রের দেহে প্রতি বৎসর হেমন্তাগমে দুরন্ত হাঁপানী পীড়ার আবির্ভাব হইত। পান এবং তামাক তাঁহার অতি প্রিয় সামগ্রী ছিল। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুইই ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সংযম, চিকিৎসা ও সর্ব্ব বিষয়ে সতর্কতা সত্ত্বেও পীড়া উত্তরোত্তর

বাড়িতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় শীতাগমে নিশাযোগে কলিকাতার ধুলিধূমাচ্ছন্ন বায়ুস্তর তাঁহার শ্বাস গ্রহণের পক্ষে নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইত। স্বাস্থ্যভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রাণান্তিক হইয়া উঠিল। ১৯০৯ ও ১৯১০ খৃঃ অব্দের শীতকাল গিরিশ কাশীধামে যাপন করিয়া আশার অতিরিক্ত ফললাভ করিলেন। বারাণসীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া গিরিশ সবিশেষ উৎসাহের সহিত রঙ্গালয়ের কার্য্যে যোগদান করিলেন। ১৯১১ খৃঃ অব্দে ৩০শে আষাঢ় শনিবার 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া গিরিশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হইল। রঙ্গমঞ্চে ইহাই গিরিশচন্দ্রের শেষ অভিনয় রজনী। সংসার রঙ্গমঞ্চে নটকবির জীবনের শেষ অভিনয় রজনীও অতি নিকট। কিন্তু হায়, কে তখন তাহা বুঝিয়াছিল। ঐ রাত্রির দুর্য্যোগ যেন অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র নাট্যজগতের দুর্য্যোগ সূচনা করিয়া দিল। সে ভয়ানক দুর্য্যোগ দেখিয়া সকলেই গিরিশকে দুর্ব্বল দেহে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র কাহারও নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। করুণাময়ের আত্মহত্যা যেন নটকবির জীবনে অভিনীত হইল। দুর্য্যোগ রজনীতে বার বার অনাবৃত গাত্রে অভিনয় করিয়া গিরিশ অসুস্থ দেহে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য আর ফিরিল না। কিন্তু দিনে দিনে শেষ দিন যতই সন্নিকট হইয়া আসিল, দুর্ব্বার ব্যাধির পীড়ন যতই বাড়িতে লাগিল, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতায় গিরিশচন্দ্র ততই যেন অমানুষী হৃদয়বলে বলীয়ান হইতে লাগিলেন। এই অসীম রোগ-যন্ত্রণায় যে-কেহ তাঁহার হাস্য প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়াছেন, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে তিনিই তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এই সময় গিরিশ একদিন বলিয়াছিলেন, "এই দেহের পুষ্টির জন্য কত না উপাদেয় ভোগ দিয়েছি, কত যত্নে একে সাজিয়েছি, কিন্তু এটা এমনি অকৃতজ্ঞ যে যত্ন ক'রে এই দুরন্ত রোগ ডেকে এনেছে, এক দণ্ড আমাকে সুস্থ হতে দিচ্ছে না।" আর এক দিন দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভগবান্, তুমি মঙ্গলময় যেন কখন না ভুলি।"

মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে রুগ্ন কক্ষের

নিবিড় নিস্তব্ধতা আলোড়িত করিয়া সহসা তিনবার রামকৃষ্ণ নাম ধ্বনিত হইল,—"প্রভু শান্তি দাও, শান্তি দাও।" শেষ তিন দিন গিরিশের নিদ্রা হয় নাই। বিনিদ্র কবি ইষ্টদেব-চরণে শেষ আত্ম-নিবেদন করিয়া মহানিদ্রার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মহাপথ-যাত্রী মহাকবির জীবনে মোহ-রাত্রির অবসান হইল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় "ক্ষেপামায়ের ক্ষেপাছেলে" মায়ের কোলে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নট-জীবন

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবন বঙ্গ-রঙ্গভূমির সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে তাহার স্বতন্ত্র ইতিহাস না দিলে তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ নাট্যশালা তাঁহার জীবনের কেবল প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ও অবলম্বন নহে, যখন অনন্যব্রত হইয়া তিনি অভিনয়-বৃত্তি গ্রহণ করেন, তখন বলিয়াছিলেন---

"লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ
পরের বেদনা হায়, পরে কি বুঝিবে তায়,
হায় রে ব্যথার ব্যথী আছে কোন্ জন ?
অন্যপরে যার তরে, সতত যতন করে,
অভিনেতা অনায়াসে দেয় বিসর্জ্জন,
যায় ধন-প্রাণ-মান, সুখ-সাধ অবসান,
পরের প্রীতির তরে আত্ম-সমর্পণ !
সদা পর-আরাধনা, সহকারী বারাঙ্গনা,
কে কোথায় রাখে তার মান !
অনুগ্রহপ্রার্থীজন, কে কোথায় পায় ধন,
রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ !
তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার,
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ।
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশিরাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।"

এ ভালবাসা শিল্পীর আকর্ষণ, সাধকের অনুরাগ, ভক্তের ইষ্টনিষ্ঠা। যে বরণীয় নাট্যকলাকে দেশবাসীর নিকট আদরণীয় করিবার জন্য আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, পরিজন, ধন, প্রাণ, মান, অপমান, দ্বেষ, কুৎসা, সব তুচ্ছ করিয়া তিনি ধ্যান-নিষ্ঠ তাপসের ন্যায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন—যাহাকে লোক-মনোমোহিনী করিবার জন্য নিত্য নব সাজে সজ্জিত করিয়াও তাঁহার আগ্রহ, আকিঞ্চন, অভিলাষ, কোনোদিন পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই—যে নাট্যকলার লীলাক্ষেত্রে তিনি হিতৈষীর নিষেধ, স্বাস্থ্য, মৃত্যুভয়, সব উপেক্ষা করিয়াছিলেন—গিরিশ-প্রতিভা আলোচনায় তাঁহার সেই নাট্যজীবনের ইতিহাস যে সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

বাঙ্গালায় নাট্যকলার প্রতিষ্ঠায় গিরিশ যে সর্ব্বাগ্রগণী ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার পূর্ব্বে পরলোকগত—রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন (পরে মহারাজ), ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র, কেশবচন্দ্র (গঙ্গোপাধ্যায়), প্রিয়নাথ (দত্ত), কালীপ্রসন্ন (সিংহ), ও উমেশচন্দ্র (Mr W. C. Banerjee) প্রভৃতি বঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ অভিনয় করিয়া যশার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পাঠক নাট্যশালার ইতিহাস নামক অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গলার নাট্যকলা কেবল অঙ্কুরিত হইয়াছিল মাত্র, এই অঙ্কুর তাঁহারই যত্নসিঞ্চনে ক্রমে মহা মহীরুহ আকারে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সহরে সহরে এক্ষণে শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি করিয়াছে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য না হইলে একটা জীবনে তাহার এতাদৃশ পরিণতি সাধন করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

কঠোর জীবন-সংগ্রামে দুশ্চিন্তার দুঃসহ তাপে মানবের জীবন-রস শুষ্ক হইয়া যায়। কাব্যের সুধাধারা সিঞ্চনে তাহার পুষ্টিসাধন করে; নির্দ্দোষ আমোদ ও স্ফূর্ত্তির পরিমিত উপভোগ পানাহারের ন্যায় মানবের অপরিহার্য্য প্রয়োজন। যিনি জাতীয় জীবনের এই অপরিহার্য্য প্রয়োজন সাধন করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবার পাত্র তাহাতে সন্দেহ কি? পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গিরিশচন্দ্র

যে কাব্যকলার সাধনায় জীবন সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কি কারণে সে সঙ্কল্প নাট্যকলা সাধনারূপ বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কেবল ইহাই জানিতে পারা যায় যে অনুমান ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে গিরিশচন্দ্রের চব্বিশ বৎসর বয়সে এই সাধনার সূচনা।

উক্ত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র কয়েকটি বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজারে একটি সখের যাত্রার দল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অভিনয়ের জন্য 'শর্ম্মিষ্ঠা' মনোনীত হয়। যাত্রার প্রধান উপকরণ সঙ্গীত। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে যাত্রার উপযোগী গীত সংযোজনা করিয়া দিবার জন্য গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার প্রধান সহযোগী উমেশচন্দ্র চৌধুরী সে সময়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ গীত-রচয়িতা প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের শরণাপন্ন হইলেন। প্রিয় বাবু নিরর্থক বিলম্ব করায় গিরিশ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া উমেশকে বলেন, "উমেশ, তুই একখানা গানের জন্য এত হীনতা স্বীকার কেন? এস যেমন পারি আমরা বাঁধি।" প্রয়োজনীয় সঙ্গীত রচিত হইল এবং গীত রচনায় সাধারণে সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিরিশের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। *

* গিরিশের প্রথম সঙ্গীত রচনা সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল দূরীকরণার্থ এইস্থানে সেই দুইটি গীত উদ্ধৃত হইল—

(১) দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতি—

(বেহাগ—একতালা)

সুর—'সখি ধর ধর'

আহা! মরি—মরি
অনুপম ছবি, মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমল-নীর ঢল ঢল
নিতম্ব চুম্বিত, বেণী আলোড়িত
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী॥
জনহীন গেহ গহন কাননে
কি ভাবে ভামিনী ত্যজিয়া ভবনে
আসিয়াছ এই স্থানে?

কলিকাতার ঠাকুর বাটীর থিয়েটার তখন বঙ্গীয় নাট্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া অপূর্ব্ব সৌরভ বিস্তার করিয়াছে। বাগ-বাজারের মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ সম্ভ্রান্ত থিয়েটারের টিকিট সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলে গিরিশ বলিয়াছিলেন, "এক বছরের মধ্যে থিয়েটার ক'রে আপনাদের শোনাব।" সেই প্রতিশ্রুতি পালনের সুযোগ এক্ষণে উপস্থিত। 'শর্ম্মিষ্ঠা' সম্প্রদায় হইতে অভিনেতা নির্ব্বাচিত হইয়া "বাগবাজার অ্যামেচ্যার থিয়েটার" ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইল। মাইকেলের অনুসরণে দীনবন্ধু তখন নাট্যকাররূপে নাট্য-জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মুখুয্যেপাড়ায় অরুণ হালদারের বাটীতে 'সধবার একাদশী'র মহলা বসিল। গিরিশচন্দ্র শিক্ষক, বাগ-বাজার অঞ্চলের দক্ষ অভিনেতা সকলেই একত্র মিলিত, কেবল অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি তখন জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার থিয়েটারে। ভোলানাথ চৌধুরী প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে দন্তবক্রের ভূমিকা অভিনয়ে অসামান্য খ্যাতি শুনিয়া গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুকে দলস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু সংস্কৃত নাটকের আদর্শ ত্যাগ করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য প্রথাবলম্বনে দৃশ্য-কাব্য রচনা করিতেন। তাঁহার কোন নাটকেই সূত্রধার, প্রস্তাবনা

দারুণ কঠিন এর পরিজন,
তাই একাকিনী রমণী রতন,
কেবা এ রমণী, কেন অনাথিনী।
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি॥

(২) সখীর প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা—

(আড়ানা—একতালা)
অতুল রূপ হেরিয়ে।
বিমুগ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই—
সে বিনে দহে হিয়ে।
চিত-মোহন, বিনোদ বদন, আর পাব কভু দরশন
মধুর বচন, করিব শ্রবণ
পরশে পুরাব সাধ—
সরস হাসি বিমল-অধরে, অনুপম আঁখি মানস হরে,
কেন রতনে না রাখিনু ধরে লুকান মন হরিয়ে।

অথবা গীতি বাহুল্য নাই ; কিন্তু সাধারণ রুচি তখনও কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীন সনাতন পদ্ধতির অনুবর্ত্তী ছিল এবং যাত্রা, কবি, পাঁচালীর উপর অনুরাগের হ্রাস হইলেও লোকে গান শুনিতে বিশেষ ভাল বাসিত। গিরিশ সাধারণ রুচির অনুসরণ করিয়া 'সধবার একাদশী'তে একখানি প্রস্তাবনা ও নাটকীয় সংস্থান উপযোগী কয়েকটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। মুখুয্যেপাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাটীতে শারদীয় পূজা উপলক্ষে 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হইল। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নিমচাঁদ। তাঁহার অভিনয়-যশ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কলিকাতার দুইচারিজন সম্পন্ন গৃহস্থের ভবনে ইহার আরও কয়েকটি অভিনয় হইয়া গেল। তন্মধ্যে সরস্বতী পূজার রাত্রিতে লাট সাহেবের তোষাখানার দেওয়ান শ্যামবাজার নিবাসী রায় রামচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের বাটীতে চতুর্থ অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেননা স্বয়ং দীনবন্ধু সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। বিস্ফারিতচক্ষু, উৎকর্ণ নাট্যকার নিজ কল্পনা-পুত্তলিগুলিকে সজীব দেখিয়া ও তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া পুলকে কণ্টকিতকায় ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া বসিয়াছিলেন। নিমচাঁদের ভূমিকার অভিনয় দর্শনে আনন্দে গদগদ হইয়া দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি না থাক্‌লে এ নাটক অভিনীত হ'ত না, নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা।" পণ্ডিতপ্রবর (পরে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি) সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 'সধবার একাদশী'র অভিনয় দেখিয়া উত্তরকালে "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছিলেন, "বয়োবৃদ্ধি বশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নাম মাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না।" লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট ও নাট্যকার শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদের অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"মদ মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথমে দেখিল নব নটগুরু তার॥"

সর্ব্বসমেত সাতবার 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হইয়াছিল।

'সধবার একাদশী'র অভিনয়ে অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বাগবাজার অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় দীনবন্ধু বাবুর অনুরোধে 'লীলাবতী' নাটকের মহলা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠা স্থায়ী করিতে হইলে স্থায়ী নাট্যশালার প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থগণ এই সম্প্রদায়ের সভ্য, সুতরাং সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। অল্পে অল্পে চাঁদা সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিছুকাল পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের শ্যালক ব্রজেন্দ্রনাথ দে তাঁহার বাটীতে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করাইতেছিলেন কিন্তু তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হইয়া ক্রমে মঞ্চটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইতেছিল। গিরিশচন্দ্র এক্ষণে শ্বশুরালয়ের আত্মীয়গণের অনুমতি ক্রমে সেই নষ্টপ্রায় ষ্টেজটি পুনরুদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। গিরিশের শ্বশুরালয় শ্যামপুকুর হইতে শ্যামবাজার রাজেন্দ্রনাথ পালের বাটীতে ষ্টেজ স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধন কার্য্যের সূচনা হইল। চিত্রকর নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মদাস দৃশ্যপট আঁকাইতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামক গিরিশের জনৈক উদারচেতা বন্ধুর সাহায্যে রিহার্সেল খরচা চলিতে লাগিল। কিন্তু ষ্টেজ নির্ম্মাণে আর এক বাধা উপস্থিত হইল। যে আশি টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল। চিত্রকরকে ছাড়িতে হইল, কিন্তু এই সময় দৈব সহায় হইলেন। একজন নিঃসম্বল পরিত্যক্ত ইংরাজ 'সেলর' (sailor) সাহায্যের জন্য সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হইলে তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া ধর্ম্মদাসের সাহায্যার্থ নিযুক্ত করা হইল। সে রঙ্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিত। ধর্ম্মদাস স্বয়ং দৃশ্যপট আঁকিতেন।

ষ্টেজের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে শ্যামবাজার রাজেন্দ্র পালের বাটীতে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের নামকরণ হইল "ন্যাশনেল থিয়েটার"। * স্বনামখ্যাত ন্যাশনেল পত্রিকার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র

* এই সম্বন্ধে বিস্তৃতালোচনা পাঠক "নাট্যশালার ইতিহাস" অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন।

মহাশয় এই নাম নির্ব্বাচন করেন। নবগোপাল সংবাদ পত্র, বিদ্যালয় বা হিন্দুমেলা প্রভৃতি যে কিছু অনুষ্ঠান করিতেন তাহাকেই ন্যাশনেল আখ্যা প্রদান করিতেন। সাধারণে এইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "ন্যাশনেল মিত্র"।

'লীলাবতী'র মহলায় গিরিশচন্দ্র নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে প্রথমে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন সংবাদ আসিল দেশমান্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় এক নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া 'লীলাবতী'র কতকাংশ পরিত্যাগ এবং কতক নূতন সংযোজন করিয়া মহলা দেওয়া হইতেছে, তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর কয়েকজন অভিনেতাসহ গিরিশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "চুঁচুড়ার দলের কাছে হেরে যাব, আর তুমি বসে তাই দেখ্‌বে?" গিরিশ অগত্যা অভিনয়ে যোগদান করিয়া ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করেন; ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মদাস এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মহলা দিতেছিলেন। অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। ডাক্তার কানাইলাল দে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্র-লোকগণ এবং স্বয়ং গ্রন্থকার 'লীলাবতী'র অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় দেখিয়া দীনবন্ধু নিজে গিরিশ বাবুকে শ্রদ্ধার সহিত সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার কবিতা যে এমন ক'রে পড়া যায়, তা আমি জানতাম না, take this compliment at least." এবং অভিনেতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "এইবার চিঠি লিখ্‌বো তুয়ো বঙ্কিম।" ডাক্তার কানাইলাল দে-ও এই অভিনয় দেখিয়া ঠাকুর-বাড়ী বলিয়া আসিয়াছিলেন, "গিরিশ বাবুর দলের অভিনয়ের সহিত তুলনা করিলে আপনাদের অভিনয় সোণার খাঁচায় দাঁড়কাক পোষা।"

'লীলাবতী'র পর 'নীল দর্পণে'র রিহার্সেল আরম্ভ হইল। এই সময় বাঙ্গালার পাবলিক থিয়েটারের আদি স্থাপয়িতা শ্রীযুত ভুবন মোহন নিয়োগী মহাশয় কার্য্যস্থানে অবতীর্ণ হইলেন। রিহার্সেলের জন্য তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানাবাটী ছাড়িয়া দিলেন। মহলা চলিতে লাগিল। নাট্যামোদীগণের কৌতূহল তখন চরম মাত্রায়

উঠিয়াছে। কি-এক অপূর্ব্ব সামগ্রী দেখিবার আশা, আগ্রহ ও ঔৎসুক্যে সমস্ত কলিকাতা উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে; এইরূপ অবস্থায় সম্প্রদায় জল্পনা করিতে লাগিলেন যে টিকিটের মূল্য গ্রহণ করিবেন। কেবল একমাত্র গিরিশ ভিন্নমত। তিনি বলিলেন, "ন্যাশনেল থিয়েটার নাম দিয়া সাধারণে প্রকাশ হইবার উপযোগী দৃশ্যপট, সাজসরঞ্জাম ও রঙ্গমঞ্চ আমাদের হয় নাই। একেই ত বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকায়, ন্যাশনেল থিয়েটারের এইরূপ দৈন্যদশা দেখিলে তাহারা কি না বলিবে? ন্যাশনেল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে 'ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় স্থাপিত।' মাত্র কয়েকজন যুবা একত্র হইয়া তাহাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করাইয়া ন্যাশনেল থিয়েটার করিতেছে। একথা কাহারও ধারণা হইবে না।" গিরিশচন্দ্রের আপত্তিতে কেহ কর্ণপাত করিলেন না, অগত্যা তিনি দল ছাড়িয়া দিলেন।

জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্ন্যালের বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গন মাসিক ত্রিশ মুদ্রায় ভাড়া লইয়া পাব্‌লিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। মহা সমারোহে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় হইল কিন্তু সাধারণে গিরিশচন্দ্রের অভাব অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন। দীনবন্ধুও ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন, "একজন উৎকৃষ্ট গম্ভীর অংশের (serious part) অভিনেতা যোগদান করে নাই বলিয়া অঙ্গহানি হইয়াছে।"

ললিতের ভূমিকায় গিরিশের যশসৌরভ শুনিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, থিয়েটার করিয়া যশ লাভ করা সহজ কিন্তু যাত্রাভিনয়ে সুখ্যাতি লাভ করা শক্ত। গিরিশচন্দ্র তাহাতে সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন, "আচ্ছা আট দিনের মধ্যেই আপনাদের যাত্রা শুনাইয়া দিব।" এই সময়ে বাগবাজারে আর একটি নূতন যাত্রা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। গিরিশ এই দলে যোগদান করিয়া মণিলাল সরকার রচিত 'উষাহরণ' পালা অভিনয়ের আয়োজন করিলেন এবং ছাব্বিশখানা নূতন গান রচনা করিয়া দিলেন। এই যাত্রার আসরেই ন্যাশনেল নাট্য-সম্প্রদায়কে শ্লেষ করিয়া গিরিশচন্দ্র রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত "লুপ্তবেণী বইছে তেরো ধার"

বাবু রাধামাধব কর কর্ত্তৃক গীত হয়। * সাধারণ বিদ্রূপাত্মক রচনায় যে বিষাক্ত শর থাকে, এখানে তাহার একান্ত অভাব। সুতরাং যাঁহাদের উপর পরিহাসের শর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহারাও আমোদ বোধ করিয়া রচয়িতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক এদিকে ন্যাশনেল থিয়েটারে দীনবন্ধু বাবুর 'নবীন তপস্বিনী', 'জামাই বারিক' সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়া গেল। অতঃপর সম্প্রদায় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচন করিলেন। কিন্তু ভীম সিংহের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য যোগ্য অভিনেতা সম্প্রদায়ে ছিল না, সুতরাং গিরিশের পূর্ব্ব সহযোগিগণ আবার তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গিরিশ ভীম সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং অনেক আপত্তি বাদানুবাদের পর স্থির হইল "ভীমসিংহ by a distinguished amateur" বলিয়া প্লাকার্ডে প্রকাশিত হইবে। অন্যথা গিরিশ অভিনয় করিবেন না। সম্প্রদায় অগত্যা স্বীকৃত হইয়া সেইরূপই বিজ্ঞাপিত করিলেন। রাণী ভবাণীর বংশধর নাটোরাধিপতি মহারাজা চন্দ্রনাথ গিরিশের যোগদানে নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া নিজহস্তে তাঁহাকে স্বকীয় রাজ-পোষাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

* লুপ্তবেণী বইছে তেরো ধার,
তাতে পূর্ণ, অর্দ্ধ ইন্দু, কিরণ, সিঁদুর মাখা মতির হার।
নগ হতে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণাকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;
শিব, শম্ভুসুত, মহেন্দ্রাদি, যদুপতি অবতার॥
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান, কিবা ধর্ম্ম, ক্ষেত্রস্থান,
অবিনাশী মুনি ঋষি কর্‌ছে বসে ধ্যান।
সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার॥
কিবা বালুময় বেলা, পালে পাল রেতের বেলা,
ভুবনমোহন চরে, করে গোপালে খেলা.
মিছে করে আশা যত চাষা নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার॥
কলঙ্কিত শশী হরষে অমৃত বরষে
জ্ঞান হয় বা দীনের গৌরব এতদিনে খসে,
স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার॥

স্থান মাহাত্ম্যে—আট আনা মূল্যে টিকিট ক্রয় করিয়া ইতর জাতিও ভদ্রসমাজে বসিয়া অভিনয় দর্শন করিত।

অনতিকাল পরে আভ্যন্তরীণ কলহে ন্যাশনেলের দল ভাঙ্গিয়া দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। এক দল বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে গেলেন, অন্য দল শোভাবাজার স্বর রাজা রাধাকান্ত দেবের রাজ-ভবনে নাটমন্দিরে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিলেন। এইদল Town Hallএ একটি Charity performance করেন। 'নীল দর্পণে'র অভিনয় হয়। পরিচালক হইলেন ধর্ম্মদাস স্থর। এদলে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন না, সুতরাং গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর অভিনীত Wood সাহেবের ভূমিকা গ্রহণ করেন। দর্শকবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ; গিরিশচন্দ্রের চলন, বলন, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিতে তাঁহাকে প্রকৃত ইউরোপীয় বলিয়া তাহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল।

ধর্ম্মদাস পরিচালিত ন্যাশনেল সম্প্রদায় ক্রমে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি অভিনয় করিতে লাগিলেন, কিছুকাল পরে 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করিবার কথা হইল। গিরিশচন্দ্রই ইহা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন কিন্তু অভিনয়-রাত্রে সে পাণ্ডুলিপি আশ্চর্য্যরূপে অন্তর্হিত হইয়া যায়; সকলেই ক্ষুব্ধ হন বটে, অবশেষে অভিনয়ের পূর্ব্বে মহেন্দ্রলাল বসু মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে বলেন, "আপনি পুস্তকখানি ধরিয়া যেখানে যেমন প্রয়োজন বলিয়া যান, আমরা সেইরূপ বলিব।" অভিনয় সেইরূপই হইল, গিরিশ অন্তরালে থাকিয়া বলিয়া দিতে লাগিলেন, দর্শকগণ কেহ কোনরূপ বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে এই সম্প্রদায়ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অনুবর্ত্তী হইয়া ঢাকা রওনা হইলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যাইতে পারিলেন না। বিদেশে লাঞ্ছিত হইয়া অনতিকালের মধ্যেই উভয় দলই কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন, এবং সম্পদ যাহা বিভক্ত করিয়াছিল, বিপদ তাহা পুনরায় সম্মিলিত করিল; উভয় দলই পুনর্ম্মিলিত হইয়া Great National Theatre স্থাপন করিলেন। গিরিশ প্রথমে এ দলে ছিলেন না। অভিনয়-উপযোগী নাটক সকল পুরাতন হওয়ায় তাহাদের উপার্জ্জন কমিয়া আসিল, সুতরাং গিরিশকে প্রয়োজন হইল।

কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে Bengal Theatre প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারাই এখন Great Nationalএর প্রতিযোগী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ সময় সময় উভয়দলের মধ্যে পরস্পরে শ্লেষ, কটাক্ষপাত ও বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইত। তাহার ফলে উভয় দলেই পঞ্চরঙ্গ (Pantomime) প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শে গঠিত গিরিশ যে সম্প্রদায়ের নাট্টকার, হাস্যরসিক শেখর অর্দ্ধেন্দু অভিনেতা এবং অসামান্য হাস্যরসনিপুণা ক্ষেত্রমণি অভিনেত্রী, প্রতিযোগিতায় তাহার ফলাফল না বলিলেও পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিবেন। অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতিতে গিরিশ লিখিয়াছেন—"একদিন এক রজনীর জন্য বুধবারে ৪।৫ খানি Pantomime বিজ্ঞাপিত হইল, শনিবারে অভিনয় হইবে। কিন্তু Pantomime একখানিও প্রস্তুত নাই। শুক্রবার রাত্রি ৩টার সময় অপর বইগুলি এক রকম হইল, কিন্তু "মাউসী" নামে একখানি বিজ্ঞাপিত প্রহসন লিখিবার সাবকাশ রহিল না। স্থির হইল, আমি, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অভিনেত্রী শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি তিনজনে মিলিয়া অভিনয় করিব। অভিনয় হইল ; এই extempore অভিনয়েও তিনজনের কৃতিত্ব সমানই রহিল।"

ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও পুরাতন হইয়া উঠিল। গিরিশ তখনও মৌলিক নাটক রচনা করিবার কল্পনা করেন নাই। অভিনয়-উপযোগী উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়া দিবার জন্য সম্প্রদায় বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী-দিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাদৃশ নাটক দুই-একখানি বই আর পাওয়া গেল না। ক্রমে উপার্জ্জনের পন্থা সঙ্কীর্ণ এবং ভুবনমোহন ঋণজালে জড়িত হওয়ায় Great National আর আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। এই অবস্থায় গিরিশ lessee (লেসী) হইলেন, সম্ভবতঃ এই লিস্ বেনামী। যাহা হউক কেদারনাথ চৌধুরীর সহিত একত্র হইয়া ন্যাশনেলের প্রতিষ্ঠাকল্পে গিরিশ এইখানে তাঁহার প্রথম গীতিনাট্য 'আগমনী' রচনা করেন ও 'মেঘনাদ বধ' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ং রাম ও মেঘনাদের ভূমিকায় দর্শকগণের নিকটে সমধিক সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। রামের ভূমিকায় গিরিশ কিরূপে গ্রন্থকারকে

অতিক্রম করিয়া মূলাদর্শ রক্ষা করিতেন সেই বিষয়ে তাঁহার নিজের কথাগুলিই পাঠকের নিকট ব্যক্ত করিব।—

"নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্পায়াসসাধ্য নহে। যাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ধ্যানধারণা শক্তি নাই তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বনা। তিনি সুপাঠক হইলে যথাযোগ্য উচ্চারণের সহিত দর্শক সমীপে নিজ ভূমিকা বুঝাইয়া পাঠ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অভিনয় নহে। অভিনয়ের পন্থা কঠোর, কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অতএব যে কার্য্যে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, তাহা বিষবৎ পরিহার্য্য। অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণ কার্য্যে মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা বুঝিয়া আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হয়। নাটক-বর্ণিত ভূমিকা কোথাও ক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রদর্শন করা যায় কিনা সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে নট, নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হন না—প্রকৃত বন্ধুজ্ঞানে নাটককার তাঁহাকে অভিবাদন করেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাইকেল মধুসূদন রামকে ভীরুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত 'মেঘনাদ বধ' উচ্চ কাব্য হইয়াও হিন্দুর নিকট দূষণীয় হইয়াছে। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'মেঘনাদ বধ' নাটকে রামের ভীরুতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। যখন নৃমুণ্ডমালিনী রামকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন তখন রামকে দৃপ্তস্বরে বলিতে হয়,—

'জনম রামের, রমা, রঘুরাজকুলে
বীরেশ্বর'——ইত্যাদি

তারপর যখন বিভীষণ বলেন—

'দেখ
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ দেব অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে

ভীমারূপা, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজ কুল অরি!’

তদুত্তরে রাম উপেক্ষাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করেন—

‘দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ তেজিনু এখনি!’—ইত্যাদি

এই ঈষৎ হাস্যে নট প্রকাশ করিতে চাহেন যে, রাবণের সহিত যুদ্ধার্থে অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়াছি, রমণীর বীরত্ব আর কি দেখিব! কিন্তু রামের ভীরুস্বভাব উক্ত কাব্যে এত স্থানে প্রকাশিত যে, তাহা ঢাকিবার জন্য নটের এ কৌশল কতদূর সফল হয় তাহা বলা যায় না।”

যাহা হউক কিছুদিন অভিনয়ের পর প্রকৃত ‘লেসী’গণ দল চালাইতে অক্ষম হইলেন। তখন ভুবনমোহন নিয়োগী প্রতাপচাঁদ জহুরির নিকট ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনেল থিয়েটারের স্বত্বই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন।

গিরিশচন্দ্র এই সময় পার্কার কোম্পানীর আফিসে বুককিপারের কার্য্য করিতেছিলেন; কর্ম্মকুশল সুচতুর প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে গিরিশচন্দ্র ব্যতীত রঙ্গালয় পরিচালন করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। প্রতাপ গিরিশের শরণাপন্ন হইলেন, গিরিশ ভাবিলেন একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও অকাতর শ্রম ব্যতীত অবনতির অন্ধকূপে পতিত ব্যবসায়কে পুনরায় উন্নতির সোপানে আরূঢ় করা অসম্ভব। নাটক লিখিতে হইবে, কেননা রঙ্গালয়ে অভিনয়ের উপযোগী পুস্তকের জন্য বার বার বিজ্ঞাপন দিয়াও বাহির হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, সমস্ত দিন কর্ম্মস্থলে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে রিহার্সেল প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে, রঙ্গালয়কে উপজীবিকাস্থল না করিলে তাহার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করা বিধেয় নহে। গিরিশ এতদিন অবৈতনিক ভাবে থিয়েটারের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, এখন হইতে একশত টাকা বেতনে অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিলেন। দক্ষ কর্ম্মচারীকে আটকাইবার জন্য পার্কার বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু রঙ্গনাথের আহ্বানই বলবান হইল।

প্রতাপের স্বত্বাধিকারিত্বেও রঙ্গালয়ের নাম ন্যাশনেল থিয়েটারই রহিল। এই রঙ্গালয়ে গিরিশ 'মায়াতরু' 'মোহিনী প্রতিমা' 'সীতার বনবাস' 'অভিমন্যুবধ' 'লক্ষণ বর্জ্জন' 'আলাদিন' 'আনন্দরহো' 'রাবণ বধ' 'সীতার বিবাহ' 'ব্রজবিহার' 'রামের বনবাস' 'সীতাহরণ' 'ভোটমঙ্গল' 'মলিনমালা' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ক্রমান্বয়ে এই কয়খানি পুস্তক রচনা করেন, কিন্তু তিনচার বৎসরের অধিক প্রতাপ থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না। ব্যবসায়ে লাভ করিতে হইলে যে নিয়মিত কতকগুলি খরচের আবশ্যক ব্যয়কুণ্ঠ প্রতাপ তাহা বুঝিতেন না, এই লইয়া গিরিশের সঙ্গে তাঁহার মনোবাদ উপস্থিত হইল, গিরিশ তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। (১৮৮৩ জুন)

ন্যাশনেল থিয়েটারে গিরিশ 'সীতার বনবাস' 'সীতাহরণ' 'রাবণ বধ' 'লক্ষ্মণ বর্জ্জন' প্রভৃতি নাটকে রাম, 'আনন্দ রহো'তে বেতাল ও নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'পলাশীর যুদ্ধে' ক্লাইব ও 'মৃণালিনীতে' পশুপতির ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। তদানীন্তন কোন সমালোচকই একবাক্যে পশুপতি ভূমিকায় তাঁহার অনন্যসাধারণ অভিনয়-চাতুর্য্যের জন্য উচ্চ প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তখনকার সমালোচকেরা ছিলেন আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষাও যেমন উচ্চাঙ্গের, রসবোধও ছিল তেমনি অদ্ভুত। ইন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, অক্ষয় সরকার, শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ সমালোচনার কষাহস্তে তখন সাহিত্য ও কলার সংস্কার করিতেন। গিরিশ একস্থানে লিখিয়াছেন, "একবার সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী সঞ্চালন হয় যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌলা যেরূপ পলাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা সিরাজদ্দৌলাও সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন 'আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই'। কিন্তু তাৎকালিক সমালোচকগণ যেরূপ কঠোরতার সহিত নিন্দা করিতেন, উচ্চপ্রশংসা দানেও সঙ্কুচিত হইতেন না। এই সকল সমালোচকশ্রেণী তাৎকালিক বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের চালক ছিলেন।" কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমস্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠাকালে

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও বলিয়াছিলেন, “এক পশুপতির ভূমিকার জন্যই যে কোন দেশে গিরিশ রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন। সে মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর শুনিব না, প্রকৃত ভাবের অভিব্যক্তিও আর দেখিব না।” সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রায়ই বলিয়া থাকেন, “গিরিশচন্দ্র কারাগারে আবদ্ধ পশুপতি-বেশে যখন বলিতেন ‘মন্ত্রীবর, বল দেখি পা রাখি কোথায় ?’ আবার পরক্ষণেই অগ্নিদগ্ধ স্বীয় গৃহখানি দেখিতে পাইয়া ‘মনোরমা যে গৃহে আছে, ছাড়ো, ছাড়ো’ বলিয়া সহসা উন্মত্তাবস্থায় সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইতেন, স্মরণ হইলে আজিও দেহ কণ্টকিত হয়। এই অর্দ্ধশতাব্দিমধ্যে এরূপ অভিনয় আর দ্বিতীয় বার দেখিলাম না।”

প্রতাপের থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান মনোমোহন রঙ্গমঞ্চের ভূমিতে শিখসম্প্রদায়ভুক্ত গুর্ম্মুখ রায় গিরিশচন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে ষ্টার থিয়েটার নির্ম্মাণ করেন। এবং সেই বৎসরেই (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) ২১এ জুলাই তারিখে তাঁহারই নূতন নাটক ‘দক্ষযজ্ঞ’ লইয়া সাধারণের নিকটে উপস্থিত হন।

সমালোচকের মুখে শুনিয়াছি ‘দক্ষ’ অভিনয়েও গিরিশচন্দ্র অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। দক্ষের অভিমান, অহংজ্ঞান ও আত্মনির্ভরতা গিরিশচন্দ্রের আবৃত্তিতে এমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিত যে, নাটকের গভীর-তত্ত্ব দর্শকের নিকট সহজেই প্রতিফলিত হইয়া পড়িত।

আত্মীয়গণের গঞ্জনায় গুর্ম্মুখ রায় কিছু দিন পরেই থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ক্রমান্বয়ে স্বত্বাধিকারী পরিবর্ত্তনে গিরিশ বুঝিয়াছিলেন যে, থিয়েটার ব্যবসায়ী থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী না হইলে এ ব্যবসা কখনও স্থায়ী হইবে না। এইজন্য গুর্ম্মুখ যখন থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করেন গিরিশ বহু চেষ্টায় অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগীকে ষ্টারের স্বত্বাধিকারী করিয়া দিয়া কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রঙ্গালয়ের স্বত্ব ক্রয় করিবার সময় গিরিশ ইঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা থিয়েটার ব্যবসায়ী, ভদ্র-লোকের ছেলে এই হীনকার্য্য করতে এসে কি রকম লাঞ্ছিত হয় ভাল

রকমই জানো। এখন তোমরা স্বত্বাধিকারী হ'লে, আমার একটি অনুরোধ রেখো, তোমাদের আশ্রয়ে যেন কোন ভদ্রসন্তান লাঞ্ছিত না হয়।" প্রতিষ্ঠা-কার্য্য নিজে সাধন করিয়াও কি কারণে গিরিশ কোন কালেই থিয়েটারের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করেন নাই, তাহা তিনি নিজের কথায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—"আমরা কার্য্য করিব, বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই। আমরা আদার ব্যাপারি, আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি ?"

এখন হইতে থিয়েটার খুব জোরের সহিত চলিতে লাগিল। গিরিশ ক্রমান্বয়ে 'ধ্রুব-চরিত্র' 'নল-দময়ন্তী' 'কমলে কামিনী' 'বৃষকেতু' 'হীরার ফুল' 'শ্রীবৎস চিন্তা' 'চৈতন্য লীলা' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' 'নিমাই সন্ন্যাস' 'প্রভাস যজ্ঞ' 'বুদ্ধদেব চরিত' 'বিল্বমঙ্গল' 'বেল্লিক বাজার' ও 'রূপ সনাতন' রচনা করেন। গিরিশের সুনামের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়ও উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিল।

ষ্টার রঙ্গালয় চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিবার পর রঙ্গজগতে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইল। এই প্রতিদ্বন্দ্বী এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গোপাললাল শীল। ইঁহার সঙ্কল্প হইল যেমন করিয়া যত অর্থ ব্যয়েই হউক গিরিশকে করগত করিবেন। এই প্রভূত অর্থশালী যুবক প্রস্তাব করিলেন, হয় বিশ হাজার টাকা বোনাস লইয়া গিরিশ তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করুন, নচেৎ ষ্টারের শত্রুতা সাধনে তিনি ত্রুটি করিবেন না। ষ্টার তথাপি গিরিশচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে নারাজ। তিনি সহায় থাকিলে যত ক্ষতিই হউক, সব পূর্ণ হইবে। গিরিশ ষ্টারের স্বত্বাধিকারী-গণকে বুঝাইলেন যে তাঁহার বোনাসের টাকায় থিয়েটারের নির্ম্মাণ কার্য্যের সহায়তা হইবে। অবশেষে সেইরূপই স্থির হইল। প্রাপ্য বেতন বাবদ বিশ হাজারের চারি হাজার টাকা কাটিয়া লইয়া বাকি ষোল হাজার টাকা ষ্টারের স্বত্বাধিকারীগণকে দিয়া গিরিশ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে এমারেল্ডে যোগদান করিয়া পরপর 'পূর্ণচন্দ্র' ও 'বিষাদ' রচনা করিলেন। গিরিশের বেতন ধার্য্য হইল মাসিক তিন শত পঞ্চাশ টাকা। 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনয় দর্শন করিয়া 'রিস্ ও রায়তের' সম্পাদক স্বনামধন্য শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে,

"এক পূর্ণচন্দ্রেই গোপাল বাবুর বিশ হাজার টাকা আদায় হইয়া গিয়াছে।" ইতিমধ্যে হাতি বাগানে ষ্টারের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। গিরিশ এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গোপনে 'নসীরাম' লিখিয়া দিলেন। তাঁহার 'নসীরাম' সম্বল করিয়া অমৃতলাল বসুর অধ্যক্ষতায় ষ্টার খোলা হইল। গিরিশ তখন এমারেল্ডের জন্য 'বিষাদ' রচনা করিতেছেন। 'বিষাদের' অভিনয়ে এমারেল্ডে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোপাললালের নাট্যসখও মিটিয়া গেল। গোপাললাল থিয়েটার লীজ দিলেন, এবং গিরিশচন্দ্রও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রিয় শিষ্যগণের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন। থিয়েটার পরিচালনার ভার তাঁহারই উপর পড়িল।

গিরিশ ষ্টারে আসিয়া 'প্রফুল্ল' 'হারানিধি' 'চণ্ড' 'মলিনা বিকাশ' ও 'মহাপূজা' রচনা করিলেন। থিয়েটারে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। কিন্তু অচিরেই স্বত্বাধিকারীগণের সহিত তাঁহার মনোভঙ্গ হইল। গিরিশের সংসারে তখন বিপদের উপর বিপদ চলিয়াছে; তাঁহার শিশু কন্যাদ্বয় এবং দ্বিতীয়া পত্নী মৃত এবং শিশু পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত। গিরিশ নিয়মিতরূপে থিয়েটারে যাইতে পারিতেন না। ষ্টারের স্বত্বাধিকারীগণ তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। গিরিশ রুগ্নপুত্র লইয়া মধুপুরে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। সেখানে সংবাদ গেল ষ্টারের স্বত্বাধিকারগণ তাঁহার নামে হাইকোর্টে মোকদ্দমার আয়োজন করিতেছেন। গিরিশ অবিলম্বে কলিকাতা ফিরিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই শিশু-পুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হইল। তৎপরে পরলোকগত বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী মিলিত হইয়া ষ্টার পরিত্যাগ করিয়া সিটি থিয়েটার স্থাপন করেন। গিরিশ এখানে প্রকাশ্যে যোগদান করেন নাই। কিন্তু প্রয়োজনমত সহায়তা করিতে ত্রুটি করিতেন না। ইহার পর স্বনামখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় সিটির দল লইয়া গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি নূতন নাট্যশালা খুলিবার সঙ্কল্প করিলেন। ন্যাশনেল থিয়েটারের জমির উপর অভিনব নাট্যগৃহ নির্ম্মিত হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা

থিয়েটার খোলা হইল। 'ম্যাক্‌বেথে'র পূর্ব্বানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া নায়কের ভূমিকায় দীর্ঘকাল পরে গিরিশচন্দ্র পুনরায় উক্ত খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ধর্ম্মদাস ষ্টেজ ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেও সমস্ত দৃশ্যপট সাহেব চিত্রকর উইলার্ড দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ইংরাজের তত্ত্বাবধানে এবং প্রসাধন কার্য্যের ভার বিখ্যাত বেশকার পীম্‌ সাহেবের উপর ন্যস্ত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে রঙ্গমঞ্চে সেক্‌সপিয়র প্রচলন করিবার জন্য যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই। ইংলিস-ম্যানের সম্পাদক স্বয়ং অভিনয় দর্শন করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করেন, "A Bengali Thane of Cawdar is a living suggestion of incongruity but the reality is an astonishing reproduction of the standard convention of the English stage." ম্যাক্‌বেথের অভিনয় করিয়া এই মিনার্ভা থিয়েটার সাধারণের নিকট প্রথম শ্রেণীর নাট্যশালা বলিয়া গণ্য হয়।

কিন্তু গুণগ্রাহীগণ অনুবাদ ও অভিনয়ের অপরিমিত সুখ্যাতি করিলেও সাধারণের সহানুভূতির অভাবে সবে দশরাত্রি অভিনয়ের পর 'ম্যাক্‌বেথ' বন্ধ করিতে হইল। ক্রমে 'মুকুল মুঞ্জরা' 'আবুহোসেন' 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' 'জনা' 'বড়দিনের বক্‌সিস্‌' 'স্বপ্নের ফুল' 'সভ্যতার পাণ্ডা' 'করমেতিবাই' 'ফণীর মণি' 'পাচকনে' অভিনীত হইয়া মিনার্ভার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। কিন্তু অবিমৃষ্যকারিতাহেতু নাগেন্দ্রভূষণ উত্তরোত্তর দুর্ভেদ্য ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন, রঙ্গালয়ের দুরবস্থা দেখিয়া গিরিশ স্বয়ং আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে নাগেন্দ্রের সহিত তাহার মনোভঙ্গ হয়, এবং গিরিশকে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করিতে হয়। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে লইয়া গিয়া নাট্যাচার্য্যরূপে বরণ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে গিরিশ 'কালাপাহাড়' রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দৃশ্য-কাব্য মিনার্ভায় অভিনীত হয় নাই। ষ্টারে যোগদান করিবার পরেই গিরিশের 'কালাপাহাড়' নাটক এইখানে অভিনীত হইল; গিরিশ স্বয়ং চিন্তামণির ভূমিকা গ্রহণ করেন। গিরিশ এই থিয়েটারের

জন্য পরে 'হীরক জুবিলি' 'পারস্য প্রসূন' ও 'মায়াবসান' রচনা করিয়া দেন। শেষোক্ত নাটকে তিনি কালীকিঙ্করের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইহার পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূতপূর্ব্ব এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ দেশপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে লইয়া ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠা হইল। নাট্যাচার্য্যরূপে গিরিশ প্রায় এক বৎসর তাহার কার্য্য পরিচালনা করিলেন। এই সময়ে 'দেলদার' ও 'পাণ্ডব গৌরব' রচিত হয়। অতঃপর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী হইয়া গিরিশকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। মিনার্ভায় আসিয়াই গিরিশ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নাটকাকারে পরিণত করিয়া দিলেন। তিনি নিজে সীতারামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তৎপরে 'মণিহরণ' ও 'নন্দদুলাল' রচনা করিয়া থিয়েটারের আয়বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ব্যবসা রক্ষণে সক্ষম হইলেন না। অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় ক্লাসিকে লইয়া গেলেন। অমরেন্দ্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া গিরিশ 'অশ্রুধারা' 'মনের মতন' 'অভিশাপ' 'শাস্তি' 'ভ্রান্তি' 'আয়না' ও 'সৎনাম' রচনা করেন। কিন্তু অচিরে ক্লাসিকে নানা গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় গিরিশও সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর মনোমোহন পাঁড়ে ও মহেন্দ্রনাথ মিত্র ষাট হাজার টাকায় মিনার্ভার স্বত্ব ক্রয় করিয়া গিরিশের উপর নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করিলেন, কিন্তু মিনার্ভার সহিত তাঁহার এই তৃতীয় সংস্রব তিন বৎসরের অধিক স্থায়ী হইল না। এই সময়ের মধ্যে গিরিশ 'হরগৌরী' 'বলিদান' 'সিরাজদ্দৌলা' 'বাসর' 'মিরকাশিম' 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' রচনা করেন। এক 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মিরকাশিম' অভিনয়ই মিনার্ভা রঙ্গালয়কে লক্ষাধিক মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল।

নাট্য-সাহিত্য হিসাবেও এই শেষোক্ত তিনখানি নাটক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কিন্তু অভিনয়ের কিছুদিন পর হইতেই ইহার মুদ্রাঙ্কন ও নাটকাভিনয় রহিত হইয়াছে। ছত্রপতি পাঠ করিয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ

স্বদেশভক্ত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত হিতবাদীতে যে কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল— "শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় কৃতী ও প্রবীণ নাট্যকার 'ছত্রপতি' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার রচিত নাটক পাঠ করিয়া রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গিরিশবাবুর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তিনি মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের চিত্র অঙ্কনে বিশেষরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি। মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজী চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণ এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে।"

মিনার্ভায় প্রায় সব নাটকেই গিরিশ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। করুণাময়, করিমচাচা, মিরজাফর ও আওরঙ্গজেব প্রভৃতি ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রকে দেখিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে, সকলেই একবাক্যে বৃদ্ধবয়সেও গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন।

কিন্তু অচিরেই রঙ্গক্ষেত্রে এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হওয়ায় মিনার্ভার স্বত্বাধিকারীদ্বয়কে গিরিশচন্দ্রের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। হাইকোর্টের উকিল প্রসন্নকুমার রায়ের পুত্র শরৎকুমার রায় একলক্ষ আট হাজার টাকায় এমারেল্ড রঙ্গালয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ক্রয় করিলেন। অমরেন্দ্র এই থিয়েটার লিজ লইয়া ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'ক্লাসিক'। শরৎ ইহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া নূতন নামকরণ করিলেন 'কোহিনূর'। প্রসন্নকুমার শরৎকে বলিলেন—"যদি ভাল করে' থিয়েটার করতে চাও, যেমন করে' পার গিরিশ ঘোষকে নাও।" শরৎবাবু গিরিশকে দশ হাজার টাকা বোনাস্ দিয়া ও ৪০০ চারি শত টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া কোহিনূরের ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে কর্ম্মস্থল পরিবর্ত্তনে ও অপরিমিত শ্রমে গিরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িল, কোহিনূরের জন্য কোন নূতন নাটক রচনা করা হইল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' রঙ্গালয়ের উপযোগী করিয়া দিয়া থিয়েটার খুলিয়া দিলেন, কিন্তু বৎসরের মধ্যে শরৎকুমারের শোচনীয় মৃত্যু আবার তাঁহাকে অব্যবস্থিত করিল। শরৎকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিশিরকুমার থিয়েটার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু গিরিশের সহিত তিনি সম্প্রীতি রাখিতে পারিলেন না। শরৎকুমারের মৃত্যুর পর থিয়েটারের একান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া গিরিশ একখানি নূতন নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। চতুর্থ অঙ্ক শেষ হইবার পর, গিরিশের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হইল। গিরিশচন্দ্রের তখন রুগ্ন অবস্থা। শিশির সেই সময় তাঁহার বেতন বন্ধ করিলেন। পারত-পক্ষে গিরিশ স্বত্বাধিকারীর সহিত বিবাদ করিতেন না, কিন্তু শিশিরের অসদ্ব্যবহার তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করাইল, বোনাসের ৪০০৲ বাকী ও প্রাপ্য বেতনের মোকদ্দমায় গিরিশ জয়লাভ করিলেন। এই সময় মিনার্ভায় পুনরায় তাঁহার ডাক পড়িল। স্বত্বাধিকারীদ্বয় ৪০০৲ বেতন ও লাভের পঞ্চমাংশ তাঁহার পারিশ্রমিক ধার্য্য করিয়া দিলেন, গিরিশ চতুর্থবার মিনার্ভায় যোগদান করিয়া 'শাস্তি কি শান্তি' 'শঙ্করাচার্য্য' 'অশোক' 'তপোবল' 'নিত্যানন্দ বিলাস' 'বিধবার বিবাহ' ও 'চাবুক' রচনা করেন। কিন্তু শেষোক্ত তিনখানি পুস্তক অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই মহাকাল আসিয়া তাঁহার নট ও নাট্য জীবনের উপর যবনিকা পাত করিল।

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন যে, গিরিশচন্দ্রের অভিনয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার পরম সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই। স্বচক্ষে শিল্প-চাতুর্য্য প্রত্যক্ষ না করিয়া মতামত প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যদিচ প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচক মাত্রই বলিয়া থাকেন গিরিশের অসাধারণ নটকৃতিত্বে একমাত্র শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পী গ্যারিকের সঙ্গেই তাঁহার তুলনা হইতে পারে, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহার অভিনয় সমা-লোচনায় আমি একরকম বিরতই রহিলাম। তবে নটের সাধনা সম্বন্ধে

তিনি নিজে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা পাঠককে তাহাই উপহার দিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব :—

"কালে অভিনয়-কার্য্যের যে গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্ব্ব-সাধারণে নটের আদর করিবে তাহা সত্য। কিন্তু সে আদর লাভের পথ পরিষ্কার বর্ত্তমান নটমণ্ডলী আমাদিগকেই কবিতে হইবে। অভিনয় কার্য্যের কেন, কোন কার্য্যেরই আদর প্রথমে হয় না। এই ইংরাজী চিকিৎসা, যাহার ইদানীং এত পূজা, আমার বালককালে শুনিয়াছি, তাহা 'মানুষখুন'করা নামে অভিহিত হইত। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে নটের আদর নাই তাহার কারণ সাধারণ যাত্রা পাঁচালীতে ভাঁড়াম ও কুৎসিৎ রুচি দেখিয়া অনেকে মনে করেন সাধারণ অভিনয়ও ঐ শ্রেণীর। কিন্তু যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে —কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুরসৃষ্টি করিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল সুসজ্জিত করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তব ভ্রম উৎপাদন করিতেছেন,—যদি আমরা দেখাইতে পারি রঙ্গালয় হইতে সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যার উন্নতি হইতেছে, যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে অভিনয় বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল —তবে নট সুধী-জন-সমাজে তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা—তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন।"

গিরিশচন্দ্র একাগ্র সাধনায় অভিনেতার এই মহান্ উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। যদিও কর্ম্মক্লান্ত মানবের আনন্দ প্রদানের জন্য তিনি স্থায়ী রঙ্গালয় সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এবং আজ তথায় ছোট বড় সকলেই আনন্দ করিতে যায়, কিন্তু কেবল আনন্দদানেই তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আরও মহত্তর। তিনি বলিতেন, "রঙ্গালয় কলাবিদ্যাবিশারদের কার্য্যস্থল।" এবং—এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার আজীবন উদ্যম ও অবিরত সাধনা "কিরূপে আনন্দস্রোত মানবহৃদয় স্পর্শ করিয়া

মানবের উন্নতি সাধন করিতে পারে। গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণ দৃশ্যসকল অঙ্কিত করিয়া, দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরে। দর্শকও তুষারাবৃত হিমাদ্রি-শিখরের চিত্র দর্শনে মহাদেবের ধ্যানভূমির আভাষ পান। কোকিলকুজিত পুষ্পিত কুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি অনুভব করিতে পারেন। মহাকালের মুকুর স্বরূপ বিশাল সমুদ্র অঙ্কিত চিত্রপট দর্শন করিয়া অনন্তের আভাষ প্রাপ্তিতে স্তম্ভিত হন। বাহ্যচাকচিক্যমণ্ডিত পাপের ছবি দেখিয়া তাঁহার মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। আত্মত্যাগী মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমে প্রেমের আভাষ পান। উদ্ঘাটিত মানবহৃদয়ে প্রেমের দ্বন্দ্ব দেখেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে যে সকল রিপু বর্জ্জনীয় তাহাও বুঝিয়া যান। অন্তস্তলস্পর্শী তানলহরীর সরস সলিলে হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া বিমল অশ্রুজল শ্রোতার চক্ষে আনে। ক্ষুদ্র কাপট্যের ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপ নিজ চতুরতাপ্রভাবে বিফল হইয়া, কিরূপ হাস্যাস্পদ হয়, তাহাও দেখিতে পান। নবরসে আপ্লুত হইয়া দর্শক তাঁহার সুখস্বপ্নে যামিনী যাপন করেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম-জীবন

গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন অতি বিচিত্র। বাল্যকালে তাঁহার বিশ্বাস কিরূপ ছিল বলা যায় না, কিন্তু যৌবনে আমরা দেখিয়াছি তাঁহার মস্তিষ্ক ঘোরতর নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ, অথচ তাঁহার ভাবপ্রবণ চিত্ত চিরদিনই একটা চির শান্তিময় আশ্রয় লাভ করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়ের এই দারুণ সংগ্রামে তিনি কিরূপে বিজয়ী হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই কথাই এক্ষণে আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্রের বাল্যকালে ও যৌবনে বাঙ্গালায় বড়ই ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এ সময়ে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার-ব্যবহারাদিতে কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। গিরিশ ধার্ম্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিল। কিন্তু তথাপি সময়ের প্রবল স্রোতে তিনিও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার এই স্বধর্ম্ম বিচ্যুতির কারণ ও কাহিনী আমরা তাঁহার নিজের কথায় ব্যক্ত করিব। "আমাদের পাঠদ্দশায় যাঁহারা Young Bengal নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজি শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী। অল্প সংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না, বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের

মধ্যে মতভেদ ; শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে, এবং বৈষ্ণবসমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্য-নারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটী হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাজিও দুপাতা পড়িয়াছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে ইত্যাদি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধিবিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ঈশ্বর না-মানা বিদ্যার পরিচয়, এ অবস্থায় স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে। আদিসমাজেও কখনো কখনো যাওয়া আসা করি। একটি ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কি না সন্দেহ। যদি থাকেন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্ক-বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না। ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম—ভগবান যদি থাকো আমার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দাও। ইহার কিছুক্ষণ পরেই দাম্ভিকতা আসিল। ভাবিলাম—জল, বায়ু, আলো, ইহ-জীবনের যাহা প্রয়োজন তাহা অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে, তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত-জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যাকথা, জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা।—"

—[ভগবান রামকৃষ্ণদেব—জন্মভূমি, আষাঢ় ১৩১৬]

পাশ্চাত্য জড়বাদ ও নাস্তিকতা সে সময় শিক্ষিতাভিমানীর উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত, অন্য প্রবন্ধে আমরা আরও সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। "সে সময়ে জড়বাদ প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক প্রকার মূর্খতা ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচয়। সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া 'ঈশ্বর নাই' এই কথাই

প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম, এবং এপাত ওপাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে ধর্ম্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। দুষ্কর্ম্ম ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম্ম, গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য্য, কৌশলে স্বার্থসাধন করাই পাণ্ডিত্য।"

—[পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ—উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩১২]

কিন্তু বুদ্ধির বিচারে ধর্ম্ম সংসাররক্ষার্থ কৃতকল্পনা বলিয়া স্থির হইলেও গিরিশচন্দ্রের হৃদয় যে তাহা একান্তপক্ষে সমর্থন করিতে পারিতেছিল না, তাঁহার আচরণেই তাহা প্রকাশ। তাই ঘোর নাস্তিকতার দিনেও গিরিশ যেদিন গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন—রামতর্পণ পাঠ করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে তিন অঞ্জলি জল দিতেন। ভাবিতেন, "কি জানি, সত্যই যদি পরলোকে পিতার কাজ হয় সেই টানে জল দিই।"

তর্ক, যুক্তি, অহঙ্কার, যতই আস্ফালন করুক পুরুষকার যতই সাহস দিক্, আজন্ম নির্ভরপরায়ণ মানব ঘটনাচক্রে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া নিরীশ্বরতায় কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। দশম বর্ষের "উদ্বোধন" পত্রিকায় 'শান্তি' প্রবন্ধে গিরিশ তাহাই বলিয়াছেন—

"যিনি যত বড় নাস্তিকতা প্রকাশ করুন, যতই তর্ক করিয়া ঈশ্বর উড়াইয়া দিন রোগ, শোক, বিপদ, মৃত্যুভয় পূর্ণ সংসারে তাঁহার একবার না একবার একটা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। যখন কোন বলবান শত্রুর তাড়নায় ব্যাকুল হন, তখন তাঁহার একটা শত্রুদমনকারী-ঈশ্বর থাকিলে ভাল হয়। নিজের বা স্ত্রীপুত্রের অথবা আত্মীয়ের অতি সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় বৈদ্য-ঈশ্বর খোঁজেন। ঈশ্বর থাকিলে ভাল হইত, একথা অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত নাস্তিককেও একবার না একবার বলিতে হয়। ঈশ্বর নাই অথবা যদি থাকেন, তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি দুর্জ্ঞেয়, এ সকল তর্কবিতর্ক বিদ্যাভিমানে দর্শনপুস্তক লিখিবার সময় বা দার্শনিক তর্কবিতর্ক সভায় একরকম চলে, কিন্তু সাংসারিক একটা কঠিন বাঁকে পড়িয়া, যে সকল কথা মুখে বা পুস্তকে তর্কপাঁতিরূপে শোভা

পাইয়াছিল, সে সকল তাঁহার শান্তিহীন হৃদয়ে ততটা শোভা বিকাশ করে না। সে সময়ে তাঁহার ঈশ্বরবিরোধী তর্কের তত জোর থাকে না। সংসার পাকে ঘূর্ণায়মান হইয়া তাঁহার নিজের বুদ্ধিমত্তার তত প্রশংসা নিজে করে না।”

যে সত্য নিজ জীবনে উপলব্ধি হয় নাই কবির লেখনীতে তাহা আত্ম-প্রকাশ করে না। গিরিশচন্দ্রের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি তাঁহার আত্মগত অভিজ্ঞতা। জন্মগত স্বভাবের উপর শিক্ষা এবং সাময়িক অবস্থা যতই প্রভাব বিস্তার করুক, বংশানুগত সংস্কার হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায় না। গৃহে অধিষ্ঠিত নুড়িরূপী ‘শ্রীধরে’র উপর মাতার ঐকান্তিক ভক্তি ও অটল বিশ্বাসই গিরিধারী শিলায় প্রমাতামহ চূণিরামের অচলা শ্রদ্ধা, বাল্যকালের সেই পুরাণকাহিনী গিরিশের অন্তরের অন্তরে যে সুগভীর রেখাপাত করিয়া-ছিল—নাস্তিকতার মধ্যে আন্তরিক অশান্তিই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাই দেখিতে পাই, নাস্তিকতার সেই ঘোর দুর্দ্দিনেও তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। তাই তাঁহার নিঃশব্দ শোক-পরায়ণ মন ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া যোগিনীরূপিণী ধূতুরাকে প্রশ্ন করিতেছে—

“যার লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী
দেখিতে কি পাও তার বাঞ্ছিত বয়ান ?”

তাই দেখিতে পাই আধ্যাত্মিকতার সেই ঘোর অমানিশায় বুদ্ধি যাহা যুক্তি বলে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছে না তাহা বিশ্বাস করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল ঃ—

“অনিশ্চিত অনিশ্চিত ! বুদ্ধি পরাজয়,
নির্ণয় না হয়—হায়, কে আছ কোথায় ?”

—[কালাপাহাড় ১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক]

কিন্তু বুদ্ধির বিচারের উপর গিরিশচন্দ্রের এখনও অগাধ প্রত্যয়। তাঁহার তর্কশক্তিও অতি উর্ব্বর ও প্রখর। যে মেধা তাঁহার নিকট উত্তর কালে

করিয়াছিল—

"তর্কবুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন"

তাহা এখনও বহু দূরে। এ সময় গিরিশ বুঝিতেন, তর্ক ও যুক্তি-বিচার বলে যাহা অপ্রমেয়, যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন অমার্জ্জনীয় মূঢ়তা। কিন্তু তথাপি তাঁহার অশান্ত হৃদয় জীবনের চরম আশ্রয় লাভ করিবার জন্য "দে ফটিক জল" বলিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এই দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-সমাকীর্ণ হৃদয়ের বিচিত্র চিত্র গিরিশ তাঁহার বহু নাটকে অঙ্কিত করিয়াছেন। "বিল্বমঙ্গলে" সোমগিরি শিষ্যের সংশয় দূরীকরণার্থ উপদেশ দিতেছেন—

"এ সংসার সন্দেহ আগার
বিভু নহে ইন্দ্রিয় গোচর
ঈশ্বর লইয়া তর্ক যুক্তি করে অনুমান
যত করে স্থির,
সন্দেহ তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।"

(বিল্বমঙ্গল, ৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

"কালাপাহাড়ে" ও এই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই—

অন্ত-স্তল চঞ্চল প্রবল
সন্দেহ প্রবাহ পাকে, নিবিড় আঁধার
আবরিল হৃদাকার, হাহাকার নিশি-
দিবা ;—সত্য তত্ত্ব কিবা কহ মহাশয়!

অন্যত্র,—

শাস্ত্রচ্ছটা, ব্যাখ্যা ঘটা, বাক্যের বিন্যাস
হতাশ হুতাশে করে মানবে নিক্ষেপ।
ক্ষুদ্রনর, শমনের ডর নিরন্তর
হৃদে জাগে, আকুল এ অকূল পাথারে
সন্দেহ-সাগরে তুলে দুরন্ত হিল্লোলে,
এই আশ, তখনি নিরাশ, মহাত্রাসে
ভাসে জীবকুল, রোদনের ধার বহে
অনিবার, কে রাখিবে দারুণ সঙ্কটে—

কোথা কোথা দয়াল ঈশ্বর!
জীবে কৃপা কই তাঁর?
অকূল এ দুরন্ত পাথার।”

এক মাত্র অলৌকিক ঘটনা এই সকল তর্ক যুক্তি বিচারের মুখ বন্ধ করিতে সমর্থ। কিন্তু অতি প্রাকৃতিক ত অসম্ভবের অসম্ভব। হিউমের পক্ষপাতী গিরিশ এসময় তাঁহারই সহিত সমস্বরে বলিতেন, “It is more probable that men should lie than miracles should be true.” দৈব শক্তি প্রতিপন্ন করিতে যাঁহারা অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেন, তাঁহারা হয় ভ্রান্ত, নয় মিথ্যাবাদী। তাঁহার কালাপাহাড়ের মতই তিনি বলিতেন—

“কি প্রমাণ তিনি বিদ্যমান
প্রমাণ, প্রমাণ কই, কোথা ভগবান?”

এই ত তাঁহার পুণ্যবতী সাধ্বী জননী, শ্রীধর বলিয়া পূজিত ঐ নুড়ির আজীবন সেবা করিয়া বক্ষে পুত্রশোকরূপ শেলাঘাত লইয়া সংসার হইতে চলিয়া গেলেন, শ্রীধর তাঁহার কি করিলেন? “বুদ্ধদেবে” ও আমরা এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

“কোথা ব্রহ্ম? কোথা তাঁর স্থান?
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার—
তবে কেন রোগ শোক জরা,
দুঃখের আগার ধরা?
মৃত্যু কেন জীবনের পরিণাম?
জীবকুল কিবা অপরাধী,
নিরবধি সহে দুঃখ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে—
পিতা কভু নাহি পারে!
এ সংসার সন্তাপ-সাগর;
সহে নর অশেষ যন্ত্রনা
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন?

রোগশোকে করে আর্ত্তনাদ—
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায় ;
কিম্বা, ব্রহ্ম শক্তিহীন, দুঃখের মোচনে ?"

দারুণ দুশ্চিন্তায় আলোড়িত, সংসার-জড়িত গিরিশচন্দ্রের—ব্যাকুল হৃদয় যখন জীবনের চরম আশ্রয় লাভ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত, তখনই তাঁহার কূট বুদ্ধি বলিত—

"কোথায় ঈশ্বর ?
কলেবর ধরে নর ভূতের সংযোগে—
অনিয়ম স্রোতের অধীন সবে ভাসে"

এইরূপে গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞানবাদিগণের ন্যায় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর সংশয়ালোড়নে ইতস্ততঃ বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। তাহাদেরই ন্যায়

"হায়, চিত্ত তার ঘোর অন্ধ অন্ধকারে"

তাহাদেরই ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন—

বিজ্ঞান কেবল মানবের বল,
কত শত করিছে কৌশল ;
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্য জ্ঞান,
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
লিখে দম্ভ ভরে
ঈশজ্ঞান অনর্থের হেতু।

চৈতন্যলীলা,—১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য।

এ দিকে দেহে তাঁহার যেরূপ অসুরের বল, তর্কশক্তিও যেমন প্রখর, অহঙ্কারও ছিল তদনুরূপ অসামান্য। বিদ্যা বুদ্ধির অভিমানে গিরিশ কিছুই দৃক্‌পাত করিতেন না ; আর যাহা বুঝিতেন নীরবে অনুভব করিবার লোকও তিনি ছিলেন না। "ঈশ্বর নাই" তাঁহার এই সিদ্ধান্ত তিনি ডাক্ হাঁক্ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং ব্যবহারেও ঐতিহাসিক কালাপাহাড়ের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা, সাধু-সন্ন্যাসীর

লাঞ্ছনা, এবং তথাকথিত ব্রাহ্মণকে অপমান তাঁহার সাময়িক দোষ হইয়া উঠিল। অবিশ্বাসের ঘোর দুর্দ্দিনে এক বৎসর শারদীয়া পূজার সময় গৃহে মৃণ্ময়ী দশভুজা মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত দেখিয়া তিনি দেবীর অস্তিত্বসন্দেহে উহা শতধা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অন্যত্র শুনিতে পাই দেবতা উপযুক্ত দণ্ড বিধান করেন কিনা দেখিবার জন্য পথিপার্শ্বস্থ লিঙ্গমূর্ত্তিকে যথোচিৎ লাঞ্ছনা করিতেও ক্রুটী করেন নাই। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এ যুগেও এইরূপ কালাপাহাড় দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না, আর তিনিও দুর্দ্দান্ত পামর ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হইয়া আনন্দোপভোগ করিতেন।

তাঁহার তদানীন্তন মানসিক বিকৃত অবস্থা আমরা 'চৈতন্যলীলা' নাটকে সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাই। মাৎসর্য্য পাপের নিকট আত্মগুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিতেছে—

—যদি মাতা করগো প্রত্যয়
একা আমি করি সমুদয় ;
অতি হীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায় ;
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-পরাজয়
বুদ্ধি বলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার ;
বুদ্ধি তারে বলে,
ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই।
গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দিবে ?

[১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সংসারে রোগ, শোক, দুর্ঘটনা, মৃত্যু নিয়মের অধীন, ইহাদের হাত অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। গিরিশেরও সংসারে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। পিতৃমাতৃহীন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভ্রাতৃযুগল কানাইলাল ও ক্ষীরোদ-চন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। এবং ত্রিশবৎসর

বয়সে (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) পত্নীর পরলোকপ্রাপ্তিতে সেই শোক ক্রমে মনোবিকারে পরিণত হইল।

"গার্হস্থ্য জীবনে" আমরা দেখিয়াছি, এই সময়ে গিরিশ শশী, গিরি, ধুতুরা প্রভৃতি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেন, তাহাতে ভগবচ্চিন্তা ক্ষণপ্রভার ন্যায় তাঁহার চিত্ত সমাহিত করিলেও অন্ধকার আসিয়া আবার তাহা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

যদিচ কথনো তিনি গিরিকে প্রশ্ন করিতেছেন—

"উন্মত্ত কি তত্ত্বে যাও ভেদিয়া অম্বর ?"

ধুতুরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"কার ধ্যানে মগ্ন প্রাণে, চেয়ে আছে শূন্য প্রাণে
কি মন-বিরাগে বল শ্মশানবাসিনী ?"

পরমুহূর্ত্তেই—

"চমকি তখনি পুনঃ পরাণ আকুলি।"

কিন্তু মানব জীবন পরিবর্ত্তনশীল। গিরিশের ধর্ম্মজীবনেও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আসিল। অতঃপর মর্ম্মে মর্ম্মে যিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—

"কভু—
কেহ শিখে মহাদুঃখে নিপতিত যবে।"

[বিল্বমঙ্গল, ৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।]

একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন কি গূঢ় উদ্দেশ্যে সেই গিরিশের দম্ভ তিনি পদে পদে চূর্ণ করিয়া তাঁহার সংশয় দূরীভূত করিলেন ও নানারূপ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে অলৌকিকে অবিশ্বাসী গিরিশের বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়ীভূত করিলেন ; আমরা সেই সমস্ত ঘটনার কয়েকটী এই স্থানে বিবৃত করিব—

স্ত্রীবিয়োগের পর ফ্রাইবারজার কোম্পানীর কাজে তিনি যখন ভাগল পুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন কতিপয় বন্ধুর সহিত বেড়াইতে যান এবং কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া একটি গহ্বরে নামিয়া পড়েন। অবরোহণ করিতে সক্ষম হইলেও বহির্গমনের কোন পথ না

পাইয়া গিরিশ হতাশ হইয়া পড়েন। বহু চেষ্টায়ও কোন পথ দেখিতে না পাইয়া ভয়ার্ত্ত বন্ধুগণ গিরিশকে তিরস্কারের সহিত বলিতে লাগিলেন "দেখো, তুমি নাস্তিক বলিয়াই আমরা তোমাকে নিয়া এরূপ বিপদে পড়িয়াছি। এসো সকলে মিলিয়া একবার মধুসূদনকে ডাকি, নতুবা রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। নিরুপায় দেখিয়া গিরিশ মৃত্যুভয়ে বন্ধুগণের সহিত সমস্বরে ডাকিলেন, "ঈশ্বর, পথ দেখাইয়া দাও।" আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার পরেই এক অদৃষ্টপূর্ব্ব পথ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল এবং বিপদহারীকে ডাকিয়া তিনিও বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু গিরিশ ইহার পর হইতেই যে বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন তাহা নহে। সম্পূর্ণ প্রত্যয় না করিয়া বিপদের ভয়ে মানিয়া লইতে হইবে, এইরূপ যুক্তিহীন বিশ্বাস তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। তাই তিনি উপরে উঠিয়াই বন্ধুগণকে বলিলেন, "ভাই, আজ বিপদে পড়িয়াই তাঁহাকে ডাকিলাম, কিন্তু যদি বিশ্বাস করিয়া কখনও তাঁহার নাম লইতে পারি, তবেই লইব, নতুবা বিপদে কি মৃত্যুভয়েও নহে।" এই ঘটনার পরেই কলিকাতা আসিবার প্রাক্কালে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল এবং ইতি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় তিনি সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন; ইহারই অব্যবহিত পরে তাঁহার দ্বিতীয় পরিণয় অনুষ্ঠিত হয়।

এই ঘটনার ন্যূনাধিক ছয়মাস পরে গিরিশ দারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার পীড়ার প্রকোপ এত বৃদ্ধি পাইল যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আসন্ন-মৃত্যু গিরিশ অচৈতন্যাবস্থায় এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাঁহার সীমন্তে সিন্দূরশোভা, নয়নদ্বয় অপূর্ব্ব স্নেহ-জড়িত, এবং পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী। এই করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি গিরিশের সম্মুখীন হইয়া "বৎস এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর, ইহা সেবন করিলেই অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে" বলিয়া মহাপ্রসাদ গিরিশের মুখে তুলিয়া দিলেন। চৈতন্য লাভ করিবার পরেও গিরিশের মনে হইল

তখনও মহাপ্রসাদের আস্বাদ তিনি অনুভব করিতেছেন। সেই রাত্রি হইতেই তাঁহার নাড়ী সজীব হইয়া উঠিল এবং গিরিশ আরোগ্য-লাভ করিতে লাগিলেন। অলৌকিকে গিরিশচন্দ্রের এই প্রথম প্রত্যয় জন্মিল; তিনি ভাবিলেন "তাইত, এও হয়?"। প্রাপ্তবয়সে গিরিশ এই ঘটনাটি বিবৃত করিতে করিতে বলিতেন, "সেই মহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ এখনও আমার স্মরণ আছে"। 'পূর্ণচন্দ্রে' রাণী ইচ্ছার মুখে তিনি এই দেবতা-দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন,

"নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ যে তেজঃ পুঞ্জকায়"

ষোড়শ বৎসর পরে (১৮৯১।৯২ খৃষ্টাব্দে) জয়রামবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধর্ম্মিনীর পুণ্যদর্শন প্রথমে লাভ করিয়া গিরিশ বুঝিয়াছিলেন যে "ইনিই বহুপূর্ব্বে মাতৃরূপে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।"

জীবন লাভ হইল বটে কিন্তু বিষয় কর্ম্মে তিনি অতঃপর বিপজ্জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে বিপদ ঘনীভূত, স্বাস্থ্য ভগ্ন, বন্ধু-বান্ধব হীন, এবং দৃঢ়পণ শত্রু সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। কেবল তাহাই নহে, তাহার কার্য্যে আবার সেই শত্রু সম্পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত। গিরিশ বুঝিলেন, আত্মনির্ভর ও পুরুষকারই জীবনে একমাত্র সম্বল নয়। এই সময়ে তাঁহার ঈশ্বরকে স্মরণ হইল। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন "উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, হে ঈশ্বর, যদি থাকো, এ অকূলে কূল দাও। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন কেহ যদি আর্ত্ত হইয়া আমায় ডাকে তাহাকে আমি আশ্রয় দিই; দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূরীভূত হয়, অচিরে আশাসূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ান্ধকার দূর করিল। বিপদসাগরে কূল পাইলাম, "যে পাঁচ জড়িয়েছিল, তা উল্টোপাকে খুলে গেল।"

(জন্মভূমি—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব" প্রবন্ধ)

অতঃপর এই প্রবন্ধেই তিনি লিখিয়াছেন—"দুর্দ্দিন আসিয়া ঠিক

নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না, দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপদ্‌মুক্ত হইবার কোন উপায় আছে কি? দেখিয়াছি অসাধ্য রোগ হইলে লোকে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও ত কঠিন বিপদ্, একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে ৺তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল। বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, আমার ধারণা জন্মিল—দেবতা মিথ্যা নয়।" কিন্তু এ ধারণা আবার বেশীদিন রহিল না। রোগ ও বিপদের বিষম কবল হইতে উন্মুক্ত হইবার পর তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা বাড়িতে লাগিল। সংশয়ালোড়নে আবার তিনি বিকল হইয়া পড়িলেন। গিরিশ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিচার করিয়া ভাবিতে লাগিলেন উহারই প্রভাবে তিনি পরিত্রাণ পাইয়াছেন, ঈশ্বর বা দেবতা কিছুই নয়। গিরিশ নিজ জীবনের এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বিচার ও বিজ্ঞতার পরিচয় পরবর্ত্তী নাটক "কালাপাহাড়ে" প্রদান করিয়াছেন। পিঞ্জরাবদ্ধ কালাপাহাড় চিন্তামণি কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া বলিতেছে—"

"তোমার কথায় প্রত্যয় করে আমি চল্‌লেম্, যদি কারামুক্ত হতে পারি, ব্রহ্মণ্যদেব প্রত্যক্ষ মান্‌বো"। তাহাতে চিন্তামণি উত্তর দিতেছেন "তুই আবার ভুলে যাবি, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ যোটাবি, বল্‌বি, এইজন্য এই হয়েছিল, ছাই ব্রহ্মণ্যদেব। যদি কারুর সঙ্কটব্যামো হয়, ঠাকুর দেবতাকে মানে, আর যেই আরাম হল অম্‌নি দ্রব্যগুণ, নয় কব্‌রেজের গুণ, নয় পরিচর্য্যার গুণ ব্যাখ্যা হতে লাগ্‌ল। ঠাকুর রইলেন ধামা চাপা, কে আর তাঁর খোঁজ নেয় বল"। তদানীন্তন এইরূপ সন্দেহাকুল অবস্থা গিরিশ "পরমহংস দেবের শিষ্যস্নেহ" শীর্ষক প্রবন্ধে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। "কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিচার করিতে লাগিলাম কিন্তু সন্দেহের বিষম তাড়নায় হৃদয়ের ঘোর দ্বন্দ উপস্থিত, সে অবস্থা বর্ণনাতীত। সহসা চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া জনশূন্য অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেরূপ অবস্থা হয় আমার তৎকালীন অবস্থার সহিত সে অবস্থার কতক তুলনা হইতে পারে। চিন্তার তাড়নায় কখনও শ্বাস রোধ হইয়া

যায়। দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি মুহুর্মুহুঃ জ্বলিয়া উঠে ও হৃদয়ান্ধকার আরও গাঢ় করিয়া তোলে।"

এইরূপ সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইয়া গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন "সংসার বিপদ হইতে ত আমি মুক্ত হইলাম কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আমার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ, কোন পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকে ডাকি। তারকনাথকে ডাকিয়া ক্রমে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল" (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রবন্ধ)। গিরিশ বুঝিতে পারিলেন সংসারের প্রবল স্রোতের সম্মুখে ও মানুষের স্বাভাবিক অসহায় অবস্থায় তাহার দম্ভ কত তুচ্ছ ও তৃণ-তুল্য হেয়। কিন্তু ঈশ্বরের (তারকনাথের) নামগ্রহণের ও মানসিক দ্বন্দ হইতে উদ্ধার পাইবার পরেও পূর্ব্ব সংস্কার কখনো কখনো আবার প্রবল হইয়া উঠিত। তিনি নিজেই বলিতেন, "ঈশ্বর নাই অনেক তর্ক করিয়াছি, তাহার সংস্কার কোথায় যাইবে।" পূর্ব্বোক্ত চিন্তামণির মুখেও তিনি এইভাবের সুস্পষ্ট আভাষ প্রদান করিয়াছেন। "আমিও বলি ভুলব না। আবার ভুলে যাই, এই প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই সে রয়েছে, আবার তখনি তুমি আমি হয়ে যাই। তালের বাখড়া খসেছে, দাগ্‌টী যায়নি।" (কালাপাহাড় ২য় অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)। তখনকার দুঃসহ অবস্থা গিরিশচন্দ্রের কথায় আরও বর্ণনা করিতেছি—"ঘটনা স্রোতে কখনও বিশ্বাস আনে, কখনও সন্দেহ আনে, এ বিষয়ে যাঁহাদের সহিত আলোচনা করি, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে গুরুব্যতীত উপায় নাই, ভাবিলাম কেন উপায় নাই? এই ত ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে গুরুব্যতীত উপায় হয় না, তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়, কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তি-পূর্ণ হইল, মনুষ্যকে গুরু-জ্ঞান করিতে পারিল না।

"গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ"

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়, সামান্য মানুষকে দেখিয়া

ভণ্ডামি কিরূপে করিব ? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব ? যাক্, আমার গুরু হইবেনা।" (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব)

স্থূলবুদ্ধি মানব যখন ভক্তি-শ্রদ্ধাদি সর্ব্বেমাত্র উপলব্ধি করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক দুর্ব্বল মন সহসা একটা অশরীরী ভাবকে ভক্তি, পূজা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে সমর্থ হয় না। এইজন্যই গুরুকরণের আবশ্যকতা হয় এবং দীক্ষাদাতা গুরুকে আরাধ্য দেবতা-স্থানে পূজা করিবায় বিধি আছে। কিন্তু মনের মাৎসর্য্য কি সহজে যায় ? গিরিশের বুদ্ধিই অন্তরায় হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—"গুরু, গুরু কেবা কোথায় কোথায়, কি প্রত্যয় কথায় তাহার, মমসম ক্ষুদ্রনর..............."যে গিরিশ উত্তর কালে গুরুর প্রতি একান্ত তদ্‌গত চিত্ত হইয়া অপরকে উপদেশ দিতেন—

ক্ষুদ্র নর তোমাসম গুরু ! গুরু কল্প-
তরু ভবে, ভীরু জনে অভয় প্রদানে
আবির্ভাব ধরা মাঝে, দীন নর সাজে
সমাজে বিরাজে নামে হৃদি তন্ত্রী বাজে
চরণ রাজীব রাজে লইলে স্মরণ
মোহের বন্ধন খোলে, সুখ দুঃখ ভোলে
তম বিনাশন ভাতে নবীন নয়ন
গুরু কৃপা যাঁর, তার কিবা অগোচর
গুরুর কৃপায় অনায়াসে ইষ্টবস্তু
পায়, পূর্ণ হয় আশ, দূরে যায় ত্রাস
অবিশ্বাস তমোনাশ, জ্ঞানের প্রভায়

কালাপাহাড়......

সেই গিরিশ এখন দম্ভভরে বার বার বলিতেন—

কেবা গুরু কোথা তার স্থান
মমসম মানবে প্রত্যয় হায় কেমনে করিব,
কেমনে জানিব বাক্য মিথ্যা নহে তার।

গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "আর কি হইবে ? বাবা তারক

নাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয় তিনিই কৃপা করিয়া আমার গুরু হউন। শুনিয়াছিলাম নরবেশ ধরিয়া মহাদেব কখনো কখনো মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি এইরূপ কৃপা হয়, তবেই; নচেৎ আমি নিরুপায়, কিন্তু তারকনাথের ত কই দেখা পাইনা, তবে আর কি করিব, প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, তারপর যা হয় হইবে"।

(শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রবন্ধ)

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রত্যহ প্রাতে তারকনাথের চরণে নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এবং স্বাভাবিক আগ্রহ-বলে গুরুপদাশ্রয় লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে তারকনাথের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি কেশ শ্মশ্রু রাখিলেন, ও নিত্য গঙ্গাস্নান ও শিবপূজা করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন ও প্রতি বৎসর শিবরাত্রি ব্রতকালে ৺তারকেশ্বরে পদব্রজে গমন করিয়া সংযত মনে উপবাস, জাগরণ ও পূজাদি করিয়া ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন এই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে করিতে গিরিশের প্রাণে উৎসাহ জন্মিতে লাগিল, ও তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। বহুদিন সংশয়াবর্ত্তে ঘুরিয়া গিরিশ এখন পথ খুঁজিয়া পাইলেন। এই সময় তিনি তাঁহার বিশিষ্ট স্নেহের পাত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয় এক এক দিনে এক এক শতাব্দী এগিয়ে যাচ্ছি।"

ভগবানের স্বরূপ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ-দর্শন করিবার নিমিত্ত এই সময়ে তিনি সিদ্ধপীঠ কালীঘাটে আসিয়া জগন্মাতার নিকট কাতরস্বরে আত্ম-নিবেদন করিতেন। প্রায় প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে তথায় গমন করিয়া কখনও মায়ের মন্দিরে বারান্দায়, কখনও সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে এবং অধিকাংশ সময় যপকাষ্ঠের সম্মুখে বসিয়া অনবরত গদ্‌গদ ভাবে জগদম্বাকে ডাকিতেন— "মা আমি বড় দীন, আমায় দেখা দাও, লোকে বলে গুরুকৃপা ব্যতীত তোমার দর্শন হয় না। তাহাই যদি হয়, তবে তুমিই মা গুরু মিলাইয়া দাও।" গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "সিদ্ধপীঠে যাইয়া এরূপ প্রার্থনায় রাত্রি অতিবাহিত করিতাম, কেননা শুনিয়াছিলাম করুণাময়ী জগজ্জননী শ্রী

স্থানে সতত জাগ্রৎ থাকিয়া সকলের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করেন। আবার যূপকাষ্ঠের পার্শ্বে বসিয়া মাকে ঐরূপে ডাকিতাম, কেননা মনে হইত ঐস্থান হইতে অনেক প্রাণী জীবনের জন্য কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া মাতার করুণায় অনন্ত-জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। মাও যদি আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রতি প্রাণে তখন এমনি একটি দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল।" গিরিশ চন্দ্রকে এই সময়ে সাধন পথের কিছু কিছু উপদ্রবও সহ্য করিতে হইয়াছিল।

১৮৭৮।৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রবৃত্ত হওয়া অবধি ১৮৮৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এইরূপ অবিরত সাধনায় তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব ক্রমে এমন দৃঢ় হইয়া উঠে যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইবার জন্য তাঁহার নিকট রোগী উপস্থিত হইলে কেবল স্তব পাঠ করিতে করিতে রোগীর গায়ে হস্ত সঞ্চালন করিয়াই ব্যাধির উপশম করিতে সক্ষম হইতেন। মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস, "আনন্দ রাহ" নাটকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গিরিশ বলিতেন —"বেটীকে গাল ভরে, বুক ভরে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাবো তাই পাবো।" ক্রমে তাহার এভাবও পরিবর্ত্তিত হইল ও পরমহংস দেবের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিবার পর গিরিশ এইরূপ শক্তির পরিচালনা করিতে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে শুনিতে পান "এ সব ভাল নয়। ইহাতে মানুষকে ক্রমে বুজরুক্ করিয়া তোলে।" গিরিশচন্দ্র "শঙ্করাচার্য্যে" শান্তিপ্রদের মুখে এই উপদেশের আভাষ দিয়াছেন।

"কিহে, ব্রহ্ম বিদ্যালাভের প্রয়াস না ক'রে তুমি সামান্য চিকিৎসা-বিদ্যার প্রয়াসী, ক্ষুদ্র ভোজ বিদ্যা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা?"

(২য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক)

যাহা হউক এপর্য্যন্ত এইভাবেই চলিতে লাগিল; বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু-পদাশ্রয় লাভ এখনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই শ্রীগুরুর চরণে একান্ত নির্ভর আশ্রয়-লাভের জন্য তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এ পর্য্যন্ত গিরিশ দুইবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়দর্শনই তাঁহার প্রতি গিরিশের

শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা আনিয়াছিল। এ কথা আমরা তাঁহার নিজের ভাষায়ই বিবৃত করিব—

"বহুদিন পূর্ব্বে Indian Mirror এ দেখিয়াছিলাম যে দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা ইত্যাদি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংস খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন্। ইহার পর কিছু দিন বাদে শুনিলাম আমাদের বসু পাড়ার প্রসিদ্ধ এটর্নি দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতুহল বশতঃ দেখিতে যাইলাম। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথ বসুর বাড়ী যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন, কেশব বাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংস দেবের সম্মুখে রাখিল, তখন পরমহংস দেব পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে?' আমি এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম "ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে সন্ধ্যা হইয়াছে কি না?' আর কি দেখিব, বলিয়া চলিয়া আসিলাম।"

কেশব বাবুর ন্যায় পাশ্চাত্যশিক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞানীও যাঁহার কথা আনন্দ করিয়া শুনিতেন, তাঁহাকে দেখিয়া গিরিশের অশ্রদ্ধা জন্মিল। মহাপুরুষ ভাবোন্মেষে পলকে পলকে সমাধিগ্রস্ত হন, চৈতন্য-সম্পাদনের পরেও বাহ্যবস্তুতে জ্ঞান আনয়ন করিতে একটু অধিক সময়ের দরকার হয়, তাই তিনি "সন্ধ্যা হইয়াছে?" অর্দ্ধ চৈতন্যাবস্থায় এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন; গিরিশ বুঝিতে না পারিয়া পরমহংসদেব সম্বন্ধে বন্ধুগণ-সমক্ষে মতপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, "আমার যেন কিরূপ মনে হয়, ঠিক বিশ্বাস হইতেছে না।" কিন্তু অতঃপরই যে ক্রমে তাঁহার ভাবের ব্যত্যয় ঘটে, ইহার অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় দর্শনের ঘটনাবলী হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"ইহার কয়েক বৎসর পরে পরমহংসদেব রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ বলরাম বসুর ভবনে আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত

পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম পরমহংসদেব আসিয়াছেন। বিধু কীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরাম বাবুর বৈঠক খানায় অনেক লোক সমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল, আমি জানিতাম যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কহেননা, কাহাকেও নমস্কার করেন না। তবে যদি কেহ অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতিদীনভাবে পুনঃ-পুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি, আমার পূর্ব্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।" কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃত-বাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না, তিনি বলিলেন, "চল আর কি দেখ্‌বে।" আমার ইচ্ছা ছিল আরো কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জোর করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।"

পরমহংসদেবের আচরণে এবার গিরিশের একটু চমক লাগিল। এমনকি তাঁহার দীনতা গিরিশের হৃদয়-স্পর্শ করিল। বিধু কীর্ত্তনীর সম্বন্ধে পরমহংস দেবের প্রতি কটাক্ষ মাত্রেই তিনি খুব ক্ষুণ্ণ হইলেন। পরমহংস দেবের কাছে বসিবার, কথা শুনিবার, রঙ্গ দেখিবার, আজ তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল, এবং শিশির বাবুর জেদ্ করায় চলিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু কি এক রহস্যময় সূত্রে "এই পূর্ব্বের আলাপী" পরমহংসদেবের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, আর তাঁহার সহিতই পরে রঙ্গ করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্য লীলা" নাটক প্রণীত হয়, এবং দেখা যায় যে এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা প্রকারান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। যে বুদ্ধিবলে তিনি ইতিপূর্ব্বে সংসারে কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না, আজ তাহাই তাঁহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে লাগিল—

হায়, বুদ্ধি কিঙ্কর আমার,
এই বুদ্ধি বলে
ভাবে মনে ভ্রান্ত সর্ব্বজন
সাধু বাক্য ঠেলে সর্ব্বক্ষণ।

যে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের যুক্তিতে অলৌকিক ঘটনা একদিন অসম্ভবের অসম্ভব মনে হইত, আজ বুঝিলেন এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কি শোচনীয় বিষম ভ্রান্তি—

চিন্তা নিরন্তর কিসে সুখী হবে নর
কিন্তু হায় চিত্ত তার ঘোর অন্ধ অন্ধকারে।

যে অহঙ্কার বলে একদিন তিনি দুর্দ্দান্ত নাস্তিকের ন্যায়—গৃহাগত দেবীমূর্ত্তিও বিচূর্ণিত করিয়াছিলেন, আজ সেই অহঙ্কারই তাঁহার কণ্টক হইয়া উঠিল—

আমি "আমি" কথা লোকময়—
দাস তার মূলাধার—
বিনা অহঙ্কার—
বল মাতা পতন কাহার?

এই নাটকেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও ভক্তিরসের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ভগবানের নিকটে হৃদয়ের বেদনা-জ্ঞাপন করিয়া পাপী-তাপীর উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা কীর্ত্তন করিয়া তিনি এই অপূর্ব্ব নাটক প্রণয়ন করেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ষ্টার থিয়েটারে "চৈতন্য লীলা" প্রথম অভিনীত হয়, এবং কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পরেই ইহার যশ সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বাস্তবিক এই অভিনয় দর্শন করিয়া কি পাশ্চাত্য শিক্ষিত young Bengal, কি তিলকধারী বৈষ্ণব, কি সাধু, কি লম্পট, সকলেই একাসনে বসিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সমস্ত বাঙ্গালায় এক অভিনব ভক্তি-প্রবাহ বহিতে লাগিল—

কেশব কৃষ্ণ করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী—
মাধব মনোমোহন মোহন মুরলী-ধারী
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার—

"—কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদামায়ী" প্রভৃতি শ্রুতি-মধুর প্রাণো-ন্মত্তকারী সঙ্গীত হাটে, মাঠে, ঘাটে, সহরে, পল্লীতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এবং এই অভিনয়ের সঙ্গেসঙ্গেই গিরিশচন্দ্র ও সাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিলেন। কথিত আছে যে নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় অভিনয় দর্শনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি গিরিশকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "গৌর তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন!"

সত্য সত্যই গৌর তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ভগবান্ তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা শুনিলেন। গীতার কথা কখনও অসত্য হয় না—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

গীতা ৯।৩০।৩১

চৈতন্যলীলার অপূর্ব্ব কাহিনী ক্রমে সুদূর দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দিরে পঁহুছিল। ভগবান রামকৃষ্ণ অভিনয় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এই অপূর্ব্ব দর্শন, ভক্ত-ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য সাক্ষাৎ, দীনের জন্য দীন-নাথের আকুল বেদনা গিরিশচন্দ্রের নিজের কথায়ই বিবৃত করিব—

"ষ্টার থিয়েটারে (৬৮নং বিডন ষ্ট্রীট বর্ত্তমান মনোমোহন ষ্টেজে) 'চৈতন্য লীলার' অভিনয় হইতেছে। আমি থিয়েটারের বাহিরের Compound এ বেড়াইতেছি, এমন সময় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষনে তিনি স্বর্গগত) আমায় বলিলেন, পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বসিতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি। আমি বলিলাম তাঁহার টিকিট লাগিবে না কিন্তু অপরের টিকিট লাগিবে, এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি,

দেখিলাম তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের Compoundএর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি নমস্কার না করিতেই তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন, আমি ভাবিলাম এইরূপই ত দেখিতেছি চলিবে। আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি boxএ বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।”

১২৯১ বঙ্গাব্দের ৫ই আশ্বিন রবিবার তারিখে (২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪) ভক্ত ভগবানের এই অপূর্ব্ব সাক্ষাৎ লাভ হয়, আর তখন ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন! যখন ছদ্মবেশী বিদ্যাধরীগণের গান শুনিলেন—

“নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখি-পাখা
রাধিকা হৃদি রঞ্জন।”

ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। আবার যখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী-বেশী দেবদেবীগণের গান হইল—

‘চন্দ্র কিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জ চারী॥’

আবার ভাবসমাধিতে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। আবার

“কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই,
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই॥”

শুনিয়া অনেকক্ষণ ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই নাটকে শ্রীচৈতন্যের ভাব-সমাধি, তীব্র ব্যাকুলতা, পাপীর প্রতি তাঁহার অপার করুণা প্রভৃতি বিষয় গিরিশ ব্যাকুল ভক্তের ন্যায় যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলেও করুণানিধানকে—আপনার ভবসাগরের কাণ্ডারীকে—এত কাছে পাইয়াও চিনিতে পারিলেন না! কিরূপে পারিবেন? মহাপুরুষ ধরা না দিলে কি কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন? এখনও তাঁহার দম্ভ

যে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। যদিও প্রাপ্ত-বয়সে গিরিশ "শঙ্করাচার্য্য" নাটকে সনন্দনের মুখে এই অদূর-দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—"ভাই, আমাদের সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যদিচ আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝিতে পারিনা," (২য় অঙ্ক, ৩গ), কিন্তু তখনও তিনি নিরাশার কুজ্ঝটিকায়, শ্রীগুরুর অভাবে দিবারাত্রি অশান্তি-অনলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তখনও—

"আমি আমি জন্মে মহাভ্রম
সুখ আসে দুখে নিমগন,
গতাগতি দুর্গতি অপার,
অহঙ্কার তবু নাহি যায়,
জন্ম মৃত্যু সহে অনিবার,
নিস্তারের না ভাবে উপায়।"

এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব। এ সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের আলাপ হয়। চিত্রকর গৌড়ীয় বৈষ্ণব। শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলাভিনয় হইবে জানিয়া অভিনয়োপযোগী কয়েকখানি দৃশ্যপট বিশেষ আগ্রহের সহিত অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। এই সরল বিশ্বাসী ভক্তের সহিত সাংসারিক অবস্থা ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বিশ্রম্ভালাপ করিতেন। একদিন ইনি গিরিশচন্দ্রকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "মহাশয়, পতিতপাবন গৌরচন্দ্রের মহিমার কথা আপনাকে আর কি বলিব? আর এ অধমের প্রতি তাঁহার করুণাই বা কত? আমি সারাদিন পরিশ্রমের পর দিনান্তে রন্ধন করিয়া যখন তাঁহাকে ভোগ দিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে বসি, তখন সত্য সত্যই দেখিতে পাই গৌর আমার সেই ভোগের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কখনও রুটী লুচিতে দাঁতের স্পষ্ট দাগ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। গৌরচন্দ্রের কৃপায়ই আমার ঐ সৌভাগ্য হইয়াছে। এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে কখনও হয় না।" গিরিশচন্দ্র "শ্রীরামকৃষ্ণদেব" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "এই সামান্য ব্যক্তির কথায় আমার চক্ষুতে জল আসিল। এই সামান্য ব্যক্তির সহিত তুলনায়ও আপনাকে

অত্যন্ত দুর্ভাগ্য মনে হইল। মন বড়ই ব্যাকুল হইল, তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম।”

কিন্তু বেশীদিন গিরিশকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের আরাধ্য ভগবান্ নারায়ন কি কাহারও ব্যাকুল ক্রন্দনে নীরব থাকিতে পারেন? বাস্তবিক পূর্ব্বাপর দেখিয়া মনে হয়, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সহিত গিরিশচন্দ্রের মিলনের পূর্ব্বরাগই এই অপূর্ব্ব নাটকে প্রকটিত হইয়াছে—

যুগে যুগে রঙ্গ, নবলীলা নব রঙ্গ
নব তরঙ্গ, নব প্রসঙ্গ, ধরাভার-হরণ
তাপহারী প্রেমবারি, বিতর রাস রাসবিহারী
দীন-আশ, কলুষ নাশ দুষ্টত্রাসকারণ।

যে গিরিশ তর্করত দার্শনিক পণ্ডিতগণের ন্যায় বিচার করিয়া বলিতেন “ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন, তিনি দুজ্ঞের্য়,” তিনিই ভক্তি ও বিশ্বাসের পূর্ব্বরাগে এখন বুঝিতে পারিলেন—

ভক্তি-স্রোতে যুক্তি ভেসে যায়,
হেরি তরঙ্গ নিচয়
সভয় হৃদয় বিজ্ঞান পালায় দূরে।

চৈতন্যলীলা ১ম, ২য় গ।

গিরিশ প্রাণে প্রাণে যেন আভাষ পাইলেন—

লীলা অন্তরে অন্তরে
বাহে তার নাহিক প্রকাশ।
দানব প্রভৃতিগত দম্ভ অহঙ্কার
প্রেমে হবে পরাভূত!

*　　*　　*　　*

নিমাই গাহিতেছেন—

রূপের বড় গরব করে রাই
দেখ্‌ব এবার মন যদি তার পাই,
এবার গৌর হয়ে ধর্‌ব পায়ে,
আর তো কাল রব না।

মনের ময়লা ঘুচাইয়া অতঃপর গিরিশচন্দ্রও প্রকৃত ভক্তেরই ন্যায় ঠাকুরের গুণ ও ভাব লইয়া খেলা করিয়াছেন।

এই তৃতীয় দর্শনের পরই গিরিশচন্দ্রের প্রাণে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। কালাপাহাড়ের ন্যায় ভাবোন্মাদ ঠাকুরকে পাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন—

কোথা গেল? বাতুল সে নয়, বাক্যে তার
জন্মায় প্রত্যয়, হায়, কবে হবে গুরু
দরশন। কবে হবে সফল জীবন।
ঘোর তম নাশ, অবিশ্বাস যাবে দূরে।

কালাপাহাড়, ১ম অঙ্ক, ৩য় গ।

পূর্ব্বোক্ত চিত্রকর সম্বন্ধীয় ঘটনার কয়েক দিন পরে গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের পাড়ার চৌমাথার একটি রকে বসিয়াছিলেন। দেখিলেন পরমহংস দেব কয়েকজন ভক্তের সহিত ধীরে ধীরে যেন কি ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছেন। তিনি ঐখানে উপস্থিত হইতেই নারায়ণ নামে একটি বালক ভক্ত বলিল—'এই গিরিশ ঘোষ'। অতঃপর গিরিশচন্দ্র "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবন্ধে" যাহা লিখিয়াছেন পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহাই বিবৃত করিতেছি। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গিরিশ নমস্কার করিলেন, কিন্তু এই দিন আর ঠাকুর প্রতি-নমস্কার করিলেন না, ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "তিনি ধীরে ধীরে যাইতেছেন, আমি সেইখানেই ছিলাম, কিন্তু বোধ হইতেছিল যেন এক অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে।" "নসীরামে" গিরিশ এই ভাব সোণামণির মুখে ব্যক্ত করিতেছেন—"ওমা কি দয়াময় গো! ওরে আমার প্রাণ টেনে নিয়ে যায় রে. আমি যে থাক্‌তে পারি না।" এই প্রাণের আকর্ষণী শক্তিতে তাঁহার চিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অনুগামী হইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল এবং ঠিক সে সময় ঐ বালক আসিয়া বলিল "পরমহংস দেব আপনাকে ডাকিতেছেন।" গিরিশ যেন এই আহ্বানেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সহসা উন্মনা হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, যেন আচ্ছন্নের

মত তাঁহার সম্মুখে আসিলেন এবং পরমহংসদেব বলরাম বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলে গিরিশও পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইখানে গিয়া আচ্ছন্নের মতই তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। বলরাম বাবু বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল তিনি পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরাম বাবুর সহিত দু-একটি কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া "বাবু, আমি ভাল আছি, বাবু, আমি ভাল আছি" বলিতে বলিতে কি একরকম অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "তখন আমার মনে একটু ভাবান্তর হইলে, পরমহংসদেব 'না, ঢং নয়, না, ঢং নয়' বলিতে বলিতে একটু পরেই আসন করিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরু কি? তিনি বলিলেন—গুরু কি জান, যেন ঘটক। 'কালাপাহাড়ে' ও গুরুদেব চিন্তামণি 'গুরুদেব? কেমন তিনি?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া—উত্তর করিয়াছিলেন—ঘটক হে ঘটক, জুটিয়ে দেয়। পরমহংস এইখানে 'ঘটক' অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। "গুরু কি জান?" বলিয়াই পরমহংসদেব বলিলেন, "তোমার ভাবনা কি? তোমার গুরু হয়ে গেছে।" গিরিশের সমস্ত প্রাণ তখন পরমহংসদেবের দিকে আকৃষ্ট; জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্র কি?" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন, "রামানন্দ প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতেন, ঘাটের সিঁড়িতে 'কবীর' নামে এক জোলা শুইয়াছিল; রামানন্দ নামিতে নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে কবীর 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই 'রাম' নাম কবীরের মন্ত্র হইল এবং সেই নাম জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর থিয়েটারেরও কথা হইল। পরমহংসদেব বলিলেন, "আর একদিন থিয়েটার দেখাইও।" গিরিশ বলিলেন, "যে আজ্ঞা, যেদিন ইচ্ছা দেখিবেন।"

পরমহংসদেব হাসিয়া বলিলেন,—"কিছু নিও"।

গিরিশও হাসিয়া বলিলেন,—

"ভাল, আট আনা দিবেন।"

পরম—সে বড় র‍্যাজলা যায়গা।

গি—না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন সেখানে বস্‌বেন।

প—না, একটী টাকা নিও।

গি—যে আজ্ঞা।

এই প্রকারে কথাবার্ত্তা শেষ হইল। বলরাম বাবু তাঁহার ভোগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। পরমহংসদেব একটি সন্দেশ হইতে কিছু গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। গিরিশেরও ইচ্ছা ছিল তিনি গ্রহণ করেন, কে কি বলিবে ভাবিয়া লজ্জায় তাহা পারিলেন না। ইহার কিছুক্ষণ পরে গিরিশ হরিপদ নামে একটি ভক্তের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। হরিপদ রাস্তায় জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখিলেন ?" গিরিশ বলিলেন "খুব ভক্ত।" গিরিশের তখন মনে খুব আনন্দ, গুরুর জন্য তখন আর হতাশ নন, তিনি ভাবিতেছিলেন, "মূর্খে বলে গুরু খুঁজিতে হইবে, এইত পরমহংসদেব বলিলেন, আমার গুরু হয়ে গেছে, তবে আর কার কথা শুনি ?"

গিরিশচন্দ্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "যে কারণে মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম তাহা একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম, এত কেন ? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাঁহার নিকট জোড়হাত হইয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন তখন তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ জোটান মাত্র। পরমহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমাকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও তিনি প্রথমে আমায় নমস্কার করিলেন, তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি আমার ধারণা জন্মিল, এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন দিন উঠে।" ইহার পরের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা উক্ত প্রবন্ধ হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"বলরাম বাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজ ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, 'পরমহংসদেব

আসিয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'ভাল, boxএ লইয়া গিয়া বসান।' দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না?' আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম 'আমি না গেলে কি তিনি আর গাড়ী থেকেও নাম্‌তে পারবেন না?' কিন্তু গেলাম, আমি পৌঁছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে নামিতেছেন, তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইল—আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়। আমি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল লইয়া তাঁহাকে দিলাম, তিনি গ্রহণ করিলেন কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন 'ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব?'

"Dress circleএর দর্শকের concertএর সময় বসিবার জন্য Star Theatreএর দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটি কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন, অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর একখানি চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিলেন না। দেবেনবাবুর সহিত আমার আলাপ ছিল, আমি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম 'বসুন না' কিন্তু তিনি অসম্মত, কারণ বুঝিতে পারিলাম না, আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব আমার সহিত নানাকথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাবনিমগ্ন হইলেন, একটী বালক ভক্তের সহিত যেন ভাবাবস্থায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহু পূর্ব্বে আমি এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম, এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল। পরমহংসদেবের ভাব-ভঙ্গ হইল। তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'তোমার মনে বাঁক আছে'। আমি

ভাবিলাম অনেক প্রকার বাঁক-ত আছেই বটে। কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন তাহা বুঝিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাঁক যায় কিসে'? পরমহংসদেব বলিলেন 'বিশ্বাস করো'।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বালক-প্রীতি সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র 'কালাপাহাড়ে' উল্লেখ করিয়াছেন। 'চিন্তামণি' বালক দুলালের সহিত খেলিতে খেলিতে তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন আর ভক্ত লেটো গদগদ চিত্তে বলিতেছে, "বালকের কৃপায় আজ আমারও চোখে জল এসেছে বাবাজি, হরি, হরি, হরি।"

ইহার পরের দর্শনও আমরা গিরিশের নিজের কথায় বর্ণন করিব—

"আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেলা ৩টার সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, একটু চিরকুট পাইলাম যে মধুরায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না, চলিলাম, অনাথবাবুর বাজারের নিকট গিয়া ভাবিলাম যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর ফিরিয়া আসি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও আসিলাম, পরে রামবাবুর বাড়ী গিয়া পঁহুছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন, ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন আমি তথায় গিয়াছি।' আমি বলিলাম 'পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে।' রামবাবুর বাড়ীর নিকটেই সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ী। তিনি তথায় আমায় লইয়া গেলেন, এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন সে কথা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সে সব কথা ভাল লাগিল না। আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটী ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রামবাবুর উঠানে রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, গান হইতেছে "নদে টলমল করে গৌর-প্রেমের হিল্লোলে"। আমার বোধ হইতে লাগিল সত্যই যেন রামবাবুর আঙ্গিনা

টলমল্ করিতেছে, আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না, চক্ষে জল আসিল, নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না, ভাবিলাম তাঁহার নিকট গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যেই মুহূর্ত্তে এই ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে করিতে আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন, আমার আর চরণস্পর্শে বাধা রহিল না, পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সঙ্কীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, আমিও উপস্থিত হইলাম, পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার মনের বাঁক যাইবে ত?' তিনি বলিলেন 'যাইবে'। আমি আবার ঐ কথা বলিলাম, তিনি ঐ উত্তর দিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেব ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিত্র নামক একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ় স্বরে আমায় বলিলেন "যাওনা, উনি বল্লেন, আর ওঁকে কেন ত্যক্ত কচ্ছ?" এইরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও ক্ষান্ত হই নাই, মনোমোহন বাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম ইনি সত্যই বলিয়াছেন, যাঁহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম, দেবেন বাবু কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।"

গিরিশ এই সমস্ত দর্শনের ফলাফল বিবৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"এই কয়দিন দর্শনলাভে আমার মনে উদয় হইল—এ ব্যক্তি কে? আমার সম্পূর্ণ পরিচয় কি উনি পান নাই? বোধ হয়। নতুবা এরূপ আপনার ভাবিয়া কথাবার্ত্তা বলেন কেন? কথায় তো মনে হয় পরম আত্মীয়, কে ইনি? আমার মনে সাহস জন্মিয়াছে যে ইনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানেন না। আমি ইহাঁকে আত্মপরিচয় দিলে ইনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না। বরং আত্মপরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি

দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ইঁহার চরণে আশ্রয় লইল। ইনি শান্তিদাতা নিশ্চয়।”

“দক্ষিণেশ্বরে গেলাম, উপস্থিত হইয়া দেখি তিনি দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন, অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরমভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মনে মনে “গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু” ইত্যাদি—এই স্তবটী আবৃত্তি করিলাম। আমি গিয়া প্রণাম করিবামাত্র যেন কে পরমাত্মীয় গিয়াছি, আমায় বসিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন ‘এই তোমার কথা আমি বলিতেছিলাম, মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো’। পরে একটি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি যেমন বাপের কাছে আব্দার করে, সেইরূপ আব্দার করিয়া বলিলাম, আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, আপনি আমার কিছু করিয়া দিন। এ কথায় বোধ হইল যেন তিনি পরম সন্তুষ্ট হইলেন, ঈষৎ হাস্য করিলেন, সে ভুবন-মোহন হাসি দেখিয়া আমার মনে হইল, আমার মনে আর ময়লা নাই, আমি নির্ম্মল হইয়াছি।”

“পরমহংসদেব, তখন ভক্তাগ্রণী শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন “কিরে, কি শ্লোকটা বলত?” রামলাল শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, শ্লোকের ভাব এই—পর্ব্বত গহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই এক মাত্র সার পদার্থ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আমার মনের সংশয় দূর হইয়া গেল, তখন মনে হইতেছে, আমি নির্ম্মল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি কে।” আমার জিজ্ঞাসার অর্থ, আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল, আমি কাহার আশ্রয় পাইলাম যে আশ্রয়ে আমার সমস্ত ভয় দূর হইয়াছে?” ঠাকুর উত্তর দিলেন “আমায় কেউ বলে আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ আমি এইখানেই থাকি।” আমি এইরূপ কথাবার্ত্তার পর অশ্রুসিক্ত নয়নে বাড়ী ফিরিলাম, পরমহংসদেব উত্তরের বারেন্দা অবধি সঙ্গে আসিলেন। বিদায় কালে

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমি যাহা করিতেছি তাহা করিতে হইবে?"

ঠাকুর বলিলেন "তা করো না?" তাঁহার কথায় আমার মনে হইল যেন যাহা করি—তাহা করিলে (থিয়েটারে থাকিলে) দোষ স্পর্শিবে না।"

উদ্বোধন, "পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ"।

এইরূপে গিরিশচন্দ্রের গুরুপাদ-পাদ্ম লাভ হইল। তিনি গুরুই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার বিক্ষুব্ধ সংশয়ানল সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইলে তাঁহার অশান্ত হৃদয়ে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। "অশোকে" তিনি এই ভাব ব্যক্ত করিয়া আত্মজীবনাখ্যায়িকার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, "যেরূপ মহাদেব দুর্যোগান্তে বাহ্য প্রকৃতি সুন্দর ও নির্ম্মল হয়, সেইরূপ অন্তঃপ্রকৃতিও প্রবল অন্তর্ব্বিপ্লবান্তে নির্ম্মল ভাব ধারণ করে।" গুরুর কৃপায় গিরিশও পরম পদার্থ লাভ করিলেন, তাঁহার সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইয়া গেল, তাঁহার মনের আঁখি খুলিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে সংশয়ালোড়নে দোদুল্যমান হইয়া যিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—

"কোথায় স্থানের সীমা?
কতই বিস্তার দশদিশি!
কালের জনম কোথা, কোথা
কালের গমন স্থির! নিবিড় তিমির।
এ রহস্য গোচর কাহার?"

এখন তিনি বুঝিলেন "দেখো লোকে আপনাকে চেনে না, আর জান্‌তে চায় কি জান? কবে সৃষ্টি হ'লো, কেন সৃষ্টি হ'লো, কোথায় সৃষ্টির শেষ! কোথায় আগা, কোথায় পেছু।"

কালাপাহাড়—১ম অ ৩ গ।

সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্ব ভ্রান্তি দূর হইল, তিনি বুঝিলেন—

ধিক ধিক মানবের সংস্কার!
মরুভূমি মাঝে ভ্রমে মরীচিকা পাছে পাছে,

ভুলি আশার ছলনে,
ওই সুখ, ওই সুখ বলি
ধেয়ে যায় উন্মত্তের প্রায়
শতবার প্রতারিত তবু নাহি শিখে,
শত দুঃখে ভ্রান্তি নাহি ঘুচে,
ধন্য ধন্য সংসার বন্ধন !

* * * *

দুরন্ত তস্কর কাল,
পলে পলে হরে পরমায়ু
তবু নিত্য নূতন কল্পনা
নিত্য নব সুখ-উত্তেজনা।

বুদ্ধদেব চরিত—৩য় অ ৩ গ।

গিরিশ "শঙ্করাচার্য্যে" মণ্ডনমিশ্র-চরিত্রে গুরুদেবের এই অহেতুকী কৃপা—অপার করুণার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—প্রদর্শন করিয়াছেন। গুরুদেবের কৃপায় গদ্‌গদ্‌ভাবে মিশ্র বলিতেছেন—

গুরু—কল্পতরু
অহেতুকী কৃপার আধার,
এত কৃপা সন্তানে তোমার ?
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার
সহি তিরস্কার
এসেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল প্রদানে
চল দেব, সাথে লয়ে শান্তিময় স্থানে।

অমনি একজন পণ্ডিত কুহকীর কুহক বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে মিশ্র তদ্‌ভাবেই উত্তর করেন—

মণ্ডন—হাঁ কুহকী বটেন, যার কুহকে ভুবন মুগ্ধ সেই কুহকী, আর সামান্য কি বল্‌ছেন ? সামান্য হতেও সামান্য—নচেৎ আমার ন্যায় হীনের দ্বারেও উনি প্রার্থী হন ? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) প্রভু, কৃপা করে অদ্বৈত জ্ঞান দান করুন। ৩য় অঙ্ক, ৮ম গ।

স্বামী-শিষ্যের এই অপূর্ব্ব মিলন গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলে প্রদান করিয়াছেন। বিল্বমঙ্গলের প্রতি সোমগিরির অযাচিত করুণায় কৌতুহলী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

ত্যজি প্রতারণা
গুরুদেব, কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব ?

গুরুদেব সোমগিরি উত্তর করিলেন—

নহে কিছু গোচর আমার
সর্ব্বজ্ঞ সে ভগবান্।
তাঁহারই নিয়মে প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব বন্ধন
সাগর লঙ্ঘিয়া, পরস্পরে করে দেখা।
প্রাণ বোঝে কোথা কার টান।
এ সন্ধান বিষয়ীর নাহিক গোচর।

বিল্বমঙ্গল—৩য় অঙ্ক, ৩য় গ

গিরিশচন্দ্রের বকলমা প্রদান

গিরিশচন্দ্র অতঃপর প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের চরণতলে বসিয়া শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন, একদিন তিনি ঠাকুরের পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন—"গুরুদেব, এখন থেকে আমি কি কর্‌বো ?"

ঠাকুর—"যা কর্‌চো তাই করে যাও, এখন এদিক-ওদিক দুদিক্‌ই রেখে চল, তার পর যখন একদিক ভাঙ্‌বে (বোধ হয় যখন গৃহশূন্য হইবে) তখন যা হয় হবে, তবে সকালে বিকালে তাঁর স্মরণ মনন রেখো।" এই বলিয়া তিনি গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এদিকে গিরিশ কিন্তু বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, ভাবিলেন "আমার খাবার শোবার সময়েরই ঠিক থাকে না, কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখিয়া আমি চলিতে পারি না, সংসারী লোকের কাছে কথা বলিয়া রাখিতে পারি না, গুরুদেবের কাছে কেমন করিয়া হাঁ বলিব, যদি কথা না রাখিতে পারি ?" কি বলিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি মৌনী রহিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

"আচ্ছা তা যদি না পারো, খাবার শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ করে নিও"। গিরিশ এবারও বিপদে পড়িলেন, "একেত উচ্ছৃঙ্খল জীবন, খাবার শোবার কোনো সময়ই ঠিক নাই, কোন দিন বেলা দশটায় খাওয়া হয়, কোনদিন বেলা পাঁচটায়, আবার মামলার ফ্যাসাদে কোনদিন খাইতে বসিয়াও হুঁস থাকে না, রাত্রের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। এমন অবস্থায় গুরুর কাছে বলিবেন "করিব" অথচ যদি না পারি, এই ভাবিয়া গিরিশ নীরব রহিলেন। অথচ প্রাণের ভিতরে একটা বিষম যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল যে এমন সহজ আদেশও পালন করিবেন বলিয়া গুরুদেবের কাছে স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তখন অর্দ্ধ-বাহ্যদশা-গ্রস্ত, ভাবাবেশে যেন গিরিশের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "তুই বল্‌বি, তাও যদি না পারি? আচ্ছা তা যদি না পারিস্, তবে আমায় বকল্‌মা দে।" বকলম সহি অন্যের নিমিত্ত সহি অর্থাৎ তোর জন্য যা কিছু করা না করা, তার ভার আমার উপর দে। কথা শুনিয়া গিরিশের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তাঁহার সমস্ত ভার ঠাকুর লইয়াছেন, জপতপ কিছুই করিতে হইবে না, এই ভাবনা তখন তাঁহাকে আহ্লাদে আত্মহারা করিয়া তুলিল, তখন বুঝিতে পারিলেন না যে হায়, 'আমি করিব' 'আমি করিয়াছি' প্রভৃতি কথা বলিবার তাঁহার কোন অধিকার রহিল না।

এখন এই বকল্‌মার যথার্থ ভাব আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক। "আমি যাহা করি তাহার কর্ত্তা আমি নই। তিনিই আমার প্রতিনিধি হইয়া করেন"—এই নির্ভরতার ভাব সাধারণের হওয়া সহজ নহে। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মও এই ভাবই শিক্ষা দিতেছে। অতএব বকল্‌মা দেওয়া হইলেও—ইহাতে স্বল্প আত্মত্যাগ প্রকাশ পায় না। অনেকে ভাবের ঘরে চুরি করিয়া সাময়িক শান্তি পাইবার জন্য মনে করেন—যাহা ভাল তাহার কর্ত্তা তিনি, আর যাহা মন্দ, তাহাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই। এইরূপ অহং বুদ্ধিতে 'বকল্‌মা' হয় না, বরং এরূপ 'বকল্‌মা' যাহারা দেন তাঁহারা নিজে ত পাপ করেনই, পরন্তু নিষ্কলঙ্ক ভগবান্‌কে তাহার হেতু করিয়া আরও পাপ বৃদ্ধি করেন। ভগবান্‌কে ডাকিতে ভাল লাগে না, যথেচ্ছাচারই

করিব, তাহাও 'বকল্‌মা' নয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি 'বকল্‌মা' দেন, তিনি প্রাণে প্রাণে ভগবান্‌কে অনুভব করেন, কোন অন্যায় কার্য্যের দায়িত্ব তাঁহাকে আরোপ করিতে দ্বিধা বোধ করেন, বিপদে পতিত হইলে ঈশ্বরের নাম করিতে ক্ষান্ত হন না এবং উদ্ধার পাইলে রক্ষাকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার প্রাণ ভরিয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বকল্‌মা লইয়া প্রকারান্তরে গিরিশচন্দ্রকে কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুরের সম্মুখে গিরিশ বলিয়া উঠিলেন "আমি কর্‌বো।" অমনি ঠাকুর সংশোধন করিয়া বলিয়া দিলেন "ওকিগো? অমন করে 'আমি কর্‌বো' বল কেন? তুমি না 'বকল্‌মা' দিয়েছ? যদি না কর্‌তে পার? বল্‌বে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তো করবো।" গিরিশও তদবধি খাওয়া শোওয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয়েও আত্ম-কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন। প্রাপ্ত বয়সে গিরিশ বরাবর বলিতেন, "আমি যখনই 'আমি কর্ত্তা' বলিয়া কোন কাজ করিয়াছি, তখনই ঠকিয়াছি।" তাই তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "আমার কর্ম্ম, অকর্ম্ম, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সব তাঁর।" তাঁহার ঐকান্তিক নির্ভরতার কথা তাঁহার নিজের কথায়ই বলিতেছি। "যিনি সুখদুঃখে অটল—সঞ্চয় বুদ্ধিরহিত, সমস্ত সংসার তাঁহার পিতৃসংসার জ্ঞানে তিনি নির্ভয়ে বিচরণ করেন। এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ করা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর শতগুণে কঠিন। আমরা সেয়ানা হইয়া সকলের কাছে ফাঁকে পড়িতেছি। গুরুর নিকট প্রার্থনা, যেন সেয়ানা বুদ্ধি দূর হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যেন **তুমি একমাত্র আশ্রয়-কর্ত্তা**, এই বোধ সকল অবস্থাতেই অচল অটল থাকে, নিদ্রাজাগরণে সমান থাকে, যেন অকপট-হৃদয়ে একবার তোমায় ডাকিতে সক্ষম হই।"

"নিশ্চেষ্ট অবস্থা" **উদ্বোধন** ১৩১০ মাঘ।

এই একান্ত নির্ভরতায়ই গিরিশচন্দ্র প্রৌঢ়ে পত্নীশোকে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই, শেলাঘাত সম পুত্রশোকও ক্রমে সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কোন অবস্থায় আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্তি হইত না। গিরিশচন্দ্র যেমন অকপটে গুরুর নিকটে আত্ম-নিবেদন

করিতে পারিয়াছিলেন, গুরুদেবও তেমনি তাঁহাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"শ্রীগিরিশ সত্যমিথ্যা উভয়ের পারে।" তিনি গিরিশের বালকোচিত সরলতায় মুগ্ধ হইয়াই তাঁহার কাছে 'বকল্‌মা' চাহিয়াছিলেন। আর গিরিশও গুরুদেবের প্রতি একান্ত নির্ভরতার বলেই 'বকল্‌মা' প্রদান করিয়া চির শান্তি লাভ করিলেন। ঐরূপ সুস্পষ্ট-ভাবে 'বকল্‌মা' দিতে রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ভিন্ন আর কোন ভক্তকে বলিয়াছেন কিনা আমরা শুনি নাই! গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"যাহার গুরু আছেন তাহার উপর পাপের অধিকার নাই, তাহার সাধন ভজন নিষ্প্রয়োজন।" সাধন ভজন না করিয়া সর্ব্বস্ব গুরুপদে অর্পণ করিয়া যাঁহারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হন, গিরিশচন্দ্র "শঙ্করাচার্য্য" নাটকে তাঁহাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন –

শান্তিপ্রদ—গুরুদেব, আমায় একটু বুদ্ধি দিন, যাতে আমি বুঝতে পারি।

শঙ্কর—বৎস, সাধন প্রয়োজন, সাধন করো, সমস্ত বুঝ্‌বে।

শান্তি—যা কর্‌তে হয়, আপনি করুন। সাধন করে তো মন বশ কর্‌তে বলেন? সে আমার কর্ম্ম নয়, আমি চোখ বুজে মন স্থির কর্‌তে বস্‌লেই, মন বেটা বরং সোজায় ছিল ভাল, চোখ বুজলেই অমনি সৃষ্টি সংসার ঘুরতে চল্‌লো। অমন মন নিয়ে কি সাধন করব বলুন। আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি আমার ও বেশ মিষ্টিও লাগে—

"ধ্যানং মূলং গুরুমূর্ত্তিঃ পূজামূলম্ গুরোঃ পদম্
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।"

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার কর্‌লেম, যা করবার আপনি করুন।

শঙ্কর—বৎস, সারতত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে, বহু সাধনা ফলে এ ধারণা জন্মে, ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করগত।

শঙ্করাচার্য্য—৫ম অ ২গ

গুরু-ভক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার করুণালাভের পরে গিরিশচন্দ্রের এরূপ অদ্ভুত গুরুভক্তি জন্মিয়াছিল যে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ গুরুভক্তি সম্বন্ধে অর্জ্জুন, বিভীষণ ও মহাভক্ত হনুমানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিতেন—"গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বল্‌বে তা তখনি দেখতে পাবে, সে ভক্তি ছিল অর্জ্জুনের। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত রথে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—দেখ সখা, কেমন এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে। অর্জ্জুন অমনি দেখে বল্‌লেন 'হাঁ, সখা, অতি সুন্দর পায়রা।' পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ চেয়ে বল্‌লেন—না সখা, ওতো পায়রা নয়। আবার অর্জ্জুনও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন,—না সখা, ও পায়রা নয়। কথাটী এখন বোঝ। অর্জ্জুন মহাসত্যনিষ্ঠ, তিনি ত আর কৃষ্ণের খোসামোদ ক'রে ঐরূপ বল্‌লেন না? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁহার এত বিশ্বাস-ভক্তি যে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন অর্জ্জুনও তখন ঠিক ঠিক তা দেখতে পেলেন।" গিরিশও এইরূপ অব্যভিচারিণী নৈষ্ঠিকী গুরুভক্তিরই অধিকারী হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন "ওর বিশ্বাস পাঁচ সিকা পাঁচ আনা, ওর বিশ্বাস আঁক্‌ড়ে পাওয়া যায় না।" বিদ্যাবুদ্ধির দম্ভে যে গিরিশ একদিন বলিতেন "মানুষকে ঈশ্বর-বুদ্ধি কেমন করিয়া করিব," আজ তাঁহারই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে—"মানবের হিতার্থে মায়াধীশ ঈশ্বর নিজ মায়ায় নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন।" (শঙ্করাচার্য্য ৩য়, ৮ম গ)। ক্ষুদ্র মানব-শরীরকে গুরুরূপে বরণ করিতে যিনি পূর্ব্বে কখনও পক্ষপাতী ছিলেন না, আজ তাঁহারই সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে—গুরুকে কখনই মানুষ জ্ঞান করিতে নাই, গুরুভক্তি মানবের নহে,—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের, কারণ—

ঈশলুব্ধ প্রাণ ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান
কি উপায়ে পুরাইবে মন-আশ,
শ্রীনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে,
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার।
অকস্মাৎ কোথা হতে কেবা আসে,
তাঁর ভাষে হয় হৃদে আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে,
মানে মনে জ্ঞানে
ঈশ্বরের বাক্য বলি,
সে হয় নিমিত্ত গুরু তার,
যার কথা করিয়ে প্রত্যয়
জগৎ গুরু করে লাভ।

বিল্বমঙ্গল—৩য় অঙ্ক, ৩ গ

বাস্তবিক বিশ্বাস ও ভক্তির প্রেরণায় এখন হইতে গিরিশচন্দ্র তাঁহার ঠাকুরকে পতিতোদ্ধারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ দেখিতেন এবং "তিনিই অবতার", এই কথা ঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও ডাক্ হাঁক্ করিয়া প্রচার করিতে বিরত হইতেন না। শ্রীমৎ প্রভু সারদানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন—কাশীপুরের উদ্যানে ভক্তজন পরিবৃত হইয়া প্রভু একদিন গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে অতো কথা (আমি অবতার ইত্যাদি) যাকে তাকে বলে বেড়াও?"

সহসা ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও গিরিশের বিশ্বাস টলিল না। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাস্তার উপরে আসিয়া ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন "ব্যাস, বাল্মীকি যাঁর কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি?"

গিরিশের ঐরূপ অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং মন উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। গিরিশও তখন ঠাকুরের সেই দেবভাবে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল

দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া "জয় রামকৃষ্ণ" "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া বারবার তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীম—কথিত "রামকৃষ্ণ কথামৃতে"ও এইরূপ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই। একদিন দক্ষিণেশ্বরে স্বর্গগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রকে বলিতেছেন, "ওহে আর সব যাই কর—but do not worship him as God (ওঁকে ঈশ্বর বলে পূজা ক'র না), এমন লোকটার মাথা খাচ্ছ"।

গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন। "কি করি মশায়। যিনি এই সংসার-সমুদ্র ও ভবসাগর থেকে পার কর্‌লেন তাঁকে আর কি বলবো বলুন। তাঁর— 'গু' কি 'গু' বোধহয়? *

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "we offer to him worship bordering on divine worship"—এঁকে আমরা পূজা করি, সে পূজা প্রায় ঈশ্বরের পূজার কাছাকাছি। তারপর অনেক তর্ক চলিল,—জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের অনেক কথা উঠিল। ডাক্তার সরকার অপ্রতিভ হইয়া গিরিশচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও, পায়ের ধূলা দাও" পরে (নরেন্দ্রের প্রতি) "আর কিছু নয় গিরিশের intellectual power (বুদ্ধিমত্তা) মান্‌তেই হবে"। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা শুনিতে শুনিতে বালকের ন্যায় হাসিতেছিলেন। এই অসামান্য গুরুভক্তির পরিচয় গিরিশ "কালাপাহাড়" নাটকে ভক্ত লেটোর মুখে প্রদান করিয়াছেন। লেটো গুরুর কৃপায় মনের মালিন্য দূর করিতে সমর্থ হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে বলিতেছেন—"বাবাজি তুমিই হরি। হরি নইলে আর চিন্‌বোনা? হরি নইলে ওদের মনের মালিন্য কে হরলে? হরি নইলে লেটোকে কে তারে?" ৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গ।

অন্যত্র লেটো তাহার গুরু চিন্তামণিকে বলিতেছে—

"বাবাজি, আমার ভগবান তুমি। কোথায় কে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পতি আছে, সে কামড়ায় কি আঁচড়ায় তা জানিনে, সে কেমন, তা কিছু বুঝলেম

* (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ ২৮২।৮৪ পৃষ্ঠা)

না, শুনেছি যে সে মানুষকে ভালবাসে। যদি ভালবাসে,—আর ভালবাসে কিনা মানুষ কি ক'রে বুঝ্‌বে?—সে মানুষ হয়ে এসে মানুষের মত ভালবাসা দেখায়, মানুষের মত কথা কয়, হাঁ তাহলে বুঝতে পারি যে ভগবান ভালবাসেন বটে। তা নয় কোথায়, কোন্ নিরেলায় তিনি বসে আছেন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভয়ে এগোন্ না। সেথায় যাই কি করে বাবাজি? অমন ভগবান যমের বাবা, তিনি ভগবান, ভগবান আছেন—আমার মাথায় থাকুন! ভগবান মানুষের মত মানুষ হয়, তাহ'লে বুঝি যে ভগবান্ প্রেমময় বটেন"।

চিন্তা—আহা, লেটো, সে মানুষ হয়ে এসে রে, মানুষ হয়ে এসে।

লেটো—তা আর বুঝিনে, বাবাজি? এই মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লেটোকে খোঁজে, লেটোর জন্য কাঁদে—

কালাপাহাড়—৪র্থ অঙ্ক, ৫ গ

এই গুরুভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী প্রায় সকল নাটকে দেখিতে পাই—বিশেষতঃ "শঙ্করাচার্য্যে"—শ্রীশঙ্কর, সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র ও শান্তিপ্রদের গুরুভক্তিতে। গুরুভক্তি-বলে সনন্দন নদী পার হওয়ায়, শঙ্করাচার্য্য শিষ্যকে গদ্‌গদ্‌ভাবে বলিতেছেন, "বৎস সনন্দন, তোমার আশ্চর্য্য গুরু-ভক্তিতে আমার ঈর্ষা হয়। গুরু-ভক্তিতে তোমার আদর্শ যে গ্রহণ কর্‌বে, ভব-সমুদ্র তার গোষ্পদ"।

গুরু-ভক্তিতে গিরিশের নিকটও ভবসমুদ্র গোষ্পদের ন্যায়ই সুগম হইয়াছিল। কখনও তিনি শঙ্করের মুখে বলিতেছেন—

হেরি এই বিদ্যমান গুরুদেব মম,
স্বস্বরূপে অবস্থিত সম্মুখে আমার,
প্রত্যক্ষ অনন্তদেব নর কলেবরে!
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর
পরব্রহ্ম মানব শরীরে,
করি নমস্কার শত চরণ অম্বুজে।
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার
জ্ঞানাঞ্জনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান,
অবতীর্ণ তুমি ভগবান।" ১ম অঙ্ক, ৭ম গ

কখনও বা পূর্ণচন্দ্রের মুখে গুরুদেব গোরক্ষনাথের প্রতি বন্দনা আরোপিত করিতেছেন—

গুরুদেব !

তুমি দিগম্বর, শশাঙ্কশেখর
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তুমি সনাতন,
তুমি জলস্থল অনিল অনল,
তুমি আদি অনাদি পুরুষ,
বাঞ্ছা মাত্র তব শ্রীচরণ।

আর এই গুরুভক্তি তাঁহার হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে ইষ্ট অপেক্ষাও গুরুই তাঁহার অধিকতর প্রিয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। এক-দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছিলেন—"গুরু শেষ কালে দেখাইয়া দেন, ঐ গ্যাখ্, ঐ তোর ইষ্ট", পাছে ইষ্ট দর্শনে গুরুর সহিত বিচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় গিরিশ ব্যথিত-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইষ্ট দেখাইয়া গুরু কোথায় যান?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিষ্যকে সান্ত্বনা করিলেন, "গুরু ইষ্ট তখন এক হইয়া যান। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, তিনে এক, একে তিন।" গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন। "শঙ্করাচার্য্যে"ও এই ভাবই পরিস্ফুট দেখিতে পাই,—"অদ্বৈত জ্ঞান বিকাশের পর গুরু অন্তর্হিত হন। ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য্য। সেই কার্য্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব তাঁর স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।"

অতঃপর গিরিশচন্দ্রের মুখে নিরন্তর "রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারিত হইত। তুচ্ছ হইতে অতি বৃহৎ কার্য্যে "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া শ্রীগুরুর স্মরণ না করিয়া হস্তক্ষেপ করিতেন না। পরমহংস বলিতেন—"যে ছেলে বাপের হাত ধরে, তারও পা পিছলে পড়বার ভয় আছে, কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, তার আর আদৌ পতনাশঙ্কা নাই।" গিরিশ "বিল্বমঙ্গলে" গুরুর সহিত তাঁহার এই নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে,
যেখানে যাই সে যায় পাছে,
আমায় বল্‌তে হয় না জোর করে।

মুখ খানি যে যত্নে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়
আমি হাস্‌লে, হাসে,
কাঁদলে কাঁদে
কত রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলাম তাই
কে বলেরে আপন রতন নাই
সত্যি মিথ্যা দেখনা কাছে
কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে।"

২য় অঙ্ক ৩ গ

পরমহংসদেব বলিতেন, "যত বড় পাপই কেহ করুক না কেন, যদি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকা যায়, প্রকৃত অনুতাপ হয়, তবে ভগবান নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন।" মহামতি ঈশাও বলিয়াছেন—"একটি সরিষার মত কণা পরিমাণ বিশ্বাসও যদি তোমার থাকে, তবে তোমার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইতে পারে। তুমি বৃহৎকায় পাহাড়কে এখান হতে সরিয়া যা বলিলে সে নিশ্চয়ই এরূপ করিবে।" এরূপ বিশ্বাসেই গিরিশচন্দ্রও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। তাঁহার শেষ বয়সে রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণদেব" কবিতায় গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে—

কভু রোষান্বিত হন, জনক জননী
সহোদর পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী
শয্যা গৃহে সর্পের বিবর,
প্রেম হীন পত্নীর অন্তর,
ধনে হয় পুত্র প্রাণ হর,
স্নেহ মায়া পাশরিয়া, দুষ্ট কন্যা দহে হিয়া,
শত্রুপ্রায় স্বজন প্রখর।
অবিশ্বাসী, পুত্রসম পালিত কিঙ্কর।

ভাবান্তর নাহিমাত্র তব করুণায়।
হে দীন-শরণ
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়
বরিষার বারি বরিষণ
বিধবার ধনাপহরণ
ভ্রূণহত্যা কুলস্ত্রী গমন
ত্যজিকন্যাপুত্র নারী পানাসক্ত অত্যাচারী
লোক ত্যজ্য ঘৃণিত জীবন
তব দ্বার মুক্ত তার পতিত পাবন।

গিরিশের প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহ

এইরূপে ঠাকুরের অহেতুকী কৃপাবলে গিরিশের ধর্ম্ম-বিশ্বাস দিন দিন অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ঠাকুরও গিরিশের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পিতা যেমন সকল সন্তানের প্রতি সমান স্নেহ করেন, গুরুদেবও তাঁহার সকল শিষ্যের প্রতি সম স্নেহ প্রদর্শন করেন বটে কিন্তু সকলকে সমান অধিকার দেন না। গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুর বীরভক্ত, শূরভক্ত বা 'ভৈরব' বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহার সমস্ত আব্দারই যেন বুক পাতিয়া সহ্য করিতেন। সময় সময় গিরিশ অত্যন্ত রূঢ়ভাষী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত কঠিন ভাষাও গুরুদেব হাসিয়াই সহ্য করিতেন। কারণ তাঁহার ঐরূপ ভাষার আবরণে অপূর্ব্ব একান্ত নির্ভরতার ভাব যে লুক্কায়িত ছিল, তিনি তাহা দেখিতে পাইতেন। গিরিশের দেখাদেখি রামকৃষ্ণদেবের জনৈক প্রিয়ভক্ত একদিন ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করায় ঠাকুর তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন, ও পরে তাহার ভুল তাহাকে বুঝাইয়া দেন। গিরিশ ('শঙ্করাচার্য্যে') এই আধার-বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"মাতা যেমন কোন্ পুত্রের কিরূপ আহার বিহারে স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করে তার ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব ও সেরূপ অধিকারী ভেদাভেদে জ্ঞান সুধা বিতরণ করেন।"

কি কারণে ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে 'ভৈরব' নামে অভিহিত করিতেন অলৌকিক হইলেও তাহার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন "পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার মন্দিরে ভাব সমাধিতে একদিন তাঁহাকে ঐরূপ দেখিয়াছিলেন"।

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ— পৃঃ ৮০।]

একদিন, সমাধিস্থ অবস্থায় কালীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিলেন একটী উলঙ্গ উগ্র বালক মূর্ত্তি মাথায় ঝুঁটা বান্ধা, বাম কুক্ষিতে সুরাপাত্র ও দক্ষিণ হস্তে সুধাভাণ্ড লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? বালক উত্তর করিল "আমি ভৈরব, আপনার কাজ করিতে আসিয়াছি"। বহুদিন পরেও রামকৃষ্ণদেব গিরিশকে দেখিয়া চিনিয়া ছিলেন "এই সেই"। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান প্রধান প্রায় শিষ্যই বলিয়া থাকেন যে ঠাকুর শঙ্করভাবে গিরিশচন্দ্রকে ভৈরব বলিয়া জানিতেন। ঠাকুর তাঁহাদের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছেন—

কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে,
উপবিষ্ট হেন কালে দেখি নিরখিয়া,
আইল মূরতি এক নাচিয়া নাচিয়া।
কেবা সে যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তায়,
কহিল ভৈরব মুই আইনু হেথায়।
কিবা প্রয়োজন তারে পূজিলে আবার
উত্তর করিল কার্য্য করিব তোমার।
গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর,
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার উপর।

[ভক্তসাধু অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত রামকৃষ্ণ গীতি]

বেলুড়ে রামকৃষ্ণদেবের প্রথমবারের জন্মোৎসবের সময়ে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ গিরিশচন্দ্রকে নিজের সমস্ত পোষাক স্বহস্তে পরাইয়া সতীর্থগণকে বলিয়াছিলেন "আরে তোরা চুপকর, আজ ঠাকুরের ভৈরবের মুখে ঠাকুরের কথা শুনবো।" ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, একবার গিরিশচন্দ্রের সুরাপান নিবৃত্ত করিতে একজন ভক্ত আবেদন

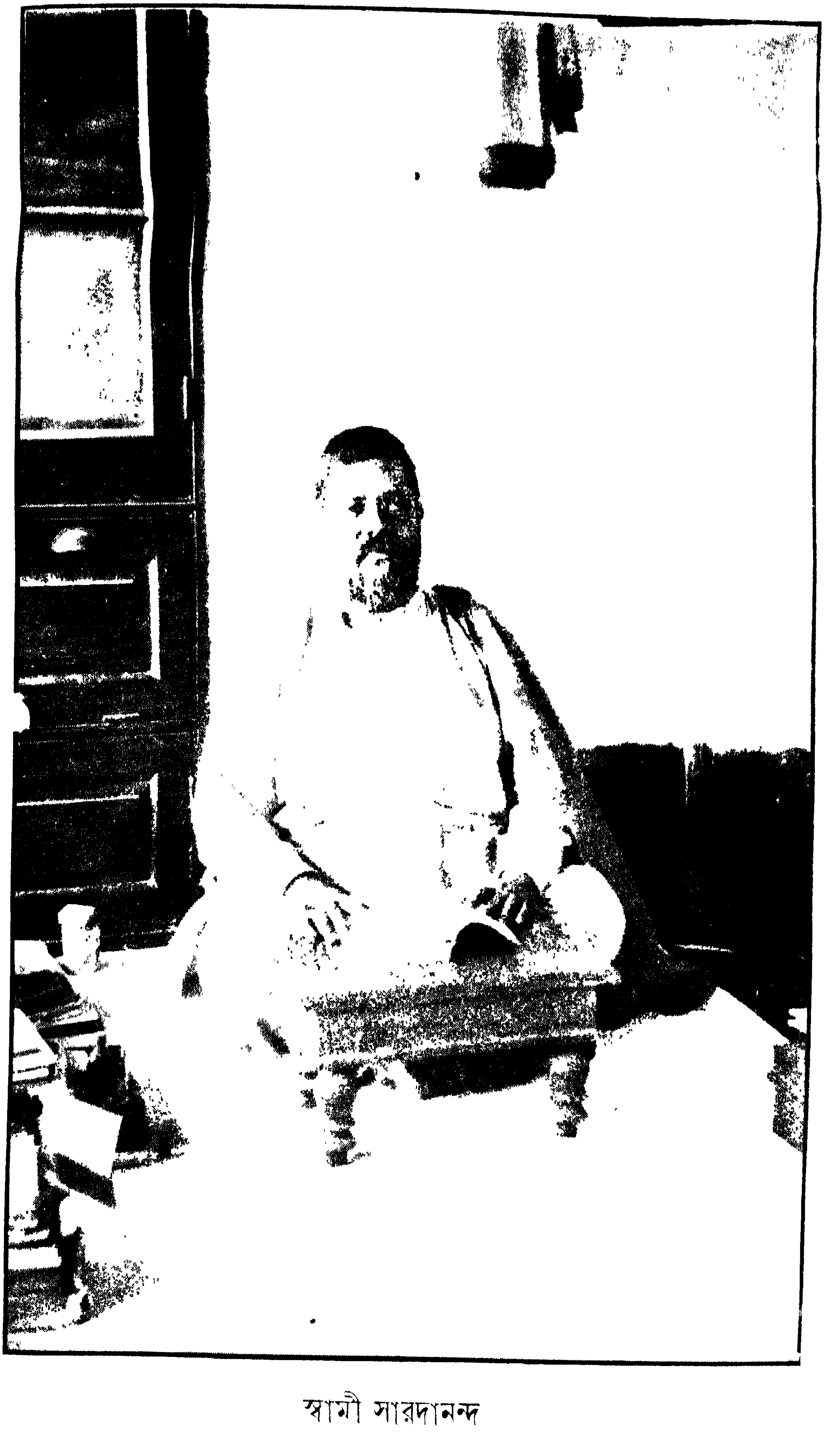

স্বামী সারদানন্দ

করিলে ঠাকুর উত্তর দেন "তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের? সে মদ ছাড়ুক নাই ছাড়ুক, যে যাহার কর্ত্তা সে বুঝবে, বিশেষতঃ ওরা শূরভক্ত, মদে ওদের দোষ হবেনা।"

আমার ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি গিরিশচন্দ্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভের জন্য দেবাদিদেব তারকেশ্বরকে কাতর বেদনা জানাইয়াছেন "তারকনাথই আমার গুরু হোন"। আজ তিনি দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসী মহাদেবকে গুরুপদে লাভ করিলেন, ভৈরব শঙ্করের পদাশ্রয় লাভ করিলেন।

গিরিশচন্দ্রের গুরুভ্রাতৃগণের নিকট শুনিতে পাই যে তাঁহার সহোদর অতুলকৃষ্ণও একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শঙ্করমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক সহস্র দোষ সত্বেও গিরিশ যে তাঁহার কিরূপ আদরের পাত্র ছিলেন আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

একদিন স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, হঠাৎ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি গিরিশ ঘোষকে চেন?

অশ্বিনীবাবু—কোন্ গিরিশ ঘোষ, থিয়েটার করে যে?

ঠাকুর—হাঁ।

অ—দেখিনি কখনও, নাম জানি।

ঠা—ভাল লোক।

অ—শুনি মদ খান নাকি?

ঠা—খাক্‌না খাক্‌না, কদিন খাবে? তুমি নরেন্দ্রকে চেন?

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষের সুরাসক্ত গিরিশের প্রতি কেন এরূপ অস্বাভাবিক স্নেহ? কেবল ইহাই কি? আর একদিনের একটী আশ্চর্য্য ঘটনা বলিব।

জন্মাষ্টমীর দিনে দ্বিপ্রহরের সময়ে গিরিশ দুই একটি বন্ধুর সহিত গাড়ী করিয়া রাস্তায় মদ খাইতে খাইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। গাড়ী থামিলে টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ হুঁস্ ছিল না। ঠাকুর কিন্তু অন্য ভক্তের দ্বারা গাড়ী হইতে চাদর ও মদের বোতল আনাইয়া রাখিলেন। ক্রমে গিরিশের নেশা বাড়িতে লাগিল, আরও পান করিবার ইচ্ছা হইল। গুরুদেব তাহা বুঝিয়া সকলের

সম্মুখেই গিরিশকে মদ আনাইয়া দিলেন। গিরিশও খুব পান করিলেন। সেদিন ছুটী বলিয়া অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। জ্ঞান হইবার পর গিরিশের খুব লজ্জা হইল, ইহার পর তিনি পানাসক্তি অনেকটা লাঘব করেন। কিন্তু মদ্যপের উন্মত্তাবস্থায়ও সমাগত সকলেই সুরাপান-মত্ত গিরিশের ভক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। গিরিশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "তুমিই পূর্ণ-ব্রহ্ম, যদি না হয় সব মিথ্যা, দাও বর ভগবান, একবৎসর তোমার সেবা কর্‌বো, মুক্তি ছড়াছড়ি, প্রস্রাব করে দিই, বল তোমার সেবা করবো"। তখন গাড়োয়ান ডাকিল, ঠাকুর কি বলিলেন, কিন্তু গিরিশ আবার ফিরিলেন, আবার কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন "ভগবান্, পবিত্রতা আমায় দাও, যাহাতে একটু পাপ চিন্তা না হয়"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তুমিতো পবিত্রই আছ, তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি, তুমিত আনন্দেই আছ"। এইরূপ কথাবার্ত্তার পরে ঠাকুর মধ্যাহ্ন-সেবা ও বিশ্রাম করিতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন, গিরিশও প্রস্থান করিলেন।

[শ্রীম-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থভাগ, ২৭৮ পৃঃ ও ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত জীবনী ১২১ পৃঃ]

আর একদিন জনৈক সঙ্গীর সহিত অতিরিক্ত মদ্যপান করিতে করিতে গিরিশ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে আহিরীটোলা ঘাট হইতে একখানি ভাড়ানৌকা করিয়া উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হন। তখন ঠাকুরের নিদ্রা খুব অল্পই হইত। তিনি অধিকাংশ সময়েই ধ্যানস্থ থাকিতেন, এবং সম্মুখের দরজা খোলা অবস্থায় থাকিত, উভয়ে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবামাত্রই তিনি তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং বাহিরে আসিয়া মদোন্মত্ত ভাবে—

"সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই জয় কালি বলে,
আমায় মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে"

বলিয়া এমন গান করিতে লাগিলেন যে ঠাকুরকেই তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর উন্মত্তবৎ বোধ হইতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এরূপ নৃত্য-গীতের পর ঠাকুর শান্ত হইলে তাঁহারা পুনরায় কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ফিরিবার সময় গিরিশচন্দ্র পরমকারুণিক পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে

একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন "যে দুর্দ্দান্ত মাতালের মত্তাবস্থা দেখিয়া, বারনারীও সশঙ্কচিত্তে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে, এই অবস্থায় পরমদয়াল পিতা ভিন্ন আর কে যত্নে এরূপ পরমানন্দ দান করিতে পারে?"

আর একদিন এক ভীষণ কাণ্ড হইয়াছিল। প্রহ্লাদ-চরিত্র অভিনয় দেখিবার কয়েকমাস পরে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) রামকৃষ্ণদেব আবার থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন, "ঠাকুরের সকল ভক্তই যাহার যাহা ইচ্ছা নানাপ্রকারে সেবা করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন, আর আমি এম্‌নি অভাগা আমারদ্বারা ঠাকুরের কোন সেবাই হইলনা। আজ যদি একজন নাম্‌জাদা সাহেব রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইত, তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোন আয়োজনের ত্রুটী হইতনা। আর যিনি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, তিনি আসিলে বড় জোর একটী box এ বসিতে দেওয়া হয়। হায়, আমি সেবা জানিনা, করিতেও পারিনা। তবে ঠাকুর যদি কোনদিন ছেলে হইয়া আমার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, হয়ত মমতাবশতঃ তাঁহার সেবা করিতে পারি"। সেদিন গিরিশ খুব মদোন্মত্ত, অভিমানে ঠাকুরের নিকটে গিয়া সেবা করিবার অধিকার পান নাই বলিয়া ঠাকুরের পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর বারংবার বলিতে লাগিলেন "ঠাকুর বল তুমি, আমার ছেলে হবে"। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন "তা কেনরে, আমি তোর গুরু হব, ইষ্ট হয়ে থাক্‌ব।" ঠাকুরের মুখে এই উত্তর শুনিয়া গিরিশ প্রথমতঃ তাঁহকে সামান্যতঃ কটূক্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু মদের উত্তেজনায় সে কটূক্তি ক্রমে সংযমের সীমা লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল অপভাষায় পরিণত হইল। ঠাকুরের মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু পাছে তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণ অসংযত হইয়া গিরিশচন্দ্রকে দণ্ড প্রদান করেন, সেই আশঙ্কায়—পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "এটা বলে কিগো, এটা কোন্ থাকের ভক্ত রে?" ক্রমে থিয়েটার ভাঙ্গিল, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গাড়িতে উঠিলেন এবং গিরিশও কর্দ্দমাক্ত পথের উপর তাঁহার সম্মুখে লম্বমান হইয়া প্রণামের ভাবে পড়িলেন। গিরিশ বাটী চলিয়া আসিলেন। পরদিন যে কেহ দক্ষিণেশ্বরে যায় ঠাকুর তাহাকেই ডাকিয়া বলেন; "শুনেছ গা, দেড়খানা লুচি খাইয়ে থিয়েটারের

গিরিশ ঘোষ আমার পিতৃউচ্ছন্ন মাতৃউচ্ছন্ন করেছে।" কেহ বলিল "তাতো করবেই মশাই, ওরা থিয়েটারের লোক আপনিও যেমন, যার তার বাড়ীতে যান"; এমনি অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। সেখানে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "রাম শুনেছ? কি বল"? রামচন্দ্র অম্লান বদনে বলিলেন "আজ্ঞে, ভালই করেছে"। ঠাকুর সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওগো শোন শোন রাম কি বলে। রাম বলিলেন "কালীয় নাগ সহস্রফণায় বিষ উদ্গিরণ করিত, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন তুমি অত বিষ ছড়াও কেন? তাহাতে কালীয় উত্তর দেয়, প্রভো, আপনি আমাকে বিষ দিয়াছেন, সেই বিষই আমি ছড়াইতেছি সুধা পাইব কোথায়?" ঠাকুর বলিলেন আর কি তাঁর বাড়ীতে যাওয়া উচিত? সকলে বলিল না মশায় আর যাবেন না। কিন্তু রাম দৃঢ় স্বরে বলিলেন, যেতে হবে বৈকি? ঠাকুব বলিলেন "শুন গো রাম বলেছে যেতে হবে, এর পরে যদি মারে?" রাম তৎক্ষণাৎ অসংকোচে উত্তর দিলেন "মার খেতে হবে!"

তাঁহাকে কটু বাক্য বলিয়া ভক্ত-চিত্ত যে ব্যথিত হইয়াছে ঠাকুর তাহা অন্তরে অন্তরে জানিতেন এবং গিরিশচন্দ্রের ন্যায় বীরভক্তকে সান্ত্বনা ও ক্ষমাদান করিবার নিমিত্ত তিনি অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রামের কথা শুনিবামাত্রই বলিলেন "তবে গাড়ী আনতে বল।"

এদিকে ঘটনার পরদিন ঠাকুরের অন্যএক ভক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত গিরিশচন্দ্রের এই কথা হইতেছিল। গিরিশের মনে কোন শঙ্কা ছিলনা, আদুরে বয়াটে-ছেলে যেমন বাবাকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তিনিও আদুরে বয়াটে সন্তানের মত কাজ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। হরিপদের মুখে সকল কথা শুনিয়া গিরিশ বলিলেন "তাঁর নিন্দাও নাই, গালও নাই; তারপর তিনি যদি আমার অপরাধ গ্রহণ করেন, আমি কটা সামলাতে পারি? রেণুর রেণু হইয়া যাই, (মাতা পিতা হন কি বিরূপ?*) তবে তাঁর ভক্তদের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি তাই আমার ভারি অনুতাপ হচ্ছে, হরিপদ তাঁহাকে নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলেন যে ঠাকুর সম্বন্ধেও

* "পাণ্ডবগৌরবে" ভীমের উক্তি।

তাঁহার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া গিরিশ বলিলেন "ভারী ঘুম পেয়েছে, একটু শুইগে।" হরিপদ তো অবাক, কিন্তু তাহার অল্পক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশের কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম"! এই অপার করুণায় গিরিশচন্দ্র তাঁহার ইষ্টদেবতার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন, আর তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অজস্র বারিধারা বহির্গত হইতে লাগিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই ঘটনা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"জি, সি, তুমিই ধন্য"।

অতঃপর নিজের ব্যবহারের কথা মনে পড়িলেই গিরিশ যে অতি-মাত্রায় লজ্জিত হইয়া পড়িতেন, অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর ক্রমেই ব্যথিত হইত, অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অপনাকে ধিক্কার দিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার পরের কথা আমরা গিরিশচন্দ্রের ভাষায়ই বর্ণনা করিব—

"ইহার কিছুদিন পরে ভক্ত-চূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভু উপস্থিত হইলেন, আমিও তথায় উপস্থিত, চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে বলিলেন, 'গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্‌নে, (এরপর) তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে যাবে।' আমি আশ্বস্ত হইলাম।"

উদ্বোধন, গিরিশ প্রণীত পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ শীর্ষক প্রবন্ধ।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন "ঠাকুর আমাকে এত স্নেহ করেন, তত স্নেহ বোধ হয় কোন বাবা মা, ছেলেকে করেন না। আমার কথা মনে হইলেই তিনি স্নেহে গলিয়া যাইতেন। তিনিতো আমার সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়াছেনই, এমন কি দৈহিক সম্বন্ধেও আমার পিতামাতা ফিরাইয়া পাইয়াছি বলিয়া মনে হইত। ঠাকুর থিয়েটারে আমাকে দেখিতে আসিবার কালে দক্ষিণেশ্বর হইতে নানা প্রকার খাওয়ার জিনিষ কিনিয়া লইয়া আসিতেন, প্রসাদ না হইলে আমার রুচি হইবে না, মুখে ঠেকাইয়া প্রসাদ করিয়া দিতেন। প্রসাদ খাইয়া আমার ঠিক বালকের মত ভাব হইত। পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করিতাম। একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, ঠাকুরের ভোজন শেষ হইয়াছে, তিনি বলিলেন, পায়েস খা, এবং আমিও খাইতে বসিলাম।

ঠাকুর বলিলেন, 'আয়, তোকে খাওয়াইয়া দিই, তুই খা'—এই বলিয়া আমাকে খাওয়াইতে লাগিলেন, হায়! কত অস্পৃশ্য ওষ্ঠে আমার এই ওষ্ঠ স্পৃষ্ট হইয়াছে, আর তিনি তাঁহার নির্ম্মল হস্তে এই অপবিত্র ওষ্ঠে ঠেকাইয়া পায়েস্ দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচেপুঁচে খাওয়াইয়াছেন, সেইরূপ চেঁচেপুঁচে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন, আমি যে বুড়োধাড়ি তাহা আমার মনে হইল না, নগ্ন বালকের ন্যায় হইলাম, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন মনে হইল"।

উদ্বোধন—পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবিতাবস্থায় কিরূপে তাঁহাকে ও কালিপদপ্রমুখ অন্যান্য ভক্তগণকে বরাভয়কর প্রকাশ করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র সে দৃশ্য "রামদাদা প্রবন্ধে" নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—

পীড়িতাবস্থায় প্রভু শ্যামপুকুরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন, কালীপূজার দিন উপস্থিত হইল। ঠাকুর শ্রীমান কালীপদ ঘোষ নামক একটী ভক্তকে বলিয়াছিলেন "আজ কালীপূজার উপযোগী আয়োজন করিও।" কালীপদ অতি ভক্তির সহিত আয়োজন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রভুর সম্মুখে পূজার উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত হইল, এক দিকে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী, প্রভু অন্ন আহার করিতে পারিতেন না, তাহার জন্য বার্লিও আছে, অপরদিকে স্তূপাকার ফুল, রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক। পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ, ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে রামদাদা, আমি তাঁহার নিকট আছি। আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির। রামদাদা আমায় কি বলিলেন, আমার ঠিক স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থ তখন যেন নয়। কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে, রামদাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'যাওনা, যাওনা'; রামদাদার কথায় আমার আর শঙ্কা রহিলনা, ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমাকে দেখিয়া বলিলেন—কি, কি, এসব আজ করতে হয়। আমি অমনি তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই, বলিয়া দুহাতে ফুল লইয়া 'জয়, মা শক্তি' করিয়া পাদপদ্মে দিলাম, অমনি সকল ভক্তই পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। 'প্রভু' বরাভয়কর প্রকাশ

হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। সে দৃশ্য যখন আমার স্মরণ হয় রামদাদাকে মনে পড়ে, মনে হয় রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।

তত্ত্ব মঞ্জরী পত্রিকা ৮ম বর্ষ নবমসংখ্যা পৌষ, ১৩১১-সাল। "রামদাদা" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

"গার্হস্থ্য জীবনে" আমরা গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী গর্ভজাত এক মহান্ হরিভক্ত শিশু পুত্রের উল্লেখ করিয়াছি। এই পবিত্র কুসুমটী অকালে শুকাইয়া যায়, কিন্তু তাহার সেই ক্ষুদ্র জীবনের আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে উদয় হয় যে সত্যই কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তের অকপট প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন? খেলনা ফেলিয়া দিয়া দুইবৎসরের শিশু দেব-দেবীর ছবি লইয়া খেলা করে, 'হরিবোল' বলিলে উল্লাসে করতালি দিয়া নাচিতে থাকে, দুগ্ধ পান করিতে কাঁদিলে হরিনামে শান্ত হইয়া দুগ্ধ খায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী তাহাদের গৃহে আসিলে পিসিমার হাত হইতে জপমালা কাড়িয়া লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে অপর্ণ করে। এ শিশু কে? কিন্তু ইহার সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের মনোভাব সম্ভবতঃ "শঙ্করাচার্য্যে" প্রভাকরের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে:—"পুত্রজ্ঞানে এতদিন যে এই ব্রহ্মবেদ মহাপুরুষের সেবা কর্‌বার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাদেরই পরম ভাগ্যফলে"। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে, ক্রমে ক্রমে গিরিশের দ্বিতীয়া পত্নী ও এই দেবকল্প শিশুপুত্রটীর প্রাণ বিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি রঙ্গালয় সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কথা তখন স্মরণ হইল—"এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) দুইদিকই রাখিয়া চল, পরে যখন একদিক (সংসার) ভাঙ্গিবে, তখন যাহা হয় হইবে"। গিরিশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অতঃপর ঠাকুর তাঁহকে দিয়া কি করাইবেন। তখন অধিকাংশ সময়েই গুরুভ্রাতাগণের সাহচর্য্যে কালাতিপাত করিতেন ও ঠাকুরের অপার করুণার কথা আলোচনা করিয়া ভাবে গদগদ হইতেন। বলা বাহুল্য এইরূপ আলোচনায় গিরিশের ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকিত না; সংসার-বন্ধনও গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান হইত। একদিন গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, ঠাকুরত তোমায় সন্ন্যাসী করিয়াছেন,

চল দুজনে কোথাও চলে যাই"। গিরিশ একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন "তোমরা যাহা বলিবে, ঠাকুরের কথা জ্ঞানে আমি এখনই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ভাই, নিজে ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসী হইবারও যে আমার সামর্থ্য নাই, ঠাকুরকে আমি যে বকলমা দিয়াছি।" অতঃপর উভয়ে কামারপুর ও জয়রাম বাটীতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীমাতা সারদাদেবীর অপার স্নেহে আপ্যায়িত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইয়াছিলেন। গিরিশ মাটে ঘাটে সকল কৃষাণদের সহিত বেড়াইতেন, উদর পূর্ণ করিয়া মার প্রসাদে তৃপ্তিলাভ করিতেন, আর পল্লীর সেই স্নিগ্ধ সমীরণে শস্য-পুষ্প-বৃক্ষ-লতায় মধুর স্বরে সুর মিলাইয়া কাতর ভাবে গাহিতেন—

মন আমার দিন কাটালি, মুল খোয়ালি,
ভালবাসাত কল্লি ভবে,
একলা এলে একলা যাবে,
মুখ চেয়ে কার ঘুরচ তবে?
কে তুমি বল্‌ছো আমি
দেখ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে,
ভাঙবে মেলা ঘুচবে খেলা
চিতার ছাই নিশানা রবে॥

"প্রফুল্ল, ৫ম অঙ্ক।"

কখনও বা আবার জ্বলন্ত বিশ্বাসে "আপন রতনে" সম্পূর্ণ ভর করিয়া হরি ডাকিতে ডকিতে গাহিতেন—

কি ছার কেন মায়া
কাঞ্চন কায়া ত রবেনা
দিন যাবে দিন রবেনাত
কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে
দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখন মেটেনা ভাই, সাধে পড়ুক বাজ
বেলাবেলি চল্‌রে চলি, সাধি আপন কাজ।

কেউ কারু নয়, আপনা চেয়ে— কবে ফুটবে আঁখি,
আপন রতন বেচে নে চল,—হরি বলে ডাকি।

বিল্বমঙ্গল, ২য় অ, ২য় গ।

অতঃপর গিরিশ সম্পূর্ণ মন স্থির করিয়া মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং "জনায়" জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি "বিদূষক" চরিত্র অঙ্কিত করেন। অবশিষ্ট শান্তিময় জীবনের কথা আমরা গিরিশের নিজের কথায়ই ব্যক্ত করিতেছি—"গুরুর কৃপায় একটী অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার নিশ্চয় ধারণা জন্মিয়াছে গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপারকৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া, সেই জন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ।" জীবনের শেষভাগে গিরিশ তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বলিতেন, "ভাই আমি আর কিছুই চাইনা, কেবল তোমরা সকলে অশীর্ব্বাদ করিও, যেন 'ঠাকুর মঙ্গলময়' জ্ঞান কখনও কোন অবস্থায় আমার লুপ্ত না হয়।" রোগশয্যায় পতিত হইয়াও একদিন তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন—"তোরা ভাবিস্ কি, আমি এই সামান্য রোগের হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারিনা? ঠাকুরকে জোর করে বলে পঞ্চবটীতলে গড়াগড়ি দিয়ে এসে তোদের এখনি দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ঠাকুর মঙ্গলময় 'রোগ, শোক, দুঃখ কষ্ট, যা কিছু জীবনে অনুভব করেছেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য,' মনে এই ধারণা তাঁর কৃপায় এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে ঐরূপ করতে আর প্রবৃত্তি হয় না। কল্পতরু-তলে আমি যখন যা প্রার্থনা করেছি তখনি তা পেয়েছি।" গুরুপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গিরিশচন্দ্রের বিচিত্র ধর্ম্মজীবনের কি অদ্ভুত পরিণাম হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

"এই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন যামিনী যায়, এই ভাব পরম সাহস, পরম আত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোন ভয় নাই, মহাভয় মৃত্যুভয়, তাহাও দুর হইয়াছে, জয় রামকৃষ্ণ।" বলাবাহুল্য এই "জয়, রামকৃষ্ণ" নামই মহাপ্রস্থানে গিরিশের একমাত্র পথের সম্বল হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরিশ-নাটকে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাশ্চাত্য জড়বাদের মোহে মতিভ্রষ্ট হিন্দুগণ যখন সংশয়-সাগরে তরঙ্গে তরঙ্গে তাড়িত হইতেছিলেন, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্ম মানবের ত্রিতাপ নিবারণের এই তিন সনাতন পন্থা পুনঃ প্রচারের জন্য পূজ্যপাদ পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হয়েন। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট এই তিন পন্থা আবার শাখাপ্রশাখায় বহুধা বিভক্ত। অলৌকিক সাধনাবলে এই পরমরহস্য নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব লোকসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন একজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, আর অনন্তময় শান্তিসাগরে যাইবার অনন্তপথ। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেরূপ নিজে প্রেমময় জীবন ধারণ করিয়া জীবদিগকে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেবও সেইরূপ নানারূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সংসারলুব্ধ, কামিনীকাঞ্চনপ্রমত্ত, ভ্রান্ত জীবকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তদুপদিষ্ট কর্ম্মপথ—শিবজ্ঞানে জীবসেবা—বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী বলিয়া কঠোর কর্ম্মযোগী নরেন্দ্রনাথ আবার তাহাও যুগধর্ম্মরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনোপায় গিরিশচন্দ্র কিরূপে তাঁহার কয়েকখানি নাটকে প্রতিফলিত করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু যে নীতি, যে ঐশীবার্ত্তা বিশিষ্ট অধিকারীগণ জীবন্ত সত্যরূপে লোকসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কৃত্রিমতাময় রঙ্গালয় হইতে তাহা পুনঃ প্রচারের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে বলিয়াই

শ্রীশ্রীপরমহংস দেব

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"তুমি যা কচ্চো তাই করো, ওতে ও অনেক কাজ হবে, লোকশিক্ষা হবে"। ধর্ম্মের তত্ত্ব, দর্শনের নীতি, কবির সরস ভাষায় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। নিপুণ অভিনয় আবার তাহার ভাব গাঢ়তররূপে অঙ্কিত করে। "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "নকলে আসলের উদ্দীপনা হয়, সোলার আতা দেখ্‌লে সত্যিকার আতা মনে হয়।"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "চৈতন্যলীলা" লিখিত হইবার পরে গিরিশচন্দ্রের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র প্রভাব প্রকটিত হয়। তদবধি তিনি যে সমস্ত নাটক রচনা করিয়াছিলেন প্রায় তাহার সকলগুলিই তদনুভাবে অনুপ্রাণিত। ইহার পর আবার শ্রীনরেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর যতই প্রসার লাভ করিতে লাগিল, "মায়াবসান" হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল নাটকেই তিনি সেই যুগধর্ম্মোপযোগী সেবামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে ধর্ম্মের তত্ত্ব, দর্শনের তথ্য, জাতির প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা ও সমাজের মনোবেদনা নাটকীয় কল্পিত চরিত্রের ভিতর দিয়া ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে, রসের বর্ণচ্ছটায় দর্শকের হৃদয়াকাশে যে আদর্শের বিকাশ করে তাহা কেবল ক্ষণিক ভাবোদ্রেক করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। অনেক সময় তাহার জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কারও উল্টাইয়া দেয়। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব' নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগ্‌বাজারের নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে চিরদিনের জন্য বলিদান বন্ধ হইয়াছে।

রঙ্গভূমি এই বিশাল বিশ্বসংসারের প্রতিকৃতি মাত্র। জাতীয় রঙ্গালয় জাতীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মর্ম্মচিত্র অঙ্কিত করে। মহাকবি সেকৃস্‌পিয়রের নাটকে অলৌকিক বা পারলৌকিক তত্ত্ব উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হয় নাই, কেননা, অতীন্দ্রিয় রহস্যে পাশ্চাত্যজাতির প্রকৃতিগত সংশয়। হ্যাম্‌লেটের ন্যায় মনীষী, মনস্বী, উন্নত, পুঙ্খানুপুঙ্খ-তত্ত্ব-বিচারশীল চরিত্র মৃতপিতার প্রেতাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াও বৈতরণীর পরপারের উদ্দেশে বলিতেছেন—

অজানিত দেশ, পান্থ নাহি
ফিরে যথা হ'তে,

কিন্তু এই পরলোকে বিশ্বাস হিন্দুর মজ্জাগত। ইহলোক-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জাতির সকল কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যমূলে নীতি ও পুরুষকার। আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে ধর্ম্ম, পরলোক, ঈশ্বর-নির্ভর প্রভৃতি; আর ইহাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। যেখানে অতীন্দ্রিয় জগৎ, সেক্সপিয়র সেখানে মূক, গিরিশচন্দ্র সেখানে মুখর। এই জন্যই গিরিশচন্দ্রের সকল মুখ্য নাটকেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ঈশ্বর-বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয়বোধ, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং মুক্তির কথা। হিন্দুর জাতীয় ভাবের দিক্ হইতে গিরিশচন্দ্রের নাটক কয়খানির আলোচনা করিলে তাঁহাকে ঠিক বুঝা যাইবে।

অতএব দেখিতে পাওয়া যায় জাতিগত সংস্কার বশতঃ অথবা যে কোন কারণেই হউক, ধর্ম্ম হিন্দুর মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। অবিদ্যার ছলনায় দুর্দ্দমনীয় ভোগবাসনা তাহাকে ভুলাইয়া ধর্ম্মপথ-বিমুখ করে। এই জন্যই উদ্দীপনা ও প্রণোদনার প্রয়োজন; দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি এবং কবি সেই উদ্দীপনার গুরু। ইঁহারাই মায়ামুগ্ধ, ভোগলুব্ধ মানবকে বুঝাইয়া দেন যে, সুখের তৃষ্ণায় দুঃখের সাগরে তুমি সাঁতার দিতেছ, শান্তির কামনায় পর্ব্বতপ্রমাণ অশান্তি সৃষ্টি করিতেছ, অমৃতের মন্থনে তোমার ভাগ্যে উঠিয়াছে কেবল হলাহল। ভোগ-চরিতার্থতার জন্য তুমি কর্ম্ম কর, কিন্তু ফল হয় মাত্র কর্ম্মভোগ। সাগরোর্ম্মির ন্যায় এই কর্ম্মস্রোত নিবারণেরও উপায় নাই। জীবন "নলিনীদলগতজলমিব তরলং", প্রকৃতি চিরচঞ্চলা, মন চিরঅস্থির, মধু অন্বেষণে মধুব্রতের ন্যায় তোমায় নিরন্তর পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রেরণ করিতেছে; আজ কামিনী, কাল কাঞ্চন, পরশ্বঃ প্রতিপত্তি, পরদিন প্রতিষ্ঠা; আবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—মন কি চায়, কিসে সুখী হয়, কোন্ বস্তু লাভ করিলে নিশ্চিন্ত হয়, তাহাও তুমি জাননা!

আশা মধুর ভাষায় তোমায় উত্তেজিত করিতেছে, লোলরসনা বাসনার পূজার্থে তুমি নানা উপচার সংগ্রহ করিতেছ, কর্ম্মের পর কর্ম্ম, বন্ধনের পর বন্ধন, তবে উপায় কি? লালসায় জর্জ্জরিত, বাসনায় বিকল, ভোগে তৃপ্তিহীন, কর্ম্মে অবসন্ন মন কখনও কখনও তাঁই কাতর প্রশ্ন উত্থাপন করে

"ততঃ কিং" ? ভোগ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জগতেও অনক সময়ে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভোগে অবসাদগ্রস্ত প্রতীচ্য জাতি খুঁজিয়াছে—অবিনশ্বর সুখ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কোথায় ? কিন্তু তথায় এ প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কৃত হয় নাই। *যুগপ্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণদেব এ'প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন* এবং আজ তাহাই যুগধর্ম্মরূপে ভারতের অসংখ্য নরনারীকে পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছে। গিরিশচন্দ্র ভৈরবরূপে কিরূপে শঙ্করাবতার ঠাকুরের লীলা-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন আমরা কয়েকখানি নাটক উল্লেখ করিয়া পাঠককে তাহার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব।

"বিল্বমঙ্গল"

ভক্ত-মাল গ্রন্থাবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। কিন্তু পরমহংসদেবের কৃপালাভের পর এই নাটকের চরিত্রাবলীর পরিকল্পনা কিরূপ অদ্ভুত ভাব ধারণ করিয়াছে আমরা এইখানে বিস্তৃত ভাবে দেখাইব।

এই নাটকের পাগলিনী সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র এবং ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রেমোন্মাদ অবস্থা কিঞ্চিৎ প্রকটিত দেখিতে পাই। পরমহংসদেব সাধনাবস্থায় ভগবানের দর্শন না পাইয়া যেরূপ আকুলি ব্যাকুলি করিতেন, ঈশ্বরদর্শন-লালসায় বিরহিনী পাগলিনীর চরিত্রে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। ব্যাকুলা পাগলিনী চিন্তামণির কথা জিজ্ঞাসা মাত্রেই তড়িৎ-স্পৃষ্টার ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতেছে।—

কই সই, কই চিন্তামণি ?
বল কোথা গেল ?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে ;—
সে তো নাই লো এখানে !
পর্ব্বত-গুহায় নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কতদিন !

কভু ভস্ম মাথি গায়—
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায় ;
শূন্যে শূন্যে ফিরি,
বুকে বজ্র ধরি,—
সে কোথায় দেখা ত হ'ল না !
হৃদয়ের চাঁদ, দেখি মাত্র সাধ,
তাতে বাদ কেবা সাধে ?
কই—কই চিন্তামণি ?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পরমযোগী মহাপুরুষের অবস্থা জ্ঞাপন করিতে স্ত্রীরূপা পাগলিনীর চরিত্র উপযোগী হইয়াছে কিনা ? পরমহংসদেবের চরিত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন "আমি আপনাকে পুরুষ বলিতে পারি না।" বস্তুতঃ তাঁহার ভিতর পুরুষ পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে, আবার নারী স্ত্রীজন-সুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে। তাঁহার চরিত্রে পুরুষ এবং প্রকৃতি ভাবের বিকাশ সমভাবে দেখিতে পাইয়া গিরিশ একদিন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন "মশায়, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি ?" ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলেন—"জানিনা।"

[রামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গ]

যাহা হউক এই চরিত্রের মূল-কল্পনা সম্বন্ধে একটী বাস্তব-আদর্শ আছে। এক পাগলী ঠাকুরের নিকট কখনও কখনও যাইত, পরমহংসদেবের উপর তাহার ভক্তি ছিল মধুর ভাবের। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব আহার করিতেছিলেন, পাগলী কক্ষের বাহির হইতে প্রশ্ন করিল "আমায় মনে ঠেল্‌লেন্ কেন ?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন "ওরে দেখ্‌ত, একি ঠেলাঠেলি বল্‌ছে"। তারপরে পাগলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর কি ভাব ?" পাগ্‌লী বলিল "আমার মধুর ভাব"। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন "আরে, আমার যে স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব"। ভগবান্ রামকৃষ্ণ-

দেবের পার্ষদগণের দ্বারা বহুবার লাঞ্ছিত ও তাড়িত হইয়াও সেই পাগ্‌লী মাঝে মাঝে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের ভিতর কেহ কেহ অনুমান করেন "এই পাগ্‌লীই বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে"।

নাটকে থাক'র মুখে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়—"ও একটা গেরস্তর বৌ, বাপ্ মা কেউ ছিলনা, মাসী মানুষ করেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের রাত্তিরেই ভাতার ছোঁড়া মরে গেল। তারপর মাগী পাগল হয়েছে, ওর দেওর-গুলো ধরে নে গে মারতো"। ৩য় অঙ্ক, ২য় গ। কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্যের উন্মেষে বারাঙ্গণা চিন্তামণি উহার পরিচয় প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিল—"এ সামান্য পাগ্‌লী নয়, একেও দাগা দে ভগবান্ গৃহত্যাগী করেছে"।

পাগলিনী সর্ব্বদাই খুঁজিতেছে তাহার প্রিয়তমকে। প্রকৃতির ক্রোড় ভিন্ন অন্য আশ্রয় তাহার নাই, কিন্তু তাহার দুঃখ যে এখনও সেই নিষ্ঠুরের দর্শন লাভে সে বঞ্চিতা—

ধরামাঝে উন্মাদিনী ধাই,
তার দেখা নাই,
কোথা পাই, কে আমারে ব'লে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয়, তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী;
ব্যোম—আচ্ছাদন;—নাহিক মরণ,
কত আর আছে তার মনে! ৩য় অঙ্ক, ৪ গ।

প্রথম প্রবেশকালে পাগলিনী জগন্মাতাকে খুঁজিতেছে ও অভিমান-ভরে গাহিতেছে—

ওমা, কেমন মা কে জানে!
মা ব'লে মা ডাক্‌চি কত,
বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা বলে তো ডাক্‌ব না আর,
লাগে কিনা দেখব তোমার,
বাবা বলে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।

পাষাণী পাষাণের মেয়ে
দেখে নাক একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় সে শ্মশানে॥ ১ম অঙ্ক, ২য় গ।

আহা, অভিমানে সাধকরূপিণী পাগলিনী মা, মা, বলিয়া কাঁদিতেছে। অসহায় শিশুর মাতৃ-অঙ্ক ভিন্ন আর আশ্রয় কোথায়? কিন্তু মা যে পাষাণী, পাষাণের মেয়ে, দর্শন দিতেছেন না। তারপর শিশু যেমন স্নেহের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য মাতার উপর অভিমানে পিতৃসন্নিধানে ছুটিয়া যায়, পাগলিনীও 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেছে। কিন্তু বাবা কিছুরই তোয়াক্কা রাখেন না, মাও মদমত্তা (বাবা বম্ বম্ বলে, মদ খেয়ে মার গায়ে পড়ে ঢলে), প্রেম-পিপাসিতার আদরের সাধ মিটাইবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু তবু কি অপূর্ব্ব আকর্ষণ! শ্যামা নাচিতেছে—

শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গাপায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে
শোন না॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ অন্তরের আকুল আগ্রহে নানা ভাবের সাধনা করিয়াছিলেন; কিন্তু নাট্যকারকে অবস্থার ভিতর দিয়া চরিত্রের সৃষ্টি এবং পুষ্টি করিতে হয়; পাগলিনী-চরিত্রও গিরিশচন্দ্র সেইভাবে ফুটাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি অদ্ভুত পরিকল্পনায় প্রকৃত আদর্শ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন নানাভাবে ও রসে শ্রীভগবানের সাধনা করিয়াছেন, পাগলিনীও তেম্‌নি নানাভাবে ও রসে তাঁহার সাধনার ধনকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। মধুরভাব সাধনার চরমভাব, পাগলিনী চরিত্রেও আমরা তাহার ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই। ইতিপূর্ব্বে যে পাগলিনী গাহিয়াছিল "আমার পাগল বাবা, পাগ্‌লী আমার মা", পরে আবার সে গাহিতেছে—"ওই যেন পাগল আমার, দেখ্‌চি যেন মুখখানি তার"। তাহার প্রিয়তম একাকী বসিয়া তাহারই জন্য কাঁদিতেছে, সেও সঙ্গদান নিমিত্ত কাতর হইয়া বলিতেছে "ঘোর যামিনী, এক্‌লা আছে প্রাণের চিন্তামণি।"

সাধনার অনুভূতিতে পাগলিনীর সর্ব্বস্ব ভগবানে অর্পিত; তিনি তাহাকে "নিয়ে বেড়ান হাত ধ'রে"; চিন্তামণি (ভগবান্) পাগলিনীর (সাধকের)

বড়ই প্রিয়। তাই সে বলিতেছে "সে আমার গো, সে আমার।" আর সেই প্রেম কান্তভাবের—সাধনার চরমোৎকর্ষ মধুর রসের। তাই সে বলিতেছে, "নাম ধরে ডাকিনি—ছিঃ লজ্জা করে।"

১ম অঙ্ক, ৪র্থ গ।

"ও মা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে।" প্রিয়কে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও প্রণয়িনীর যে লজ্জা, এ সেই লজ্জা। নতুবা পূতিগন্ধময় জনমানবহীন শ্মশান-ভূমে তাহার ভয় বা ঘৃণা কোথায়? এই রসের সাধনায় তাহার দয়িত তাহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছে—সর্ব্বদা তাহাকে যত্ন করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। পাগ্‌লী এখন 'আপন রতন' খুঁজিয়া পাইয়াছে,—"যেখানে যায় সে যায় পাছে, সে হাসলে হাসে কাঁদ্‌লে কাঁদে, কত রাখে আদরে।" ২য় অঙ্ক, ৩য় গ। আর অপরকেও সে আপনার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া সান্ত্বনা দিতেছে—"তুমি তাঁকে ডাকো, আশ্রয় লাভ করিবে, পরম নির্ভর পাইবে।" মধুর রসে সাধনার পরম পরিণতির অবস্থায় সাধক যে আপনার প্রিয়তমের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছে, যাঁহাকে সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে, সে যে কেবল ন্যস্ত ভার গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত, সাধনার তাহা নিয়ম নয়। সাধকের জন্য তাঁহার আগ্রহও তাঁহার জন্য সাধকের আগ্রহ অপেক্ষা ন্যূন নহে। চিন্তামণির দর্শন না পাইয়া সাধকেব অভিমান এখন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সাধকের জন্য ভগবানের অভিমান আরম্ভ হইয়াছে। তাই ভগবানকে দর্শন দিতে সাধক এখন ব্যগ্র হইয়াছে, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাহার প্রাণে বাজিয়া উঠিয়াছে, আর সেও তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) কৃতার্থ করিতে ছুটিয়াছে; নতুবা তিনি যে অভিমান-ভরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যাইবেন! পাগলিনী তাই তাহার সঙ্গিনী চিন্তামণিকে রাস্তায় একাকী ফেলিয়া **প্রাণ-চিন্তামণির** জন্য ছুটিতেছে—

যাইগো ওই বাজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে।
এক্‌লা এসে কদম তলায়
দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে॥

যত বাঁশরী বাজায়, তত পথপানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে
চ'লে যাবে মান-ভরে।

৪র্থ অঙ্ক, ২য় গ।

পাগলিনীর গানে ও কথাবার্ত্তায় নাটকের অপূর্ব্ব পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মহামায়াই এই রূপ ধরিয়া যে প্রেমিক বিল্বমঙ্গল ও প্রেমিকা চিন্তামণির প্রথম বৈরাগ্যের উন্মেষে তাহাদের প্রাণে সাধনার বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছেন, ঘটনাদৃষ্টে তাহাই মনে হয়। তাহার "সারারাত কি পাগ্‌লা নিয়ে যায়গো মা জাগা, কেমন ক'রে ঘর করি মা, নিয়ে এ ন্যাংটা নাগা" সঙ্গীতটীতে বিস্মিত হইয়া চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিতেছে "মা গো তুই কে ? তুই কি সাক্ষাৎ জগদম্বা ?"

পাগলিনী—হ্যাঁ মা, হ্যাঁ, আমি সেই আবাগী মা, সেই আবাগী, দেখ্‌না মা, সব্ সেই, সব্ সেই। ৩য় অঙ্ক, ২য় গ।

অন্যত্রও পাগলিনী চিন্তামণির প্রশ্নে উত্তর করিতেছে—

আমি তাঁর দাসী, মা দাসী
সে বাঁকা হয়ে বাজায় মোহন বাঁশী, মা, বাঁশী।

৩য় অঙ্ক ৪র্থ গ।

এখন ইনি মধুর রসের সাধিকা বলিয়া আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কি স্ত্রীলোক মাত্রেই ভগবানের অংশ বলিয়া সেই ভাবে আপনাকে জগদম্বা ভাবিতেছেন, কি সাক্ষাৎ ভগবতীই আবির্ভূতা হইয়া সাধকের তাপ, জ্বালা, সংশয় বিদূরিত করিতেছেন, এ বিষয়ে নানা ভাবের তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু চিন্তামণির নিকটে পাগলিনী যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতেই তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়—

ওরে পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে ;
ধরামাঝে উন্মাদিনী ধাই,
তার দেখা নাই, ৩য় অঙ্ক, ৮র্থ গ।

শেষ অঙ্কে বৃন্দাবনে সোমগিরির সহিত কথোপকথনেও প্রকৃত পরিচয় কতক অংশে উদ্ঘাটিত হয়।

পাগলিনী—বাবা চলো যাই, আর কেন বাবা, অনেকদিন ঘর ছেড়ে এসেছি।

সোমগিরি—মা, আর ত কাজ বাকী নেই, চল যে কাজে এসেছি সেরে যাই।

পাগলিনী—বাবা, আর থাক্‌তে পারি নি বাবা, আমার মন কেমন করে; বাবা দেখো দেখি কতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমায় এমন লাঞ্ছনা করে গা, আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে।

৫ম অঙ্ক ১ম গ।

এখন কি কাজের জন্য তাহার **প্রিয়** তাহাকে বনে পাঠাইয়াছেন আর কি কাজ সারিয়া তিনি ঘরে ফিরিবেন এখন সেই কথার আলোচনা করিব।

বিল্বমঙ্গল যখন নদীপার হইয়া চিন্তামণির কাছে যাইবার জন্য নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, পাগলিনী তখন সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নদীতীরস্থ শ্মশানভূমিতে প্রজ্জ্বলিত চিতাপার্শ্বে স্থির—তদ্গতচিত্ত। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতের সেই ভাবরাজ্যের চিদ্ঘনরূপ **চিন্তামণির** জন্য পাগলিনীকে, বাস্তবজগতের রক্ত-মাংসের চিন্তামণির জন্য পাগল বিল্বমঙ্গল যদিচ তখন উপদেবতা-জ্ঞানে অনুরোধ করিয়াছিল—"ওগো আমায় পার ক'রে দাও, চিন্তামণির জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে"—বস্তুতঃ এই অবাস্তব রাজ্যের সাধিকা উন্মাদিনীই কিন্তু অতঃপরে ঐহিকসুখলোভাতুর বিল্বমঙ্গলের মোহান্ধ নয়নে প্রথম অঞ্জন-শলাকা প্রয়োগ করিয়াছিল। যাহার জন্য শবদেহ অবলম্বনে রণমুখী নদী পার হইয়া, রজ্জুভ্রমে সর্প ধরিয়া, সে প্রণয়িনীর গৃহে উপস্থিত হইল, সেই বারাঙ্গণার লাঞ্ছনায় গৃহত্যাগ করিয়া আজ তাহার প্রথম স্মরণ হইল—

কোথায় কে আছ আমার, বল?
সাধ হয় দেখিতে তোমারে;—
আত্মজন দেখিনাই জন্মাবধি!

কোথা যাব ?
কোথা দেখা পাব ?
অন্ধকার-মাঝে হ'য়ে আছি দিশেহারা—
কে দেখাবে আলো ?
খুঁজে লব আমার যে জন ? ২য় অঙ্ক, ৩য় গ।

সেই অন্ধকারে আলোকরশ্মি বিস্তার করিয়া যখনই পাগলিনী তাহাকে বলিয়া দিল "আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে" অর্থাৎ ভয় কি ? তুমি তাকে ডাকো, তিনি আমায় কত যত্ন করেন, আমার বড় আপনার জন, তোমাকেও তিনি যত্ন করবেন "কে বলেরে আপন রতন নাই ?" সঙ্গে সঙ্গে বিল্বমঙ্গলেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল ! তিনি বুঝিলেন "তাইতো, তিনিই আমার আপনার আছেন, আমার কাছে কাছে আছেন, আমি মূর্খ, আমিই অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, নইলে ঘোরতর তরঙ্গ মধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে ? করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে ?" সেই পরমসুন্দরের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা আসিল, গুরুর জন্য তিনি অধীর হইলেন এবং ক্রমে গুরুদেবের কৃপায় তাঁহার মৃতহৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

কিন্তু নাট্যকার ইহার পর আর পাগলিনীর সহিত বিল্বমঙ্গলের সাক্ষাৎ সংঘটন করান নাই। অতঃপর চিন্তামণির বৈরাগ্যের উন্মেষে তাহার সাধনপথে পাগলিনীই প্রথম সহায় হয়। চিন্তামণি যখন ভাবিতেছে— "হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা করবেন ? শুনেছি তিনি প্রেমময়, আমি প্রেমহীনা বেশ্যা।" পাগলিনী যেন তাহার মন বুঝিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল—"মা, তুই ভাবিস্ নি ; তোকে হরি কৃপা ক'রবেন, সে সকলকে কৃপা করে"। তৃতীয় অঙ্ক, ২য় গ। বিল্বমঙ্গলের জন্য অনুশোচনা করিয়া যখন চিন্তামণি তাঁহার নিকট যাইবে স্থির করিয়াছে, অমনি তাহার ভাবনা আসিল—"উঃ একা স্ত্রীলোক, কোথায় যাব ? কোথায় খুঁজব ? পোড়া পেট সঙ্গে আছে।" পাগলিনী তাহার মন বুঝিয়া বলিয়া দিল "ভয় কি ? দ্যাখ মা দ্যাখ—ঐ শেয়ালটা খাচ্চে দ্যাখ, পেট ভ'রে খাচ্চে। আমিও পেট ভ'রে খাই, পাখীগুলোও

পেট ভ'রে খায়। আমি দেখিচি মা দেখিচি—সে দেয়"। ৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গ। পাগলিনীকে ছাড়িয়া যাইবার সময়, যখন চিন্তামণির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, একাকী থাকিবে ভয়ে তাহার সঙ্গ ছাড়িতে কষ্ট হইল, পাগলিনী যেন তাহার মন বুঝিতে পারিয়া আশা ও সান্ত্বনার কথা বলিয়া গেল—"ছাথ্, পাখীটা একলা বেড়াচ্ছে, আর গান কচ্ছে"। ৪র্থ অঙ্ক, ২ গ। কিন্তু এখানেও গুরুদর্শন পর্য্যন্তই। অতঃপর সোমগিরির সহিত তাহাকে বৃন্দাবনে দেখিয়া চিন্তামণি যখন বলিতেছে "দয়াময়ী মা, আমায় ত ভোল নি?" সে বাবাকে দেখাইয়া দিল "ওমা, আমি নই মা, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর; বাবা তোরে ব'লে দেবে।"

৫ম অঙ্ক, ১ গ।

এইরূপ ভিক্ষুককেও সে পথ দেখাইয়া দিল—"বাবাকে ব'লে তুইও আমার সঙ্গে আয় না?"

সাধকের অন্তর্দ্দৃষ্টিতে পাগলিনী সকলের কথাই জানে ও বুঝিতে পারে। তাহার হাতে গহনা দেখিয়া ভিক্ষুকের গহনার লোভ হইলে অমনি সে "ননাচোরা গোপাল" বলিয়া গহনা খুলিয়া দিল। থাক'র চিন্তামণিকে বিষ দেওয়ার ষড়যন্ত্র সে যেন বুঝিতে পারিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে "বিষ! বিষ! বিষ!" আবার চিন্তামণিকে বিষময় সংসার ও কাঞ্চন-সংসর্গ ভগবদ্দর্শনের একান্ত বিরোধী বলিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিতেছে—

থাকি মা, তরুর মূলে,
হাত জুড়িনি কোন কালে,
বলি মা, লক্ষ্মী এলে,
"যাও, বাছা তুমি যাও চ'লে,
তুমি এলে তারে পাবো না কোন কালে।" ৩য় অঙ্ক, ৪ গ।

কৃষ্ণদর্শনের পর আর সংসারে যে শ্রেণীর সাধকের ফিরিবার আবশ্যক হয় না—শাস্ত্রে যাহারা 'জীবকোটি' বলিয়া অভিহিত হন—পাগলিনী সেই শ্রেণীর সাধক। তাই সে আক্ষেপ করিতেছে—"দেখ দেখি, কত ঘোরালে! চল বাবা যাই!" চিন্তমণিকে বলিতেছে—"তোর গলা ধ'রে

খানিক কাঁদি—আর তো মা তোর সঙ্গে দেখা হবেনা, তোর স্বামীর বাড়ীতে দিয়ে চলে আস্‌ব”। সোমগিরিকেও বলিতেছে—“এবার যখন দেখা হবে, বাপবেটীতে হাত ধরাধরি ক’রে চলে যাব! আর কি করতে থাকব!”

৫ম অঙ্ক, ১ গ।

পরমহংসদেব এই যুগে যে নূতন একটি ভাব আমাদিগকে দিয়া প্রলয়ে শান্তি বিধান করিয়াছেন, যে সত্য নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া তিনি জগতে উহা প্রচার করিয়া সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্ম্মবৈষম্য বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও এই নাটকে আলোচিত হইয়াছে। মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, প্রভৃতি সকল ধর্ম্মবলম্বীরই ভিন্ন ভিন্ন মত। হিন্দুধর্ম্মও আবার শাখা প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত, শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র প্রচলিত, প্রত্যেকের মতে অপর মতাবলম্বীর নরক ব্যবস্থা। বহুমত, বহুশাখা, এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়? দ্বাপরে একবার শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট কথাপ্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে” ইত্যাদি অর্থাৎ “হে অর্জ্জুন, যে আমার যেরূপে উপাসনা করে, আমি তাহার মনোরথ সেইরূপ পূর্ণ করিয়া থাকি। পৃথিবীর লোকেরা যদিও নানা মতাবলম্বী, কিন্তু তাহারা, আমারই উপাসনা করিতেছে”। কিন্তু তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই ভাব কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ তাঁহার সময়ে বহুমত, বহুভাব, বহু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিলনা। যে যুগে বহুমত, বহুভাব ও বহু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন ভারত ধর্ম্মের গ্লানিতে একান্ত জর্জ্জরীভূত, শ্রীকৃষ্ণের সেই উক্তি কার্য্যে পরিণত করিবার যখন একান্ত প্রয়োজন, যুগাবতার রামকৃষ্ণ সেই সময়ে নিজ জীবনে বহুসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন—“যত মত, তত পথ”। যিনি কালী, তিনি শিব, তিনিই রাম বটেন, আর যেমন ভাবে হউক, (আল্লা, গড, যীশু, ব্রহ্ম, হরি, কালী) যেমন রূপেই হউক (সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ), এক ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা করে তাহার উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন “যেমন কোন্ পুষ্করিণীর চারিটী ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জলপান

করিতেছে। এতঘাটেও যেমন কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছেনা, অথচ অদ্বিতীয় গঙ্গারও পরিবর্ত্তন হইতেছেনা, সেইরূপ সচ্চিদানন্দকে যাহাই বল, যে ভাবেই ডাক, তিনি সকলেরই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন, এক ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ জ্ঞান করিয়া যে যাহা করিবে তাহাতেই তাহার পরিত্রাণ হইবে। ভগবান্ ভাবের অধীন, তিনি অন্তর্য্যামী, মনের ভাব লইয়া তাঁহার কার্য্য। যাহাদের সঙ্কীর্ণভাব, তাহারাই দল পাকায় কিন্তু যাহারা প্রকৃত সাধন ভজন করে, তাহাদের মতে কোন ভেদ-বুদ্ধি নাই।"

গিরিশ রামকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত এই অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন সত্য একাধিক নাটকে ও ভাবে প্রচার করিয়াছেন। 'কালাপাহাড়ে' চিন্তামণি লেটোকে বলিতেছে—

ছিঃ লেটো, তুই ঠাকুর আর আল্লাতে ভেদাভেদ করিস্?

"এক বিভু বহুনামে ডাকে বহুজনে"

* * * * * *

মূঢ়জনে ভেদজ্ঞানে দ্বন্দ্বে পরস্পরে॥

"বিল্বমঙ্গল" নাটকেও সাধকরূপী পাগলিনীকে বিস্মিত বিল্বমঙ্গল যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে—"হ্যাঁগা, চিন্তামণি তোমার কে? চিন্তামণি যে মেয়ে মানুষের নাম," পাগলিনী চকিত হইয়া উঠিল, "ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে," তুমি ভাই কি ভগ্নী, জনক কি জননী—প্রণয়িনী স্ত্রী, কি পুত্র কন্যে!" পাগলিনী কি পরিচয় দিবে? তাহার যে সবই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত, তাহার হৃদয়ের অপার্থিব ভালবাসায় পুরুষ, প্রকৃতি সব যে একাকার হইয়া গিয়াছে। "চিনিতে নারিনো সোহি পুরুষ কি নারী, রূপ লাগি গেল হৃদয় হামারি।" ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আহা সে অনন্ত-রূপের কি সীমা আছে? গদ্‌গদ্‌ভাবে পাগলিনী দেখিল, দেবী আলুলায়িতকেশা, বরাভয়-করা, ভক্তজন-মনোমোহিনী শ্যামামূর্ত্তিরূপে তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে—

চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী

বরাভয় করা, ভক্ত মনোহরা,
শবোপরে নাচে বামা—

কখনও সেই প্রিয় বংশীধারী গোপীজন-মনোমোহন, রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণরূপে—হৃদয় নন্দিত করিতে লাগিলেন—

কভু ধরে বাঁশী
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।

কখনও সদাশিব মহাদেব রূপে তিনি প্রকাশিত হইলেন—

কভু রজত-ভূধর—
দিগম্বর জটাজুট শিরে
নৃত্যকরে বম্ বম্ বলি গালে।

কখনও হ্লাদিনী আনন্দময়ী রাধামূর্ত্তিতে তাহার প্রাণে অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া পড়িল—

কভু রাস রসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা,
প্রেমে ঢলে, বনমালা গলে,
কাঁদে বামা——
"কোথা বনমালী" ব'লে।

কখনও শিব-শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম-রূপে সাধনার আরও উচ্চস্তরে তাহার প্রাণ একাগ্রীভূত করিয়া দিল—

একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি ;
বিপরীত রতি,
কেহ শব কেহ, বা চঞ্চলা।

তিনিই একাধারে প্রকৃতি ও পুরুষ, ব্রহ্ম ও বিশ্ব-শক্তি। ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ, তাই তিনি শিব বা শব—নিষ্ক্রিয়। আর ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া শক্তিরূপী মাতা প্রকৃতি—জড়, চঞ্চলা বা ক্রিয়। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি—এই গভীর তত্ত্বটী রামকৃষ্ণদেব বড় সামান্য কথায় বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন "ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি ও ইহার শক্তি—উত্তাপ, বর্ণ ও দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবিলেই ইহার গুণত্রয় ভাবিতে হয়।

গুণগুলি স্বতন্ত্র করিলে আর অগ্নি থাকে না। যেমন দুগ্ধ ও ধবলত্ব, মণি ও তাহার আভা। যেমন সূর্য্যের উত্তাপ ছাড়িয়া সূর্য্য ভাবা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি অভেদ। জল যখন স্থির থাকে তখন তাহাকে ব্রহ্ম বা সৎ অথবা পুরুষ বলা যায়, কিন্তু ঢেউ উঠিলে চিৎ, বা প্রকৃতির ভাব আসিয়া থাকে। যখন কোন কার্য্য নাই, সৃষ্টি নাই, তখন তিনি ব্রহ্ম বা অচল, অটল সুমেরুবৎ, কার্য্য থাকিলেই শক্তির খেলা বলিতে হইবে। জড়জগৎ বা সৌরজগৎ সমস্তই ব্রহ্মের শক্তিতে চলিতেছে। বিপরীত রতি—কেননা ব্রহ্ম শক্তিকে দিয়া কার্য্য করিতেছেন না, পরন্তু শক্তিই ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংঘটন করিতেছেন, প্রকৃতিই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিতে প্রকট।

এইরূপ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে করিতে পাগলিনী একেবারে সর্ব্বোচ্চস্তর নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অবস্থায় উঠিয়া পড়িলেন। কি সে আনন্দের অবস্থা—সেই নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা—সেই আত্মায় আত্মায় রমণ—

কভু একাকার,
নাহি আর কালের গমন;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়;
নাহি—নাহি—"ফুরাইল" বাক্—
বর্ত্তমান বিরাজিত।

একেবারে অদ্বৈতজ্ঞান—আমি আমার নাই, তুমি তোমার নাই, দুই নাই, একও নাই, আমি, তিনি সব এক—মন একেবারে সংকল্প-বিকল্প-রহিত—স্থির, সকল বৃত্তির একেবারে লয়, এটা করিব, ওটা ত্যাগ করিব, এরূপ সংকল্প আর আসে না। দিক্ নাই, দেশ নাই, কাল নাই, অবলম্বন নাই, রূপ নাই, আবার নামও নাই! কেবল অশরীরি আত্মা আপনার অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায়, মনোবুদ্ধির গোচরে অবস্থিত যত প্রকার ভাবরাশি আছে, সে সকলের অতীত, এক প্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত।

গিরিশ স্বরচিত "তাও বটে, তাও বটে" নামধেয় প্রবন্ধে এই অবস্থা সম্বন্ধে নিজেই খুব প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গিরিশ লিখিয়াছেন—"একজন শিষ্য ঠাকুরকে সাকার নিরাকার সম্বন্ধ প্রশ্ন করিল। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে ভগবান রামকৃষ্ণ বলিলেন "তাও বটে, তাও বটে, আর যদি কিছু থাকে তাও বটে"। এই কথা শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতার মনে যে কি বিপুল ভাবের বিকাশ পাইল, তাহা আমি অকপটভাবে বলিতেছি আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাঁহার মুখে কথাটী শুনিয়া মনে উদয় হইল ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের গোচর, মনের গোচর ও মনোবুদ্ধির অগোচর, একেবারে তিনটি ভাব ফুটিয়া উঠিল। যেন বিশাল ভবার্ণবে ডুবিয়া গেলাম। একথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ভাবিলাম, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিতে পরিলাম না। সেই বৃহৎ গুরু রামকৃষ্ণ দেবের প্রভাবে উত্তর আপনি হৃদয়ে ফুটিল। বুঝিলাম আমি অতি ক্ষুদ্র, মনোবুদ্ধিতে যাহা উঠে তাহাই বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার আমার শক্তি নাই। সেই স্বরূপ-বুদ্ধির উদয় হইলে মনোবুদ্ধি লোপ হইবে। এই লয়ের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ যে পরমানন্দের কথা তাহার আভাস পাইলাম। পূর্ব্বে শুনা ছিল যে শুষ্ক জ্ঞান-পন্থীরা নির্ব্বাণের অধিকারী হন, কিন্তু এ নির্ব্বাণ একটা স্বতন্ত্র কথা। এ অতি সরস নির্ব্বাণ—রসের সাগরে ডুবিয়া নির্ব্বাণ, মধুর নির্ব্বাণ—ভক্তিস্রোত যে মহাসাগরে ধাইতেছে, সেই মহাসাগর মাঝে নির্ব্বাণ, যেন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই—সে দেশে রজনী নাই, চেতনাচেতন অবস্থায় ভেদাভেদ নাই, বিপুল রাজ্য অনন্ত-রাজ্য, নির্ব্বাণ-রাজ্য······"

গিরিশ ভগবানের নানা ভাব, নানা রূপ ও পুরুষ প্রকৃতির ভেদাভেদ-শূন্য অবস্থার পরিচয় পাগলিনী-চরিত্রে আরও প্রদান করিয়াছেন চিন্তামণি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে 'তোমার স্বামী কে মা ?'

পাগলিনী— আমি মা পাঁচ ভাতারী
এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ
না, মা; আমি এক ভাতারী এয়ো ;
আমার ভাতার সেই মা, সেই !

সে বিনে আর নেই, মা নেই
সে বাঁকা হয়ে বাজায় মোহন বাঁশী, মা, বাঁশী।

৩য় অঙ্ক ৪র্থ গ।

অন্যত্র ও সে কৃষ্ণের কথা বলিতেছে—তোমার মতন তোমার, আমার মতন আমার, এক কৃষ্ণ ষোল শ’।

এই পাগলিনী চরিত্রের কেবল আধ্যাত্মিক পরিস্ফুটিই যে কেবল উল্লেখযোগ্য তাহা নয়। ইহার অভিনবত্ব, আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা এবং ঘটনাপরম্পরায় নাটকীয় পরিপুষ্টি এইরূপ সমভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে যে নাটকখানি পাঠ করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ আনন্দে বলিয়াছিলেন “পঞ্চাশ বার পাঠে পঞ্চাশ রকমের তত্ত্ব পাইয়াছি,” অভিনয়েও আপামর সাধারণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়া আত্মার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেন। দীর্ঘকাল পরেও পাগলিনী চরিত্রের অভিনবত্ব ও চমৎকারিতা লুপ্ত হয় নাই, আজও সেই গান হৃদয়ে সমভাবেই আনন্দ-উৎস প্রবাহিত করিতেছে—এ যে “নিতুই নব”।

সোমগিরি—রামকৃষ্ণদেবের সাধনোন্মাদ অবস্থা যেমন পাগলিনী চরিত্রে পরিস্ফুট, তাঁহার অসাধারণ গুরুভাবও সেইরূপ সোমগিরিতে প্রকটিত। ধীর, শান্ত, কারুণিক গুরুরূপে রামকৃষ্ণদেব যেরূপ গুণ-নির্ব্বিশেষে শিষ্যগণের সংশয় ভঞ্জন করিতেন, সোমগিরি-চরিত্রেও সেই আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে সংরক্ষিত। সোমগিরি সম্বন্ধে ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থে সামান্য মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

“স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম,
তার স্থানে কৃষ্ণনাম লৈলা অভিরাম।
এক ভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন,
করিয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধ প্রেমধন।
আলৌকিক প্রেম ভক্তি পাইয়া হৃদয়,
মদ পানে যেন মত্ত দিবানিশি যায়।”

এই ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে নাট্যকার ইহাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া অভিনব পরিকল্পনায় সজীব ও মূর্ত্ত আদর্শ-গুরুরূপে এই চরিত্রের পরিস্ফুটি

সাধন করিয়াছেন। বৈরাগ্যের অঙ্কুরোদ্গমে আবাসহীন, আচ্ছাদন-হীন, বান্ধবহীন বিল্বমঙ্গল যখন পথে পথে,—পরম কারুণিক সোমগিরি তাহাকে সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করেন। এখানেই তিনি বুঝিতে পারেন "ইনি একজন প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ"। পথিককে অযাচিত করুণা ও লম্পটের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দৃশ্যেই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির ও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার উপদেশেই 'কৃষ্ণ', নাম সাধনা করিয়া বিল্বমঙ্গল ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। কি সহজ দীক্ষা! কোন উপদেশের ছড়াছড়ি নাই, বাগাড়ম্বর নাই, কর্ম্মবাহুল্য নাই। বিল্বমঙ্গল যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব?" —তিনি শিষ্যকে সার কথাটি মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হন্—

"কৃষ্ণকে ডাকুন; তিনিই ব'লে দেবেন কোথায় তাঁর দেখা পাবেন।" বিল্বমঙ্গলের ন্যায় তিনি চিন্তামণিকেও আশ্বাস দিতেছেন—"মা, তোমার যে প্রেম, রাধাবল্লভ তোমায় অবশ্যই কৃপা করবেন।" এমন কি চোর ভিক্ষুকও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই—"এ বৃন্দাবন আনন্দধাম, আনন্দময়ের কৃপায় কেউ নিরানন্দে থাকে না।"

ইহার পর লোকশিক্ষা। তৃতীয় অঙ্কে তাঁহার মুখে যে সকল ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, ইহার প্রতি ছত্রই রামকৃষ্ণ-ভাবে অনুপ্রাণিত, আর যুগে যুগে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব রূপে ইহাতে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু জনের জ্ঞানতৃষা নিবারিত হইবে।

প্রকৃত ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিশ্বাস প্রাণে; লম্পটই হউক, চরিত্রবানই হউক, সেই বৈরাগ্য জন্মিলেই ভগবান তাহাকে কৃপা করেন। কামিনী ও কাঞ্চন অবিদ্যারূপী মায়ার দুইরূপ মাত্র, সংসারে এই অবিদ্যামায়ায় মুগ্ধ হয় না, এরূপ মানুষ বড়ই বিরল। কিন্তু যিনি এই মোহ পাশ কাটাইয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ। ভক্ত-নাট্যকার এই সত্য, নিম্ন কয়ছত্রে সোমগিরির মুখে আরোপ করিয়াছেন—

কামিনী কাঞ্চন—
এক মায়া, দুই রূপে করে আকর্ষণ;
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।

ভ্রমি এ সংসারে, হের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যজি ?
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন,
অবহেলি' কামিনী-কাঞ্চন নিরঞ্জন করে আশা।

লম্পট বিল্বমঙ্গলের প্রতি গুরুদেবের অসাধারণ আকর্ষণ দেখিয়া শিষ্যের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সবিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "প্রভু,

কামিনী-কাঞ্চন করিয়ে বর্জ্জন
লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ফিরিছে—

গুরুদেব বুঝাইয়া দিলেন "বৎস, বাহ্যিক সন্ন্যাসেই ভক্তির বিকাশ হয় না, অনেক সময়েই সন্ন্যাস ভাণ মাত্র—

"বৎস ! জাননা—জাননা,
মায়ার আশ্চর্য্য লীলা।
কেহ কাঞ্চনের তরে,
জটা ধরে শিরে ;
কাহারও বা সাধুর আকার,
নারী সহ করিতে বিহার,—
সন্ন্যাসীর ভাণ,
ভুলাইতে বামাগণে ;
কেহ মান করিতে সঞ্চয়,
দীর্ঘ জটা বয়,
কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশা ;
অহেতুকী ভক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।"

এইরূপে আরও ভূরি ভূরি বিষয়ে সোমগিরি শিষ্যগণের সন্দেহ বিদূরীত করিয়া তাহাদের মানস-কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

পরমহংসদেব যেরূপ কেহ তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া সম্বোধন করিলেই বলিতেন "কে কার গুরু ? এক ঈশ্বরই সকলের গুরু ; টাকা মাকা

আমার ও মামা, তোমারও মামা", গুরুকরণের পরে "গুরু" সম্বোধন শুনিয়া সোমগিরিও বলিতেছেন—

গুরু ? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু, গুরু আর কেউ নাই। তৃতীয় অঙ্ক ৪র্থ গ।

অন্যত্র তিনি শিষ্যগণকে বলিতেছেন—

কেবা গুরু ? কেবা শিষ্য কার ?
শিবরাম গুরুশিষ্য দোঁহে দোঁহাকার
জগদগুরু সেই সনাতন। ৩য় অঙ্ক।

তিনি সমদর্শী। বৈরাগ্যের চেতনমূর্ত্তি—লম্পট বিল্বমঙ্গল ও বারাঙ্গণা চিন্তামণি অহেতুকী ভক্তিবলে কৃষ্ণদর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই তিনি বলিতেছেন—

"সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য বেশ্যা ও লম্পট ভাণ মাত্র।"

কৃষ্ণদর্শন সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা—শুভাদৃষ্টের পরম পরিণতি। সে পদলাভের পরে আর কি মানুষের কোন কামনা থাকে ? সে চরম-সৌন্দর্য্যলাভ যে ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটে, তাহার মনে আর কি কোন লাভালাভের কথা উদিত হয় ? তাই তিনি শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন "বৎস, কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন, আর অন্য ফল নাই"।

যে সরল, মনের ধোঁকা যাহার নাই, তাহার পক্ষে ভগবানলাভ সম্ভব—এই সত্য, ভিক্ষুক-চরিত্রে প্রতিভাত হইতেছে। কি সাধক (কপট সাধু) কি বিল্বমঙ্গল, কি পাগলিনী, কি চিন্তামণি, সকলের সহিতই ইহার ব্যবহার সরল, ঋজু,—কথায় আচরণে কি কার্য্যে কোন কপটতা নাই। পুরাতন চোর হইয়াও সে অকপটভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রথম সাক্ষাতেই বিল্বমঙ্গল যখন জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁরে তুই কখনও পিরীতের টানে পড়েছিস ? ভিক্ষুকের পরিচয় স্বতঃই আসিয়া পড়িল—

"আজ্ঞে, ও সব আমার নাই ; আপনি যে শুনেছেন, হাতটান—সে গেরোর ফেরে হয়েছিল, সেই অবধি নেশাটা ভাঙটা কদাচ কখন করি। পেলুম কল্লুম, নৈলে নয়।"

তারপর—"বাঁধা হুঁকো সরিয়ে পঁচিশ কোড়া" খাওয়া ও একমাস ঘানি টানা, এক মোহান্তের জটার ভিতর থেকে সোণার বাট সরান"

শান্তিপুর থেকে সোণার বাটী সরান সে কোন কথাই অব্যক্ত রাখে নাই। চিন্তামণি যখন সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া গৃহত্যাগ করে, এই সরলতার জন্যই তাহার ও প্রাণে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়ঃ—

একি! বেশ্যা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চল্লো নাকি? আঃ দূর মনা আমি আর কা'র জন্য গাঁট দিই? আমিও পিছু নিলুম। (দূরে চাবি নিক্ষেপ) দেখছি, দু'টী খেতে পাওয়া যায়;—তবে ওই পরওয়ানার কি করি? এখনই বা কি কচ্চি? যা থাকে ধরাতে হবে, সেই ঘুরে ঘুরে বেড়াই—হরিনাম করে বেড়াব। লোভ কি সাম্‌লাতে পার্‌ব? দেখি, মা দুর্গা আছেন। এইত' চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি আর দারোগার হাত থেকে বাঁচব না?

৩য় অ ৪ গঃ।

গিরিশচন্দ্রের পরবর্ত্তী অন্যতম পৌরাণিক নাটক "পাণ্ডব-গৌরবে" ও দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ কঞ্চুকীকে বলিতেছেন—"মিতে, যে আমার সঙ্গে দমবাজী করে, আমি ও তার সঙ্গে দমবাজী করি—আর যে দমবাজী জানে না, আমি তার সত্যি মিতে হই।"

২য় অঙ্ক, ৬ গর্ভাঙ্ক।

ভিক্ষুকের প্রাণেও এই সরলতার জন্যই বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি স্থির করেন—

ছাড়ি যদি দাগাবাজী
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি;

ঠিক এই সময়ে তাহারও গুরুর অভাব বোধ হয়।—

যদি কেউ বাত্‌লে দিত
এমন লোক দেখ্‌লে হত
দাগাবাজীর উপর বাজী
খেলা বড় বিষম ভারি!

গুরুর কাছে আসিয়াও আবার সেই অকপট উক্তি "বাবা, আমি যে চোর, আমার কি উপায় হবে?" এই অকপট সারল্যের জন্যই গুরুর কৃপায় তাহারও কৃষ্ণদর্শন হয়।

সাধক আবার ঠিক ভিক্ষুকের বিপরীত, তাহার সমস্ত কথাই কপটতাপূর্ণ। কাঞ্চনের জন্ত জটাধারণ, রমণী মুগ্ধ করিতে সন্ন্যাসীর ভাণ, মুখে কৃষ্ণ অন্তরে সর্ব্বদা কামনা যে সমস্ত কপটাচারী সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, এই শ্রেণীস্থ ভণ্ডসাধু এই চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই চরিত্রের মূল-কল্পনা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং এই প্রকার কপট সাধু সাজিয়া গিরিশচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন। প্রথম অঙ্কের নিম্নলিখিত কথাগুলি ঠাকুর সব নকল করিয়া বলিতেন—

ভিক্ষুক—কথা কইবেত? না কইবেনা।
সাধক—যোগ্য লোকের সঙ্গে কইবো।
ভি—ধুনী জ্বালাবে?
সা—কখন কখন।
ভি—তোমার ভৈরবী থাক্‌বে?
সা—খুব গোপনে।
ভি—লোককে কি বলুব যে, "টাকাকড়ি নাওনা, যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দিলে" কি বল?
সা—সাম্‌নে একটা হোমকুণ্ড থাক্‌বে, যার যা ইচ্ছা হবে, তারই ভিতর দিয়া যাবে।

সাধকের পরিণাম—থাক'র সহিত ষড়যন্ত্রযোগে চিন্তামণির সিন্দুক ভাঙ্গিবার অপরাধে, পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া ও বিষ ভক্ষণে মৃত্যুও খুব সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মূল সূত্র অবলম্বনেই প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত এই চরিত্রের অভিব্যাক্তি। গিরিশচন্দ্র অনেক সময় স্বয়ং এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া চরিত্রের যথার্থ পরিকল্পনা প্রদর্শন করিতেন।

বিল্বমঙ্গল—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবান ভিন্ন সে কিছু চায় না। খুব রোক রোক্ বৈরাগ্য না হ'লে মানুষের ঈশ্বর-লাভ হয় না।" এই নাটকে সেই তীব্র বৈরাগ্য খুব উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত।

ঠাকুর দর্শনের পূর্ব্বেও গিরিশ চৈতন্যলীলা নাটকে সমাধি ব্যাকুলতা প্রভৃতির আকুতি যেরূপ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত অধিকারী

বলিয়াই উহাতে তিনি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে চৈতন্য-লীলায় যাহা অঙ্কুর, বিল্বমঙ্গলে তাহা মহীরুহ। চৈতন্যের "কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া মূর্চ্ছা, ক্রন্দন ও ব্যাকুলতা বিল্বমঙ্গলের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের বৈরাগ্য, নামসাধনা, ভাবসমাধি ও কৃষ্ণপ্রেমেরই পূর্ব্বাভাস মাত্র। কিন্তু যে শক্তির প্রভাবে অঙ্কুরোদ্গত বৃক্ষক পরে শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত মহীরুহ, তাহা বিল্বমঙ্গলের পাঠক সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া গিরিশ প্রথমেই ঠাকুরকে বলেন—"আমি উপদেশ শুনিবনা, উপদেশ নিজেই অনেক লিখিয়াছি, আমায় কিছু করিয়া দিন।" সেই 'করিয়া দেওয়ার' প্রভাবেই বিল্বমঙ্গল অমূল্য গ্রন্থ।

চিন্তামণিনাম্নী বেশ্যার প্রতি বিল্বমঙ্গলের আসক্তি, পিতৃশ্রাদ্ধদিনে শবধারণে ঝটিকাতাড়িত নদীপার হওয়া, রজ্জুভ্রমে সর্প ধরিয়া লম্ফ দিয়া পড়া প্রভৃতি বিষয় গিরিশচন্দ্রের প্রাণস্পর্শী ভাষায় অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিলেও বহুপূর্ব্বে উহা "ভক্তমাল"গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকেও ভক্তমালে কি পার্থক্য এই স্থানে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু "ভক্তমাল" গ্রন্থে অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পর্য্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ বিশেষ কোন কথা নাই। নিম্নের কয় ছত্রেই তাহার পরিসমাপ্তি—

রাত্রি কৃষ্ণ-লীলা গানে প্রভাত হইল,
... ...
কৃষ্ণ দরশনে মন উৎকণ্ঠ হইল।
হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল।
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয়,
দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান নাই অনুরাগে ধায়।

নাটকে এই সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়াই বিল্বমঙ্গলের অনুরাগ, উৎকণ্ঠা ও তীব্র বৈরাগ্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—তিন থাকতে নয়। সাধন পথের অন্তরায় এই তিনটি যিনি অতিক্রম করিতে সমর্থ, সিদ্ধি তাঁহার করতলগত। চিন্তামণিতে একান্ত আসক্ত বিল্বমঙ্গলেরও ঘৃণা ছিল না, লজ্জা ছিল না,

ভয় ছিল না। সে দড়ি মনে করিয়া সাপ ধরে, কাঠ বলিয়া পচা মড়া ধরে। সর্ব্বস্ব তাহার ঋণের কবলে, সে একবার সে দিকে চায়নি, নিন্দা তার অঙ্গের আভরণ। কিন্তু তাহার এই একনিষ্ঠ আকর্ষণ হেয় বস্তুর দিকে, তুচ্ছ বিষয়ে, ঘৃণিত বেশ্যার প্রতি। তবে আধার যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, যদি প্রকৃত প্রেম জন্মে, যদি ভালবাসার জিনিষ ভাবিতে ভাবিতে জগৎ ভুল হইয়া যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাহার উপর পর্য্যন্ত মায়া থাকে না, সেই প্রেম ক্ষীণাধার পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের দিকে ধাবিত হইলেই পরমাশ্রয় লাভ হওয়া সহজ হয়। সাধকের ভাষায় ইহারই নামান্তর "মোড় ফিরন"। নাটকীয় সৃষ্টি-পুষ্টির মধ্যেও এই গতি-পরিবর্ত্তন বিল্বমঙ্গল চরিত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। তাহার সম্বন্ধে সোমগিরি শিষ্যের নিকট বলিতেছেন—

"যেই জন বেশ্যার কারণ—
শবে দেয় আলিঙ্গন,
কাল সর্প ধরে অনায়াসে,
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই ?

বাস্তবিক ইতিপূর্ব্বে যে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির জন্য নিঃসঙ্কোচে জলে ঝম্পপ্রদান করিয়াছে, যে মেঘগর্জ্জনকে ভয় করে নাই, তরঙ্গের কলকল নাদে ভীত হয় নাই, দেহের মমতা রাখে নাই, নদী কি—সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত ছিল, আজ সে

প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ,
প্রেমময়-আশে
সংসার দলেছে পায়।
অতি তীব্র বৈরাগ্য সঞ্চার,
উন্মত্ত আকার,—
একমনে ডাকে ভগবানে।

কিন্তু লাম্পট্যের মোহেও বিল্বমঙ্গলের পবিত্র প্রেম অননুকরণীয়। বেশ্যার প্রতি ভালবাসায় ও বিন্দুমাত্র স্বার্থ তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই, পিতৃশ্রাদ্ধদিনে বারে বারে নানা অছিলায় ফিরিয়া আসায়ও তাহার

একাগ্রতাই উপলব্ধি হয়। ক্ষুদ্রাধার ঘৃণিত বেশ্যার কাছে তাহার এই প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইবে নয়ত কি? সোমগিরি তাই বলিতেছেন—

স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ মন,
প্রেমের কারণ করেছিল বেশ্যা উপাসনা;
বিফল কামনা—
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান!

তাই যখন দেখিল "সকলই মায়া, যার জন্য জলে ঝাঁপ দিলুম, সেও আমার নয়'—তাহার স্মরণ হইল জগচ্চিন্তামণিকে—"আর কেউ কোথাও কি আমার আছে, একবার দেখ্‌লে হয়"। যখন ভাবিল ঐ মোহিনী নারীও একদিন নশ্বর শবদেহেই পরিণত হইবে, দেখিল সবই ছায়ার সংসার, তাহার প্রাণ চাহিল ঐ অসীমকে—

কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ
মিশে যায় হবে লয়?

এই প্রকারে রূপরসস্পর্শ-সর্ব্বস্ব বিল্বমঙ্গলের ভালবাসা চিদ্‌ঘনরূপ ভগবানের প্রতি পবিত্র প্রেমে রূপান্তরিত হইল, প্রেমিক সাধকে পরিণত হইল—একনিষ্ঠ পার্থিব প্রেমের স্থানে অহেতুক ঈশ্বরীয় প্রেম তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। সোমগিরি তাই বলিতেছেন—

হের,
এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—
কৃষ্ণপদে অর্পিয়াছে প্রাণ
মান অপমান সুখ দুঃখ নাহি জ্ঞান;
কৃষ্ণে চায়, কিবা হেতু
কিছু নাহি জানে;
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার।

সাধন-পথে সময় সময় দুরতিক্রমণীয় বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। একদিন তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নামজপ করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন—

নারী এক সুবেশা সুন্দরী ; আবার মোহ আসিয়া বিল্বমঙ্গলকে অভিভূত করিল—

বাপীকূলে হেরি তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে পূর্ব্ব সংস্কারে,
মুগ্ধ হ'ল পাপ মন।

পরে কিরূপে স্বামীর কাছে রাত্রি-সহবাসের অনুমতি লাভ করিয়াও তাহার কেশ হইতে সুঁচ চাহিয়া লইয়া, বিল্বমঙ্গল তদ্দ্বারা চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করিয়া "উত্তম নয়ন" লাভ করেন, অপূর্ব্ব ভাষা-সম্পদ ও অভিনবত্বে তাহা অপূর্ব্ব হইলেও ভাব ভক্তমাল হইতে গৃহীত বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। কিন্তু তাঁহার তীব্র-বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে রাখাল বালক, বণিকও তাহার পত্নীকে বলিতেছে—

"ওগো তার জন্য গরু চরাতে পাইনি, তারজন্য খেল্‌তে পাইনি, তারজন্য যার বৃন্দাবনে যেতে পাইনি।

... ...

"আচ্ছা, সে দেখতে পায়না, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে! সঙ্গে যাই ; কোথা কাঁটাবনে পড়বে, খেতে পাবে না। আমি না দিলে আর খেতে পাবেনা, কে দেবে বল? কাণা মানুষ ;—আর সে যার খেতেই চায়না ; আমি কত ভুলায়ে খাওয়াই।"

বণিক—তিনি কোথায় আছেন?

রা— ওগো সে যেখানে বন-বাদাড় পায় সেই খানেই যায়।

বণিক—কি করেন?

রা— কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, ওই আর করে কি? কৃষ্ণ যেন তার সাতপুরুষের চাকর!

ব— আর কি করেন?

বা— কখন মুখ রগ্‌ড়ায়, কখন টিপ্ ক'রে মাটীতে পড়ে, কখন চুল ছেঁড়ে!

এইরূপে নদীতটে, কাঁটাবনে, বিজন বনবাদারে বিল্বমঙ্গল "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতেন, মতিভ্রমে রাখালকে বলিতেন—

"হে রাখাল জ্ঞান যদি বল—হৃদয়ের আলো,
কোথা বনমালী কালো।
দাও—এনে দাও—
প্রেম-সুধা তৃপ্ত কর মোর।" ৪র্থ অঙ্ক, ৪ গ।

ডাকিতে ডাকিতে কখনও মূর্চ্ছা যাইতেন, আবার রাখালই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কর্ণমূলে ধ্বনিত করিয়া সেই সমাধি ভঙ্গ করিতেন, কোনদিন বা সন্ধ্যাগমে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেন—

ওইত ফুরাল দিন
দিন গেল—কই দেখা হল ?
এসো এস কোথা গুণনিধি,
মরি যদি দেখাত হবেনা।
দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময়,
প্রাণ করে আকুলি-ব্যাকুলি।

পরে রাখালই তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবে শুনিয়া কিরূপ ব্যগ্র হইয়া উঠেন—

চল চল, যাব বৃন্দাবনে—
প্রেমধামে যাব আমি প্রেমহীন।
প্রেমধামে যথা যমুনা-পুলিনে
মাধব বাজায় বাঁশী ;
ধেনুগণে নাচে কুতূহলে ;
বনহারে সাজায় রাখাল—শ্রীগোপাল
চল—চল দেখি গিয়া।
রজে লুটাইয়ে, রজ মাখি কায়
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলি ডাকি উভরায়
প্রেমধারে ভেসে যায় কায় ;
প্রেমের পুলক কম্প ঘন ঘন ;
উন্মাদ নর্ত্তন,
কভু হাঁসি—কভু কাঁদি।
চল বৃন্দাবনে প্রাণকৃষ্ণ মোর।

পরে কিরূপে কৃষ্ণদর্শন না পাইয়া অনাহারে আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, আবার রাখাল বালকই রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, সমস্ত বিষয় নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক অপূর্ব্ব বর্ণনা-মাধুর্য্যে ভক্তের প্রাণে সর্ব্বদাই অমৃত বর্ষণ করিবে।

বিল্বমঙ্গলের জীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন শ্রেষ্ঠকলারূপে গিরিশচন্দ্রের নাটকে যাহা সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত, যে রূপান্তরসাধনে রক্ত-মাংস-দেহের চিন্তামণি অতঃপরে বিল্বমঙ্গলের নিকট সাধন-নায়িকা, সহজ সাধনার গুরু, অতঃপর বঙ্গকবিগণের মধ্যে এক চণ্ডীদাস-ভক্ত চিত্তরঞ্জন ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার কাব্যে উহার স্ফূরণ করিতে পারেন নাই।

বিল্বমঙ্গলের ন্যায় ঐরূপ প্রেমিক না হইলেও 'চিন্তামণিরও' পরে বিল্ব-মঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণদর্শন লাভ করিবার কথা "ভক্তমালে" আছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রই পাগলিনী, ভিক্ষুক, সাধক ও থাকমণির চরিত্রসংযোগে চিন্তামণির চরিত্রের অপূর্ব্ব পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। পাগলিনীর সঙ্গলাভে তাহার সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা আসে এবং থাক' ও সাধক কর্ত্তৃক বিষ-প্রয়োগের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারে, "পোড়া মন একবার ছাখ অর্থ কত আপনার"। তাহারও বাসনা বিলুপ্ত হয়, কাঞ্চনের সম্বন্ধেও তাহার সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মে—"অর্থের জন্য যারা আমায় বিষ দিতে চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ দিয়ে এসেছি। তারা এখন জানেনা—কি বিষ তাদের দিয়ে এলুম।"—ভগবদ্দর্শনে ব্যাকুলতা আসে এবং গুরুলাভ করিয়া তিনিও ভগবানের দর্শন লাভ করেন। উপরি উক্ত নূতন চারিটী চরিত্রের সৃষ্টি না হইলে চিন্তামণির চরিত্র এরূপভাবে বিকাশ লাভ করিত না।

পরমহংসদেব বলিতেন "সংস্কার সহজে যায় না, রসুনের বাটী ধুলেও গন্ধ থাকে।" বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্ব-সংস্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ভিক্ষুক ও এই সংস্কারে চুরির কথা ভুলিতে পারে নাই—"চুরিটুরি কত্তে না পাল্লে তার রাত্রে নিদ্রাই হত না।" চিন্তামণিকেও সেই সংস্কার যে অল্প তাড়না করে নাই, তাহার আত্মগ্লানিতে প্রকাশ হইতেছে—

ধন্য, ধন্য পূর্ব্ব সংস্কার!
এ বিকার কত দিনে হবে দূর?

বসি, তরুতলে,
মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর—
যথা দেহপণে কিনিয়াছি ধন,
জিহ্বা চাহে সুস্বাদু আহার—
শত্রু যাহে গরল মিশায় ;
ঘৃণা করে মলিন বসন—
চাহে আভরণ—
সাজিবারে ছলের প্রতিমা—
ভাবি তাই,
কতদিনে সংস্কার হবে দূর।

৪র্থ অঙ্ক, ২ গ।

চিন্তামণির তিরস্কারেই বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে প্রথম বৈরাগ্যসঞ্চার হয়—"এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'তো।" এ বাণী সহজ-উচ্চারিত মন-ভোলান থাক'র কথা নয়—"কেউ নেই, কেউ নেই, ক'রনা, হরি আছেন ভাবৃছ কেন"—

তৃতীয় অঙ্ক ২ গ।

তাহারও প্রাণ যে তখন বিল্বমঙ্গলের অসাধারণ প্রেমে আর্দ্র হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিল্বমঙ্গলের গৃহত্যাগের পরেই তিনিও বলিতেছেন "একি বিবাগী হ'ল নাকি? বোধ হয়। তা হ'লে আমারও কেউ আপনার নাই। দেখ্তে হ'লো।" যে মহাবাণীতে বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে প্রেমের উৎস প্রবাহিত হয়, যাহাকে ভালবাসিয়া বিল্বমঙ্গল ভগবানকে ভালবাসিতে শিখেন, ভগবদ্দর্শনের পূর্ব্বে বিল্বমঙ্গল তাহাকে দেখিবা-মাত্রই যে গুরু, বিশ্ববিমোহিনী, প্রেমশিক্ষাদাত্রী বলিয়া সম্বোধন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? স্ত্রী-গত-প্রাণ তুলসীদাসেরও পত্নীর তিরস্কারে এইরূপ প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। পিত্রালয়ে পহুঁছিয়াই অনাহুত স্বামীকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমুপস্থিত দেখিয়া তিনি স্বামীকে ক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়াছিলেন—

লাজ ন লাগ্তু আপ্‌কো ধোরে আয়েহু সাথ
ধিক্ ধিক্ অয়সে প্রেমকো কহা কহোঁ মৈ নাথ

অস্থি-চর্ম্ম-ময় দেহমম, তামো জৈসী প্রীতি
তৈসী জৌ শ্রীরাম মহ-হোত নও ভবভীতি

অতঃপর তুলসীদাস—

সর্ব্বত্যাগ করি রামচন্দ্রের চরণ
আশ্রয় করিয়া কৈল একান্ত শরণ॥

এতদ্ব্যতীত বিল্বমঙ্গল নাটকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—সমস্ত রসেরই পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। রাখালরূপী কৃষ্ণের প্রতি বণিক ও তাহার পত্নীর প্রেম বাৎসল্যের আশ্চর্য্য নিদর্শন।

রূপ সনাতন

বিল্বমঙ্গলের ন্যায় এই নাটকের মূল আখ্যানও ভক্তমাল হইতে গৃহীত। যে সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া বিল্বমঙ্গলের চরিত্রের অপূর্ব্ব পরিপুষ্টি সাধিত, এই নাটকে তাহার অভাব হইলেও বিল্বমঙ্গল অপেক্ষাও এখানে সনাতনের তীব্র বৈরাগ্য অধিকতর প্রকটিত।

সনাতন গৌড় প্রদেশস্থ নবাব হোসেন সার প্রধান উজীর, সাকর মল্লিক নামে প্রসিদ্ধ। তাহার প্রতি নবাবের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। ইতিপূর্ব্বে তাহার ভ্রাতা রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, নবাব তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত। সনাতনেরও সেই ভাব দেখিয়া তিনি আরও চিন্তিত হইয়াছেন। ভক্তমালে উল্লেখ আছে—

শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন,
বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন।
রাজকর্ম্মে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি,
শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি॥

গিরিশচন্দ্র প্রথম দৃশ্যেই সনাতনের এই তীব্র বৈরাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাজ-কার্য্য ভুলিয়া, সংসারে উদাসীন হইয়া, সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া সনাতন ভাগীরথী তীরে লুণ্ঠিত-চরণে একমনে গৌরাঙ্গকে

ডাকিতেছেন—"কে আমায় ডাক্‌ছে? কে আমায় টান্‌ছে? আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি না কেন? কে আমায় ডাক্‌ছে? প্রভু, প্রভু অধম ভৃত্যকে কি এতদিনে স্মরণ করেছেন? ঐ ডাকে, ঐ ডাকে! কে আমায় ডাক্‌ছে?.........মা আমায় হরিপাদপদ্মে মতি দাও—আমায় বৈরাগ্য দাও। মা! তোমার তটের রেণু অঙ্গে মাখ্‌ছি, আশীর্ব্বাদ কর, বৃন্দাবনের রজে যেন এইরূপ লুণ্ঠিত হই।" দ্বিতীয় দৃশ্যেও প্রভুভক্ত ঈশান সনাতন-পত্নী অলকাকে বলিতেছে—"গঙ্গার তীরে ধূলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি, আর "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" ব'লে চীৎকার! একেবারে উন্মত্ত!!"

সনাতন সংসারের মায়া ও বিষয়াসক্তি বর্জ্জন করিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। নবাব অনেক চেষ্টার পরে তাহাকে সম্মুখে আনাইয়া নানারূপ প্রলোভন বাক্যে আবার রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। ভক্তমাল ও অন্যান্য গ্রন্থ এখানে সামান্য ভাবে উল্লেখ করিতেছেন—"তোমার মনের কথা বল, তোমার এক ভাই ফকিরী গ্রহণ করিয়াছে, তুমিও কি সেই পথ অবলম্বন করিবে?"

সনাতনের তখন বিষয়-বাসনা লুপ্ত হইয়াছে—

তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম,
আমা হ'তে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম।

ভক্তমাল।

ক্রুদ্ধ নবাব সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। গিরিশচন্দ্র এইস্থানে সনাতনের মানসিক অবস্থার সম্যক্ পরিচয় দিতে যে সমস্ত দার্শনিক নীতি ও ধর্ম্মের তত্ত্ব সংযোজনা করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ ভক্তমাল অথবা চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে নাই। নবাব বলিলেন "মল্লিক, তুমি উজীরী গ্রহণ কর, তোমার শত্রু বুদ্ধিমন্তের আমি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছি"। সনাতন কি উত্তর দিবেন? গৌরাঙ্গপ্রেমে যে তাঁহার মন একেবারে উন্মত্ত, দেহ ক্ষণভঙ্গুর, দুষ্ট রিপু সর্ব্বদা প্রবল, বিবেক-বৈরাগ্য এখনও দূরে, এইরূপ নানা দুশ্চিন্তা তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল—

তিনি বলিলেন "জাহাঁপনা! আমার শত্রু আমার দেহে।"

ষড় রিপু সতত প্রবল
সদা করে বল—
অন্তর চঞ্চল দারুণ পীড়নে যার
ইন্দ্রিয়-লালসা
হৃদিমাঝে করিয়াছে বাসা,
দুরাশায় নিয়ত নাচায়।
ধরিয়াছি মানব-জীবন—
পশুসম নিয়ত ভ্রমণ!
নিদ্রা, ভয়, আহার, মৈথুন
এই মাত্র ক্রিয়া মম,
পরমায়ু গত ক্ষণে ক্ষণ,
পাছে পাছে ফিরিছে শমন,
ভ্রান্ত মন ভ্রমেও না ভাবে তাহা।
সুখ-চিন্তা নূতন কল্পনা,
সাগর-তরঙ্গ সম উঠিছে বাসনা,
যেন কভু যেতে নাহি হবে,
ভঙ্গুর এ দেহ যেন চিরদিন রবে। ২য় অঙ্ক, ২ গ।

নবাব বলিলেন—"তোমার কোন কথা শুনিব না, তুমি কাজে মন দাও, উড়িষ্যার কাগজপত্র দেখ, হাম্ জান্‌তা হুঁয়া লড়াই হোগা।"

কিন্তু সনাতনের যে সংসারে আসক্তি একেবারে লুপ্ত, বিষয়-কর্ম্ম যে তাঁহার কাছে জঞ্জাল, তাই তিনি বলিতেছেন—

অপার সাগর-মাঝে ভাসে যেই জন,
কর্ম্মক্ষম সে কেমনে হবে?
যোগ্যজনে দেহ ভার।
দিবানিশি বাতুলের প্রায়
ফিরিতেছি প্রাণশূন্য কায়;
মতি ধায় গৌরাঙ্গের পদে!
জীবন্মৃত হইয়াছি গৌরাঙ্গ-বিহনে।

নবাব কিছুতেই ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন, সনাতন আবার কাতর বাক্যে বলিলেন "আপনি আমাকে পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিয়াছেন। আপনার কৃপায় আমি এরূপ সম্মান, পদ, অর্থ লাভ করিয়াছি। কিন্তু—হায়!

"ভব-ভয়ে ব্যাকুল হৃদয়
আসিতেছে চরম সময়—
সে দুর্দ্দিনে কে দেবে আশ্রয় দীনে?
দিন গেল—ঐহিক ফুরাল
ভ্রমে সাথে কৃতান্তের চর।

ধন মান কিছুই তো সঙ্গে যাইবে না। তাই—

অগতির গতি গৌরাঙ্গের পদে
স্মরণ লইতে সাধ।"

এই নূতন ঘটনার সংযোজনায় সনাতনের সংসার-বিতৃষ্ণা, ব্যাকুলতা ও গৌরাঙ্গ-ভক্তি বৈষ্ণবগ্রন্থাপেক্ষাও উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নূতন ঘটনা—কারাগারে বালকবেশিনী পত্নী অলকার সহিত সনাতনের শাস্ত্রের বিচার। বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই। এই তর্কে সংসার ও সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে গিরিশের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্য-লীলায় একবার গিরিশ গঙ্গাদাসের মুখে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন—"চৈতন্য, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কর, বল, সংসারাশ্রম অপেক্ষা কোন ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ"। কিন্তু "রূপসনাতনে" এই বিচারের সমাধান হইয়াছে। এই বিষয়ে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশও উল্লেখযোগ্য—তিনি বলিতেন "সংসার কেন ছাড়্‌বে? পুত্র পরিবার তোমার কে খাওয়াবে? এতে ধর্ম্ম,অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পাওয়া যায়"। কারারক্ষক রামদিন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কোন আশ্রম ভাল বলেন'? অলকা উত্তর করিলেন "সংসার আশ্রমের তুল্য আর আশ্রম নাই, এতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পাওয়া যায়"।

রামদিন—ঐ ঠিক্। যে ফকির, সে ত পেটের জ্বালায় ঘুর্‌বে—সে দয়াধর্ম্ম কখন্ কর্‌বে?

গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক ত্যাগনিষ্ঠ কর্ম্মী স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির মঙ্গলের জন্য সেই সন্ধিক্ষণে বৃত্তিবর্জ্জন শ্লাঘনীয় হইলেও,—চিরকাল গৃহীর পক্ষে উহা সম্ভব নয়। বৎসরেক পরে দেখা গিয়াছিল, অপর উপায়ে সংসার রক্ষা করিতে এত সময় অতিবাহিত হয় যে, যে কার্য্যের জন্য ব্যবসায় বর্জ্জন, সেই মূল কার্য্যে সময়ের বড়ই অভাব হইয়া পড়ে।

অলকা স্বামীর সহিত বিচার করিতেছেন—

আশ্রিত পালন, কর্ত্তব্য সাধন,
পরিহরি কি কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ ?
সংসার আশ্রম
আশ্রমের সার জেন স্থির ;
দয়া নাহি যার, ধর্ম্ম কোথা তার ?
আশ্রিত স্বজনে ত্যজে মূঢ় জনে।

গৃহে তব আছে প্রণয়িনী
কেন তারে কর অনাথিনী ?
কোন্ শাস্ত্রে নিষ্ঠুরতা দেয় উপদেশ ?
যদি তব এত ছিল মনে—
কি কারণে
উদ্বাহ বন্ধনে বাঁধিয়াছ অবলায় ?

অনাথায় অকূলে কে দেবে কূল!
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করিয়া বর্জ্জন
এ তোমার কি মনোবিকার ?
আশ্রিতে না ত্যজে সাধুজন।

সনাতনের সবই যে গৌরাঙ্গময়, তাহার আবার অন্য ভার কি ? প্রভু-সেবা ভিন্ন তাহার যে অন্য কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু অলকা আবার বলিলেন—তোমার এই ভীরুতা কেন ? তুমি এই নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ কর। শাস্ত্রের বচন শুন—

কর্ম্ম ফল করিয়া বর্জ্জন
নির্লিপ্ত সংসারে রবে রত,
সতত আশ্রিত জনে করিবে পালন,
পত্নী যদি হয় তব মন্দপথগামী
তার পাপে তুমি অংশী হবে,
ধর্ম্ম কোথা রবে ?
পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্র ছিলেন ভূপাল ;
যদুপতি নির্লিপ্ত সংসারী ;
আছিলেন জনক রাজন—
ছিল তাঁর নারী পরিজন ;
তবে কি সে সংসার ঘৃণিত ?
সংসারে সকলে যদি হবে হে সন্ন্যাসী,
সৃষ্টি তবে রবে কি প্রকার ?
মানব-জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আচার,
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় জন নরকুলগ্লানি ।
আনন্দ বাজার এই হের ত্রিভুবন—
পুরুষ প্রকৃতি সনে লীলায় মগন !

২য় অঙ্ক, ৪ গ ।

কিন্তু নির্লিপ্ত সংসার আনন্দবাজার হইলেও, গৃহ স্বর্গে পরিণত করা অসম্ভব না হইলেও, তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভব-বন্ধনই ছিন্ন হয়। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যখন ঝড় উঠে, তেঁতুল গাছ, আঁব গাছ এক হ'য়ে যায়। এই তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায়ই সনাতন সংসার ও বিষয়-বাসনা (কামিনী ও কাঞ্চন) এইরূপ দাবানলের ন্যায় পরিত্যাগ করেন।

যখন আসবে তুফান ভাসিয়ে নে যাবে
সে অকূল পাথার নাইক সাঁতার,
কূল-কিনারা কে পাবে ?

১ম অঙ্ক, ৩ গ ।

কিন্তু ঈশ্বর-কৃপা ভিন্ন এইরূপ বৈরাগ্য-সঞ্চার অসম্ভব ।

সনাতন তাই বলিতেছেন—

গৌরাঙ্গ-রাজীবপদে আশ্রিত যে জন—
ভবের বন্ধন ঘুচে তার ;
সে চরণ স্মরণ বিহনে
কার সাধ্য বৈষ্ণবী মায়া করে ভেদ ?

* * * *

ঈশ্বর কৃপায় হয়, বৈরাগ্য-সঞ্চার ;
নহে মোহডোর ছিঁড়িতে কে পারে ?

অলকা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, পরাভূত হইয়া কারগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

জাতীয়তাও ধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। স্বদেশমাতার সেবার জন্যও সনাতনের ন্যায় যাহাদের তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, স্বদেশের লাঞ্ছনা দাবানলের ন্যায় যাহাদিগকে পীড়ন করে, তাহাদের ত্যাগ-বৈরাগ্য আর পূর্ব্বোক্ত বিষয়-বাসনা-তাপিত সাধারণ ব্যক্তির বৃত্তি-বর্জ্জনে অনেক পার্থক্য। এই তীব্র বৈরাগ্যের প্রভাবেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় সংসার, অর্থ, মান, অপমান, নিন্দা, পুরস্কার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া দেশের মুক্তির জন্য ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়াছিলেন।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সনাতনের কারামুক্তি সম্বন্ধে ভক্তমালে উল্লেখ আছে—নবাবের অনুপস্থিতে সনাতন প্রধান কারারক্ষকের হস্তে সাত হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া মুক্তি ভিক্ষা করেন—

পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥ চৈতন্য-চরিতামৃত।

আর বলিয়া দেন যে রাজা তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে—

রাজারে কহিবে তেঁই জলে প্রবেশিল
গঙ্গাতে লইয়া গেনু স্নান করাইতে।
ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল বিবেকেতে॥

মুদ্রা পাইয়া যবন কারাধ্যক্ষ সনাতনকে—

থালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা
ঈশান নামেতে ভৃত্য সহিত চলিলা॥ ভক্তমাল।

বৈষ্ণবের এবম্বিধ কৌশল গিরিশচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। ভক্তের পরিকল্পনায় এই ঘটনা নাটকে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে—

কারাগারেও সনাতনের পূর্ব্বের ন্যায়ই আনন্দ; কিন্তু দুঃখ কেবল যে নন্দরাণী প্রভুকে ক্ষীর-সর নবনী দিতেন, তিনি শুষ্ক চণক কেমন করিয়া নিবেদন করিবেন? তবে আশা এই, ভক্তাধীন প্রভু বিদুরের ক্ষুদও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আনন্দ দেখিয়া কারারক্ষক নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কাকে ডাকেন, কার সঙ্গে কথা কন্, আপনার এই অন্ধকার কারাগারে যে আনন্দ, নবাবেরও আমি কখনো তেমন আনন্দ দেখিনি।" সনাতন উত্তর করিলেন, প্রভু তাহার সঙ্গেই আছেন, তাহার পক্ষে গৃহ, কারাগার সব সমান।

নসীর—আমি মুসলমান আপনাকে জিঞ্জির বেঁধে রেখেছি, আমি কি আপনার প্রভুর কাছে নিস্তার পাব?

সনাতন তাহার প্রভুর কথা গদ্‌গদ চিত্তে বলিতে লাগিলেন—

ওরে, বড় দয়াল ঠাকুর;
যেই নাম লয়, ধন্য সেই জন,
হোক্ দীন হীন ম্লেচ্ছ যবন,
নাহিক বিচার, নাহিক আচার,
গোরার হৃদয় প্রেম পারাবার,
যেই প্রেম চায় তাহারে বিলায়। ৩য় অঙ্ক, ৩ গ।

নসীরের বৈরাগ্য আসিল, 'গৌরাঙ্গ' 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। অতঃপর প্রধান কারাধ্যক্ষ রামদিন সনাতন-পত্নী অলকা-সহ কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া সনাতন উজীরি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেই তাহাকে মুক্তিদান করিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখান। সনাতন গৌরাঙ্গ-ধ্যানে নিমগ্ন, তাঁহাকে বিরক্ত করিতে তিনি নিষেধ করেন, তদুত্তরে রামদিন বলিলেন যে তিনি একবার লিখিয়া দিলেই মুক্তি প্রদান করিবেন।

কিন্তু সনাতন মিথ্যাচরণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। রামদিন সনাতনকে বিনাসর্ত্তে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেও সনাতন নবাবের বিনানুমতিতে মুক্তিলাভ গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। নবাবের হস্তে তাহার প্রাণসংশয়, শুনিয়াও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সুমেরুবৎ অটল, অচল সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত রহিলেন। তিনি নির্ভীক ভাবে উত্তর করিলেন—

নাহি জান বৈষ্ণবের রীতি ;
হয় হোক জীবন সংশয়
ছিল দেহ, গেল,—
তাহে ক্ষোভ বৈষ্ণব না করে,
বৈষ্ণবের সমনের নাহি ভয়—
ডরে মিথ্যা প্রবঞ্চনা। তৃতীয় অঙ্ক, ৩ গ।

অতঃপর কারাধ্যক্ষ রামদিন ভৃত্য ঈশানের সহযোগে সনাতনকে বলপ্রয়োগে কারাগারের বাহির করিয়া দেন। এই নূতন ঘটনা সংযোগে সনাতন-চরিত্র আরও প্রকৃষ্টভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মের অগ্রদূত নাট্যকার সনাতনের কারাভোগ সম্বন্ধে যেরূপ আনন্দের, ধৈর্য্যের ও তিতিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছেন, অনেক দেশভক্ত বীরও বর্ত্তমান যুগে সেই ভাবেই কারাগৃহে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম-গুরু সনাতন দেশভক্তগণেরও আদর্শ হওয়া উচিত।

ঈশানের সহিত দস্যুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ, দস্যুকে মোহর প্রদান, সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ, সমস্তই অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

চৈতন্যের ইঙ্গিতে ভোট কম্বলের পরিবর্ত্তে কন্থা গ্রহণ করায় "চৈতন্য চরিতামৃতের" ভাব—

সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ।

গিরিশচন্দ্র আরও বৈরাগ্যের রসে ফুটাইয়াছেন। বৈষ্ণবের পরিবর্ত্তে নসীরের ছেঁড়া কাঁথা খানি তিনি চাহিয়া আনিলেন, কেননা নসীর গৌর-ভক্ত, তাঁহার অপেক্ষা শুচি কে?

"চৈতন্য-চরিতামৃতে" দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাতড়া পর্ব্বতে হাত গণনায় সুদক্ষ দস্যু ঈশানের সহিত মোহর আছে জানিয়া সনাতনকে বলে "ইহার ঠাঁঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়"। গিরিশচন্দ্র ভক্তমালের 'পঞ্চদশখানি' ব্যবহার করিয়াছেন। এ পার্থক্য অতি সামান্য, কিন্তু এখানে নাট্যকারের পরিকল্পনায় বিশেষত্ব আছে। সনাতন ঈশানের সংস্রবে বড়ই অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে বলিতেছেন—

ঈশান, আমার পায়ে যেন কে শৃঙ্খল দিয়ে টান্‌ছে, আমি চল্‌তে পারছিনি, আমি মহাপ্রভুর দর্শনে যাত্রা করেছি, আমার এ ভাব কেন? ঈশান, তুমি কাছে এলে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়; তোমার কাঁথার পানে চাইতে আমার ভয় করে; বোধহয় এ কাঁথাখানা অতি অপবিত্র!

ঈশান—প্রভু, এ ছেঁড়া নামাবলীতে তয়েরী করেছি।

সনাতন—তবে কি, আমি ত কিছু বুঝতে পারছিনি। তোমার মনে কি কিছু বিষয়-কামনা আছে? ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গ।

ঈশান কিছুতেই স্বীকার করে না; কিন্তু দস্যু সম্মুখে দেখিয়া কাঁথায় যে পনের খানা মোহর শেলাই করিয়া আনিয়াছেন, সেকথা সনাতনকে বলিলেন। এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন কেন চলিতে পারিতেছিলেন না। অতঃপর দস্যুকে সব কয়খানি মোহর দিয়া দস্যুর নিকট একখানি চাহিয়া লইয়া ঈশানকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বিষয়-ত্যাগী মহাপুরুষ কাঞ্চনের সংস্পর্শে তথাকার বাতাস পর্য্যন্ত অপবিত্র মনে করেন।

অতঃপর চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রভু যখন তাহাকে বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করেন, সনাতনের উত্তর "আমি গোলক চাইনি, বৃন্দাবন চাইনি, আপনার চরণযুগল চাই," গিরিশেরই পরিকল্পনা।

সনাতনের মদনমোহন লাভের উল্লেখ আছে। কিন্তু চৌবের স্ত্রীর বাৎসল্য ও চৌবের ছেলের সখ্যরসও গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব কল্পনা।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয় পরিত্যাগ করিয়া রূপের স্ত্রী করুণার কায়মনঃপ্রাণে গৌরাঙ্গ-ধ্যানে গোপীপ্রেমের কতক আভাস পাওয়া যায়। করুণার

স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন, স্বামীর আদেশে তিনি গৌরাঙ্গের সেবা করেন, দেবালয়ে মূর্ত্তি সাজান, গৌরাঙ্গ-প্রেমে তিনি একেবারে তদ্গতচিত্ত। সনাতন-পত্নী অলকার সহিত তাঁহার কথোপকথনে সখী-প্রেমের কতক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অলকা—আচ্ছা, তুমি কি পাগল হয়েছ?

করুণা—পাগল হইনি, দিদি, পাগল করেছে।

অ—তুমি রাতদু'পুরে পান খেয়ে গহনা গাঁটি প'রে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যাবে, লোকে টের পেলে যে মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে না।

ক—তুমি লোকের কথা শুন্‌তে বল, না স্বামীর কথা শুন্‌তে বল? আমার স্বামী আমাকে নূতন স্বামী দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

অলকা—তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর, আমি কর্ত্তাকে ব'লে আজই বাপের বাড়ী চ'লে যাব।

ক—দিদি, রাগ করোনা, তোমায় বল্লেই কি তুমি বুঝ্‌তে পারবে? তুমি মনে স্থির বিশ্বাস রেখো, আমি এক বই দুই জানি না।

অ—তবে তুমি যাও কোথা?

ক—তাঁর কাছে।

অ—শুনেছি তোমার স্বামী ত বৃন্দাবনে।

ক—আমার স্বামী সর্ব্বত্রে, আমি চল্লেম্, আর থাক্‌তে পারিনে।

তারপর ঈশান অলকাকে বলিতেছে "মেজমা, ছোটমা আর কতক্‌-গুলো মেয়ে গান গাইতে গাইতে একদিকে চলে যাচ্ছেন, উনিও (সনাতন) তাদের পেছু পেছু চল্লেন।" পরের দৃশ্যে সনাতন মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছেন "দেবাঙ্গনারা মিলে ক'নে সাজিয়ে গৌরাঙ্গের বিবাহ দিচ্ছেন"।

গৌরাঙ্গ-কল্পনায় সংসার, ব্রজের অদ্ভুত প্রেম গিরিশ এইভাবে "রূপ-সনাতনে" করুণা ও বিশাখা প্রভৃতির চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

"পূর্ণচন্দ্র"

"পূর্ণচন্দ্রে"ও রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব প্রভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত, ঈশ্বর সর্ব্বদা মঙ্গলময়, তাদের মনে থাকে, হাজার বিপদের মধ্যে পড়্‌লেও হতাশ হয় না।" তরুণ যুবক পূর্ণচন্দ্র জীবনে এই সত্য সারজ্ঞান করিয়া সংসার-রূপ দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবানের অপার করুণা, তাঁহার কৃপায় শিশুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই 'মাতৃ-পয়োধরে দুগ্ধ', আর তাঁহারই কৃপায় মায়ের হৃদয়ে অসীম স্নেহ। অশান্ত শিশুকে মাতা যেরূপ তাহার মঙ্গলের জন্যই তাড়না করেন, ঈশ্বরও আমাদিগকে শিক্ষার জন্যই দুঃখ দিয়া থাকেন। কিন্তু—

সুখের ছলনে মুগ্ধ ভুলে তাহা নর,
অহঙ্কার অন্ধকার ঘোরে।
হায়! দেখিতে না পায়,
সৌভাগ্য উদয় তার বিষ্ণুর কৃপায়;
ভাবে মনে—নিজ গুণে সুখের ভাজন।

তাই দ্বাদশ বৎসর নিভৃতে সযত্নে শিক্ষাদান করিয়া সালিবান-মহিষী ইচ্ছা পুত্রকে সংসার-প্রবেশের প্রারম্ভে সারমর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছেন—

ঈশ্বর প্রত্যয়
একমাত্র আশ্রয় সংসারে;
সে প্রত্যয় জীবনের ধ্রুব-তারা যা'র,
কূল পায় এ দুস্তরে লক্ষ্য রাখি তায়;
কিন্তু— নানা তরঙ্গের খেলা
উঠায় নাবায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়,
কভু সে সাগর ধরে সুন্দর প্রকৃতি,
বিমোহিত-মতি ধ্রুব তারা যায় ভুলে,
সংশয়-সাগর-চর আসি সংগোপনে
আঁখি করে আচ্ছাদন,
পথহারা, ডুবে তরী ঘূর্ণমান জলে। ১ম অঙ্ক, ১ গ।

এইরূপ সংশয়-রহিত-চিত্ত পুরুষ কেবল বিপৎপাতেই ধৈর্য্যরক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, বিষয়-বাসনা পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, রমণীর অব্যর্থ সন্ধানও ব্যর্থ করিতে তিনি সম্পূর্ণ শক্তিমান্। পূর্ণচন্দ্রের চরিত্রে এই ঈশ্বর-প্রত্যয়ের জাজ্বল্য নিদর্শন প্রতিফলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত সন্ন্যাসীর আদর্শ সম্বন্ধেও নাটকে গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পনা প্রকটিত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রত্যয়ী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, গুরু-ভক্ত, অকলঙ্ক পূর্ণশশী—পূর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে গোরক্ষনাথ শিষ্যগণকে বলিতেন—বৎস, সন্ন্যাসাশ্রম বড় সহজ নয়, শ্রেষ্ঠ যোগীই কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, আর বসুমতীও তাহাকে ধারণ করিয়া পবিত্র হন। সেরূপ লোকের লক্ষণ শোন—

যাঁর অঙ্গে নাহি বিঁধে অঙ্গনা-নয়ন,
কাঞ্চনে না টলে যার মন ;
সুযোগে আসক্তি যারে টলাইতে নারে,
সেই নরোত্তম ;
তার সাজে সন্ন্যাস-আশ্রম।
হেন সাধু লভিলে জনম,
পবিত্র এ বসুমতী।

আদর্শ গুরুদেব কিরূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া এই বাল-সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, ঘটনার পরম্পরায় তাহা নাটকে বড়ই উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। ব্যর্থমনোরথা, কামতাড়িতা বিমাতার ষড়্যন্ত্রের ফলে, পিতৃরোষে নির্ম্মলাত্মা বালক পূর্ণচন্দ্র কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, গোরক্ষনাথ শিষ্যের সহায়তায় তাঁহাকে জল হইতে বাহিরে উঠাইয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফলে প্রাণরক্ষা করেন। পূর্ণচন্দ্র গুরুদেবের পদতলে এখন পরমাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। গুরুপদ-সেবা ভিন্ন তাঁহার আর কোন কার্য্য নাই, বাসনাও নাই।

কিন্তু গুরুদেব তাঁহাকে পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, রাজ-সকাশে তিনি বিমাতার স্বরূপ পরিচয় দিয়া সেই দুশ্চারিণীর দণ্ডবিধান

করাইবেন আশ্বাস দিলেন, নতুবা সম্মুখস্থ এক নৃপতি-বিহীন রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়া প্রজাগণকে শাসন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের "তব পদ সার এ জীবনে"—গুরুপদ ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কামনা নাই। তিনি আশ্রয় না দিলে—

পশিয়া বিজনে, মুদিত নয়নে,
মগ্ন রব শ্রীচরণ ধ্যানে,
অনাহারে দিব ছার প্রাণ বিসর্জ্জন।

গোরক্ষনাথ সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোরতা সম্বন্ধে তাহাকে অনেক বুঝাইলেন—

কঠিন এ সন্ন্যাস আশ্রম।
তুমি আজীবন যতনে লালিত,
এ কঠিন ব্রত কেমনে পালিবে বল ?
আজীবন ক্ষীর সর নবনী ভোজন,
দারুণ আশ্রম, কভু অর্দ্ধাসন,
অনশনে যাবে কভু,
সপ্তাহ কাটিবে কভু বারিবিন্দু পানে।
শীত গ্রীষ্ম ভীষণ তাড়ন,
ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর বারিবরিষণ,
তরু সম সহিতে হইবে।
বিহীন সম্বল, শয্যা—ধরাতল,
বসন—বল্কল,
আচ্ছাদন—বিভূতি কেবল,
কাঞ্চন শরীরে বৎস সহিবে কেমনে ?
যোগাভ্যাস বিজন কাননে,
ভীষণ গর্জ্জনে
ফিরে যথা দুরন্ত শ্বাপদ,
কোটি কোটি মশক দংশন,
মন স্থির রবে কি তোমার ? ৩য় অঙ্ক, ২গ

রাজপুত্রের পক্ষে এ কঠোর কৃচ্ছ্র পন্থা কোন প্রকারেই শোভা পায় না। তাই গুরুদেব বলিলেন—

"অস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা দিব আমি তোরে,
আনন্দে হরিবি দিন দারাপুত্র সনে।"

কিন্তু পূর্ণচন্দ্র কিছুই চাহেন না, গুরুপদ সেবা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কামনাই নাই। গুরুদেব মাতৃক্লেশ স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের আধ্যাত্মিকী বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনি জানেন ঈশ্বর মঙ্গলময় জ্ঞান লোপ না পাইলে জননীও গুরুপদ সেবা করিয়াই পরম সন্তোষে দিনপাত করিতে পারিবেন। অতঃপর গুরুদেব পণ করিলেন, তিনি যাহার সেবা গ্রহণ করিবেন—

"ভালমন্দ যবে যা বলিব
না করি বিচার
তখনি সে করিবে স্বীকার।"

তাহাতেও পূর্ণচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে কঠোর পরীক্ষায় পূর্ণচন্দ্রের মন বুঝিয়া গোরক্ষনাথ তাহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু প্রথমেই অসামান্য রূপবতী সুন্দরা দেবীর পুরীতে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন।

এইখানে সুন্দরার পরিচয় আবশ্যক। ইনি শতদ্রুতীরস্থ স্বাধীন রাজ্যের রাণী, তাঁহার শস্য-শালী রাজ্য, পূর্ণ ধনাগার, নতশির শত্রু কিন্তু তথাপি উপযুক্ত বরের সন্ধানে ভিখারিণীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়াও তিনি বীর, ধীর, প্রশান্তস্বভাব মনোমত পতি লাভ করিতে পারেন নাই। সহচরী সারিকে তিনি বলিতেছেন "যে বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার সঙ্গে বিচারে সে মূর্খের ন্যায় নির্ব্বাক্ হ'ল, যে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার ধনাগার দৃষ্টে মোহিত হ'ল, রূপ-গর্ব্বিত আমার রূপ দর্শনে দাস হয়েছে। পুরুষের প্রধান গর্ব্ব তরবারি, রণস্থলে বিপক্ষ-রাজ আমার পতাকা দর্শনে তরবারি ত্যাগ করেছে"। চর্ম্মকার জম্বু তাহার কন্যা লুনাকে (পূর্ণচন্দ্রের বিমাতা) বলিতেছে "সে অমন সুন্দরা না, তোর রাজা বাপের নাক কেটে লেবে। তার লাক্ সওয়ার মজুত; ঘোড়-সওয়ার হ'য়ে আপনি লড়ে"। স্বয়ং গোরক্ষনাথও সুন্দরার রূপ সম্বন্ধে শিষ্যগণকে বলিতেছেন—

সুন্দরা সুন্দরী
বিধাতার নির্জ্জনে গঠন ;
কলেবরে ঋতুরাজ যেন বিরাজিত ;
মদন ধরিয়া ধনু নয়নে প্রহরী ;
হেরি কেশদাম
অভিমানে ঝরে কাদম্বিনী ;
বরণ-প্রভাবে চঞ্চলা দামিনী,
সহ-সহচরী নিতম্বে প্রহরী রতি ; ৩য় অঙ্ক, ৪ গ।

কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের দর্শনেই তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তিনি দেখিয়াই সারিকে বলিলেন "সারি, ঐ নবীন যোগী আমার প্রাণেশ্বর, যোগী আপনার ধ্যানেই মগ্ন। সংসারদৃষ্টি-শূন্য।"

পূর্ণচন্দ্র গুরুদেবের আদেশ মত সুন্দরা দেবীর হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সুন্দরা দেবী বুঝিলেন "যোগীর সমস্ত লক্ষণ এই নবীন সন্ন্যাসীতে বিরাজমান ; উচ্চধ্যান, শূন্য দৃষ্টি প্রকাশ করছে, হৃদয়ে ঈশ্বর-পদ বিরাজিত, তথায় আমার ন্যায় তৃণের স্থান নাই।"

সুন্দরা কাঞ্চন ভিক্ষাদান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ; কেননা—মণিমুক্তা গ্রহণ করিয়া গুরুদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছেন, গুরুসেবার জন্য ভোজ্য সামগ্রীই তাঁহার প্রয়োজন। সুন্দরা পুরীতে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর পুরীতে প্রবেশ নিষেধ। সুন্দরা পূর্ণচন্দ্রের সহিত গোরক্ষনাথ দর্শনে আসিলেন, পথে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি যার প্রার্থী, তা পাব?"

পূর্ণ—কল্পতরুতলে যা যাচ্‌ঞা করবেন, তাই পাবেন।

কিন্তু আসিয়া চাহিলেন—

"অভিলাষী দাসী—তব নবীন সন্ন্যাসী
মম প্রাণেশ্বর, আমি পদে চিরদাসী"।

গোরক্ষনাথও তৎক্ষণাৎ পূর্ণচন্দ্রকে অনুমতি করিলেন—

"যাও যোগী বামার সহিত
অঙ্গীকার রক্ষা কর মোর"।

এইখানে পূর্ণচন্দ্রের ঘোরতর সঙ্কটময় পরীক্ষা উপস্থিত—কিন্তু এই চরম পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হইলেন।

সেবাদাসের সহিত সারির নিম্নোক্ত কথোপকথনে এই পরীক্ষার ফলাফল পাঠক বুঝিতে পারিবেন—

সেবাদাস—বল কি? তুমি যে আমায় আশ্চর্য্য করলে? সুন্দরাকে দেখ্‌লে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়। আমরা ত যোগী! দৃষ্টিমাত্র আমাদের মনও বিচলিত হয়েছিল, গোরক্ষনাথের কি হয়েছিল জানি নি, অন্য সকলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

সারি—কিন্তু এ যোগিরাজের নিকট মদনের গর্ব্ব খর্ব্ব, নারীর দর্প এঁর নিকট চলে না।

সে—আমি যে তোমায় বলেছিলুম উত্তম উত্তম আহার দিও।

সা—কৈ তা তিনি গ্রহণ করেন কৈ? কোন দিন অনশন, কোন দিন একটী ফল আহার।

সে—শিবপূজা ত নিত্য করে, তোমায় যে বলে দিলাম শিবের ভোগে নানাবিধ সামগ্রী দিও।

সা—তা ক'রে দেখেছি, কণিকামাত্র ধারণ করেন, বাকী অতিথ ফকীরদের দেন।

সে—অতিথি ফকীরদের কাছে আস্‌তে দাও কেন? তা হ'লে প্রসাদ ফেল্‌তে পারবে না।

সা—কেউ না থাক্‌লে হোমকুণ্ডে ভস্ম করে ফেলে।

৪র্থ অ ১ম গ।

কিন্তু একত্রাবস্থানেও এই বালসন্ন্যাসী যোগভ্রষ্ট হয় নাই। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী বিষয়-বিরাগী যোগী সুন্দরার প্রলোভন, কাতর প্রার্থনা, প্রাণভিক্ষা, শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে সবই উপেক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছেন। সুন্দরাকেও তিনি তাহার সহিত সেই অদ্বৈতসম্বন্ধ মনে করিতেই উপদেশ দিতেছেন—

অলীক সম্বন্ধ তুমি আন কি কারণ?
দৈহিক রমণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব কেবল,

আত্মায় আত্মায় আত্মিক-রমণ
সে রমণ না হয় ভঞ্জন,
গুরুপদে একত্রে মিলন,
আনন্দের লীলা অবিরাম;
সঁপ মন শঙ্কর-চরণে,
এক আত্মা হ'ব দুই জনে,
চিরদিন রবে
সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে;
করহ আত্মায় মন লয়,
ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার
হেরিবে পুরুষ সনে প্রকৃতি বিহার;
একজ্ঞানে বহুজ্ঞান ঘুচিবে তোমার,
নরনারী ভেদজ্ঞান রহিবে না আর।

৪র্থ অঙ্ক, ৩ গ:

সুন্দরা পূর্ণচন্দ্রে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাম্পত্য জীবনের জন্য পতিলাভের কোন আশা নাই দেখিয়া হৃদয়ে সহধর্ম্মিণীর ভাব লইয়া (জন্মজন্মান্তরে রহে যেন ভেদাভেদ জ্ঞান) দাসীভাবে পূর্ণচন্দ্রের মাতা ইচ্ছার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

যাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয়ই অধিগত হইয়াছে তাহাতে আর সংসারী ভক্তে অনেক পার্থক্য। বিল্বমঙ্গলের ন্যায় পূর্ণচন্দ্রকে কোন সংস্কার অভিভূত করে নাই। "নূতন হাঁড়ীর দৈ সহজে নষ্ট হয় না।" পরমহংসদেব বলিতেন "বিবেকানন্দ দু'হাতে দু'খানা তরোয়াল ঘোরায়, একদিকে জ্ঞান ও অন্যদিকে বৈরাগ্যের।" তাই আদর্শ গুরু সকল শিষ্যকে সমান অধিকার দেন না। এই কারণেই ঈর্ষান্বিত হইয়া গোরক্ষনাথের শিষ্য সেবাদাস দামোদরকে বলিতেছে—

"দেখ, ভাই, সেই ব্যাটাকে পাতকো থেকে তোলা গেল, তিনি হলেন সাধূত্তম, প্রভুর মানস পুত্র! আর আমরা জটা রাখ্‌লেম, ভেসে গেলেম? তাঁর মণিকাঞ্চন ছোঁয়ায় নিষেধ নাই। তাঁর মেয়ে মানুষের

সহবাসেও নিষেধ নাই, আর আমাদের তরুতল বাস, কাঞ্চন—লোষ্ট্রবৎ, পরদার মাতৃবৎ !"

দামোদর—বলি মানস পুত্র ত ? ওঁর লীলা, ওঁর ও লীলা।

যোগীর পক্ষে যোগ, যাগ, তপ, ধ্যান বাহ্য আচরণ মাত্র, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগই তাঁহার প্রধান লক্ষণ। এই কামিনীকাঞ্চনত্যাগই নবীন সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্রে উজ্জ্বলভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত শ্রেষ্ঠভাবময় গানটি সৃষ্টির প্রারম্ভ সূচনা করিতেছে। পরীক্ষান্তে পূর্ণচন্দ্রকে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদানের পরেই কাঞ্চন-কিরীটিনী-উষা সমাগত প্রায় দেখিয়া প্রভু গোরক্ষনাথ শিষ্যগণকে শিবগুণ গান করিতে আদেশ করিলেন—

যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর।
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর।
প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষ রাজে,
ভয়ে অগ্নি ভস্ম সাজে, ঢাকে কলেবর।
শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক নাহি দুই আর, প্রকৃতি নিথর ;
কালবদ্ধ বর্ত্তমানে ব্যোমকেশ ব্যোমপানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ মহেশ্বর।

উষাগমে শিব-সঙ্গীত, কি অদ্ভুত ভাবের বিকাশ !

পঞ্চনদে গোরক্ষনাথ নামে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। বিমাতার পাপবাসনা পূর্ণ না হওয়াতে কুমারের বিপদ, গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্রয় ও সন্ন্যাস-দীক্ষা দান প্রভৃতি বিষয়ের ভিত্তি "पूरन भक्त" নামক হিন্দি ভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র উপাখ্যান বটে, কিন্তু সুন্দরা, দামোদর, সেবাদাস প্রভৃতি অভিনব চরিত্র-সৃষ্টি, ঈশ্বর মঙ্গলময় জ্ঞান ও পূর্ণচন্দ্রের পরীক্ষা প্রভৃতি নূতন পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র নাটক খানিকে উৎকৃষ্ট রসসৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত করিয়াছেন।

বিষাদ

"বিষাদে" শ্রেষ্ঠ নাট্যকলার পরিস্ফুরণ হইয়াছে। এই নাটক পুরাণোক্ত গন্ধর্ব্বকন্যা মদালসার আখ্যান হইতে গৃহীত। মদালসা অত্যন্ত বিদুষী, ধর্ম্মশীলা ও জ্ঞানবতী রমণী ছিলেন; জন্মসিদ্ধা ও দৈববল সম্পন্না বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ঋতধ্বজ রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন ও অলর্ক নামে চারিটী পুত্র তাঁহার গর্ভে জন্মধারণ করেন। পুত্রগণকে তিনি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহারই উপদেশে প্রথম তিন পুত্র সংসার-বিরাগী হইয়া বাল্যকালে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। চতুর্থ অলর্কের শৈশব-কালে রাজা সহধর্ম্মিণীকে বলেন "তুমি এই পুত্রটীকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিও না, এই বিশাল রাজ্যের রক্ষা করিতে আমার বংশে কি কাহাকেও রাখিবে না"? অতঃপর পতির আগ্রহে মদালসা তাঁহাকে রাজনীতি-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

বহু গ্রন্থে (বিশেষতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে) মদালসা ও অলর্কের সংবাদ বর্ণিত আছে—

মদালসা বনগমন কালে পুত্রটীকে একটি অমূল্য রত্ন প্রদান করেন—

"কৃষ্ণ ভক্তি" তত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল,
সোণার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া
দৃঢ় বদ্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া।

ও উপদেশ দেন "তোমার ঘোর বিপদের সময় ইহা খুলিয়া দেখিও"।

কিছুদিন রাজত্ব করিবার পরে, তাঁহার সংসারাসক্তিতে ক্ষুন্ন হইয়া মধ্যম ভ্রাতা সুবাহু মনে মনে চিন্তা করেন "মা ত আমাদের ত্রাণ করেছেন, কিন্তু কনিষ্ঠের এখনও এই দুর্দ্দশা!" তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সহিত মিলিত হইয়া অলর্ককে পরাভূত করেন। আর...

অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িলা
সেই কালে মাতা দত্ত "সোণার পুটিকা"

মনে পড়ি গেলা সেই বিপদ নাশিকা

... ...

পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয়। ভক্তমাল।

তিনিও সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। অলর্কের শত্রু সুবাহুকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর করেন "আমরা ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছি, এই হেয় বিষয়ে কি প্রয়োজন? আমাদের ভাই ইহাতে জড়িত ছিল, আমি তাহাকেই ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছিলাম, রাজ্যলোভে আসি নাই।"

এই উপাখ্যানই 'বিষাদ' নাটকের ভিত্তি। কিন্তু গিরিশ উহাকে বৃন্ত-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আপনার অন্তরের রসসৌন্দর্য্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকে মাধব (সুবাহু) রাজ-পারিষদ রূপে অলর্ককে পত্নী ও রাজ্য হইতে দূরে রাখিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করাইয়া রাজকোষ শূন্য করিতেছেন ও নিত্য নূতন নূতন বারাঙ্গণা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার রিরংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। বেশ্যা উজ্জ্বলা রাজার উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে রাজা তাহার হস্তেই রাজ্যপ্রদান করিয়াছেন। এদিকে রাণীর ভ্রাতা জিৎসিং ভগ্নীর প্রতি অলর্কের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া মাধবের প্ররোচনায় উত্তেজিত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সহিত মিলিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। সতীকুলশ্রেষ্ঠা রাণী সরস্বতী রাজ-দর্শনে একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া 'বিষাদ' নামক বালক ভৃত্যরূপে সেই বেশ্যার গৃহেই স্বামীর সেবা করিতেছেন। পরে অলর্ক পত্নীকে চিনিতে পারিলেও মিলনের সন্ধিস্থলে উজ্জ্বলার অস্ত্রাঘাতে বিষাদের জীবনের অবসান হয়। মাধবের চক্রান্তেই অলর্কের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হওয়ায় মাধব অনুতাপ করিয়া বলিতেছেন "হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম, ভগবান্, আমি অজ্ঞান, আমি জান্‌তেম না, কুকার্য্য দ্বারা সৎ অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না। আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?"

এই সমস্তই গিরিশের নিজস্ব পরিকল্পনা। উপরি উক্ত ধ্রুববাণীও গিরিশ বহু নাটকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব। সরস্বতীর অদ্ভুত চরিত্রস্ফুরণও অন্যত্র উল্লেখ করিব।

গিরিশ সম্পুটের লিপি সম্বন্ধেও নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন। "মুমুক্ষুতার" জন্য পুরাণ-কথিত অনুশাসন এবং ভক্তমালের "কৃষ্ণভক্তি" লাভের উপদেশের স্থলে গিরিশচন্দ্র পরিকল্পনা করিয়াছেন—

"বিপদে কাণ্ডারী জেন শ্রীমধুসূদন
তাপ দূর হবে সার কর শ্রীচরণ"।

পূর্ণচন্দ্র নাটকের "ঈশ্বর মঙ্গলময়" উপদেশবাণীর ন্যায় ইহাই নাটকের মূলসূত্র। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের সংসার প্রবেশ-প্রাক্কালে যে মাতৃদত্ত মঙ্গলময় শিক্ষা তাঁহার জীবনে অদ্ভুত মঙ্গল সাধন করিয়াছিল, অলর্কের পত্নীবিয়োগে তাঁহার ভক্তিমতী মাতার শেষ উপদেশও কিন্তু এত সত্বর বৈরাগ্য জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। এই স্থানে গিরিশচন্দ্র নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে অলর্ক চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্র আবাল্য ধর্ম্মশিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁহার চরিত্রের কখনও পতন হয় নাই। সংসারের মোহ, তৃষ্ণা তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আর অলর্ক শৈশবে ভক্তিপূতা স্নেহময়ী জননীর বক্ষঃসুধা-রসে বর্দ্ধিত হইয়াও যৌবনে রূপ-মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। মোহ কাটিতে কাটিতেই দেখিলেন প্রেমময়ী আত্মত্যাগিনী মহিষী শোণিত-শোষিণী প্রণয়িনী উজ্জলার হস্তে নিহত হইয়াছেন। শোকমত্ততা তাঁহার প্রধান অন্তরায় হইল। এই কঠিন শেলাঘাত তিনি শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। হীন আমোদের পঙ্কিলতায় নিমগ্ন থাকিয়াও যে অলর্ক একদিন জানিতেন "মা আমার একটী কৌটা দিয়ে গিয়েছেন, আমি এদিক্ ওদিক্ যা করি সেই কৌটাটী পূজা করি। খুব মন নিবিষ্ট করে—চক্ষু বুজে, সেই মা যেমন গোপালজীর বাড়ীতে বস্‌তেন! কৌটাটীর কি মজা জান? যখন ভারি বিপদ হয়, কৌটাটী খুল্‌বো আর ফুস মন্তরে উড়িয়ে দিব। মার কথা মিথ্যা নয় জানত? মাকে দেখেছো তো, গোপলজী তার কাছে কথা ক'য়ে লাড়ু চাইতেন···আমার আবার বিপদ? কৌটাটী যদ্দিন আছে, আমি কাকেও ভয় করি না।" আজ রাণীর সহোদরের সখ্যলাভে বহিঃশত্রুভয়-মুক্ত হইয়াও, ভ্রাতার (মাধব-সুবাহু) পরিচয় পাইয়াও—জ্ঞানবতী ধর্ম্মপরায়ণা মাতার উপদেশ হস্তে পাইয়াও—পত্নী-শোকে বিহ্বল

অলর্কের বৈরাগ্য জন্মিল না। অবশ্য পুরাণোক্ত অলর্কের মাতৃ-কবচ পাঠেই বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। এই নূতন পরিকল্পনায় নাট্যকার এখানে অলর্কের চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কঠোর শোকে শোকের প্রশমন না হইলে ভক্তির উদয় হয় না, দেহের অসারত্ব উপলব্ধি না হইলে বৈরাগ্য আসে না। যদিচ প্রতীচ্য প্রেমিক ওথেলোর ন্যায় অলর্ক এত শোকে বিহ্বল হইয়াও নিজহস্তে আপনার প্রাণনাশ করেন নাই, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানশীলা ভক্তিমতী মাতার আদরের দান গভীর সলিল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিলেন—'আজ সম্পদ না চাই বিপদ বাসনা মম'। তিনি উন্মত্তের ন্যায় শ্মশানে ঘুরিতে লাগিলেন, তাঁহার অঙ্গ অবশ, পদদ্বয় দেহভার-বহনে ক্লান্ত। এই শোক প্রশমনের জন্য গিরিশচন্দ্র রাজমাতাকে ছায়ামূর্তিতে আবির্ভূত করাইয়াছেন। মদালসা বলিতে লাগিলেন—

> ত্যজ খেদ সন্তান আমার!
> সুখ দুঃখ অনিত্য সংসারে।
> দেখ আমি ব্যাকুলা তোমার তরে,
> এসেছি গোলক ত্যজি তোমার কারণ
> বাপধন! শোকভিক্ষা দেহ জননীরে!
> কর বৈরাগ্য আশ্রয়,
> সার কর হরির চরণ। ৫ম অঙ্ক, ২য় গ।

কিন্তু তখনও অলর্কের শোক কিছুতেই প্রশমিত হইল না। রাজরাণী প্রেমের জন্য, তাঁহারই সেবার জন্য ভৃত্য সাজিয়া ঘাতকের হস্তে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন, কিরূপে তিনি সে শোক অপনোদন করিবেন? তিনি বলিলেন—

মা দেখা হলো, হলো ভাল। তুমি আমার সরস্বতীকে খুঁজে এনে দাও, নইলে আমি সুখ চাইনে, প্রেম চাইনে, আনন্দ চাইনে, আমি নারকী, নরকে অবস্থান করবো, মা এ জ্বালা আমি ভুলতে পারবো না।

অতঃপর রাজমাতা সূক্ষ্মশরীরে আপনার পার্শ্বে সরস্বতীকে দেখাইলেন। অলর্ক দেখিলেন দেহের বিনাশ হইয়াছে, কিন্তু—সরস্বতী

তখনও জীবিত। অলর্কের আর ক্ষোভ রহিল না, তিনি মধুসূদনকে ডাকিয়া গোলোকধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, জননী ও সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

সরস্বতীর চরিত্রে মৌলিকতা, পত্নীশোকে অলর্কের বিহ্বলতা, ছায়া মূর্ত্তিতে রাজমাতা ও রাজরাণীর আবির্ভাব গিরিশের নিজস্ব পরিকল্পনা। এইখানে পুরাণ ও উপকথার আখ্যান বস্তু নাটকীয় রসে পরিপুষ্টিলাভ করিয়া এমন সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে "বিষাদ" নাটক শ্রীমদ্ভাগবতা-নুগত জ্ঞানোপদেশময় ঐশ্বরিকতত্ত্বমূলক গ্রন্থ হিসাবেই কেবল উহা সকলের ভক্তি আকর্ষণ করিবে না, পরন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিয়োগান্ত নাটক হিসাবেও ইহার মূল্য অল্প নহে।

বিষয়-বিরাগী সুবাহুই মাধবরূপে রাজবয়স্য হইয়া অলর্ককে কুকার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে যোগী, ঐহিকধনলুব্ধ তস্করগণের নিকট আধ্যাত্মিক পিতা "চোর—চূড়ামণি" সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় তিনি প্রদান করিতেছেন—

"তাঁর ভাব কোটিকল্প চিন্তা ক'রে কেউ বুঝ্‌তে পারে না। তবে যদি কেউ সোণাকে ধূলাজ্ঞান করে, পরস্ত্রীকে মা ভাবে, কেউ যদি আপনাকে দীন বিবেচনা করে, তবে সেই দীননাথের কৃপায় বুঝ্‌তে পারে"।

২য় অঙ্ক, ২য় গ।

পূর্ণচন্দ্রের কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্তির বাণী এখানে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

———•———

"নসীরাম"

বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী চরিত্রে যেরূপ পরমহংসদেবের সাধনকালীন প্রেমোন্মাদ-অবস্থা আংশিক প্রতিফলিত হইয়াছে, 'নসীরাম' ও 'কালাপাহাড়ে'র চিন্তামণিতেও সেইরূপ ভাবময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিয়াছি 'নসীরাম' লইয়াই হাতীবাগানের নূতন ষ্টার থিয়েটার খোলা হইয়াছিল। আর ইহারই ৮৷৯ বৎসর পরে এই ষ্টার রঙ্গমঞ্চেই আবার কালাপাহাড়ের অভিনয় হয়। তাই নসীরামের অনেক কথা চিন্তামণির মুখে পুনরুক্ত হইলেও গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয় হইতে এই ভাবের ধারা যেরূপে প্রবাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কালাপাহাড়ে তাহার পরিণতি হইয়াছে। যে অবস্থার মধ্যদিয়া কালাপাহাড়, চঞ্চলা, বীরেশ্বর, ইমান প্রভৃতি চরিত্র শ্রেষ্ঠ নাটক "কালাপাহাড়ে" পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, আর ত্রিতাপ-তাড়িত, আত্ম-প্রতারিত, প্রতিহিংসা-জর্জ্জরিত নরনারীর তাপ জ্বালা গ্রহণ করিবার জন্য চিন্তামণি অধীর হইয়াছেন নসীরামে তাহার সূচনা মাত্র; তাপিত, পতিত ও লাঞ্ছিত উদ্ধারের জন্য নসীরামেরও ব্যগ্রতা সমভাবে দৃষ্ট হইলেও, চিন্তামণি চরিত্রের পরিকল্পনা আরও অধিক সূক্ষ্ম ও মহৎ।

নসীরামও পাগলিনীর ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি সকলের কথা জানেন ও বুঝিতে পারেন। লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া জানে কিন্তু তিনি উন্মাদ ভগবানের জন্য—আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত, ক্ষোভহীন—সুখ দুঃখে সমান উদাসীন—

যে সুখ আশায় উন্মাদ মানবকুল
অদ্ভুত বাতুল সেই সুখ ঠেলে পায়।

আত্মভোলা নসীরামের পরিচয় তাঁহার নিম্নকথিত উক্তিতে আরও পাওয়া যায়—"মরতেও চাইনি, বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়ীও চাইনি, গাছতলাও চাইনি, ক্ষীর সরও চাইনি, খুদকুঁড়োও চাইনি, ওসব ভাবিইনি, জানিও একদিন সুখ, একদিন দুঃখ আছে, সুখ দুঃখ দু'শালাই সঙ্গের সাথী"। আমরা "পূর্ণচন্দ্রে" ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ আকৌমার সন্ন্যাসীর কামিনী

কাঞ্চনে অনাসক্তি দেখিয়াছি, কিন্তু সংসারী লোক রমণীর মোহ-বন্ধন হইতে কিরূপে মুক্ত হইতে পারে, সেই ভাবটী নাট্যকার নসীরাম চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

সাংসারিক বিষয়ে সাধারণ লোকের ধারণা সম্বন্ধে তিনি অনাথনাথকে বলিতেছেন—"লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মতন পাগল না হয়, আপনার মজায় থাকে, তারেই বলে পাগল। কোন শালা ধনের কাঙ্গাল, কোন শালা মানের কাঙ্গাল, কোন শালা মেয়ে-মানুষের কাঙ্গাল, কোন শালা ছেলের কাঙ্গাল, যে শালা এই কেঙ্গলাবৃত্তি না করে, সে শালাই পাগল।"

অনাথ—নসীরাম, তোমার সংসারে চাইবার কিছু নাই?

নসী—চাইবার মত জিনিষ একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই, তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব ভুয়ো। সুন্দরী ছুঁড়ী পুড়ে ছাই হবে, লোকজন কোথায় যাবে, তার ঠিকানা নাই, টাকাকড়ি আজ বলছো তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে তার, না যদি খরচ কর তো দু'হাতে দু'মুঠো ধুলো ধর না কেন, বল, এই আমার টাকা, এই আমার টাকা।

রামকৃষ্ণদেবও নিজ জীবনে সাধনাবলে এইরূপে কামিনী-কাঞ্চন অসার-জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি একহস্তে রৌপ্য মুদ্রা ও অপর হস্তে একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া বিচার করিতেন—"এ দুটীর কোন জিনিষেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না", উভয়ই জড় পদার্থ। অতঃপর তিনি টাকা মাটি, মাটি টাকা বলিয়া জপ করিতেন এবং পরে উভয়ই গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দিতেন। এইরূপ করিবার পরে তিনি কখনও টাকা স্পর্শ করিতেন না। কামিনী সম্বন্ধেও বলিতেন, "কামিনী কাহাকে বলে অগ্রে বুঝিয়া লও; ইহা একটী হাড়ের খাঁচা—মাংস ও তদুপরি চামড়া, ইহা লইয়া কি সম্ভোগ করিবে?" কিন্তু লোকে ত এই কামিনী-কাঞ্চনই চায়।

'কালাপাহাড়ে'ও এইভাব প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। চিন্তামণি কালাপাহাড়কে বলিতেছেন "মানুষে কি ক'রে বেড়ায় তা তো আর জানতে বাকী নেই"।

কালা—মানুষে কি করে, তা কি তুমি সব জান ?

চিন্তা—অত চম্‌কে উঠছো যে ? এ তুমিও জান আমিও জানি, হয় টাকা, নয় ছুঁড়ী, আর নয় মান, এই নিয়ে ঘুরছি।

লোকে যা চায়, সেই যদি নিতান্ত অসার ও পরিহার্য্য পদার্থই হয়, তবে প্রকৃত চাহিবার জিনিষ কি ?

নসীরাম বলেন "চাইবার জিনিষ কিছুই নাই, কারণ যে আমার জন্য ঘুরে বেড়ায়, তারে আবার চাব কি ?"

অনাথ—তুমি কি বল, হরি তোমার জন্য ঘুরে বেড়ায় ?

নসী—বেটা ঘুর্‌বে না! আমি তো আমি—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সবার জন্য ঘুরে বেড়ায়। কি খাবে কোথায় থাক্‌বে, আমি ওই মজা দেখে বেড়াই। খালি লুকোচুরি খেলছে—সকলেরই সাম্‌না সাম্‌নি বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্তু সবাই মনে করছে, আমি বাগিয়ে নিলেম। ২য় অঙ্ক, ৩ গ।

মানবের এই দুঃখময় সংসারে নসীরামের আশ্চর্য্য প্রভাব বুঝিতে হইলে নাটকীয় উপাখ্যানটী জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। গৌড়ের রাজকুমার অনাথনাথ মগধ জয় করিয়া সন্ধির সর্ত্তানুসারে রাজকুমারী জ্ঞানে বিরজাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। রাজধানীতে উভয়েই উভয়ের প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িলে, বিরজা অনাথনাথের কাছে প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে যে সে রাজকুমারী নহে, কিন্তু মন্ত্রী কোন চাতুরী-দীক্ষিতা বালিকাকে রাজকুমারী সাজাইয়া তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। অনাথনাথের গভীর ভালবাসা তথাপি অটুট থাকে, তিনি নিজ প্রাণদানেও প্রেমিকাকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এদিকে কামুক রাজারও কামদৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হয়। রাজ-গুরু কাপালিকও আবার পদ্মিনী কন্যার ধর্ম্মনাশ ও প্রেমিক রাজপুত্রের বলিদান দিয়া সিদ্ধ হইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সকলের ষড়্‌যন্ত্রই কাপালিকের ভৈরবী পতিতা সোণার কৌশলে ব্যর্থ হয়। কাপালিক সোণার হস্তস্থিত খড়্গে পঞ্চত্ব লাভ করে, কুমার অনাথনাথ নসীরামের শিক্ষায় দিবারাত্রি হরিনাম কীর্ত্তন করেন এবং কামুক রাজাও ক্রমে হরিভক্ত হইয়া উঠেন।

এক্ষণে নসীরামই নাটকের প্রধান চরিত্র। এই চরিত্রের অবতারণায় গিরিশচন্দ্র নাটকখানিকে ভগবত্তত্ত্বমূলক নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এই চরিত্রের প্রভাবেই নাটকখানি 'ট্রেজিডি' হয় নাই, অনাথনাথ বিরজার রূপ-রস-স্পর্শ জনিত ভালবাসা পবিত্র প্রেমে পরিণত হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে নসীরাম অনাথনাথকে বলিতেছেন "ও খেপা, মনে আড় রাখিস্‌নি—বিরজার অপরাধ নাই। সে তোমা বই আর ধ্যানেও জানে না। আর যদি অপরাধীই হয়—তুই প্রেম দান ক'রে সব বুঝে নে। বোঝ কামে প্রেমে তফাৎ—বোঝ কাম স্বার্থপর, মনকে কুঁকড়ে দেয়; প্রেম জগদ্ব্যাপী—প্রাণ-মন জগদ্ব্যাপী হয়। ৫ম অঙ্ক, ৩ গ।

এই কাম প্রেমে রূপান্তরিত করিবার জন্য, সংসারকে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত করিতে,—নসীরাম সকলকে বলিতেছেন "শোন্‌, তোদের সকলকে বলি শোন্‌, জগৎকে প্রেম দে—যে হীনের হীন তাকে প্রেম দে—রাই রাজার ঘরের প্রেম ফুরাবে না। যত পাও, বিলাও"।

এখন দেখা যাউক্‌, যে রাজকুমার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মনস্তাপে পীড়িত হইয়া নসীরামকে বলিতেছেন—"তুমি যদি কখনও রাজকুমার হ'তে, পিশাচীকে প্রণয় অর্পণ ক'র্‌তে, যদি তোমার পিতা তোমার বক্ষে বজ্রাঘাত ক'রতো, তা হ'লে বুঝ্‌তে ঐ চিন্তা ছাড়া যায় কি না"—

কিরূপে তাহার মন সেই চিন্তা ছাড়িয়া ভগবানের দিকে প্রধাবিত হইল? ২য় অঙ্ক, ৩ গ।

নসীরাম অনাথের কথার উত্তরে বলিতেছেন "আর তুমি যদি দিন কতক হরি হরি ক'র্‌তে, তা হ'লে আমি বুঝতেম, এগুলো ভোলা যায় কি না"।

অনাথ—হরি কে? হরি কি আছেন?

নসী—তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? জল জল কর্‌লে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাক্‌লো।

অনাথ—তা কি হয়?

নসী—হয় না হয়, পরখ্‌ ক'রে দেখ্‌লে বুঝতে পার। হরি নাই বলে কারা জান, যাঁরা একবার হরি হরি করেন, মনে করেন, হরিকে খুব

কৃপা করেছি—তবু হরি কেন এসে তাঁর বাপের বাগানের মালী হয় না? আর হরি আছে কি না জিজ্ঞাসা করেনা কারা জান? যাদের হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে প্রাণ ভ'রে যায়, যত হরি হরি করে, তত আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায়না যে জিজ্ঞাসা করে, হরি, তুমি আছ কি না? ততক্ষণ আর দুটো হরিনাম করবে।

অনাথ—তুমি হরিনাম কর?

নসী—হরিনাম করব না? মজা ওড়াব না? তোমার মতন তো আমি পাগল নই যে ভাব্‌বো, কি হবে কি করবো।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙ্গে ছোপাবে সে রঙ্গ হ'য়ে যায়"—অর্থাৎ যে মন অনাথনাথ বিরজায় সমর্পণ করিয়াছে, হরিপাদপদ্মে দিলে, হরি নিশ্চয়ই তাহাকে কৃপা করিবেন। তাই নসীরাম অনাথনাথকে বলিতেছেন—"মন বেটার একটা মজা দেখছি, যদি রাতদিন হরিবোল বলা অভ্যাস করিস্, তা হ'লে মন বেটা হরি হরিই করবে, যখন এটা সেটা ভাবনা আস্‌বে তখনই তুই হরি হরি কর্‌বি, তখন ভাবনা শালা পালাবার পথ পাবে না; আমার তো ভাই এই হয়েছিল।"

কিন্তু সঙ্গে আর একটী জিনিষও আবশ্যক। ভগবানের পায়ে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর রাখিতে হয়, ভয় নির্ভয় সব দূর করিতে হয়, তাই নসীরাম বলিতেছেন, "ও ভয় ভরষা দু'শালাই শত্রু! তোমার ভয়েও কাজ নেই, ভরষায়ও কাজ নেই। আর কথারও কাজ নেই, আয় হরি হরি করি, হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!"

৩য় অঙ্ক, ২ গ।

এই নির্ভরশীলতাই নসীরামের প্রধান ভাব—যেমন রামকৃষ্ণদেব সকল সময়ে মায়ের উপর ভর দিয়া চলিতেন। প্রথম দৃশ্যেই নসীরাম বলিতেছেন "পালাব বই কি? এখানেও থাকে, চোখ বুজে দাঁড়াই, যে দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেই দিকে যাই; সিদে চ'লে চল।" সোণাকেও নসীরাম বলিতেছেন "সেই বেটার উপর ফেলে দে, আর তোর যাই খুসী ক'রে বেড়া"।

এইরূপে নসীরাম কামান্ধ রাজার মনও হরিপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া

তাঁহাকে হরি-ভক্ত-সাধুরূপে পরিণত করিয়াছেন। হরি নামে কি না হয়? সে নামে—

নাম শুনে মন মেতে উঠে।
পাথরে জল ঝরে ভাই
শুক্‌নো ডালে কলি ফোটে॥
মজা সে হরিনাম রটা
দেখ্‌বি আমোদের ঘটা,
পায়ে ঠেলে যাবে দিন ক'টা ;
নাই যমের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা,
হরি বল এক চোটে॥ ৪র্থ অঙ্ক, ৩ গ।

রাজা বলিতেছেন, নসীরাম তুমি কি আমায় ঘৃণা কর?

নসী—আমি তোমায় ঘৃণা করবো কেমন করে, আমি যে তোমারই মতন ইন্দ্রিয়-দাস। দেখ, দুর্ল্লভ মানবজন্ম পেয়েছি, হরিনামে অনুরাগ হলোনা, তাই তোমায় হরিনাম কর্‌তে সাধি।

রাজা—হরিবোল, হরিবোল, হরি কি আমায় পায়ে রাখবেন?

নসী—তোমার কাজ তুমি কর, তাঁর কাজ তিনি করবেন, হরি পায়ে না রাখলে রাজা, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি হরি বল?

বিরজাও যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে—"প্রভু! আমার মত পাতকীকে হরি দয়া কর্‌বেন?"

নসী—দয়া কিরে?—তাঁর ওই কাজ, তাঁর একটা নাম হ'লো পতিত-পাবন ; যে আপনাকে পতিত ভাবে, হরি তার পেছনে পেছনে ফেরে ; হরিগুণ গেয়ে বেড়া, হরি সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌বে।

নসীরামের আর এক মহৎ কার্য্য—পতিতাকে হরিনাম দিয়া তাহাকে উদ্ধার করা। পতিতা রমণীর প্রতি রামকৃষ্ণদেবের এত অহেতুক করুণা ছিল যে, থিয়েটারে আসিয়াও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিতেন না—"তোর চৈতন্য হউক।" সোণাকে উদ্ধার না করা পর্য্যন্ত নসীরামেরও কার্য্য শেষ হয় নাই। দুরন্ত কাপালিকের কৌশলে সোণার সতীত্ব নষ্ট হয়, সে রাজার নিকট আবেদন করে, কিন্তু রাজা কাপালিকের প্রতি

পক্ষপাতিত্ব-বশতঃ তাহার আবেদন উপেক্ষা করেন। প্রতিশোধ লইবার মানসে সোণা অবগুণ্ঠনবতী বিরজা সাজিয়া কামান্ধ রাজাকে প্রকাশ্য সভায় তাহার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য করে। নসীরাম যতবার তাহাকে হরিনাম লইতে বলিয়াছে, সোণাও ততবার তাহার মুখে আগুন ধরিয়া দিতে চাহিয়াছে। সোণা বলিত, "আমি কেন হরিনাম করবো, আমায় বেশ্যা কল্লে কে? আমায় মদ খাওয়ালে কে? আমায় অনাথিনী কল্লে কে? সেই হরি না আর কেউ? সেই হরিনাম করতে আমায় বলিস্।"

নসীরাম কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবেন না, সোণাকে তিনি যে বড় ভালবাসেন! এই ভবসমুদ্রে তাহাকে ছাড়িয়া তিনি একাকী বাঁচিতে চান না। ক্রমে সোণার মনও দ্রব হইয়া আসিল। ভক্ত নসীরামের আকর্ষণে কে স্থির থাকিতে পারে? প্রেমিকের কৃপায় তাহারও জন্ম সার্থক হয়, রাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ হয়। পরবর্ত্তী অশোকগুচ্ছের কবি দেবেন্দ্রনাথের মুখেও আমরা শুনিতে পাই,—"হরিনাম ব্যর্থ নহে গণিকার মুখে"।

হরিনামে সেই প্রদেশের পর্ব্বত, অরণ্য, গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত হয়, পাপী, তাপী, পতিত, কামুক সার্থক জীবন লাভ করে, সংসার স্বর্গে পরিণত হয়। এই সত্য প্রচার কল্লেই নসীরাম চরিত্রের সৃষ্টি। তিনি বলিতেন, ওই শোন, হরি বল্‌ছেন "কে রে তাপিত, আয়, আমার কোলে আয়, আমি তোর তাপ দূর করবো"।

কালাপাহাড়

নসীরাম যে হরির তাপ গ্রহণের কথা বলিয়াছিলেন এই হরিই "কালাপাহাড়" নাটকে চিন্তামণি রূপে মানুষ হইয়া আসিয়া পাপী, তাপী, সবল, দুর্ব্বল, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলকে বলিতেছেন, "আয়, আয়, তোর তাপ, জ্বালা, আমায় দে"। চিন্তামণি সকলের অন্তরের চিন্তায় প্রবেশ করিয়া, সকলের কথা জানে, আর জানে বলিয়াই সকলের উদ্ধারের জন্য সে এত ব্যাকুল। মানুষের জন্য তার প্রাণ কাঁদে, কারণ "সে মানুষ হয়ে মানুষের যন্ত্রণা বুঝেছে, সে বুঝেছে যে দিনরাত্রি মানুষকে ত্রিতাপে তপ্তখোলায় ভাজ্‌ছে, তার কায়মনোবাক্যে কামনা, যদি শত সহস্র জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তাও ভাল, যদি সে একজন মানুষকে ত্রিতাপ থেকে পরিত্রাণ ক'রতে পারে, তা'হলে আপনাকে সে ধন্য জ্ঞান করবে। এই তার মন্ত্র, এই তার শক্তি, এই তার সাধনা।" ৪র্থ অঙ্ক, ২ গ।

এই শক্তি ও সাধনা বলেই সে কালাপাহাড়ের ন্যায় অবিশ্বাসী অবিদ্যায় অন্ধ, শক্তিমত্ত ধর্ম্মদ্রোহী পুরুষকেও বলিতেছে—তোমার জ্বালা আমায় দাও [কালা—ওহো হো বড় জ্বালা]। ৫ম অঙ্ক, ২য় গ।

জড়-শক্তির উপাসক অনুতাপ-দগ্ধ বীরেশ্বর—যে প্রাণপণে শক্তির চেষ্টা করিয়াও শান্তি পায় নাই, অন্তরে বাহিরে, শিরায়, মর্ম্মে যাহার পাপস্মৃতি জ্বলিতেছে,—তাহাকেও বলিতেছে,—"ভয় কি, তোমার পাপ আমায় দাও"—। অতৃপ্ত-বাসনা-দগ্ধা প্রতিহিংসা-পরায়ণা চঞ্চলাকে বলিতেছে— "ওরে যাসনে, যাসনে। দে, দে, তোর জ্বালা আমায় দে"।

এখন এক ভগবান্ অথবা তাঁহার অবতার ভিন্ন অপর কে আর পাপীর পাপ লইয়া জীবকে পরিত্রাণ করিতে পারেন? নতুবা মহাসিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াও আপনাকে কেহ অপর আর একজনের জন্য দায়ী করিতে পারেন না। চৈতন্য যেমন জগাই মাধাইর পাপতাপ গ্রহণ করিয়া উহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যীশু যেমন পাপীদিগের পরিত্রাণের জন্য আপনার শোণিতও দান করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবও অপরের তাপ, জ্বালা, পাপ গ্রহণ করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন,

রুগ্নাবস্থায়ও তাঁহার কৃপালাভে কেহ বঞ্চিত হয় নাই। চিন্তামণিও এইরূপ ব্যাধি-তাপ-জ্বালা গ্রহণ করিয়াও ভগবানের অবতারের ন্যায়ই নাটকে ছায়াপাত করিয়াছেন, তাই লেটো বলিতেছে "আমার ভগবান্ তুমি।—তাই হরি হয়ে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছ"—' ৪র্থ অঙ্ক, ৫ গ।

ব্রাহ্মণযুবক কালাচাঁদ হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া ইতিহাসে এই কালাপাহাড় আখ্যা লাভ করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বীরেশ্বর, চঞ্চলা, মুরলা, চিন্তামণি, লেটো প্রভৃতি নূতন চরিত্র সৃষ্টি এবং কালাচাঁদের হৃদয় কখনও সংশয়াচ্ছন্ন, কখনও অবিদ্যাশক্তি-অর্জ্জনে আগ্রহান্বিত, কখনও নবাবনন্দিনী ইমানের জন্য উন্মত্ত, আবার শেষে দীনদয়াল মহাপুরুষের কৃপার পাত্র—প্রভৃতি ভাবের বিকাশ করিয়া নাটকখানিকে ধর্ম্মমূলক দৃশ্যকাব্যরূপে পরিণত করিয়াছেন। ষ্টারে প্রথম অভিনয়ের সময় ইহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। গিরিশচন্দ্র দুঃখিত অন্তরে কর্ত্তৃপক্ষদের বলিতেন, "তোমরা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী নাটকখানি পিছিয়ে দিলে।"

এখন কিরূপ প্রেম, সমদর্শিতা এবং ধৈর্য্য লইয়া চিন্তামণিকে তাহার জীবনের মন্ত্র, শক্তি ও সাধন কার্য্যে পরিণত করিতে হইয়াছিল, এখানে কয়েকটী কথায় তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিব—

কালাপাহাড়ের মন অতীব কুটিল, সন্দেহ-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন—শাস্ত্রে তাহার অবিশ্বাস, মানবকে গুরুরূপে বরণের অনিচ্ছা। এই সংশয়ের হেতু তিনি বাল্যকালে—

ধরি উপবীত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ
করিলাম বহুদিন, দেবতা অর্চ্চনা,
বিষয় বঞ্চনা, ভোগসুখ সর্পসম
করি ত্যাগ, নিত্য-নব অনুরাগ, পূজা
ধ্যানে নিমগন, কিন্তু তাহে ফলে
বিষময় ফল। ১ম অঙ্ক, ১ গ।

কিন্তু—তাহারও হৃদয়ে চিন্তামণি ক্রমে বিশ্বাস জন্মাইতে সমর্থ হ'ন। প্রথমেই তাহাকে দেখিয়া কালাপাহাড় জিজ্ঞাসা করিতেছে "মহাশয়, ঈশ্বর আছেন?"

চিন্তামণি—খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে। আর কিছু আছে কি না, জানিনে।

কা—কোথায় ঈশ্বর?

চিন্তা—ঐ তেঁতুল গাছে।

কা—এ পাগল না কি?

চিন্তা—কেন পছন্দ হ'লো না? আচ্ছা ভাল ক'রে বলছি—তোমার কাছে, অন্তরে, অন্তরে——সর্ব্বত্রে! এই যে, হৃদয়েশ্বর এই যে আমার হৃদয়ে!

আমরা শুনিয়াছি রামকৃষ্ণদেবও বলিতেন "যেরূপ তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, ঈশ্বর ইহা হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্তু। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইচ্ছা কর, তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পার।"

কিন্তু কালাপাহাড় কিরূপে যুক্তিশূন্য অনুমান—অন্ধ বিশ্বাস—আশ্রয় করিতে পারেন? সে যে "দিন দুই চক্ষু বুজে বসে দেখা পায় নি বলে, একেবারে জেনে ফেলেছে শাস্ত্র মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা!"

চিন্তামণি এখানে অন্ধবিশ্বাস সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি-তর্ক প্রদানে কালাপাহাড়ের ন্যায় অবিশ্বাসী ব্যক্তিরও সন্দেহ দূর করিয়া তাহার প্রাণে ব্যাকুলতা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার আভাস দিবার জন্য আমরা পাঠককে সম্পূর্ণ কথোপকথনটীই উপহার প্রদান করিব—

চিন্তা—আমায় বল্‌ছো অন্ধবিশ্বাস, আমি আলোর মাঝখানে ব'সে আছি, আর তোমার চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে, ভূতের মত অন্ধকারে ঘুর্‌ছ! আমার অন্ধবিশ্বাস নিয়ে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখছি। চোখওয়ালা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি হাঁপিয়ে মর্‌ছো।

কালা—যুক্তিহীন কথায় যার প্রত্যয় হ'তে হয় হোক, আমি কখনো প্রত্যয় করবো না।—

চিন্তা—আহা হা, কি যুক্তির চোট? যে বিশ্বাসে ভগবান পাওয়া যায়,—সে বিশ্বাস কাণা, তোমার মত ধান কাণা না হ'লে কেউ বিশ্বাস করে না।

কালা—যাও, আর বাক্য ব্যয়ে আবশ্যক নেই; যে কথার মাথা মুণ্ডু নেই, তা প্রত্যয় ক'র্ব্ব কেমন ক'রে?

চিন্তা—বেশ ভাই! ঈশ্বর যে আছেন এই কথাটার-ই মাথামুণ্ড নেই, আর দুনিয়ার যত কথা আছে সব দশমুণ্ড রাবণ, আচ্ছা, যাবই তো, কিন্তু তোমার ঠেঙে একটা মুণ্ডু-কথা জেনে নেই।

কালা—এই সূর্য্য উঠেছে, এই দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ।

চিন্তা—সত্যি?

কালা—সত্যি না, দেখতে পাচ্ছো না?

চিন্তা—কি ক'রে জান্‌বো বল? কাল রাত্রে ঘুমিয়ে দেখেছিলাম—হাতী চ'ড়েছি, তারপর কোথায় বা হাতী, আর কোথায় বা কি!

কালা—তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, স্বপ্ন আর জাগা বোঝ না।

চিন্তা—না, চক্ষুওলা অবিশ্বাসে ত বোঝা যায় না, যখন স্বপ্ন দেখেছিলাম তখন মনে ক'রেছিলাম, সত্যি দেখেছি; এখনো মনে করুছি, সত্যি দেখছি, চক্ষুওলা অবিশ্বাসে দেখলে কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা, বোঝা যায় না। তবে অন্ধবিশ্বাস করতে বল, সে এক আলাদা।—

কালা—কি বল্‌ছো?—

চিন্তা—দেখ, একটা কথা তোমায় বলি; একজন ফকির ছিল, রোজ দিনের বেলা ভিক্ষা করতো, আর রাত্রে স্বপ্নে রুমের বাদশা হতো। জেগে যেমন আজ এ বাড়ী ভিক্ষা কর্‌লে, কাল সে বাড়ী করলে; স্বপ্নেও তেমনি আজ এর গর্দ্দানা নিলে, কাল ওকে তালুক দিলে, বলতে পার তার কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা? বলবে এটা গল্প—হ'তে পারে কিন্তু চাঁদ! তুমিও যদি স্বপ্নে সূর্য্য দেখ, দেখে মিথ্যা বলতে পার, তাহ'লে বোলো, তোমার সে সূর্য্য মিথ্যা, এ সূর্য্য সত্য।

কালা—স্বপ্নে কি কখন মনে হয় যে, স্বপ্ন দেখছি?

চিন্তা—জেগেও কি কখন মনে হয় না যে, মিছে দেখছি? দেখ; চোখওলা অবিশ্বাসে বড় ফ্যাঁসাদে ফেলে দিলে। ১ম অঙ্ক, ৩গ।

কালাপাহাড়ের হৃদয়ে 'প্রত্যয়' জাগিয়া উঠিল।

আমরা শুনিয়াছি প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সাকারবাদীদের প্রতি মাঝে মাঝে কটাক্ষ করিতেন। তর্কের সময়েই এ ভাবটী তাঁহাতে বিশেষ লক্ষিত হইত। সাকারবাদী

গিরিশের সহিত তর্কে কিন্তু স্বামীজীকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সাকারবাদীদের ভগবানে বিশ্বাসকে 'অন্ধবিশ্বাস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। রামকৃষ্ণদেব তদুত্তরে বলেন, "আচ্ছা, অন্ধবিশ্বাসটা কাকে বলিস্, আমায় বলতে পারিস্? বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ; বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি? হয় বল্ 'বিশ্বাস' আর নয় বল্ 'জ্ঞান'। তা নয়, বিশ্বাসের আবার কতকগুলো অন্ধ আবার কতকগুলোর চোখ্ আছে এ আবার কি রকম? স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "ঠাকুরের কথাই ঠিক বুঝিয়া সেদিন হইতে আর ও-কথাটা বলা ছাড়িয়া দিয়াছি।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৮৬ পৃঃ।

যাহা হউক চিন্তামণির কথায় প্রত্যয় জন্মিতে না জন্মিতেই কালাপাহাড়ের অন্য অন্তরায় উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে তাহার জীবনে এক বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। নবাব কন্যা ইমান সঙ্গিনী সঙ্গে লইয়া এক উপবনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। তথায়—

রমণীয়
বন, নানা মত পশুপাখী কত, আঁখি
বিনোদন, ভীষণ দর্শন, পুলকিত
চিত হেরি অদ্ভুত আকার; আচম্বিতে
উঠিল হুঙ্কার, দুর হাহাকার ধ্বনি;
চূর্ণ করি লোহার পিঞ্জর, দুর্নিবার
কেশরী গর্জ্জিল; হত রক্ষিদল, উঠে
কোলাহল, জীবন-সংশয় সবে; কোথা
হ'তে, হেন অরুণ প্রভাতে, এল এক
ব্রাহ্মণ-কুমার; বধি দুর্ম্মদ কেশরী
এল, চ'লে গেল, কেহ না জানিল কিবা; ১ম অঙ্ক, ৩য় গ।

এই ব্রাহ্মণকুমারই কালাপাহাড়। নবাব তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য নানা স্থানে খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান পা'ন না, এদিকে নবাবনন্দিনীও সেই দিন হইতে তাহার জন্য একেবারে জ্ঞানহারা——উন্মাদিনী। কোন হকিমই তাহার ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিতে না পারায় রাজধানীতে

ঘোষণা দেওয়া হয় যিনি ইমানের ব্যাধি উপশম করিতে পারিবেন নবাব তাহাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার প্রদান করিবেন। চঞ্চলা সেই ব্যাধি উপশম করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

এই চঞ্চলার আবার কালাপাহাড়ের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। তাহার—

মদন-তাড়নে,
হৃদি-হুতাশনে দগ্ধ প্রাণ অহরহ,
পিপাসী পরাণ, নাহি অন্য
ধ্যান, কোথা পাব প্রাণ ধনে! ১ম অঙ্ক, ১ম গ।

কালাপাহাড়ের কিন্তু আবার রমনী জাতির প্রতি বড় বিরাগ। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি তাহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুসরণেরই অভিব্যক্তি।

"ঘৃণায় কখন হেরি নাই ললনায়,
অবহেলা করেছি মাতায়; কর্ণপাত
করিনাই পিতার কথায়; নারী প্রতি
সদা হীন বোধ, উপরোধ মানি নাই
কভু কার; করিনাই উদ্বাহ স্বীকার;
১ম অঙ্ক, ৫ম গ।

লেটো তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তামণিকে বলিতেছে—"বাবাজি, কিন্তু ওর শক্ত জান। অ্যাদ্দিন সাম্‌লে চলেছে, বল্‌বো কি বাবাজি যেমন মড়া দেখলে শুকুনি পড়ে, তেমনি ছিষ্টির ছুঁড়ীগুলো ওকে খাবার চেষ্টায় খালি ফেরে! কত বেটী কত ঠাট্ ঠমক ক'রে কথা কইত, ও কিন্তু ফির্‌তো না। কারুর কথায় কান দিতো না, তাই বেটীরা বল্‌তো কালা। আর ঠিক ঐ ব'সে ধ্যান ক'র্‌তো, নড়তো না, তাই বেটীরা নাম দিয়েছিল পাহাড়। কিন্তু আজ ত পাহাড় কাত; (৩য় অঙ্ক, ১ম গ)—আজি—

"প্রতিশোধ বুঝি তার এতদিনে।
মন চায়, অনিমিষে হেরিতে বালায়।"

ইমানের রূপ, তাহার উন্মাদিনী ভাব ও অভিনব ভাষা কালাপাহাড়কে বিচলিত করিয়া ফেলিল।

চঞ্চলার লালসা-তাড়িত কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় বটে কিন্তু কালাপাহাড় অঙ্গনার অব্যর্থ সন্ধান জানিয়া অচিরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

এই স্থানেও কামিনীর প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবার জন্য চিন্তামণি কালাপাহাড়কে যে সমস্ত উপদেশ দেন, নসীরামে তাহার অস্ফুট ধ্বনির পূর্ব্বসূচনা থাকিলেও অনাথনাথের ন্যায় কালাপাহাড়ের মনে সহজে তাহার রেখাপাত হয় নাই। তবে তাহার বিস্ময়মুগ্ধ মনে কাতর প্রশ্ন জাগ্রত হইল—

"এ কে? এ বালক নয়, পাগল নয়, মূর্খ নয়, পণ্ডিত নয়, এ কে এ? কি ভাবে থাকে?" ২য় অঙ্ক, ৩য় গ।

কালাপাহাড় প্রশ্ন করিতেছে—মানুষ কি কেবল টাকা, ছুঁড়ি, আর মান নিয়েই ঘুরছে? নিঃস্বার্থ কাজ করে এ কথা তুমি মান না?

চিন্তা—নিঃস্বার্থ তো দয়া, পরের উপকার। তবে তাই শুন। আমার তো দয়া আছে, দয়া ক'রে যদি কখনও চারুকে কিছু দিই তো মনে হয়, যদি একটা মেলা হতো, লোক জড় হয়ে দেখ্‌তো, কারুকে কিছু লুকিয়ে দিলে মনে হয়, আমি তো লুকিয়ে দিচ্ছি; আর পাঁচ জনে দেখলে তো তাদের চোখে আগুন লাগতো না! তারপর কোন আত্মীয় বন্ধুকে গোপনে ডেকে বলা আছে, অমুক লোকটা এসেছিল, তাকে কিছু দিলেম, বড় দুঃখে পড়েছিল, তাই দিলেম। যদি কখনও কারুর উপকার করি, আর সে যদি জন্মের মত আমার গোলাম না হয়, অম্‌নি রাগের পরিসীমা থাকে না। বলি, বেইমান, সয়তান, অকৃতজ্ঞ! লোক দেখাতে দিলেম, সেটাই বা নিঃস্বার্থ কি হলো? আর উপকার ক'রে কৃতজ্ঞতা পিত্তেশ ক'রে রইলেম, সেই বা নিঃস্বার্থ কি হলো?

কালা—তুমি এম্‌নি?

চিন্তা—আর কেন বল ভাই! মনের কথা আর কেন জিজ্ঞেস কচ্ছো? তোমায় বল্‌বো কি, এক দিন সমস্ত রাত ভগবানের ধ্যান কর্‌লেম, কত প্রাণ ব্যাকুল হলো, ভক্তিতে চোখ দিয়ে জল বের হলো, এ সব তো তখন হলো। ধ্যান ছেড়েই মনে হলো, হায় হায়, ভোর

রাত্রি ব'সে ধ্যান কর্‌লেম, দর দর ক'রে চোখ দিয়ে জল বের কর্‌লেম, কেউ দেখলে না! সেই দিন থেকে মনকে বুঝে নিয়েছি যে, আগুন না সেঁধুলে কয়লার ময়লা ছোটে না।

কালা—তুমি কি কর?

চিন্তা—চুপ ক'রে ব'সে মন ব্যাটাকে দেখি, খালি ব্যাটা ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ফির্‌ছে; কেন যে তা মনের কথা মনই বুঝে না, বল্‌বে কি! বলে ব্যাটা, সুখের জন্ম ঘুরি, আর সৃষ্টির অসুখের কাজেই ঘোরে।

কালা—তুমি জ্ঞানী।

চিন্তা—বা রে আমি! আবার বা রে তুমি!

কালা—কেন, আমি কি?

চিন্তা—তুমিও জ্ঞানী। মন সুখের কাজে ফিরে, এই কথা জানার নাম যদি জ্ঞান হয়, তা হ'লে দুনিয়ার সবই জ্ঞানী। কিন্তু দেখছ মনের ফাঁকি, জেনে শুনে সেই অসুখের কাজই করে, একবার যদি চোখওয়ালা অবিশ্বাস দিয়ে দেখ, তা হ'লে বুঝতে পার্‌বে যে, মানুষ কত হুঁসিয়ার। অসুখ খুঁজছেন, আবার অসুখের নামেই শেওরাচ্ছেন।

কালা—অসুখ খুঁজছে কি রকম?

চিন্তা—অষ্ট প্রহর বল্‌ছে ভারী অসুখ, আর পারিনে, আবার সেই কাজই কর্‌ছে। একটা লোক ছিল, সে সৃষ্টির ফেলা হাঁড়ী ভেঙ্গে বেড়াতো, আর বল্‌তো, পারি নি। লোকে তার নাম দিয়েছিল পাগল। যাঁরা পাগল বল্‌তেন, তাঁরাও বুঝতেন না যে, তাঁরাও ফেলা হাঁড়ী ভেঙ্গে বেড়াচ্ছেন। আমায় যদি কেই পাগল বলে, আমি বলি—তুই পাগল।

কালা—তুমি কখনও বে করেছিলে?

চিন্তা—না।

কালা—কেন?

চিন্তা—দেখ, আমার এক ভাই ছিল। ছেলেবেলা একদিন দেখি যে আমাদের বড়বৌ তার গলায় কাপড় দিয়ে ধরেছে। দাদা জোরে পারে, কিন্তু জুজুটির মত হয়ে রয়েছে, আমি চুপি চুপি এসে মাকে বল্লেম।

কালা—আচ্ছা, রমণীর কটাক্ষ কি কখনও তোমায় বিদ্ধ করে নি?

চিন্তা—বড় জোর ক'রে যোটাতে পারে নি, অমনি ভাস' ভাসা গিয়েছে। একে তো বেটীদের ভয়ে সরে বেড়াতুম, ভাবতেম কোন্ দিন গলায় কাপড় দেবে, তার পর ভাবতেম, বেটীদের জোর কিসের? ঠাউরে দেখলেম, এক ফোঁটা রূপের। আমি মজা পেলেম আর কি। মনে মনে ঠাউরে দেখলেম যে, রোস, যার খুব রূপ, তাকে নেব। গুরু বলেন, খুব রূপ এক ভগবানের। এই সুন্দর সাগরে ভাসলেম আর কি! ছটাকে রূপ আর নজরে এলো না! কিন্তু এখনও বলছি, আমার গা ছমছমানি ঘোচেনি।

কালা—কেন?

চিন্তা—আরে বোঝ না, বেটী আর রূপ পেয়েছে কোথা? ও রূপ তো তাঁরই, ঈশ্বরের! ঐ ছটাকে রূপে তো জগৎ মজিয়ে রেখেছে। কাজ কি ওধার দিয়ে চলে? কেউ কাছে এলে রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিয়ে বসে থাকি। ২য় অঙ্ক, ৩য় গ।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "ঈশ্বর বড় চুমুক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুমুক পাথর, কামিনী কি ক'র্‌বে?"

যাহা হউক চিন্তামণির কোন কথাই এখনও কালাপাহাড়ের বৈরাগ্য জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই।

এদিকে যে চঞ্চলার বুদ্ধিবলে কালাপাহাড় ও ইমানের মিলন সংঘটিত হয়। উভয়ের অনুরাগ দর্শন করিয়া, কথা কহিতে কহিতে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া নবাবের কাছে সংবাদ পাঠাইল যে শাজাদীর অন্তঃপুরে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে, নবাবের আদেশে কালাপাহাড় কারাগারে প্রেরিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণিও পাহারাওয়ালার ভ্রমে ধৃত হন।

এখানেও চিন্তামণির সুখ দুঃখে সমান ঔদাসীন্য, ব্রাহ্মণ্যদেবের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরশীলতা তৃতীয়বার কালাপাহাড়ের প্রাণে গভীর রেখাপাত করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সংশয় আসিয়া আবার হৃদয় অধিকার করিল—

সংশয়—সংশয়—নারি করিতে নির্ণয়
কারামুক্তি দৈববলে, কিবা ছলে ভুলে
রক্ষক খুলেছে দ্বার !

অন্যদিকে আবার ইমানের জন্য 'অন্তরের গভীর বেদনা'—সর্ব্বদাই আত্ম-প্রকাশ করিত—

আহা, কোথা সুলোচনা ? মোর তরে
গিয়েছিল কারাগারে। কোথা আছে
বিনোদিনী, আর কি হেরিব মুখশশী ?

মানসিক এই অবস্থায় চঞ্চলা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিল ইমান তাহার প্রণয়ীর বন্ধনের কথা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; কালাপাহাড়ের প্রতিহিংসা-অনল জ্বলিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে আবার চঞ্চলার প্ররোচনায় "উচ্চ প্রলোভন" তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। চঞ্চলা তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল—

"প্রজার পীড়ন
হইবে দমন, তব শাসন মানিবে,
বাদসাহ দিল্লীতে কাঁপিবে, যশোগান
ভারতে গাইবে" ;

একদিকে সংশয় ও নারীর কটাক্ষ, তদুপরি প্রতিহিংসা ও হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ! চিন্তামণির বারণ ব্যর্থ হইল। বিদ্যামায়ার সুশীতল ছায়া পরিত্যাগ করিয়া কালাপাহাড় অষ্টসিদ্ধি লাভের আশায় অবিদ্যামায়ার মহামোহ পাশে আবদ্ধ হইল, চঞ্চলার পিতা বীরেশ্বরের কাছে মন্ত্র-দীক্ষা লইয়া মুকুন্দদেবের পক্ষ সমর্থন করিল, আর তাহার হৃদয় লোক হইতে শান্তি চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিল।

চঞ্চলার সহায়তায় নবাবের আদেশক্রমে আবার প্রণয়ী প্রণয়িনীর মিলন সংঘটিত হয়। এইবার সে যবন বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, কারণ তাহার মন মুসলমান-কন্যা ইমানের দাস, আর সে মহা-অশুদ্ধ জ্ঞানে বীরেশ্বর-প্রদত্ত সিদ্ধমন্ত্রও পরিত্যাগ করে কারণ সে "স্বার্থ-শূন্য প্রেমগুরুর দর্শন পেয়েছে, আত্মত্যাগ দেখেছে আর জেনেছে মনুষ্যত্বের নাম

আত্মত্যাগ"। কালাপাহাড় ক্রোধপরবশ হইয়া ইতিপূর্ব্বে যবনের বিরোধী হইয়াছিলেন, এবার মুসলমানবালার জন্য হিন্দুর বিরোধী হইতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না। তাহার কোষোন্মুক্ত অসি অনেক শোণিত পান করিয়াছে, এবার তাহাকে বিশ্রাম দিলেন।

কিন্তু চঞ্চলার চক্রান্তে স্বার্থশূন্য প্রেমও অধিকক্ষণ তাহার হৃদয়ে রেখাপাত করিল না; ঘটনা স্রোত নিবারণ করে কাহার সাধ্য? কালাপাহাড়ের হৃদয়ে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব—

"কভু মত্ত যবনীর ধ্যানে,
নিত্যতত্ত্ব অন্বেষণে; শক্তির অর্জ্জন,
প্রতিহিংসা শত্রুর দমন সাধ কভু;
বিরক্তি—বৈরাগ্য ভ্রান্তমতি ঘূর্ণমান।"

চঞ্চলার পরামর্শে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেব ইমানকে কারাগারে বন্দী করিলেন কিন্তু চিন্তামণি তাহাকে (ইমানকে) সত্যপথ দেখাইয়া দিয়াছেন "ঈশ্বর সঙ্গে আছেন"। এদিকে চঞ্চলা কালাপাহাড়কে বলিয়া দিল, "ফকিরের প্রেম পাশে বাঁধা"। ইমান চিন্তামণির কৃপা লাভ করিয়াছে, তাই—

ধ্যানে জ্ঞানে সাধু জনে কায়মন প্রাণ
করেছে অর্পণ; আশা পরম সম্পদ
পরমার্থ ইষ্টবস্তু পাবে—

কিন্তু কালাপাহাড়ের মন এখনও শুদ্ধ হয় নাই, সে এই সর্ব্বব্যাপী প্রেম বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহ জ্বালায় ইমানকে ধিক্কার দিল—

"তীব্র বিষ ঢালিলি ফণিনী—"

এই যখন মনের অবস্থা—কখনও পিশাচমন্ত্রের সংহারের উত্তেজনা—"যেমন জ্বলছিস্, সেই আগুণে পৃথিবীকে জ্বালা"—কখনও প্রণয়িনীর জন্য চিন্তা, হৃদয়ের সংশয় "ঈশ্বর মিথ্যা শাস্ত্র মিথ্যা, দেবদেবী মিথ্যা," কখনও বা যবনধর্ম্ম গ্রহণে ঐকান্তিক ইচ্ছা—এইরূপ নানা সঙ্কল্প বিকল্পে যখন তাহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান—একবার ঈশ্বরের নাম মনে হইল—"যদি ঈশ্বর থাক, দেখা দাও, আমার মন স্থির কর"। আর মায়াধীশ ভগবানও অমনি

মানব-শরীরে চিন্তামণি-রূপেই স্বরূপ বলিয়া দিলেন, "তুমি ক'দিক্ রাখবে বল! একবার ঈশ্বর-তত্ত্বে ঘুরছো, আবার রণক্ষেত্রে তলোয়ার চালাচ্ছ, *একবার পীরিত, একবার প্রতিহিংসা, একবার বাম্‌নাই আবার একবার* বৈরাগ্য, এত একটা মানুষে চলে না।"

কালা—ও, তুমি? আমি বড় বিপদে পড়েছি, যবনীকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি, কোন রকমে মন ফিরাতে পাচ্ছিনে—

চিন্তা—ফেরাতে পাচ্ছ না, না ফেরাতে চাও না?

কা—আমি কত চেষ্টা করছি, কোন মতেই ভুলতে পাচ্ছিনে, কি সর্ব্বনাশ হবে!

চিন্তা—দেখ, ঐ *ন্যাকামোটুকু* আমি বুঝতে পারিনে, তুমি তাকে চাও, আর বল্‌ছো চাইনে; দিনরাত্রি তাকে ধ্যান করছো, আর বলছো ভুলতে পাচ্ছিনে। মনে বুঝে দেখ, তাকেও চাও, আর বামনাইটুকুও চাও। দু রকম ত হয় না। মনটা কি জান? যেন ভাঁটার মতন, যে দিকে গড়িয়ে দেবে, সেই দিকেই গড়িয়ে যাবে। এখন মনে করছো সে আমার, সে আমায় ভালবাসে, তারে না দেখে থাক্‌ব কেমন করে। কেমন মুখখানি, কেমন চোখ দুটী……আবার একবার যদি ভাব সে তোমার শত্রু, তোমায় ছল ক'রে নিয়ে গেছলো, কামিনী কামকলা তোমায় কামের দশা করেছে, তা হ'লে আবার দেখ, মন কি বলে!

* * * *

কা—সে মুখ মনে পড়ে, আমার অন্তর গ'লে যায়।

চিন্তা—আচ্ছা, আর একটা উপায় বলি, তিন দিন হরি হরি কর, তা হ'লেই তারে ভুলে যাবে। কিন্তু সে তোমায় চায় না, চাইবার জিনিষ চিনেছে—

কা—সে কি আমায় ভালবাসে না?

চি—ভালবাসে না। তার আর তোর মত শুঁটকে ভালবাসা নেই, সে প্রেমময়ের প্রেমসাগরে ভেসেছে। প্রেম বিশ্বব্যাপী, তার সর্ব্বভূতে প্রেম, তার আর আত্মপর নেই, তার সব সমান হয়েছে।

* * * *

কা—আমার অবিদ্যা মন্ত্রতো আমায় ছাড়ে না—

চি—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোল। বিদ্যামায়ার শরণাপন্ন হও, প্রেমে রিপু জয় কর।

চিন্তামণির প্রভাবে এত শিক্ষা পাইয়াও কালাপাহাড়কে আবার প্রতিকূল অবস্থার দাস হইতে হইল। অবশেষে তিনি শুনিলেন—তাঁহার প্রাণাধিকা প্রেমাস্পদা ইমান হিন্দুরাজের বন্দী,—মুক্তি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই; তিনি স্বয়ং ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন; লুট করিয়া, ঘর জ্বালাইয়া, দেবদেবী ধ্বংস করিয়া মুসলমানধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, মুকুন্দদেবের হস্তে ইমানের প্রাণবধ হইয়াছে এই মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া তাহাকেও হত্যা করেন।

অতঃপরে যাহার মুখে ইমানের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কালাপাহাড়ের অনুতাপ জন্মিয়াছিল সেই প্রতিহিংসা-পরায়ণা চঞ্চলার হস্তেই তাহার মৃত্যুদর্শন করিয়া কালাপাহাড়ের হৃদয়ে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, তিনি সংসার অন্ধকার দেখিলেন। এইবার আবার চিন্তামণি দর্শন দিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে এতদিন "অহং অভিমানেই" তিনি মরীচিকার পশ্চাতে কেবল ঘুরিয়া ফিরিতেছেন, কিন্তু তাহার ভাগ্যে উঠিয়াছে কেবল হলাহল। তিনি সাধ করিয়াছিলেন কিসে বড় হইবেন, কল্পতরু-তলায় সব সাধই তাহার পূর্ণ হইয়াছে। এইবার যদি সাধ করিয়া পরমবস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাও তাহার লাভ হইবে। উদ্দাম মনোবৃত্তির প্রবল তাড়নে, সংশয়ের ঘোর তমসাবরণে, মানব যখন বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, সহজে পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বিশ্বাসই তখন একমাত্র পদার্থ, আর ব্যাকুল হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। চিন্তামণি বলিতেছেন "বিশ্বাস কর, বিশ্বাস বড় সোজা। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেওনা, সরল বিশ্বাসে সরল প্রাণে ডাক, পাবে।" এই বিশ্বাস ও ব্যাকুলতাই ক্রমে ক্রমে চিন্তামণি কালাপাহাড়ের হৃদয়ে জাগাইয়া তাহাকে বন্ধমুক্ত করিয়াছেন আর এই চিন্তামণির প্রভাবেই নাটকীয় গতি ট্রেজিডির দিকে না গিয়া অন্য ভাবে দাঁড়াইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নিজের যৌবন-চরিত্রে প্রতিচ্ছবি কৌতূহলী পাঠক সংশয়চিত্ত কালাপাহাড়ে পাইতে পারেন।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ভিন্ন এরূপ গুরুকৃপালাভ অসম্ভব। বন্ধন গেল, সংস্কার দূর হইল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা উন্মূলিত হইল, চিন্তামণি সোজাপথ 'বিশ্বাস' দেখাইয়া দিলেন, তাপিত কালাপাহাড় তাপহারীকে ডাকিলেন। চিন্তামণি, তাহার জ্বালা গ্রহণ করিলেন, কালাপাহাড়ের কাজ ফুরাইল, প্রেম কি তাহা জানিতে পারিলেন, প্রেমময়কে দেখিতে পাইলেন।

"নসীরামে" ও অনাথনাথ প্রেমময়ের দর্শন পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কালাপাহাড়ের ন্যায় উহাতে এত ঘটনার সমাবেশ ও বৈচিত্র্য নাই।

এই যে বিভিন্ন অবস্থা—প্রকৃতি প্রবৃত্তির অনুকূল প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, পুরুষকারের প্রচেষ্টায়, দৈবের নির্ব্বন্ধে, আশায়, নিরাশায় মোহে, ত্যাগে, কালাপাহাড়-চরিত্র পরিপুষ্ট হইয়াছে, এবং অবশেষে চিন্তামণির প্রভাবে কালাপাহাড়ের শান্তি ফিরিয়া আসে, ইহা কি নাট্যকারের কেবল নীতিকথা প্রচার, না অনাবৃত রূপ-রস-স্পর্শ-জনিত ভোগের স্থূল-বিবৃতি? বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া কালাপাহাড়ের গতি-নির্দ্দেশ করিয়া অবশেষে তাহার কাম প্রেমে পরিণত করিয়া নাট্যকার এখানে শ্রেষ্ঠ কলার পরিস্ফূরণ করিয়াছেন। একবিংশতি বৎসর পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাশ মহাশয়কে বলিতে শুনিয়াছি "শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealist ও নয়, Realist ও নয়, সে Naturalist. রূপের ভিতর যখন আত্মার রসটী জাগিয়া উঠে, তখনই তাহা সুন্দর। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায় তখনই সুন্দর, সুন্দর। এই সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্যই কল্পকলার সৃষ্টি।" এই শ্রেষ্ঠকলার অভিব্যক্তি "কালাপাহাড়" নাটকে।

এই অধ্যায়ে কালাপাহাড়ের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চরিত্র বীরেশ্বর। ইনি অষ্টসিদ্ধ পুরুষ, অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ—পরিচয় নিজেই চিন্তামণির কাছে বিবৃত করিতেছেন—

জন্ম মম ব্রাহ্মণের
ঘরে, কিন্তু অবিদ্যার বরে, করিলাম
অবিদ্যা অর্চ্চনা। ধনজন প্রতিষ্ঠার
নিয়ত কামনা মম, বাসনা-সাগর

উথলিল বালক হৃদয়ে ; বাসনার
মোহবশে, বালক-বয়সে ব্রহ্মচর্য্য
আচরণ, কামের দমন আকিঞ্চন
নহে, অবিরাম কাম-তৃপ্তি অভিলাষ ;
নিত্য যোগ-যাগ, দেব অনুরাগ, অষ্ট-
সিদ্ধি আশা জাগে মনে মনে ; শবাসনে
বসিয়ে শ্মশানে, ধ্যানে মগ্ন কাপালিক,
আসব সেবনপাত্র শবের কপাল,
নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, সতীত্ব-ভঞ্জন,
প্রবল ইন্দ্রিয় বলে নির্ভীক হৃদয় ;
পরম আরাধ্যে ত্যজি মহাবিদ্যা, দাস
অবিদ্যার——— ১ম অঙ্ক, ৪ গ।

এইরূপ পৈশাচিক সাধনায় বীরেশ্বর অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। সে চিন্তামণিকে বলিতেছে—

"জানিস্, বাঙ্গলার সিংহাসন কেন বার বার শূন্য হচ্চে? আমার কোপে। যে রাজা আমায় অবজ্ঞা করে, তার তখনি মৃত্যু।"

চঞ্চলার কাতর প্রার্থনায় প্রতিহত না হইলে কালাপাহাড়ও তাহার কোপে 'ভস্ম' হইত, চিন্তামণিকেও আবার সে ভয় দেখাইতেছে "জানিস্, এখনি তোরে মেরে ফেল্‌তে পারি।"

এই সিদ্ধাই (miraculous powers) বা যোগবলে, অনেক লোক নানা প্রকার শক্তিলাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধির বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়—

অনিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা।

কিন্তু ইহার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "চাইবার জিনিষ থাক্‌তে রাজার বাড়ী গিয়ে লাউ কুম্‌ড়ো মেগে আন্‌বো কেন?" তিনি আরও বলিতেন "ছেলে কাঁদছে, মা এক খানি খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে গেলেন, কিন্তু যে ছেলে খেলনায় ভোলে না, মা তাকে কোলে ক'রে ঠাণ্ডা

ক'রেন"। এই অষ্টসিদ্ধি মায়ের দেওয়া খেলনা মাত্র, ইহা পাইয়াই বীরেশ্বর ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মূল্য যে কত অকিঞ্চিৎকর চিন্তামণি তাহা বলিতেছেন—

"তুই আমায় মেরে ফেল্‌বি? আগুণে, জলে, তলোয়ারে, রোগে, সাপে, বাঘে, ভালুকে, কত নাম কর্‌বো বল্—কি সে না মরি? তোর এই জারি যে তুই কেউটে সাপটি! কারুকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখ দেখি তবে তোর বাহাদুরি বুঝি! তুই সিদ্ধি বস্তু কি ছাই নিলি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ভগবান কোথা একবার খুঁজলি নি?"

রামকৃষ্ণদেব একটী গল্পে বলিতেন "এক যোগীর কথায় হাতী মরে ও বাঁচে দেখিয়া নিকটস্থ জনৈক ভক্তসাধু জিজ্ঞাসা করে 'এতে আপনার কি এলো গেলো, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছেন, না, জরামৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছেন!' যোগীর চৈতন্য হইল।"

চিন্তামণিও বীরেশ্বরকে বুঝাইয়াছিলেন—

শক্তি কার? মূলাধার
ভগবান—শক্তির আকর; ভাবে মুগ্ধ-
নর শক্তিধর আপনারে; জলধরে
বর্ষে বারিধারা, চলে প্রণালী বহিয়ে
জল, জল নহে প্রণালীর; জেনো স্থির
শক্তি সেই মত। ১ম অঙ্ক, ৪ গ।

যাহা হউক এই কয়টী কথায়ই বীরেশ্বরের অষ্টসিদ্ধির অসারত্ব উপলব্ধি হয়। যেখানেই এই যোগ-যাগ ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য নয়, ভোগ সুখের ক্ষমতা লাভের জন্য, সেখানে ইহার ফল বিষময়, কারণ—

স্বার্থ আছে যার; অষ্টসিদ্ধি তার
ঘোর নরকের দ্বার; অষ্টসিদ্ধি শোভে
স্বার্থহীন নিরঞ্জনে।

বীরেশ্বরও পরে বুঝিয়াছিলেন "কল্প কল্পান্তরে এ বন্ধন না হবে ছেদন," তাই তাহার প্রাণ চাহিল মহামায়ার বিদ্যামূর্ত্তির শরণাপন্ন হইতে কারণ উহাই ———

ভবের নিস্তার, শুদ্ধমনে নিত্যধনে
যে করে অর্চ্চনা, শান্তি বসে হৃদাগারে।

কিন্তু প্রেমময় ভিন্ন আর কে শক্তির উপাসক বীরেশ্বরের প্রাণে শান্তি আনিতে পারে? তাহার তখন অন্তরে বাহিরে শিরায় পাপস্মৃতি জ্বলিতেছিল।

এই অবিদ্যামায়া একমাত্র বিদ্যামায়ার প্রভাবেই লুপ্ত হয়, কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়। বস্তুতঃ মহাশক্তির প্রভাব ভিন্ন এত প্রবল জড়শক্তির কিরূপে বিনাশ হইতে পারে? তাই চিন্তামণি বলিতেছেন—প্রেম ভিন্ন ছাড়াতে পার্‌বিনে, ভূতপ্রেত নিয়ে খেলা ভূতনাথের শোভা পায়, তিনি প্রেমময়। না হ'লে ভূতের রাজার ভূতেই ঘাড় ভাঙে———

৪র্থ অঙ্ক, ২গ।

বীরেশ্বর আত্মত্যাগে বনে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথের দারুমূর্ত্তি উদ্ধার করেন ও অতঃপর গুরুকৃপা লাভ করেন।

"চিন্তামণি বীরেশ্বরের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলে" তাহার অজ্ঞান-তিমির অন্তর্হিত হইয়া গেল, দিব্যদৃষ্টি খুলিল, তিনি পরমপুলকে জ্ঞানালোকে পরমব্রহ্ম দেখিতে পাইলেন।

অবতার পুরুষের কৃপা ও অন্যের পাপ গ্রহণে তাহাকে পরিত্রাণ চিন্তামণি-চরিত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

চিন্তামণি ইমানকেও প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে বলিতেছেন—

"তুই জানিস্ নি ঈশ্বরের নাম নিলে পাপ দূর হয়—তবে আর পয়গম্বর এসেছিল কেন। কার জন্য দেহ যন্ত্রণা সহ্য করেছিল?"

দোলেনাকে বলিতেছেন—"মা, ভয় করো না, ঈশ্বরকে ডেকেছ, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন"।

লেটো এবং দুলালের চরিত্রে চিন্তামণির শিষ্য-প্রীতি ও বাৎসল্যভাব পরিস্ফুট হইয়াছে! যে দৃশ্যে শিশু দুলাল চিন্তামণিকে মালা পরাইতেছে, এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দিতে চাহিতেছে, চিন্তামণি তাহাকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন, লেটোর চক্ষু আর্দ্র হইয়াছে, আর বালক

বলিতেছে—"তুমি হরি, মাকে বল্‌বো, যদি দেখ্‌তে চায়, দেখা দিও।"—ভাবে অতীব মধুর ও রামকৃষ্ণদেবের শিশু-বাৎসল্য অভিব্যক্ত।

লেটোর একনিষ্ঠ গুরুভক্তি ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। গুরূপদেশে রমণী-প্রলোভন তাহাকে কিরূপে অভিভূত করিতে পারে নাই, সে সম্বন্ধে লেটো বলিতেছে—

ভাগ্যিস্, বাবাজি, তুমি বাত্‌লে দিয়েছিলে! তা না হ'লে অ্যাদ্দিন লেটো ঘেটো, হেটো, মেঠো হয়ে চার খুরে চল্‌তো! মা বল্‌লেই বেটীদের জোঁখের মুখে নুণ! তা না হ'লে খালি শুষে খাবার চেষ্টা!

কালাপাহাড়ে চিন্তামণি-চরিত্রে রামকৃষ্ণদেবের সকল ধর্ম্মের প্রতি সমজ্ঞানও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে "বিল্বমঙ্গল নাটকে" আমরা এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান নাটকে চিন্তামণি বলিতেছেন—

যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি,
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা, গড,
ঈশ্বর, যিহোবা, বিশু নামে নানা স্থানে,
নানা জনে ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান-লক্ষণ, ভেদ বুদ্ধি কর দূর,
বহুনাম—প্রতিনাম সর্ব্বশক্তিমান্—
যার সেই নামে প্রীতি-ভক্তির উদয়,
প্রফুল্ল হৃদয়, যেই নামে মনস্কাম
পূর্ণ, সেইজন, সেই নাম উচ্চারণে। ৩য় অঙ্ক ৬ গ।

জাতিবিচার সম্বন্ধেও সেই সমদর্শিতা। সত্ত্ব-গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক, চিরদিনই শ্রেষ্ঠ। তমোগুণী হিন্দু সত্ত্বগুণী মুসলমান অপেক্ষাও হেয়। তাই চিন্তামণি বলেন—

সত্ত্ব, রজ, তম, বিশ্বসৃষ্টি তিনগুণে
সত্ত্ব গুণ অধিক যাহার, সত্ত্বগুণী
তার ব্যবহার; সত্ত্ব প্রবল যাহার,
আহার-বিহার সেই মত। রজোগুণে

কার্য্য অধিকার, জেনো সকলি তাহার
রজোভাব-উত্তেজক। তমোগুণে রীতি
নীতি সেই রূপ, যার যেই সংস্কার
আচার ব্যবহার, জন্ম তার তদাচারী
কুলে। সংস্কার মত জীবের জনম,
জেনো স্থির। হিন্দুর সমান সত্ত্বগুণী
মুসলমান, ম্লেচ্ছাধিক হিন্দু তমোগুণী
আচার-ব্যাভার জাতি কুলের লক্ষণ! ৩য় অঙ্ক, ৬ গ।

অতএব দেখা যায় জাতিভেদ গুণ-কর্ম্মমূলক, যেমন রামকৃষ্ণদেব বলিতেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা থাকের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে নাট্যকার কালাপাহাড়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জাত্যন্তর-গ্রহণ অনুমোদন করেন না—"আমি যবন ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌ব। ধর্ম্ম শাসন-বাক্য মাত্র। যা হবার হবে, আমি মুসলমান হবো। তা হ'লে তো আর বাধা থাক্‌বে না"— ৪র্থ অঙ্ক, ২ গ।

তিনি বলেন—অভিমানশূন্য জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেই কেবল জাতি-বিচার নাই। তাই চিন্তামণি বলিতেছেন—

"ঘৃণা, লজ্জা,
ভয়, জ্ঞান বলে পরাজয় করিয়াছে
যেই মহাশয়, অহঙ্কার-শূন্য জন,
তার নাহি জাতির বিচার। কিন্তু যেই
অজ্ঞান অধম, করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির
হেতু জাতি বিসর্জ্জন, হেয় সে পামর।
তমোগুণে তমোগুণী ভোগের প্রয়াসী।"

অভিমান-বর্জ্জিত মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জ্ঞানবলেই জাত্যভিমান বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের লোকাচার রক্ষণে ত্রুটী লক্ষিত হয় না। কেন না—

"যদি কেহ শক্তিমান্ সুমেরু-লঙ্ঘনে,
সাগর শোষণে ক্ষম; আজ্ঞা যদি চন্দ্র,
সূর্য্য, গ্রহগণ মানে, পবন গমন যদি
বারে, লোকাচার উচিত রক্ষণ।" ৩য় অঙ্ক, ৬ গ।

জনা।

গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ 'বিশ্বাস' সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা ধর্ম্মজীবনে উল্লেখ করিয়াছি। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "বিশ্বাসের জোর কত তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে রামচন্দ্র যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হইল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়্‌ল! তার সেতুর দরকার নাই।" এই জ্বলন্ত বিশ্বাস "জনার" বিদূষকে পরিস্ফুট হইয়াছে।

বিদূষক এক অভিনব চরিত্র। এমন সরল, বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত চরিত্র এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই।

"এক নামে মুক্তি পায় নরে,
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।"

এই 'একনামে মুক্তি' (একবারে নাম ক'ল্লে ত'রে যায়,) এই বিশ্বাস—বিদূষক-চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছে। বিদূষকের কোন বাহ্যিক বর-গ্রহণের আবশ্যকতা নাই, সে জানে "হরি দয়াময়, নাম কল্লেই হ'ন উদয়।" অগ্নি জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোমার রাজার জন্য এত দয়া? তোমার আপনার দশা কিছু ভাবনা?" তাহার প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করে "ওই যে তোমার ঠেলায় প'ড়ে বিশ বার হরি হরি বল্লুম, একবার নাম ক'ল্লে ত'রে যায়। আমার উপায় হ'য়েছে, তোমায় ভাব্‌তে হবে না।"

পঞ্চম অঙ্কে ব্রাহ্মণীর সহিত কথোপকথনে এই বিশ্বাস আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। বিদূষক বস্ত্র দিয়া চক্ষু বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণী—"ওঃ! হরি তোমায় দেখা দেবার জন্যে অমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মিন্‌ষের বায়ান্তুরে ধরেছে।"

বিদূষক—"আরে থাম্ থাম্, ওরে জানিস্‌নে, ডাক্‌লেই এসে উঁকি মারে।"

ব্রাহ্মণী—"উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণ নাম আনেন না। কত যোগী ঋষিরা

গাছের পাতা খেয়ে ধ্যান ক'রে কিছু ক'র্‌তে পারে না, আর উনি হরির দেখা পাবেন!"

বিদূষক—"আরে রেখে দে তোর ধ্যান, জপ! "ও নামের" ঠেলা জানিস্‌নে!"

ব্রাহ্মণী—"তা তোমার কি, তুমি ত ভুলেও নাম কর না।"

বিদূষক—"আরে, ঝক্‌মারী ক'রে ফেলেছি বই কি? তোর মনে নেই, সেই যে দিন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য মোণ্ডা তুলে রাখলি, আমায় খেতে দিলি নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলুম "দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বাম্‌নীর হাতের খাড়ু খোল", সেই অবধি আমার গা-ছমছমানি একদিনের তরে যায় নি।"

এই বিশ্বাসে তাহার মুখে কৃষ্ণ-নিন্দা—"হরিকে ডেকে ঐহিকের ভাল কারু কখনও হয়নি"—"লোকে ভয়ে কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াময় কেবল খুঁজছেন কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখ্‌বেন, কোন সতীর কঙ্কণ খুল্‌বেন, কোন কুল নির্ম্মূল ক'রে গোপাল হ'য়ে ননী খাবেন" —নিন্দাচ্ছলে ব্যাজস্তুতিমাত্র। তাঁহার কথা—"যদি ঐহিক সুখ চাওতো হরিনাম যেথা হয়, সেথা কানে অঙ্গুল দাও, আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠে শুভাগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ ধ'রে বনবাসে যান্, হরি ভব-নদীর কাণ্ডারী কিনা!"—ও প্রকৃত বিষয়বর্জ্জিত ভক্তেরই কথা, মোহগ্রস্ত, সুখাভিলাষী সংসার-অভ্যস্থ গৃহীর জন্য নয়। তাই অগ্নি বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণ, তোমার নিন্দা নয় স্তুতি, তুমি যথার্থ হরিভক্ত। হরি যে মুক্তিদাতা, তুমিই বুঝেছ।"

৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গ।

এই বাহিরে মোণ্ডাপ্রিয়তা—অন্তরে জ্বলন্ত বিশ্বাস যে মহাভক্তের হৃদয়ে, তাহাকে হরি স্বয়ং আসিয়া যে দর্শন দেন আর তাহার অসাধারণ ভক্তিবলে অসম্ভব ও যে সম্ভব হয়, গিরিশচন্দ্র নূতন ঘটনা-সংযোজন করিয়া সে সত্য প্রতিভাত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে জনার একমাত্র পুত্র বীরবর প্রবীরের নিধনসাধন হওয়ায় শোকে, রোষে ও প্রতিহিংসায় রাণী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ

করিয়াছেন। জাহ্নবীর মানসকন্যা ও সহচরী মহাতেজস্বিনী জনার রোষানল কে অবাধে এড়াইতে পারে? এই রোষে পুত্রহন্তা অর্জ্জুনের "অবশ্য হইবে তার শমন-দর্শন"। কিন্তু ভক্তবৎসল হরিই তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

পুত্র-শোকাতুরা প্রতিবিধিৎসা-পরায়ণ জনা অর্জ্জুনের অন্বেষণে বিপক্ষ শিবিরে সমাগতা—

করালিনী কাল ভুজঙ্গিনী
শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘনে, কাঁপে ওষ্ঠাধর,
দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ভীষণ,
অস্ত্রধারী প্রহরী বারিতে নাহি পারে।

রাণী অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া 'অর্জ্জুন' বলিয়া প্রবল দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন, আর অমনি সেই নিশ্বাস-অনলে উহা শুষ্কবৃক্ষে পরিণত হইল।

এই তপ্তশ্বাস ভক্তবৎসল ভগবান বৃক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। কিন্তু কোন্ মহাজন পুনরায় এই ভগবানরূপী বৃক্ষের জ্বালা ধারণ করিয়া উহাকে শান্ত,শীতল ও পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন? 'একনামে মুক্তি' এই ভাবের জ্বলন্ত-বিশ্বাসী বিদূষকের স্পর্শেই অশ্বত্থবৃক্ষ আবার নূতন পত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। আর ইনি হরি দর্শন করিবেন না ভয়ে যতই চক্ষু বন্ধন করিয়া রাখেন, হরি ও তাহার "বাপের বাগানের মালীর" ন্যায় ততই তাহাকে দর্শন দিতে ব্যাকুল-ভাবে সম্মুখীন হইয়াছেন। কিন্তু ভক্ত ও জেদ্ করিয়া ধরিলেন "ঠাকুর তোমার শঙ্খচক্রগদাপদ্ম (সংহারের মূর্ত্তি) দেখাবার জন্য তো আমি চোখ্ খুল্‌বোনা।" ভক্তাধীন হরি ভক্তের অপার বিশ্বাসে সপত্নীক ব্রাহ্মণকে, দ্বিভুজ মুরলীধর রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তিতেই দর্শন দিতে বাধ্য হইলেন। এই একবার হরিনামে মুক্তি, বিদূষক-চরিত্রে প্রকটিত হইয়াছে।

নাটকে বর্ণিত এই বিশ্বাস ও শুদ্ধাভক্তি অভিনয়েও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সেই ভাব প্রতিফলিত করিতে কি সমর্থ হয়? নাট্যকারের পরিকল্পনা সাত্ত্বিক অভিনয়ে ফুটাইতে পারিলেই হয়। জনার অভিনয়ের প্রথম তিনচারি রাত্রি সুপ্রসিদ্ধ নট অর্দ্ধেন্দুশেখর বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ

করিতেন। তাঁহার অভিনয়ে দর্শক হাসিতে চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু কৃষ্ণ-নিন্দার অন্তরালে হরিভক্তি ও বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করিত না। ইত্যবসরে তিনি এমারেল্ড থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিত্ব গ্রহণ করিয়া মিনার্ভা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর নাট্যকার স্বয়ংই এই ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, আর তখন হইতেই বিদূষকের চরিত্রের প্রকৃত ছবি দর্শকের চক্ষে উদ্ঘাটিত হয়। এই অভিনয়েও লোক হাসিত কিন্তু হাসির মধ্যেও ভক্তিরস এমন অদ্ভুত-ভাবে ফুটিয়া উঠিত যে এই মৌলিক চরিত্রসৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই গভীর শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছেন।

এক উত্তররামচরিত ব্যতীত প্রায় সকল সংস্কৃত নাটকেই বিদূষক চরিত্র শোভা পাইতেছে, আর সেই চরিত্রের বিশেষত্ব ভোজন ও রহস্যপ্রিয়তা। গিরিশও "ধ্রুব-চরিত্র" ও "নলদময়ন্তী"তে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। "জনা"র বিদূষকের জ্বলন্ত বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের মৌলিক পরিকল্পনায় নাটকে কিরূপ অদ্ভুত ভাব ধারণ করিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহা পাঠকের নিকটে প্রদান করিয়াছি।

"পাণ্ডবগৌরব"

বিদূষকের বিশ্বাস 'পাণ্ডবগৌরবের' কঞ্চুকী-চরিত্রে আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের আদর্শানুসারে এই নাটকের কঞ্চুকীও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, চরিত্রবান ও রাজার পরমহিতৈষী গৃহরক্ষক।—

অন্তঃপুরচরঃ বৃদ্ধঃ বিপ্রগুণ-সমন্বিতঃ
সর্ব্বকার্য্যেষু কুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।

কিন্তু তাহার চরিত্রে যে অনন্ত বিশ্বাস প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা গিরিশের নিজস্ব। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সুভদ্রাসহ বাণেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া অম্বিকাদেবীর কাছে বর চাহিতে বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পথে ঘোর অরণ্যানী, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, অগ্রসর হওয়া অসাধ্য—

শালবৃক্ষ নিবিড় কানন
পত্রে পত্রে ঠেকেছে গগন
দূরে ঘোর জলদ সমান—
বিদ্যমান শৃঙ্গধর;
উন্নত তৃণের শির
নরপদ চিহ্ন নাহি হেরি—

উভয়ের নিকটই পথ সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ উভয়েই দণ্ডীরাজের জন্য বিপদগ্রস্ত। তবে কঞ্চুকীর কৃষ্ণের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আর সুভদ্রা এখনও হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। যখন সুভদ্রা অগ্রসর হইবার পথ না পাইয়া বলিতেছে—

"ফিরিবার পন্থা না নেহারি।
চিত্তে নারি করিতে নির্ণয়
কোন পথে এসেছি কাননে
ঘোর বনে শ্বাপদ-ঝঙ্কার—
আগুসার হইব কেমনে?"

বৃদ্ধ সরল বিশ্বাসে সেই সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পথ দেখিতেছেন,

কারণ "ছোঁড়া বলেছিল, পথ না পেলে চোখ্ বুজে আমায় দেখিস্"। কঞ্চুকীর 'আলো ও পথ' বিশ্বাসে সুভদ্রা বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঠিক্ ঠাক্ বুঝিতেছেন—

"আমায় সেই ছোঁড়া বলেছিল, পূব্ পশ্চিমের ধার ধারিস নে, বলেছিল সব বিশ্বাস করিস্! তাই ঘেঁসেড়ার কথায় বিশ্বাস কর্‌লুম—শুনলুম যে পূবদিক নেই। মনে করিস্ নি ঘেঁসেড়ার কথায়—সেই ছোঁড়ার কথায়। সে বলেছে যে পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও সব মানিস্ নি। না মেনেতো ঠকিনি; তোকে তো বাণেশ্বরের মন্দিরে ধরেছি!"

কিন্তু তথাপি যখন সুভদ্রা কেবলই অন্ধকার দেখিতেছেন—

কহ বৃদ্ধ, কোথা তুমি দেখো আলো?
কালো—কালো—
গভীর কালোর উপর কালো
স্থূল কলেবর এ আঁধার!
যেন আঁধারে আঁধার ঢাকা
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেদিতে না পারে—

"কঞ্চুকী আলোতে পথ দেখিতে পাইতেছে,—পথপ্রদর্শক কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছে "তুই আমায় দেখতে পাচ্ছিস নি—তোর মনের ঘোর, প্রাণের ফেরফার। আমার হাত ধর্ আমার সঙ্গে চল্।"

এই মনের ঘোর, প্রাণের ফেরফারেই সুভদ্রার নিকট চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারময় বোধ হইয়াছিল, কৃষ্ণ সঙ্গিনীগণের গান শুনিয়াও সে দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারে নাই। এইবার সে বৃদ্ধের হাত ধরিল, বিশ্বাসীর সংস্পর্শে তাহার ও অন্ধকার দূর হইল, বুঝিল,—সেই অহেতুকী কৃপার মহাসিন্ধু কে? যার মুখ মনে পড়িলে "বৃদ্ধের সব গুলিয়ে যায়," য'র নাম "গলা কাট্‌লেও সে বলবে না" যাঁহাকে—

প্রভুভক্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ
পাইয়াছে ভক্তাধীনে প্রভুভক্তি-বলে।

সে অহেতুকী কৃপাসিন্ধু হরি ভিন্ন আর কে তাঁহাকে পথ বলিয়া দিবে? বুঝিল—

"হেতু শূন্য দয়াপূর্ণ কেবা ?
কার ধ্যানে আর বাহ্যজ্ঞান হয় দূর ?
নিশ্চয় অনাথনাথ কালো মিত্র তব।"

কঞ্চুকীর বিশ্বাস ভক্তিবলে অম্বিকাদেবীও দর্শন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, অষ্টবজ্র-সম্মিলনের পরে রাজার (দণ্ডীর) পিতৃলোক উদ্ধার পাইয়াছিল। তাহার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ উভয়পক্ষীয় নিহত যোদ্ধৃবৃন্দের প্রাণদান দেন আর এই ব্রাহ্মণের ভক্তির জোরেই দণ্ডীরাজের পিতৃলোকের উদ্ধারসাধন হয়।

"স্বপ্নের ফুল"

"কালাপাহাড়ে" দেখিয়াছি, বিদ্যামায়ার বলে অবিদ্যার বিনাশ হয়— "কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়।" যে অবস্থায় মানব উভয়বিধ মায়াই অতিক্রম করিতে সমর্থ, তাহাই নির্ব্বাণ। সংসারের মোহ, আশা, সুখের প্রয়াস, নিত্য নব অভিলাষ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। কিন্তু হায়! সব যে মনের বিকার—

"আশার প্রয়াস তার
সার মাত্র দুখভার।"

তবে এখন উপায় ? মন কিসে সুস্থির হইবে ? উপায়—

"কেন আর তোর সনে করি আকিঞ্চন
হওরে নির্ব্বাণ, যাও শান্তি নিকেতন।"

নাট্যকার, প্রেমিক ধীর ও অধীর এবং প্রেমিকা বেলা ও যূথীর প্রেমকাহিনীতে দেখাইয়াছেন প্রেম মোহ নয়, প্রেম আত্ম-বিসর্জ্জন— ভালবাসা সুখ নয়, দুঃখ (মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা দে' উঠে গেল)।

যে অবস্থায় এই উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দেওয়া যায় সুখ দুঃখ অতীত হয়, তাহাই **নির্ব্বাণ**—

"দুটো কাঁটা ফেলে দে দেখ,
সেই, সেই, সেই রে।
হেথা আমি নেই, তুমি নেই,
সেই, সেই, সেই এই।"

মনের মতন

এই মিলনান্ত নাটকেও ফকিরের চরিত্রে রামকৃষ্ণদেবের ছায়া পড়িয়াছে। বাদসাহ মির্জ্জান তাঁহার সেনাপতি ও বন্ধু কাউলফ্‌কে সহোদরাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। এক সময়ে কাউলফ্‌ শত্রু পরাজয় করিয়া স্বর্গীয় বাদসাহের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। মির্জ্জান বন্ধুকে অন্তঃপুরে প্রবেশে অধিকার দেন এবং বেগম গোলেন্দামও স্বামীর বন্ধুকে সমাদর করিতে ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু একদিন কাউলফ্‌ তাঁহার প্রণয়িনী দেলেরার নিকট অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমের রূপের প্রশংসা করেন। পরদিন বাদসাহ ছদ্মবেশে কাউলফের সহিত দেলেরার গৃহে আসিলে দেলেরা অন্যলোক দেখিয়া বিরক্তির সহিত ব্যঙ্গভাবে কাউলফের সঙ্গে তাহার জননী-সদৃশী বেগমের নাম উচ্চারণ করে। বেগমের প্রতি বাদসাহের ঘোরতর সন্দেহ হয় এবং তিনি ফকিরের বেশে ফকিরের সঙ্গে সংসার দেখিয়া বেড়ান। এদিকে কাউলফও গৃহত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করেন। অতঃপর বেগমের সতীত্বগুণে উভয়ের মিলন হয় এবং দেলেরাও তাহার প্রণয়ীকে ফিরাইয়া পায়।

ফকির সাধক। তাঁহার ঈশ্বরের অনুভূতি হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর-লাভ হয় নাই। তিনি বলেন "ঈশ্বর দেখা দেন, আবার লুকোন, আবার দেখা দেন, আবার লুকোন। আমার সাধন্ অবস্থা। আমার কার্য্য সাধনা, লাভ তাঁর ইচ্ছা।"

ফকির বলেন "আত্মত্যাগে মানব-কষ্ট দূর করাই ফকিরের কার্য্য, এই সাধনাই ঈশ্বরের কার্য্য। সাধনা দুঃখময়, সাধনা শান্তিময়।"

সুখদুঃখ সম্বন্ধেও তিনি বলেন "মানবজীবনের যন্ত্রণাই বন্ধু। দুঃখকে আদর ক'রে যদি সুখকে প্রত্যাখ্যান ক'রতে পার, তা হ'লে দেখ্‌বে যাকে তুমি সুখ বল, সে বাঁদীর মত তোমার পেছনে পেছনে ঘুরবে।"

"সংসারে সুখ বিশ্বাস, দুঃখ—সন্দেহ। যার বিশ্বাসী হৃদয়, সে ফকির হোক্—আর সংসারী হোক্—দুঃখের তরঙ্গ এক রকম কাটিয়ে যায়।

কিন্তু যার মনে সন্দেহ, সে দুঃখের তরঙ্গে ওঠে নাবে। দুঃখের তরঙ্গ তাকে নিয়ে খেলা করে, তার অসুখের জীবন।”

“সংসারে সুখ দুঃখ উভয়ই আছে। হেথা দুঃখের ভয় পাওয়া হীনতার পরিচয়।”

ফকিরের পরোপকারময় স্বার্থশূন্য আদর্শ ও উপদেশে মানবের কর্ত্তব্য স্থির হয়—ফকির বাদসাহকে বলিতেছেন “**মানবের হিতসাধন** ফকির ও সংসারী উভয়েরই কার্য্য। ঈশ্বর-কৃপায় আমার কার্য্য-সাধন হয়েছে, তুমি সিংহাসনে বসেছ, খোদা তোমায় বাদ্‌সাই দিয়েছেন, বাদসাই কর। আমি ফকির, ফকিরি করিগে। বাদ্‌সা, বুঝতে পেরেছ, সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না থাক্‌লে—ভগবানের সংসার প্রেমের সংসার স্বরূপ জ্ঞান হ'লে, কার্য্যের নিমিত্ত কার্য্য কল্লে—**পরহিত সাধন ক'লে,** ফকির বাদ্‌সাই দুইই সমান।”

এইস্থানে আমরা ভক্তি ও কর্ম্মজগতের সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছি। এই কর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

এই সমস্ত নাটক ব্যতীত **শঙ্করাচার্য্য, অশোক, তপোবল** প্রভৃতি নাটকেও রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত নাটক গিরিশের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে এমন ওতপ্রোতভাবে আবিষ্ট যে, আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উক্ত নাটকাবলী সম্বন্ধে সমালোচনা করাই শ্রেয়ঃ মনে করি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাতীয়তায় গিরিশচন্দ্র

বাঙ্গলার স্বদেশপ্রেমিক কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে বাঙ্গলার দুর্দ্দশার কথাকে সাহিত্য করিয়া তুলিয়াছেন। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মনোমোহন, গোবিন্দরায়, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও কালিদাস প্রভৃতি সকলের লেখনীই স্বদেশপ্রেমের ক্ষুদ্র বৃহৎ উৎস। কিন্তু বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইঁহারা কেহই কর্ত্তব্য-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই বা দিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। জাতীয়তার মন্ত্রগুরু বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বাঙ্গালীকে মন্ত্রদানের অনুশাসন স্বরূপ বলিয়াছিলেন—"আপনার পায়ে আপনি নির্ভর কর, অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি পরিত্যাগ কর, ভ্রাতৃবৎসল হও।" বঙ্কিমের তিরোভাবের পরে বাঙ্গালীকে নিজের পথ দেখাইয়া দিতে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় এমন সাহিত্যগুরু বোধহয় বাঙ্গলায় কেহ আবির্ভূত হন নাই। গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম খাঁটি বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেম, তাঁহার রাজনীতি গভীর দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত। তাঁহার দেশানুরাগে বিলাতীর নামমাত্র গন্ধ নাই, খাঁটি বাঙ্গলার জলমাটীর উহা অনুরূপ। গিরিশচন্দ্র যে স্বদেশপ্রেম প্রচার করিয়াছেন তাহার প্রথম ভিত্তি জাতির আত্মবোধ জাগরণে, পথ আত্মনির্ভরশীলতায় ও আত্মত্যাগে, বিকাশ আত্মবিকাশে। আমরা এই অধ্যায়ে তাঁহার দেশপ্রেমের সংক্ষেপে পরিচয় দিব।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশীয় যুগে এই মহানগরীতে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী-পরিচালিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়া আমরা সেই মহাসম্মিলনীর প্রভাব প্রথমে জীবনে অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। সত্য বটে, সমগ্র দেশে তখন নবধারায় প্লাবিত দেশবাসী নূতন আশায় উৎসাহিত, কিন্তু সেই সময়ে বাঙ্গলার উপেক্ষিত রঙ্গমঞ্চ হইতে রাজনীতি

সংসর্গ-বিরহিত নাট্যকারের সিরোজোদ্দলা ও মিরকাশিম অভিনয় দেখিয়া যাহা শিখিয়াছিলাম, জীবনে তাহা কখনও বিস্মৃত হইব না। সমগ্র জাতীয় মহাক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া অভিনয়-ক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলাম আমার বাঙ্গলা কত বড়, আর এই বাঙ্গলার বীর সিরাজ ও কাশিমালীর দেশপ্রেম কত গভীর, কত জীবন্ত, জ্বলন্ত ও কত হৃদয়স্পর্শী। বাঙ্গলার কথা, বাঙ্গলার সুখস্বচ্ছন্দ, বাঙ্গলার দুঃখদৈন্য, শত্রুমিত্র, পক্ষাপক্ষ দেখিয়া আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, বাঙ্গলার ইতিহাস এই প্রথমে সত্যভাবে আমার চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং ইহাই খাঁটি সত্য; আর এতদিনে যাহা শিখিয়াছি, কেবল নকল আলেখ্যে ভুলিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে কোনও উদ্দীপনাময়ী ভাষাই উদ্ধৃত করিবার আমার সাধ্য নাই। কিন্তু আমার দেশকে এই প্রথমে আমি চিনিলাম, আর পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে আমার জাতীয় শিক্ষা এই প্রথমে আরম্ভ হইল। ইহার পর দেশাত্মবোধের কত কথা কত স্থানে পড়িয়াছি, কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস সেই সময় প্রথমে শিখিয়া বাঙ্গলার কথা যাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছি, তাহার প্রভাবেই বাঙ্গলা হইতে যখন দেশমাতৃকার আহ্বান প্রথমে আমার মর্ম্মে পঁহুছিল, সেই আহ্বানে 'আকুল করিল মোর প্রাণ', মোহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম, আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না।

সত্য বটে—বাঙ্গলার সেই প্রথম জাগরণের দিনে 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' জাতীয়তা প্রচারে অল্প সহায়তা করে নাই, কিন্তু এই কয়খানি নাটকই গিরিশচন্দ্রের প্রথম জাতীয় সাহিত্য নহে। কতবার কবির লেখনীতে নূতন তত্ত্ব বাহির হইয়া দেশভক্তের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তখনও জাতীয় মহাসঙ্ঘ বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দেশের জনসাধারণকে বিশেষ কোন আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করে নাই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'গরুড়' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র যে মাতৃমন্ত্রের বীজ প্রথমে উচ্চারণ করেন, আজিও আমাদের কর্ণকুহরে তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"মাতৃমন্ত্র ইউরূপেই ফলে এমত নহে। বিপদ-শঙ্কিত আকবর রাণা প্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন, রাণা একজন

মাতৃ-উপাসক। ইতিহাসে শুনি তাঁহার জয় অপেক্ষা পরাজয় অধিক গৌরব বর্দ্ধিনী! যখন সমস্ত রাজপুতানা আকবরের সিংহাসন-তলে যুগলকরে দণ্ডায়মান তখন পুরুষসিংহ রাণার সিংহনাদ আরাবলী পর্ব্বত শুনিতেছে। দুর্জ্জয়-মুসলমান-শক্তি-সুরক্ষিত দুর্গ সকল একে একে পদানত হইতেছে, সভয়ে আকবর সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন। ইহা সকলই সেই মাতৃমন্ত্রের ফল। শতদ্রু-সলিল বিকম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ উঠিল—পাণ্ডুগণ্ড ইংরাজ শুনিল! দেখিতেছি এ মন্ত্র হীন ভারতবর্ষেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে কেহই ঈদৃশ হীন নাই—যিনি মনে করিলে এ মন্ত্র না গ্রহণ করিতে পারেন। তবে কি নিমিত্ত আমরা আপনাকে হীন বিবেচনা করি? সিদ্ধ মন্ত্র রহিয়াছে, হায় কেহ কি গ্রহণ করিতে নাই?" জাতীয় উদ্বোধনে এই মন্ত্রের আরম্ভ, এবং 'ছত্রপতি শিবাজী'তে ইহার অভিব্যক্তি। আর এই দীর্ঘ-পঞ্চবিংশব্যাপী স্বদেশী প্রচারে নাটাকার খাঁটি হিন্দুর ভাবেই তাঁহার জাতীয়তা প্রচার করিয়াছেন। তিনি হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু, অন্যের অনুকরণে হিন্দুর স্বতন্ত্রতা কখনও নষ্ট করেন নাই, এবং হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে তিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন ধর্ম্ম, আচার ও জাতীয়তা বিস্মৃত হইয়া বিদেশীর অন্ধ অনুকরণে মত্ত হইয়াছিল, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "মায়াবসানে" তিনি সতর্ক করিয়া দেন "আমি ইংরাজের অনুকরণের বিরোধী, ইংরাজের আচার ব্যবহার ইংরাজের উপযোগী, ভারতের অহিতকর"। "ছত্রপতিতে"ও তিনি স্বদেশীয়ের বিজাতীয় ভাবে ব্যথিত হইয়া আক্ষেপ করিতেছেন "বিজাতীয় আদর্শে সকলেই প্রায় বিজাতীয় ভাবাপন্ন, হিন্দুর হিন্দু পরিচ্ছদ নাই, হিন্দুর অভিবাদন নাই, হিন্দুর হিন্দুভাবে সদালাপ নাই"। আজ মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীকে এই কুশিক্ষা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সম্মুখে জাতীয়তা ও আড়ম্বরহীন জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং সমগ্র দেশই তাঁহার ত্যাগ, সত্যানুরাগ ও উচ্চাদর্শে সত্য খুঁজিয়া পাইতেছে। কিন্তু বঙ্গবাসীকে তিনিও নূতন কিছু শুনাইতে পারেন নাই। কি স্বদেশী প্রচার, কি আইনাদালত বর্জ্জন, এমন কি তাঁহার প্রেম, সত্য ও

অহিংসা কোন শিক্ষাই বাঙ্গালীর কাছে নূতন নহে। গিরিশচন্দ্রের নাট্যতরঙ্গ মন্থন করিয়া দেখিতে পাই, পত্রে পত্রে এই আদর্শই অমৃতায়মান। "মায়াবসানের" নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্রে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

"মোড়ে মোড়ে মোদের দোকান তুলে দিন, বড়লোক একত্র হয়েছেন, যে মদ খাবে তাকে সামাজিক শাসন করুন। নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন্। চক্ষের উপরে দেখ্‌ছেন দীন দরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজী চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় কর্‌তে পারে না। তাতে যে কি সর্ব্বনাশ হচ্চে একটু চিন্তা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারেন। এমন কুটীর নাই যেখানে মদের বোতল, শ্লিপ বোতাম্, সাবান, এসেন্স নাই। যদি বড় লোক একত্র হ'য়ে থাকেন সাধারণকে স্থনীতি শিক্ষা দিন্। পরিহিতাচারী হ'তে বলুন। বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে সেই টাকায় দীন দরিদ্রের সাহায্য করুন্"।

১ম অঙ্ক, ৫ গ।

উকীল এবং আদালতের সংসর্গ-বর্জ্জন ও পঞ্চায়েতপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের অভিমত মহাত্মার অসহযোগ ধর্ম্ম-প্রচারের অনেক আগেই রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। কালীকিঙ্করের মুখে গিরিশ দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন "গ্রাম, পল্লী, সহর মোকর্দ্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সকল বড় লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়ত ক'রে মোকর্দ্দমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন্। তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্টফি বেঁচে যাবে, কৌন্সলিরা কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্ছে সে টাকা দেশে থাক্‌বে। চরক্ বলেন, যেদেশে উকিল প্রধান, সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহারজীবীর সংখ্যা-বৃদ্ধি মারীভয়ের অন্যতম কারণ। এ ব্যয় আপনাদের হাতে আছে, এইটে আগে করুন"।

উকীলের হস্তে নেতৃত্ব স্থাপন করিতে অসম্মত হওয়ায় গান্ধীজীর প্রতি অনেক লোক তখন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রও বরাবর নির্ম্মম-ভাবে উকীলের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যদিচ দেশের সকল আইনব্যবসায়ীই সমান নহেন, "বিচারের সহায়তা

কর্‌বো, সমস্ত ভারতবর্ষের টাকা দিলেও অন্যায় কার্য্য কর্‌তে পার্‌বোনা” ।ই আদর্শে অনেকে ব্যবসা করেন কিন্তু দেশের অধিকাংশ আইনব্যবসায়ী যে স্বার্থান্বেষী, তাহাতে সন্দেহ নাই। “প্রফুল্লের” ভিলেইন (villain) রমেশের ত কথাই নাই; কৃষ্ণধন, সিদ্ধেশ্বর ও শিবুর চরিত্রেও (‘মায়াবসান’ ও ‘গৃহলক্ষ্মী’) উকীলের কুবুদ্ধির কতকটা আভাষ আছে—“উকীলের বুদ্ধি কুমারের চাক; যত ঘুরুবেন তত ঘুর্‌বে”। আর কালীকিঙ্করের উক্তিতে উকীলের কার্য্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়—

টি, রে—আপনি বলেন ওনি পাগল, দুষ্টু। লিগেল্ প্রফেসনের উপর ভারী হেট্রেড। আপনি জানেন কৌন্সুলীরা দেশের মাথা।

কালীকিঙ্কর—জানি, জানি, খুব জানি, ছেলে বেলা থেকে জানি। এরা না থাক্‌লে বড় বাড়ী হ’তো না, ঘর হ’ত না। পরের বিষয় ঘরে আস্‌তো না। ঘর জ্বালানো, গ্রাম লুট চল্‌তো না। ভাইপোয়ে বিষ খাওয়াতো না।

স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি সমভাবে স্পষ্ট ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্মোপযোগী। দেশীয় শিল্প কেন বিনষ্ট হইয়াছে, কি উপায়ে আবার উহার পুনরুত্থান হইবে, পূর্ব্বে শিল্পের জন্য এই দেশ কত সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল ছিল, কেন আমরা আত্মনির্ভরশীলতা শিখিতেছি না, সেই করুণ-কাহিনী কবি “মহা-পূজায়” গাহিয়াছেন—

কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারত সন্তান-গণে
কোন মতে শিখিল না আপন নির্ভর
শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিলনা কর।

এ দুঃখ কহিব কারে, তব শ্বেত পুত্র দ্বারে
পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে
শ্বেত-পুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে।

লবণের প্রয়োজন, নিত্য জানে জনে জন
তব পুত্র হ’তে তারা ক্রয় করি আনে
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে।

প্রিয় ভগ্নী সরস্বতী নানাবিদ্যা দিল সতী
করিতেন যদি হায় এই ভ্রান্তি দূর
ভারতের সমকক্ষ হ'ত কোন পুর ?

সুজলা সুফলা বামা, ফলে ফুলে সাজে শ্যামা
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল
শারীরিক শ্রম বিনা শরীর দুর্ব্বল।

কি কারণে দেশীয় শিল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দীন প্রজার সর্ব্বনাশ-সাধন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাহাও প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই—

বৃটোনিয়া—

বল সতি কি কারণে, ভারত সন্তানগণে
এতদিন শিল্পবিদ্যা করোনি প্রদান
চিরদিন শিল্প জান উন্নতি-সোপান।

সরস্বতী—

অনুমতি মমপ্রতি, কর নাই ভাগ্যবতী
রাজ্যোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায়
সে সাহায্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।

ছিল শিল্প নানামত, শ্বেত-শিল্প তেজে হত
নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না করে গ্রহণ
ভারত-সন্তানে দেহ আশ্বাস বচন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে হীরক জুবিলিতেও এই ভাবের সুস্পষ্ট আভাষ দেখিতে পাই—ভারতে কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব! লবণ সমুদ্র-বেষ্টিত ভারত লবণের জন্য লিভারপুলের ভিক্ষুক। যে ভারত-প্রস্তুত কাপড়ের পূর্ব্বতন জগদ্বিখ্যাত রোমে বিক্রয় হয়েছে, সেই ভারত এখন বিদেশের নিকট বস্ত্রের নিমিত্ত অধীন। "মহাপূজায়"ও এই কথা পাই—

"চিকণ বসন তরে, রোম আসি তব ঘরে,
জানাইত জন্মদে তোমায় প্রয়োজন!"

১৯০২ খৃষ্টাব্দের "ভ্রান্তিতে"ও তিনি এই কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। রঙ্গলাল ভূম্যধিকারী উদয়নারায়ণকে বলিতেছেন "আপনার অঙ্গে যে পরিচ্ছদ, তাহা কার হাতে প্রস্তুত? দিন দিন যে রাজভোগ প্রস্তুত হয়, তাহা কার অনুকরণে? কার দোকান হ'তে আস্‌বাব ক্রয় ক'রে আপনার রাজপ্রাসাদ সজ্জিত? কোন্ হিন্দু শিল্পীকে আপনি উৎসাহ দেন"? [৫ম অ, ৬গ]। রঙ্গলাল চরিত্রেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনের ভিত্তি, আমরা অন্যত্র তাহার সবিস্তার আলোচনা করিব। "হরগৌরীর" সৃষ্টি রহস্যের অর্থও এই যে শিল্পের মাহাত্ম কীর্ত্তনের জন্যই যেন দেবাদিদেব মহাদেব গৌরীমাতার হস্তে স্বয়ং শাঁখা পরাইয়া দিয়া পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন সাধন করিয়াছেন।

বাস্তবিক নাট্যকার নানাস্থানে যে স্বাদেশিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহারই পূর্ণবিকাশ—"সিরাজদ্দৌলা" ও "মিরকাসিম" নাটকে—অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলার জাতীয় উদ্বোধনে যাহা অল্প সহায়তা করে নাই।

হিন্দু-মুসলমান—একতা

হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্বন্ধে ও বাহ্য শিষ্টাচার অপেক্ষা আন্তরিক বিদ্বেষ-শূন্যতাকে তিনি একতার মূলীভূত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একতার ভিত্তি প্রেমে, এবং এই প্রেম ব্যতীত উভয় জাতির মিলন অসম্ভব। এক সময়ে কংগ্রেসের বড় বড় লোক অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াও, মুখে রাজনৈতিক ভ্রাতৃভাবের দোহাই দিয়া দেশোদ্ধার করিতে চাহিতেন, গিরিশচন্দ্র "মায়াবসানে" তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। মাধব হলধরকে বলিতেছেন—

আমাদের যে সব একতা হবে। মুসলমান, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টা, পার্শী, মান্দ্রাজী সব একত্র হয়ে পলিটিকেল ব্রাদার্স অর্থাৎ রাজনৈতিক ভ্রাতা হবো।

হলধর—তবে যে তুমি কাল দাওয়ানজীকে নবাব সাহেবের কাছারী লুট করবার জন্য লেঠেল্ পাঠাতে বল্‌লে?

মাধব—আরে, এ হ'লো বিষয়কর্ম্ম, আর সে হ'চ্চে রাজনৈতিক ভ্রাতৃভাব। আমি মিটিংএ নবাব সাহেবকে সেখ (Shake) করে রিসিভ করেছিলাম তুই তা জানিস্?

এইরূপ স্পষ্ট কথায় অনেকে মনে করেন, গিরিশচন্দ্র কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ "মায়াবসান" হইতে কালীকিঙ্কর চরিত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু বরাবর যিনি মহাসম্মিলন সমর্থন করিয়াছেন এবং যাঁহার রাজনৈতিক মতানুমত বহুপূর্ব্ব হইতেই দেশের হিতানুযায়ী, তাঁহার সম্বন্ধে একথা চলেনা। "হীরক-জুবিলি" ও "মহাপূজায়" তিনি স্বায়ত্ব-শাসন ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এবং জাতীয় মহাসম্মিলন সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি সেখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত আছে—"রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা এক জাতি, ভারতের স্বার্থ আমাদের স্বার্থ একীভূত, ভারতের ধনাগমে আমরা ধনী, ভারতের সম্মানে আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে আমরা উন্নত, একত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিব।" ভারতরক্ষায় গোরাবাহিনীর উল্লেখ করিয়া তিনি মহারাণীকে কাতর প্রার্থনা করিতেছেন "কেন মা, দুর্গনির্ম্মাণ, কেন এত বেতনভোগী গোরাসৈন্য? কেন এত অর্থব্যয়? চেয়ে দেখ তোমার রাজপুত সন্তান দণ্ডায়মান, চেয়ে দেখ রণব্রত রাজবৎসল শিখ, মারহাট্টা, মুসলমান, মান্দ্রাজী, পার্শি, অসি করে দণ্ডায়মান। দুর্গের প্রয়োজন নাই, আমরাই তোমার দৃঢ় প্রাচীর। যদি প্রয়োজন হয়, জগজ্জন দেখ্‌বে, যে ভিক্টোরিয়ার অধিকার-আক্রমণ বাতুলের স্বপ্ন-মাত্র। মা, অস্ত্রধারী সন্তানের কামনা পূর্ণ কর, ভারত রক্ষার অধিকার দাও"। বাঙ্গালীর অধিকার সম্বন্ধেও তিনি "মহাপূজায়" বলিতে ত্রুটি করেন নাই—

"দুর্গম অরণ্যে পশে, বোমজান হ'তে খসে
ভারত সন্তান সবে সমরে সহায়
ক্ষুদ্র বঙ্গবাসী দেখ, সৈন্য কার্য্য চায়।

[মহাপূজা, ১৮৯০]

বর্ত্তমান স্বদেশী নেতাগণ সমর বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য বহুবার আলোচনা করিয়াছেন। অন্যত্র ইংরাজের সহিত সমানাধিকার

লাভে ভারতবাসী যে প্রকৃত অধিকারী, তাহাও তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন "তোমার শ্বেত সন্তানের মত হবো, তোমার শ্বেত সন্তানের কার্য্য পাবো, তোমার শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্রণাগৃহে ব'সে ভারতের উন্নতি সাধন ক'র্‌বো।"

এই কথাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে অন্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

যদিচ গিরিশচন্দ্র বলেন "রাজভক্তিতে আমরা তাঁর শ্বেতসন্তান অপেক্ষা ন্যূন নই," তথাপি শক শাসন নীতির উল্লেখ করিয়া যে রাজনীতি প্রচার করিয়াছেন, বোধহয় বিদেশী শাসনকর্ত্তা মাত্রের পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে—"তাদের রাজনীতি ধর্ম্মনীতি নয়, এ নিমিত্ত তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে বিজিত রাজ্যের প্রজা বিনষ্ট হ'লে যে স্বার্থের জন্য প্রজাপীড়ন ক'রছে, সেই স্বার্থেরই ব্যাঘাত। বাণিজ্যাদি নষ্ট হ'লে প্রজা ধনহীন হ'লে, কি লুণ্ঠন ক'রবে? দারুণ পীড়নে প্রজাধ্বংস হ'লে কে তাদের দাসত্ব ক'রবে? প্রজারা রাজভক্ত হ'লে তাদের হ'য়ে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক শত্রু দমন ক'রবে—এ সকল উচ্চ-রাজনীতি তাদের রাজনীতির অন্তর্গত নয়"। বাসর, ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।

রাজনীতি ও দেশের বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে যাঁহার এইরূপ উচ্চধারণা, তিনি কিছুতেই কংগ্রেসের বিরোধী নহেন, তবে তিনি বলেন "আমি বিরোধী নহি, উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই"। তাই "মায়াবসান" নাটকে কালীকিঙ্কর বলিতেছেন "হিউম সাহেবের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য নাই। তিনি রাজাদের গোপনে অর্থ দিয়ে কংগ্রেসের সাহায্য কর্‌তে বলেন"।

ডাক্তার—প্রকাশ্য সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট বিরূপ হবেন!

কালীকিঙ্কর—আমি বুঝেছি, আপনারা কি বিবেচনা করেন, গবর্ণমেণ্টকে লুকুনো সহজ? আর যদিও সহজ হয়, যে কাজে গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষ, সে কাজ গোপনে করা কখনও যুক্তিসিদ্ধ নয়।

কৃষ্ণ—আরে মশায়, সব লুট্‌লো, সব লুটলে।

কালী—সে লুট কি আপনি নিবারণ ক'রবেন? নিশ্চয় জান্‌বেন,

ভারত অধিকারে ইংলণ্ডের স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি ত্যাগ ক'রবেন ? হিউম সাহেব যদি ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে থাকেন, তিনি সমস্ত অবস্থা তাঁর স্বদেশীকে বোঝান। যিনি যথার্থ লোকহিতকারী, তিনি একাই সহস্র, তাঁর কার্য্য কখনই বিফল হয় না।

ডাক্তার—অ্যাজিটেসন আবশ্যক, ভারতবাসীর অভাব ভারতবাসীর রেপ্রেজেন্ট করা উচিত। ১ম অঙ্ক, ৫ম গ।

এই সমস্ত উক্তিতে গিরিশচন্দ্রের মতামত বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ইংলণ্ড স্বার্থত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অ্যাজিটেসন কি রেপ্রেজেন্টেসনে যে কিছুই দিবেনা, তাহা ঠিক। অতএব মডারেট্ বা ভিক্ষা-নীতি কিছুতেই অবলম্বনীয় নয়। আবার গোপনে কোন কাজ সম্ভবও নয় এবং ফলবতী হওয়ারও আশা নাই। তাই গান্ধী-চিত্তরঞ্জন প্রবর্ত্তিত প্রকাশ্য পন্থাই একমাত্র উপায়। কবি দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি ভবিষ্যৎ চিত্র সাধারণ জনগণ অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বেই দেখিতে পান। তাই গিরিশ সেই সময়ে 'সেকেলে' বা প্রাচীন-তন্ত্রী বিবেচিত হইলেও বর্ত্তমান সময়ের প্রকৃষ্ট পন্থা তিনি বহু পূর্ব্বেই দেখাইয়া ভারতবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে বলিয়া গিয়াছেন।

একমাত্র একতা

ভারতে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্ম্মমত আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। গিরিশ বলেন "একমাত্র রিলিজিয়স ইউনিটী ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে আমাদের একতা বা মিলন সম্ভবপর নহে"। [মায়াবসান, ১ম অঙ্ক, ৫ গ]। ইহার অর্থ নয় যে, আমরা সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সম্মিলিত হইব। এ উক্তির উদ্দেশ্য সকল ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবত-প্রেমে পরস্পরের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন—ধর্ম্মবিদ্বেষ-শূন্য—হইয়া সেবাধর্ম্মে বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মিলন। "মায়াবসানে" যে religious ইউনিটির কথা আমরা প্রথম শুনিয়াছি পরবর্ত্তী সকল নাটকেই সেই একই সুর বাজিতেছে। "সৎনামে" হিন্দুর অনৈক্যের কারণ নির্দ্দেশিত করিয়া রণেন্দ্রের মুখে নাট্যকার বলিতেছেন—"মেরুশির, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে হিন্দুর বীরত্ব-গাথা অঙ্কিত রহিয়াছে, কিন্তু দেখ—

হিন্দুর পতন
অনৈক্য কারণ ;
দ্বেষ হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি অভিমান।

"সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্যজ্ঞান" যে হিন্দুর শাস্ত্রানুবচন, নির্ব্বাণ-কামী সেই হিন্দুর স্বজাতি-ঘৃণা এখন **প্রথম প্রক্রিয়া!** 'দেবদেবীনামে মহাপাপক্ষয়' এই উদার-ভাবাপন্ন হইয়াও হিন্দুর ব্যবহার আজ এত কুটিল! গিরিশ 'সৎনামে' অযথা শাস্ত্রব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া হিন্দুর উদারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। "সৎনাম" স্বদেশীযুগের উদ্বোধনের পূর্ব্বে রচিত হয়, আর সেই শুভদিনের ইহাই প্রথম রচিত জাতীয়তা-মূলক নাটক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই নাটকের একটু বিস্তৃতালোচনা প্রয়োজন।

"সৎনাম" ঐতিহাসিক নাটক। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে "জিজিয়া" কর প্রবর্ত্তিত হইবার পরে—মুষ্টিমেয় সৎনামী সম্প্রদায় মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ কারতরফখাঁর বিনাশ সাধন করিয়া প্রথমে তাহার দুর্গাধিকার করে। মস্তক মুণ্ডন করিত বলিয়া ইহাদিগকে 'মুণ্ডী' ও বলা হইত। বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈক তেজস্বিনী রাজপুত-রমণী এই বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন, তাঁহার উদ্দীপনায় সমগ্র কৃষককুল ক্ষেত্রকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে শত শত দুর্গ এই সৎনামী বা মাধ্যি সম্প্রদায়ের হস্তগত হয় এবং তাহাদের অদম্য সঙ্কল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বাহুবলে দিল্লী সিংহাসন অধিকার করাও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু হামিদখাঁ ও রাজপুত বিষণ সিংহের পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ মোগলসৈন্য অস্ত্র ধারণ করিতে লাগিল, স্বয়ং সম্রাট্ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও মোগল পতাকায় কোরাণের বয়েত্ সকল লিখিয়া সয়তান-উপাসক এই হিন্দু সম্প্রদায়কে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। 'সৎনাম' সম্প্রদায় পরাজিত হয়, বৈষ্ণবী ধৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করে এবং হিন্দুস্থানে জিজিয়া কর পুনরায় স্থাপিত হয়।

এই নাটকের প্রতি ছত্র জীবন্ত স্বদেশ-প্রাণতায় অনুপ্রাণিত। বীর

*রণেন্দ্র ও শক্তিরূপিনী বৈষ্ণবীর তো কথাই নাই, ফকিররাম যেন এই মহা-*সংগ্রামে 'রুদ্র অবতার হনুমান'। তাঁহার প্রতি ছত্রে দেশপ্রেমের অনাবিল উৎস প্রবাহিত হয়। তাঁহার শিষ্য চরণদাস সম্বন্ধেও পরশুরাম বলিতেছেন "আপনি প্রকৃত মুক্তাত্মা, কর্ম্মযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। দেশের কার্য্যই আপনার উদ্দেশ্য, কার্য্যই আপনার জীবন, আপনি ফলাফল-জ্ঞানশূন্য—নরকেও আপনি ভয় রাখেন না।" এই নাটকের স্থানবিশেষই উদ্দীপনা-পূর্ণ নহে, সমগ্র নাটকখানাই স্বদেশ-প্রেমের নবধারায় প্রবাহিত। রণেন্দ্র, ফকিররাম, চরণদাস, পরশুরাম ও সোহিনী প্রভৃতি সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক চরিত্র এবং তাহাদের বাক্য ও কার্য্যে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়।

শাস্ত্রায়ুধ মহান্ত ও পণ্ডিতবর্গের ধর্ম্মশিক্ষায় দেশে যে তমোভাব আসিয়াছে, সত্ত্বভ্রমে হিন্দু যে জড়তাপন্ন এবং এই তমোনাশ হইয়া কার্য্যকারী রজোগুণের বিকাশ না হইলে দেশোদ্ধারের যে কোন আশাই নাই, এই নাটকে তাহা বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ফকিররাম মহান্তকে বলিতেছেন "কেন মহান্তজী, তোমরা ত টোল ক'রে শিক্ষা দিচ্ছ নির্ব্বাণলাভ করো, যদি কেহ মারে, সে কিছু নয় স্বপ্নমাত্র! বাড়ী কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, সেও স্বপ্নমাত্র, একমাত্র পুত্রকে না খেতে দিয়ে হত্যা করে, সেও স্বপ্ন, কিছু নয় মায়া। খালি নির্ব্বাণ হওয়ার চেষ্টা করো"।

মহান্ত—আচ্ছা ফকির, তুমি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, কিন্তু শাস্ত্র ব্যাখ্যা নিয়ে দিবারাত্রি ব্যঙ্গ কর কেন?

ফকির—কে বলে ব্যঙ্গ করি? আ মরি মরি, এমন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা! মনে হয় শাস্ত্রকারেরা যদি জান্‌তেন যে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ পাঠ ক'রে ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনুষ্যাকারে গাছ পাথর হবে, সকল অত্যাচার সহ্য করবে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবেনা, তাহ'লে বোধহয় শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন ও তুষানল ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতেন্"!

এই অবস্থায়ই জাতীয় নাট্যকার তাঁহার দেশবাসীকে জলন্ত ভাষায় উত্তিষ্ঠত জাগ্রত বলিয়া উদ্বোধিত করিতেছেন "আপনার কি ধারণা যে হিন্দুস্থানে সকলে সত্ত্বগুণী, তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়, একবার চক্ষু খুলে দেখ যে ঘোর 'তম'তে দেশ আচ্ছন্ন, অলস কুম্ভকর্ণের

মত জড় হয়ে প'ড়ে আছে। অনলস হয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে তবে সে জড়তা দূর হবে, রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণ নাশ হবে। ভগবান্ বলেছেন, কার্য্যব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয় না। জড় তামোগুণ কি চৈতন্য লাভ কর্‌তে পারে? সৎকার্য্যফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়। তবে সে নির্ব্বাণের অধিকারী। জড় হ'য়ে থাক্‌লে যে সত্ত্বগুণী হয় তা মনে ক'রনা। আমাদের অপেক্ষা মুসলমান শ্রেষ্ঠ, তারা তমতে আচ্ছন্ন নয়—রজোগুণী বীরপুরুষ। বীরব্যতীত কেউ সত্ত্বগুণলাভ কর্‌তে পারেনা"। আমরা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সত্ত্বভ্রমে যে 'তম'তে আচ্ছন্ন হইয়াছি সেই বিষয়ে ফকিররাম নাগরিকগণকে বলিতেছেন "ধর্ম্মের ভাণ ক'রে হিন্দুর হৃদয়ে ভীরুতা অধিকার ক'রেছে। যদি বলবান হ'তে, যদি মুসলমানকে মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌তে, অত্যাচারে যদি বিচলিত না হ'তে, যদি অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডেকে তাহাকে না অভিশাপ দিতে, তা হ'লে জান্‌তেম যে ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রতিশোধ দাও নাই। কিন্তু—তা নয়, তোমার মার্জ্জনা ভয়ে;—মুসলমানের নিকট পরাস্ত হবে, এই ভয়ে মার্জ্জনা। দেখ কি ভীরুতা! সকলে ঐক্য হয়ে অগ্নিকুণ্ডে পুড়্‌তে চাচ্ছো, তার সম্মুখীন হ'তে সাহসী হচ্ছো না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর কি পরিচয় দেবে? হায়, মাতৃভূমির দুঃখে অন্ততঃ একজনও শোণিত দান করে, এমন সর্ব্বত্যাগী কেউ নাই।" [২য় অঙ্ক, ১ গ]

যাহা হউক পূর্ব্বকথিত মহান্তই বৈষ্ণবীর পিতা। মোগলহস্তে পিতৃহত্যার সংবাদ শুনিয়া উন্মাদিনী সহসা তেজস্বিনী হইয়া উঠিল। "মাস্ম ক্লৈব্যং গমঃ" প্রভৃতি গীতার শ্লোক তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল, এবং যেন কোন সংহার-রূপিণী দেবী তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন "দুর্ব্বল হৃদয়ে কাঁদবো কেন? নগবালা মহিষাসুর বধ করেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন, আমি মোগল বধ ক'র্‌বো"। রণেন্দ্রও গুরুহত্যার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। শুভলক্ষণ সূচিত হইল, কুমার-কুমারী শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বাধীনতাকামী স্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তির কর্ত্তব্য অতি কঠোর, কোন মোহ তাহাকে অভিভূত করিলেই কার্য্য পণ্ড হইবে, মহৎ সঙ্কল্পে যাহা অন্তরায়, দূর

করিতেই হইবে। তাই ফকীররাম রণেন্দ্রকে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন "দৃঢ়প্রতিজ্ঞের অর্থ তুমি অবগত আছ? একমন একধ্যান হ'য়ে কার্য্যে ব্রতী হওয়া, পাপ পুণ্য উভয়কে তুচ্ছ করা, শতশত প্রলোভন উপেক্ষা করা, কামিনী-কটাক্ষ না হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, কাঞ্চন না আকর্ষণ করে, সম্মানে না নরত্ব দূর করে। তুমি যদি এরূপ কুলতিলক পাশমুক্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, সত্যই তোমার অসাধ্য কিছুই নাই"। মহাকার্য্যে অনেক বিঘ্ন! তাই একনিষ্ঠ কর্ম্মীকে গিরিশচন্দ্র অমূল্য উপদেশ স্মরণ রাখিতে বলিতেছেন "রমণীর বড় মুগ্ধকারিণী শক্তি, কালসর্পের ন্যায় রমণীসঙ্গ ত্যাগ ক'রো, দয়া, মায়া, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য—নারী-প্রলোভন নানা রূপ ধারণ করে। মহামায়াকে মাতৃজ্ঞানে দূরে অবস্থান ক'রো, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবে।" ১ম অঙ্ক, ৩ গ।

এইরূপে রণেন্দ্রের কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাকে এই নিদ্রিত হিন্দুজাতিকে জাগাইতে হইবে। যে জাতি—'শত্রু শস্য কেটে নিক্, ঘর জ্বালিয়ে দিক্, ছেলে কেড়ে লউক্, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করুক্, শাস্ত্রে নিষেধ—তলোয়ার খুল্‌তে নাই,' নীতির অনুসরণকারী; যে জাতি অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দেশত্যাগ করে বা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, প্রতিশোধ নেয় না,—সেই মৃতজাতিকে উদ্বুদ্ধ করা বড় সহজ নহে; কিন্তু গিরিশচন্দ্র বলেন এক উপায়ে হিন্দু জাগিতে পারে—

ধর্ম্ম হিন্দু-জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ, হিন্দুকে জাগাইতে ও তাহার জাতীয় জীবন উন্নতি করিতে হইলে, এই ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। ধর্ম্ম হইতে তাহার জাতীয় জীবন পৃথক্ করিলে স্বদেশধর্ম্মে তাহাকে পাইবেনা। তাহাকে যদি বুঝাইতে পার যে স্বদেশ-রক্ষার জন্য তাহার মৃত্যু ধর্ম্ম-কার্য্যে মৃত্যু, তীর্থস্থানে মৃত্যু, তাহাহইলে এই হিন্দুর দ্বারা অসাধ্য সাধিত হইতে পারে। আমরা 'সংনামে' এই শাস্ত্রব্যাখ্যাই একাধিক স্থানে দেখিতে পাই। ফকিররাম বলিতেছেন "এমন হিন্দু অতি বিরল যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না। আত্মীয়-রক্ষা, স্বদেশরক্ষা এ সকল কথায় কর্ণপাতও করেনা, কিন্তু দেখ, মুসলমানেরা দেবদেবী ভঙ্গ কর্‌ছে, হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা ক'রে দেবদেবী ল'য়ে পলায়ন করে।

দেখাবার সে সময় তাহাদের মুসলমানের ভয় দূর হয়। তুমি যদি তোমার উপদেশও আদর্শে বোঝাতে পার যে মাতৃভূমির নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত যবনযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা অপঘাত নয়, কাশীমৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যে অস্ত্রধারণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়"। পুনরায় স্বদেশভক্ত চরণদাসের মুখে এই কথাই আরোপিত হইয়াছে—"মৃত্যুভয় হিন্দুর নাই, বাঙ্গালী ব'লে একজাতি হিন্দু আছে, জগৎ জুড়ে যাদের ভীরু ব'লে জানে, তাদেরও দেখেছি মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে জাহ্নবী তীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর ভয় কি জানো? যবনের হাতে ম'রে পাছে অপঘাত মৃত্যু হয়। হায় হায়, যদি এই সংস্কার দূর হয়, যদি গীতার প্রকৃত ধর্ম্ম হিন্দুরা হৃদয়ে স্থান দেয়, তা'হলে বুঝতে পারে যে আত্মরক্ষার জন্য, স্বগণরক্ষার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যবনবিরোধী হ'য়ে প্রাণ দিলে কোটী জীবন গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায়, হায়, এ ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পেলে ভারত অজেয় হ'তো। অযথা শাস্ত্রব্যাখ্যায় দেশ উৎসন্ন গেল"। এইভাবে স্বদেশ-ভক্তি লইয়া মোহিনী বৈষ্ণবীকে বলিতেছে—

মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন।
কিন্তু শুনি তোমার বচন,
সে বাসনা নাহি আর
যথাসাধ্য হব' তব কার্য্যে অনুকূল।
ক্ষুদ্র কার্য্য আমা হ'তে হলে সমাধান
ভাবিব মা সার্থক জনম।
বুঝিয়াছি কথায় তোমার,
যাগ-যজ্ঞ তপ-জপ নাহি কিছু হেন
মাতৃ-ভূমি-পূজা সম।

২য় অঙ্ক, ৪র্থ।

যাহাহউক রণেন্দ্রের একপ্রাণতায় ও সঙ্কল্পদৃঢ়তায় নাগরিকগণ দলেদলে সৈন্যশ্রেণী-ভুক্ত হইতে লাগিল। এই স্থানে ভীরু, কুতর্ক-নিরত জড়-ভাবাপন্ন দেশবাসী কিরূপ তাহার উদ্দীপনায় গৃহবাড়ী, পুত্র কলত্র

পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করে, তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। ভাষা, ভাব ও উদ্দীপনাশক্তিতে এই দৃশ্যটী অতুলনীয়। পরবর্ত্তী দ্বিজেন্দ্র-রচিত দুর্গাদাস নাটকের মহামায়া ও নাগরিকগণের কথোপকথন প্রায় তুল্যানুরূপ। রণেন্দ্র মাতৃভূমির জন্য শোণিত দান করিতে নাগরিকগণকে উত্তেজিত করিতেছেন—

মোক্ষলুব্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল ;—
চাহে সৎকার্য্যের ভার,
কার্য্য অনুষ্ঠান জীবনের সার,
একা, বহু, না করি বিচার—
আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্য্যে হয় ব্রতী ;—
হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি।
মুক্ত যেই পুরুষ প্রধান, সংসারে অসাধ্য কিবা তার ?
হে ধীমান ! মোরা সবে সৎনাম-আশ্রিত ;—
উচ্চরবে সৎনামের জয় করি গান
মহাকার্য্য করি অনুষ্ঠান,
রাখি **মাতৃভূমির** মান,
ধর্ম্মের গৌরব ব্যক্ত করি পুণ্যধামে।
এস ভাই মোক্ষ-লুব্ধ-চিত্ত কেবা।
এস এস মহাকার্য্যে কর, যোগদান। ২য় অঙ্ক, ১গ।

যাহা হউক, নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবার পরে রণেন্দ্রের পতন আরম্ভ হইল। 'মমতা' তাহার ধর্ম্মের নিষেধ, কিন্তু গুলসানা নাম্নী মুসলমান-কন্যা ছলে তাহার প্রতি রণেন্দ্রের মমতা জন্মাইয়া তাহাকে আকৃষ্ট করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই রমণীও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সৎনাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। রণেন্দ্রের পতনে সৎনামী সম্প্রদায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, আবার মোগলপতাকা উড্ডীয়মান হয়। নাট্যকার দেখাইয়াছেন এই 'মমতা' ও 'নারী-প্রলোভন'ই কিরূপে একটা রাজ্যের জয় পরাজয়ের কারণ হইয়া উঠে। ফকিররাম তাহাকে বারম্বার উপদেশ দিতেন "মহামায়ার নিকট প্রার্থনা ক'রো, যেন তিনি দয়ার বেশভূষায় কামকে না সজ্জিত

ক'রে তোমায় প্রতারিত করেন। মহামায়ার নিকট প্রার্থনা ক'রে নারী হ'তে দূরে অবস্থান ক'রো, এই আমার মিনতি"। কিন্তু রণেন্দ্রের আত্মবিস্মৃতি হওয়ায় বৈষ্ণবীর ন্যায় তেজস্বিনী রমণীর প্রভাব সত্ত্বেও তাহাকে মোগলের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়। এই পতন ও পরাজয়েই বৈষ্ণবী আক্ষেপ করিয়া বলেন—

"করিলাম মাতৃ-অপমান
প্রসাদ মুকুট তার দানি' হীনজনে।

বৈষ্ণবী এই নাটকের কেন্দ্রীশক্তি। তাহার উদ্দীপনায় সৈন্যসৃষ্টি হইয়াছিল, প্রেমিকের শুষ্ক প্রেম জন্মভূমির কার্য্যে প্রবাহিত হয় এবং সে সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে উত্তেজিত করিয়া সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করে। "সিন্ধু শোষে, মেরু টলে প্রতিজ্ঞার বলে"। এবং এই বলে সে উপলব্ধি করিত——

অলক্ষিতে শতকোটী যোগিনী সঙ্গিনী ফেরে
জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের তরে,
ইঙ্গিতে আমার সৈন্য হইবে সৃজন।

কৌমারী-শক্তি-সম্পন্না বৈষ্ণবী বুঝিল, শতশত যুবক বেশ্যার মোহে আবিষ্ট হইয়া আত্মীয়-স্বজন, গৃহবাড়ী, জন্মভূমি, সব বিসর্জ্জন দেয়, অথচ তাহাদের মধ্যেই অনেকে সামান্য নারীর অভাবেই সময়ে সময়ে বলীয়ান্ হইয়া উঠে, হেলায় নিজের প্রাণও বিসর্জ্জন দেয়। বেশ্যার মোহিনীশক্তিতে ও অশেষ কার্য্য হইতে পারে, তাই সে শ্রেষ্ঠা ও প্রবীণা বারাঙ্গণা মোহিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল, "মা যে শক্তিবলে অতুল ঐশ্বর্য্য উপায় করেছ, সে শক্তির প্রকৃত মূল্য লও নাই। যে শক্তি-প্রভাবে শতশত যুবক—পিতামাতা স্ত্রীপুত্র সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ ক'রে তোমার শরণাগত হয়েছিল, যদি সেই শক্তির-দ্বারা সেই যুবাবৃন্দকে উচ্চপদে চালিত ক'রতে, তা'হলে ভারতবর্ষে ভগবতী ব'লে তোমার ঘরে ঘরে পূজা ক'রতো। মা তুমি অবশ্যই শাস্ত্র জানো, অসুর নিধন নারীর মোহিনী শক্তিতেই হ'য়েছিল"। তিনি এই বিদ্যা শিখিয়া যুবতীগণের সহায়তায় তাহাদের সম্মোহিনী শক্তি-বলে পুরুষকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে একাকী শতশত যবনের সম্মুখীন করাইতে লাগিলেন, আর——

"মাতৃভূমি পূজাহেতু উৎসাহ-অনলে,
মহাপাপ দগ্ধ হ'ল সবাকার"।

সমস্ত বাহিনীর শক্তিই বৈষ্ণবী, কিন্তু রণেন্দ্রের দুর্বলতায় তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। দারুণ মনস্তাপ তিলতিল করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, কালানল সম তাহার হৃদয়তাপ লোমকূপ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল এবং তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন—

বৃথা উচ্চ কুলোদ্ভব নিরীহ যুবক,
উত্তেজিত পাপ-মন্ত্রে মম
প্রাণ দিল এ কাল সমরে।
পিতা, মাতা, **স্বদেশী**,
স্বধর্ম্মী, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন,
ভাসিল এ রণস্রোতে,
বৃথা এ বিদ্রোহ।

অতঃপর বৈষ্ণবী বাদসাহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মৃত্যুদণ্ড চাহিলেন। প্রকৃত দেশকর্ম্মী আজীবন শৃঙ্খল, স্বচক্ষে স্বদেশীর পীড়ন ও মাতৃভূমির লাঞ্ছনা দর্শন অপেক্ষা মৃত্যুতে অধিক শান্তি পায়, তাই বৈষ্ণবীর ইচ্ছামৃত্যু।

"সৎনামী" সম্প্রদায় কৌমারীর বরে জয়লাভ করিবে এই বিশ্বাসেই অনেকদূর পর্য্যন্ত সফলকাম হইয়াছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র গুলসানার মুখে বলিতেছেন এইরূপ বিশ্বাসে একটা বিপদ আছে, কেননা, বিশ্বাস ভঙ্গ হইলেই তাহার পরাজয় ও নিধন অবশ্যম্ভাবী। তাই উচ্চ কর্ত্তব্য বোধে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে——

যদি ধর্ম্মের স্থাপনে, মাতৃভূমি উদ্ধার কারণে,
হিন্দুগণে হ'ত উত্তেজিত,
দেশহিতে রত,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝে হ'ত ভারত জাগ্রত,
মোগলের সিংহাসন নিশ্চয় টলিত।
রাজপুত প্রতাপ-রাণা প্রমাণ তাহার,

অটল স্বদেশ-ভক্ত আকবর প্রভাবে।
শিবাজী, মারহাট্টা-দস্যু, দ্বিতীয় প্রমাণ,
শিখসেনা তৃতীয় দৃষ্টান্ত নরনাথ।

৪র্থ অঙ্ক, ৫ গ।

মৃত্যুকালে বৈষ্ণবী স্বদেশের উদ্ধার সম্বন্ধে যাহা দৈববাণী করিয়া গেলেন সকল দেশভক্তেরই তাহা শ্রোতব্য। বিশেষতঃ যে জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রেম বা 'রিলিজিওস্‌ ইউনিটি' নাট্যকার সকল দেশবাসীর পক্ষে একমাত্র মিলনের উপায় নির্দ্দেশ করেন তাহারও পরিচয় এই উক্তিতে—

যতদিন কামিনী কাঞ্চন
হিন্দুগণ করিয়ে বর্জ্জন
না করিবে দীনভ্রাতৃসেবা,
ততদিন কামিনী-কাঞ্চন-সঞ্চালিত
স্বার্থপর বর্ব্বরনিকর
রবে সবে পরাধীন বিধর্ম্মীকিঙ্কর।

এই সৌভ্রাতৃবন্ধন ও বিশ্বপ্রেমই ভারতীয় কর্ম্মী ও নেতাগণের একতা ও মিলনসূত্র। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ও বিবেকানন্দের সহিত গিরিশচন্দ্রের মতভেদ নাই। মহাত্মা যাহা কর্ম্মে, বিবেকানন্দ যাহা ধ্রুব-বাণীতে প্রচার করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তাহাই নাট্যকলায় সরস করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে প্রেরণ করিয়াছেন।

স্বদেশীর বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন করিয়া যাহারা বিদেশীর শক্তি বাড়াইয়া দেয়, গিরিশচন্দ্র তাহাদের সম্বন্ধেও নির্ব্বাক্ থাকেন নাই,—"মা গো, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিব্যতীত সুজলা সুফলা ভারতভূমি দীন হীনা কেন হবে?"

সৎনাম ৫ম অঙ্ক, ৩গ।

"সৎনামে" নারীশক্তি জাগরণ বিষয়ে গিরিশের উক্তি সম্পূর্ণ আধুনিক। বৈষ্ণবী অন্যান্য যুবতীগণকে বলিতেছেন, "ভারত-ললনা অনেকদিন ঘুমিয়েছে, আর ঘুমের সময় নাই। কুলাঙ্গনারা চিরাপরাধিনী, স্বামীর অধীন হ'য়ে উৎসাহবিহীনা হয়েছে। ভারতকে উৎসাহপ্রদান আমাদের কাজ, কুলাঙ্গনাকে উৎসাহপ্রদানে শিক্ষাদান আমাদের কাজ, ধর্ম্মের

জন্য, দেশের জন্য বক্ষের শোণিত প্রদান কর্‌তে উত্তেজিত করা আমাদের কাজ।"

২য় অঙ্ক, ২য় গ।

"আত্মত্যাগ"

"সৎনামের" পরবর্ত্তী তিনখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকই একসময়ে বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন সংগঠনে অপরিসীম সহায়তা প্রদান করিয়াছে। সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাসিম উভয় চরিত্রেই জাতীয় অধিনায়কের আদর্শ অনুস্যূত আছে। উভয় নাটকই হিন্দু-মুসলমানের একতা, ও নিঃস্বার্থ স্বদেশভক্তির জ্বলন্ত আদর্শে প্রাণময়। সিরাজ মীরমদনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখনও হিন্দু-মুসলমান জন্মভূমির অনুরাগে ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হ'য়ে সাধারণের মঙ্গলের সহিত আপনার মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচপ্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশবাসীর অপমান আপনার জ্ঞান করে, তবেই আশা, নতুবা নিষ্ফল।"

এই জাতীয়তা ও স্বদেশানুরাগ যে আত্মত্যাগের দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত, লুৎফ-উন্নিসার (বেগম) কাছে, সিরাজের আর দুই একটী কথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি বলিতেছেন "যদি সুখ ইচ্ছায় রাজ্যভার গ্রহণ কর্‌তেম্, তা হলে এ ছার রাজ্য পরিত্যাগ করে তোমার সহিত নির্জ্জনে বাস কর্‌তেম্। কিন্তু রাজ্যের সহিত আমার উপর গুরু ভার স্থাপিত। প্রজার মঙ্গলসাধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

নেতার আত্মত্যাগ ও প্রজাহিত সাধন রূপ পবিত্র আদর্শ মিরকাসিম চরিত্রে প্রকৃষ্টতররূপে অভিব্যক্ত। মিরকাশিমের নিজজীবনের আত্মত্যাগ ও আড়ম্বর-শূন্যতা যে আদর্শ নেতারই উপযোগী সে বিষয়েতো কথাই নাই। আমরা যথাস্থানে তাহার বিশদালোচনা করিব। অধীনস্থ সেনানায়ক-গণকেও তিনি এই আদর্শেই গঠিত করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে

তকীখাঁকে বলিতেছেন "অতি গুরুতর কার্য্য আমাদের উপস্থিত—কার্য্য আত্মত্যাগ। আমাদের আত্মগৌরব ত্যাগ করতে হবে। যশোলিপ্সা ত্যাগ করতে হবে। বাঙ্গালার দীনপ্রজা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।" জাতীয়তার মূলমন্ত্র স্বার্থত্যাগ কেবল সিরাজ ও মিরকাশিমের চরিত্রে নয়, বহুপূর্ব্বেই চিতোরের রাণাবংশের রাজকুমার চণ্ডের মুখেও ব্যক্ত হইয়াছে:—

অন্তরের গূঢ়স্থান কর অন্বেষণ
মন। পশি' অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ-আশ,
উন্নতি প্রয়াস, আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশ-বৎসল ভাব? আধিপত্যলিপ্সা,
কিবা চিতোরের হিতে চালিত অন্তর?
সত্যতত্ত্ব কর নিরুপণ। দেখ মন,
স্বার্থশূন্য নহে কি অন্তর? "চণ্ড" ১ম অঙ্ক, ২ গ।

আর 'মহাপূজায়'ও নাট্যকার এই কর্ত্তব্য দেখাইয়া বলিয়াছেন— "প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য তাহার স্বার্থসাধন নয়, 'স্বার্থ-বিসর্জ্জন'।"—

"শিখো যদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃ মন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা রহ জননী সেবায়" "মহাপূজা"।

"শেষ কথা"

উপসংহারে আবার বলা যাইতে পারে "একতা ভিন্ন জাতিগঠন সম্ভব নয়।" তাই গিরিশচন্দ্র বলিতেন "স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্যমাত্রেই এক জাতীয়, স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীনচেতা তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই! ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করে।" যে একতাসূত্রে সকল ধর্ম্ম, জাতি, সম্প্রদায় ও ব্যক্তি প্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম্মবিদ্বেষশূন্যতা ও সেবাধর্ম্মে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আবদ্ধ থাকিবে, যে 'রিলিজিয়স্ ইউনিটীর' কথা আমরা পূর্ব্বে কালীকিঙ্কর বসুর মুখে উল্লেখ করিয়াছি ও দীন-ভ্রাতৃসেবায় যাহা 'সৎনামে' অভিব্যক্ত, গিরিশচন্দ্র মিরকাসিম নাটকে

তারাদেবীর আদর্শজীবনে তাহার পূর্ণাভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। তারা দুঃখিনী বঙ্গমাতার দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য সকল স্থানে গমনাগমন করিয়া সকলকে শিক্ষা দিতেছেন—"ভাইদের ধর্ম্মশিক্ষা দাও, বাঙ্গলার কৃতঘ্নতা দূর কর, বাঙ্গলার সেবায় নিযুক্ত হও। প্রেমে সকলকে বশীভূত কর।" তাহার প্রেমশক্তিতে মেজর মনরোও কৃতজ্ঞতা-উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছেন "ইনি ঈশ্বর-প্রেরিতা রমণী, লড়াই শেষ হইলে দেখেন নাই, দেবদূতের মত আসিয়া সৈন্যদিগকে সেবা করিয়াছেন। তাহাতে ইংরাজ আর ভারতবাসী প্রভেদ করেন নাই। সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়াছেন, আমি উহাকে দেবদূত জানিয়া সেলাম করি"। (৫ম অঙ্ক, ৯ম গ, মিরকাসিম)। আজ ভারতে এইরূপ চরিত্রেরই একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, যেন তাঁহার শিক্ষাগুণেই দেশবাসী সমস্বরে বলিতে পারে "মায়ি, আজ তোর কাছে শিখলেম, ধর্ম্ম শিখলেম, কর্ম্ম শিখলেম, খোদার কার্য্য শিখলেম, **জন্মভূমির কার্য্যে স্বার্থত্যাগ শিখলেম**"। আজ গিরিশের এই বাণী, কোন ভাগ্যবান্ সফল করিবেন? কোন মহাত্মা প্রেম, জাতীয়তা, অহিংসা ও শত্রুমিত্রভেদে সেবাব্রত লইয়া নবভাবে নূতন ভারত গঠন করিবেন? ভারতের যশোগান প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনিত হইবে—

"জননী ভুবনমোহিনী, তীর্থকায়া কীর্ত্তিদায়িনী
বাল্মিকী ব্যাস গায় মা তোমার পূরা কাহিনী;
সাম গানে তপোবনে নিত্য তোমার আরতি।
কর মা নরত্ব প্রদান,
দে মা শক্তি, **মাতৃভক্তি**, কর গুণগান,
গগনে সমীরণে উঠুক ঐক্যতান
শুনি আর্য্যভেরি, কাঁপুক অরি—
পূজ্যবীর-প্রসূতি।"

"বাসন্তী।"

—)(০)(—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গিরিশ ও বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্দ্ধসমাহিত অবস্থায় একদিন মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে বলেন—"জীবে দয়া ক'রবার আমাদের শক্তি কৈ? শিবজ্ঞানে জীব সেবাই ধর্ম্ম।" বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "আজ একটা নূতন আলোক পাইলাম। যদি কখনও দিন পাই, এই সত্য কার্য্যে পরিণত করিব।" ইহাই নরেন্দ্রনাথের জীব-সেবাধর্ম্মের বীজমন্ত্র স্বরূপ হয়। আর এই সত্যের আভাসেই শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদিষ্ট কর্ম্মপথ শিবজ্ঞানে জীবসেবা বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী বলিয়া কঠোর কর্ম্মযোগী নরেন্দ্রনাথ যুগধর্ম্ম রূপে উহা প্রবর্ত্তিত করেন। এই সার্ব্বভৌমিক যুগধর্ম্ম গিরিশচন্দ্র কিরূপে তাহার কয়েকখানা নাটকে প্রতিফলিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে একদিন বসুপাড়ায় বলরাম-মন্দিরে কয়েকজন গৃহী এবং সন্ন্যাসী যুবকগণকে স্বামীজী বেদ-বেদান্ত ও উপনিষদ্ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন। সেই সময় গিরিশচন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলেন "নরেন, বেদ-বেদান্ত নিয়ে কি বকাবকি ক'রছ, সংসারের দুঃখটা একবার ভেবে দেখেছ কি? বাপ ক্ষুধিত ছেলেকে অন্ন দিতে পারেনা, জ্বরে কত হতভাগ্য ঔষধ পথ্য পায় না, শীতে কাঁপে, গায়ের কাপড় জোটেনা; সতীর ধর্ম্ম নষ্ট, গুণ্ডার অত্যাচার! এই সব দুঃখের প্রতীকার তোমার বেদে আছে কি?"

শুনিতে শুনিতে স্বামীজি সহসা উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "তাইত জি, সি, কি উপায় হয়? কি উপায় করি? এত দুঃখ, এত কষ্ট?" বলিয়া স্বার্থশূন্য সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র উপস্থিত যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই জন্যই তোদের স্বামীজীকে এত মানি, আদর্শ সন্ন্যাসী ব'লে নয়; অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, লেক্‌চার দিতে

পারে ব'লে নয়, পরের দুঃখ অন্তরে অন্তরে এমনি ক'রে বোধ করে বলে। দয়া ভিন্ন আবার ধর্ম্ম কোথায়?" এই বিরাট প্রাণই ছিল স্বামীজীর নরসেবার পশ্চাতে। স্বামীজী পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "জি, সি, যদি জগতের দুঃখ দূর করতে হাজার জন্মও নিতে হয়, তাতে কারও যদি এতটুকু দুঃখও দূর হয়, তাও শ্রেয়ঃ। ব্যক্তিগত মুক্তি দিয়ে কি হবে?"।

আমরা দেখিয়াছি দীন ভ্রাতৃসেবাই 'রিলিজিয়স ইউনিটি'। আবার ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। এই নরসেবা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলিতেন "নরসেবা তোমার একমাত্র ব্রত ক'রো, এই সেবাধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন করেন, জীবসেবা ছাড়া ব্রহ্মের আর কোন উপাসনা নাই। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক জীবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কোথায়?"

[গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধ—বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ]

স্বামীজী যখন দিগ্বিজয় করিয়া আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগত হন, গিরিশচন্দ্র গার্হস্থ্যনাটক "মায়াবসানে" এই প্রসঙ্গের প্রথম উত্থাপন করেন। রঙ্গিণী কালীকিঙ্করের সেবাধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিতেছে "মারীভয় উপস্থিত হ'লে কুটীরে কুটীরে সেবা ক'রতে তোমায় দেখেছি, পরের দুঃখে প্রাণ দিতে তোমায় উদ্যত দেখেছি, সামান্য জীবজন্তুর দুঃখে ব্যাকুল হ'তে তোমায় দেখেছি"। তিনি নিজেও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় যাদব ও মাধবকে বলিতেছেন "এই ফেমিন হ'য়েছে, গরীবের উপকার ক'রবার সম্পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত"। পরোপকারে তাঁহার পরমানন্দ, তাই ভাগিনেয় হলধরকে বলিতেছেন "তুমি লোকের উপকার ক'রে বেড়াও শুন্‌তে পাই, তাতে আমার আনন্দের সীমা নাই"। আশ্রিতা উপকৃতা বিন্দু বৈষ্ণবী বলিতেছে "তারপর ছোট কর্ত্তাকে দেখ্‌লেম, তাঁর দেবমূর্ত্তি দেখে আমার মনে হ'লো যে আমার বাপ, তিনি আমায় মা ব'লে ডাক্‌লেন, আমি

স্বামী বিবেকানন্দ।

ছ'মাস শয্যাগত হ'য়ে থাকি। সাহেব ডাক্তার দিয়ে ছোটকর্ত্তা আমার চিকিৎসা করিয়েছেন, যেমন মেয়ের ব্যামো হ'লো খরচ করে, সেইরূপ অকাতরে ব্যয় করেছেন"।

এখানে কালীকিঙ্করের চরিত্র সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহা করিব, কিন্তু যে আত্মত্যাগ ভিন্ন প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভ হয় না, যাহা ভিন্ন নরসেবায় অভিমান আসে, বন্ধন কাটে না, কালীকিঙ্কর অবশেষে সেই আভাস পাইয়াছিলেন। ত্যাগ অর্থে সংসার ত্যাগ নয়, দশকর্ম্মান্বিত প্রকৃত সংসারী হওয়া, মনুষ্যত্বলাভের নাম ত্যাগ। মরণে আত্মত্যাগ হয় না, আত্মা সঙ্গে যায়, আপনাকে বিলাইয়া দিলে তবে আত্মত্যাগ হয়। তাই কালীকিঙ্কর রঙ্গিণীকে বলিতেছেন "তোমায় এতদিন উপদেশ দিয়েছি, পরের উপকার কর; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাইনি কেন জান? মুখে বল্‌তেম্ নিষ্কামধর্ম্ম, —নিষ্কামধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফল কামনা ছাড়ে না। সুখ আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম্ম উপার্জ্জন ক'রতে পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি,—ফল কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে 'ফল' বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম; রইলেম কি জগতে মিশলেম।"

রঙ্গিণী—আমিও আভাস পাচ্ছি, আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি।

কালীকিঙ্করের যেখানে শেষ, রঙ্গলালের সেখানে আরম্ভ। "ভ্রান্তি" নাটকে রঙ্গলালের পরহিত-সাধন-ব্রত আত্মবিসর্জ্জনের সাত্ত্বিকতায় আদর্শ নরসেবায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। রঙ্গলালই বিবেকানন্দ, কর্ম্মযোগ সাধনার উৎকৃষ্ট ফল—বঙ্গীয় যুবকগণের আদর্শ। বিবেকানন্দ বলিতেন "বঙ্গযুবক বিশ্বাস করো, তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো, জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম"। তিনি বলিতেন "চাই একদল শক্তিশালী যুবাপুরুষ, তাদের দৃঢ় মাংসপেশী, কর্ম্মঠ দেহ, হৃদয় উন্নত, প্রফুল্ল অন্তঃকরণ, বন্ধন-মুক্ত প্রাণ।" রঙ্গলাল এইরূপই শক্তিশালী বন্ধনমুক্ত পুরুষ। তাহার শারীরিক শক্তির পরিচয় উদয়নারায়ণের মুখে পাওয়া যায়—

এখনি স্বচক্ষে আমি করেছি দর্শন
নিরস্ত্র একাকী
পঞ্চজন অস্ত্রধারী করেছ দমন
বহুকষ্টে ধরেছে তোমায়।

কারারুদ্ধ শালিগ্রাম ও নিরঞ্জনকে শৃঙ্খল মুক্ত করিবার সময় প্রহরীদের বাঁধিতে গিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া তিনি অদ্ভুত কৌশল ও সাহসের পরিচয় প্রদান করেন! এই স্বদেশভক্ত (জননী জন্মভুমির কার্য্যে তিনি তৃণের ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করতে পারেন) কর্ম্মীর প্রকৃত পরিচয় গঙ্গার মুখে পাওয়া যায় "পড়াশুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ারকিও দাও, চিকিৎসাপত্রও ক'রে থাক, যে থাও করোনি খবর রেখেছি, মেয়েমানুষের কাছেও যাওনা। আজ ক'বছরের কথা, আমি ঠাকুরতলায় সর্দ্দিগর্ম্মী হ'য়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি, বেশ্যাব'লে ঘৃণা ক'রে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়ীতে নিয়ে এলে, আপনি নীচেয় শুয়ে নিজের বিছানায় জায়গা দিলে, যে যত্ন ক'রলে ভালবাসার লোকও সে রকম করে না: তারপর যখন ভাল হ'য়ে আমি বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায় চেনই না"।

আত্মাভিমান বর্জ্জন করিয়া পরের জন্য আপনাকে বলি দিতে সমর্থ বলিয়াই তাহার এত সাহস ও শক্তি। তাই নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ যখন বলিতেছেন "আচ্ছা ফকির্ তোমরা মন্‌মে এত্তা বল্ ক্যায়সে? তোমরা এত্তা জোর ক্যায়সে? তোম্ নবাব কো নেহি মানো?" রঙ্গলাল উত্তর করিতেছেন "নবাব সাহেব, ভারী সোজা আবার ভারী শক্ত, আমি যদি আপনার জন্য বাঁচতেম, তা হ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হ'তো। মরতে চাইতেম্ না। কিন্তু আমার মনে কি হয় জান? যে মরবার সময় পর্য্যন্ত যদি হাত উঠে, তা হ'লে একটা পরের কাজ ক'রে যাব, আমি পরের জন্য বেঁচে আছি, এক মরণ ভয় গেলেই সব ভয় গেল"। কি নরসেবায়, কি স্বদেশব্রতে, কি ধর্ম্মাচরণে, মৃত্যু-ভয়লোপেই মানুষের প্রাণে অজেয় শক্তি সঞ্চারিত হয়। "কাপুরুষের প্রাণে কোন বিষয়েই দৃঢ়তা স্থায়ী হয় না; মৃত্যুভয় থাকিলে আত্মত্যাগ ও সম্ভব নয়। শেষ দৃশ্যে

ও গঙ্গাকে তিনি বলিতেছেন "পরের দায় মাথায় নিলে আপনার দায়ে নিশ্চিন্ত হবো, অতোটা ঘোর থাক্‌বে না"। এবং এই পরকার্য্যে তাহার ধর্ম্ম বা মুক্তি কোন কামনাই নাই, কারণ তিনি বলেন "যে ধর্ম্মের জন্য পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পারে না, সে ব্যাটার মনে ধোঁকা আছে, মরতে ভয় আছে। সে ব্যাটা আঁচে কি জানেন? পারে যদি ম'রে একটা কিছু আমোদ করবে, বেহস্ত যাবে, স্বর্গে যাবে, বৈকুণ্ঠে যাবে, খুব আমোদে থাক্‌বে। আমি ওসবের অতো তোয়াক্কা রাখিনে। ক্ষিদে পেলে খেলেম্, ঘুম পেলে ঘুমুলেম্"।

জীব-সেবাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া রঙ্গলালের বিশ্বাস, তাই তিনি কোন পূজা যাগ, তপ, নিষ্ঠার ধার ধারেন না। তিনি বলেন—"আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। মানুষ আমার দেবতা, যারে হিন্দু, মুসলমান ক্রীশ্চান বলে ভগবানের অংশ। আমার দেবতা প্রাণময় পুরুষ। যার সেবা কর্‌লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, যে দেবতা-পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই, একবার মানুষের সেবা করে দেখ, প্রাণ তর্ হয়ে যাবে। আমার দেবতার পূজা যদি কর, তা হ'লে মনে করবে টাকা রোজগার করেছ সার্থক, ঠিকঠাক্ দেবতার পূজায় লেগেছে"। যাহারা মুখে বলেন "মা ব্রহ্মময়ী, তুমি সর্ব্বভূতে আছ," অথচ জীবজন্তু দূরে থাকুক্ মানুষের বুকেই ছুরী দেন, রঙ্গলাল সেরূপ মায়ের পূজা করেন না। তিনি মার কাছে প্রার্থনা করেন "যেন দু'একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপছে তাকে একখানা কম্বল দিতে পারি, তা হলেই আমি চরিতার্থ হবো"। স্বর্গ সম্বন্ধেও তাহার ধারণা "একদিন একজনকে খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চারটী খেতে দিও, খুব তেষ্টা পেয়েছে একটু জল্ দিও খেয়ে ব্যাটারা আঃ কর্‌বে, শুনে যে তোমার সুখ হবে, কোন ব্যাটার চৌদ্দ পুরুষের কল্পনায় স্বর্গ সৃষ্টি ক'রে এত সুখ সৃষ্টি কর্‌তে পারে নাই"। কিন্তু কেবল স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষই এ সুখের অধিকারী হইতে পারেন। যে সে নয়।

উন্মুক্ত উদার পথে বিচরণ করেন বলিয়াই রঙ্গলাল তাহার প্রতি গঙ্গার ভালবাসা গঙ্গাকে সর্ব্বভূতে বিলাইতে বলিতেছেন "দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি মানুষকে তুমি ঠাওর করেছ? দেখো, এ দুনিয়া একটা দেখ্‌বার জিনিষ। দেখলে দেখতে পারো। যদি দেখতে পারো আমার মত একটা ছোট খাটো কীট পতঙ্গ দেখবে না, তোমার প্রাণ উদার আকাশে মিশিয়ে যাবে, তুমি আপনাকে খুঁজে পাবে না, দেখবে যে রসের তরঙ্গ বইছে"। গিরিশচন্দ্র রঙ্গলাল-চরিত্র-সৃষ্টিতে কোন কাল্পনিক চরিত্রের সহায়তা লয়েন্ নাই। নর সেবায় মানুষ কতদূর উন্নত হইতে পারে, সেবাশ্রমের অনেক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন। স্বামীজী ও প্রায়ই বলিতেন "পরহিতায় সর্ব্বস্ব অর্পণ, এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস, ইচ্ছা হয় মঠফট সব বিক্রী ক'রে এই সব দরিদ্র নারায়ণদের বিলিয়ে দিই।" অনেক সময়ে কুলীমজুর অস্পৃশ্যদের লুচি তরকারী মেঠাই মণ্ডা দধি ইত্যাদিতে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া বলিতেন "তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'ল"। কম্বল বা শীতবস্ত্র বিতরণেও স্বামীজীর সেইরূপ আনন্দই লক্ষিত হইত।

রঙ্গলাল সামাজিক খুঁটিনাটি বাধানিষেধের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই চিকিৎসাকালীন নবাবের গৃহে মুসলমান প্রদত্ত অন্নভোজনে দোষ না ধরিয়া নবাবকে উত্তর দিতেছেন "খানা খেয়ে যদি হিন্দু মুসলমান হয়, তা হ'লে আপনি হিন্দু হ'য়েছেন, আপনার অসুখের সময় আমি গাঁদালের ঝোল রেঁধে খাইয়েছি"।

এইরূপ স্বাধীন, সুচতুর, স্বদেশ-ভক্ত, বলিষ্ঠ এবং ভোগে বীতশ্রদ্ধ ও কামকাঞ্চনত্যাগী রঙ্গলাল কেবল পরের কাজ করিয়াই বেড়ান এবং কর্ম্মই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। নাটকের শেষ কয়টী কথায় এই সাধনার আভাস পাওয়া যায়—"ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, আগাগোড়া ভ্রান্তি, তবে কাজ ক'র্‌তে এসেছি, কাজ ক'রে বেড়াই এসো"—তাই তিনি বন্ধুর মনস্তাপ বিদূরিত করিতে নিজে কারাবরণ করিতেও ভয় পান্ নাই এবং যুদ্ধকালে আহতের চিকিৎসার জন্য প্রাণতুচ্ছ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। সমদর্শী রঙ্গলাল নবাবকে বলিতেছেন"হুজুর যদি লড়াই বাঁধে, আমি

হকিম, শত্রুমিত্র দু'জনকেই দাওয়ায় দেব, এতে যেন কেউ আমায় দুষমন্ না ঠাওরায়"। আর এই যে কাজ করেন তাহাতে কোন আত্মাভিমান নাই, তিনি তাই বলিতেছেন "কি ক'রবো ঠাউরে আমি কোন কাজ কর্‌তে পারিনে, আমি ঠাউরেছি একরকম, হয়েছে আর একরকম। কে এক বেটা সয়তান আছে, সে মানুষকে নিয়ে খেলা করে; তবে দেখ তুমিও একটু চেষ্টা কর, আমিও একটু চেষ্টা করি, এই পর্য্যন্ত আমাদের হাত"। রঙ্গলাল পুনর্ব্বার বলিতেছে "কোথা যাব, যদি জান্‌তেম্ নবাব সাহেব, তাহলে আপনাকে মাতব্বর ঠাওরাতেম্, একবেটা সয়তান আছে কেবল কান্ পাকড়ে ঘোরাচ্ছে"।

সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞানে নরসেবায় যে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, বেদান্ত দর্শনেরও তাহাই লক্ষ্য। রঙ্গলাল, নরসেবায় সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই বিবেকানন্দ এই কর্ম্মযোগের প্রভাবই সমধিক প্রচার করিতেন, আর ইহার নাম দিয়াছিলেন "বেদান্ত (in practice)"

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গলাল, উভয় ভূমিকাই গিরিশচন্দ্র নিজে গ্রহণ করিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার অভিনয়ে এই উভয় ভূমিকাই জীবন্ত হইয়া দর্শকের মন দ্রবীভূত করিত!

"বলিদান" নাটকে বান্ধব-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে বিবেকানন্দ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মিযুবকগণের কার্য্যের আভাস কতকটা পাওয়া যায় এবং রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী কিশোর তাহাদের আদর্শ। আজ গিরিশচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে কয়েকটী উচ্চশিক্ষিত যুবকের মধ্যে এই আদর্শ স্বচক্ষে দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। করুণাময়ের বিপদে তাহাকে সাহায্য করিতে, জলমগ্না হিরণ্ময়ীকে জল হইতে উত্তোলন করিতে, রমানাথ দুলাল প্রভৃতি দুষ্টের দমন করিতে ও দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে কিরণ্ময়ীকে উদ্ধার করিতে স-বন্ধু কিশোরকে আমরা সর্ব্বদাই অগ্রগণ্য দেখিয়াছি এবং তাহাদের বিশ্বাস ছিল "ভগবান তাহাদের ক্ষুদ্র সমিতিকে উচ্চ কার্য্যের ভার দেবেন"। তাহার বন্ধুগণের মুখেই তাহার চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় "হয়ত কোন গরীবের শক্ত ব্যারাম হয়েছে, তারে nurse কচ্ছে, নয়ত কোন বেকার familyর খোরাকীর ব্যবস্থা ক'রে

দিচ্ছে, নয়তো কে বিপদে পড়েছে তার উদ্ধারের চেষ্টা পাচ্ছে, এম্‌নি একটা কাজে আছে নিশ্চয়।

৩য় সভ্য—ভাই বড় মানুষের ছেলে যে এমন হয় তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না। সৃষ্টির লোকের উপ্‌কার করে বেড়াচ্ছে, রাত্রে অনাথ-স্কুলে পড়াচ্ছে, যেখানে হাহাকার সেখানেই কিশোর, অন্ন নাই সেইখানে কিশোর, ওষুদ নাই সেইখানে কিশোর। বোধহয় ও বিষয় পেলে সন্ন্যাস করবে! Sacrifice (ত্যাগ) আর কিশোর এক কথা।

রামকৃষ্ণমিসন সংক্রান্ত সমিতি গুলির উদ্দেশ্যও এইরূপ সেবা ও পরোপকার।

"গৃহলক্ষ্মীতে"ও মন্মথের সেবাপরয়াণতার উল্লেখ পাওয়া যায়। "ঐ বুড়ীটা গাড়ী চাপা পড়েছে, একখানি গাড়ী নিয়ে আসি, হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে"। আর তাহার শুশ্রূষাগুণের পরিচয় উপেন্ ও আহত শৈলেনের রোগ মুক্তিতে। এ ভিন্ন মন্মথের চরিত্রে পরোপকার বা সেবার অন্য কোন নিদর্শন না থাকিলেও ফুলী তাহার শিক্ষায়ই শিক্ষিতা হইয়া পরের উপকার সাধন করিত, এবং তাহার কাছেই 'আত্মবিসর্জ্জন' কি বুঝিতে পারে।

মন্মথ ফুলীকে বলিতেছেন "সহস্রবার বেশ্যাজন্ম হোক্, বিষ্ঠার কীট হই, নরকের কৃমি হয়ে থাকি, তবু লোকহিত করব! এই ভেবে যখন লোকহিত করতে পারবি তখন আর 'কিন্তু' থাক্‌বে না; এর নাম আত্মবিসর্জ্জন—পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া"!

গৃহলক্ষ্মী ৫ম অঙ্ক ২গ।

যদিচ পঞ্চম অঙ্ক নাট্যকারের মহাপ্রস্থানের পরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরিকল্পনায় ও নাটকীয় সৌন্দর্য্যে যে উহা সম্পূর্ণ মৌলিক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সেবা-ধর্ম্মের চরম বিকাশ "শাস্তি কি শান্তির" পাগলের চরিত্রে।

পাগল স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া বিদেশে চাকুরি করিতে যায় কিন্তু তথায় এক জমিদারের চক্রান্তে জেল খাটে। আর জাহাজডুবি হইয়া হাঁসপাতালে মারা গিয়াছে রটাইয়া জমিদার তাহার স্ত্রী হরমণির ধর্ম্মনষ্ট

করিতে ষড়যন্ত্র করিয়া বিফল মনোরথ হয়। তারপর দেশে আসিয়া স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে পাগল কিরূপ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয় সেই পরিচয় তাহার নিজের কথায়ই পাওয়া যায়—"আমি নিরাশ্রয় পথে পথে বেড়াতুম, ক্রমে পুষ্করিণী থেকে শাক্ তুলে বিক্রয় করে ঈশ্বর কৃপায় আমার এই উন্নতি। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আমার গদি আছে, তাঁর কৃপায় এখন আমি তাঁর দাস—শান্তিময় চিত্তে তাঁর কার্য্যে নিযুক্ত। [শাস্তি কি শান্তি ৫ম অঙ্ক, ৫গ]। পরোপকারী, বহুদর্শী পাগল পরের জন্যই কাজ করিয়া বেড়ায় "এ সংসারেত স'ন্যাসয়ীর কথা নয়, কাজ করবার কথা, কাজ করো। কাপুরুষ পরের জ্বালা ভুলে আপনার জ্বালা নিয়ে বিব্রত হয়"। আর সর্ব্বদাই তিনি কাজে ব্যস্ত, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়ার পরও স্ত্রীর সহিত কথা কহিবার পর্য্যন্ত তাহার অবকাশ নাই এবং 'কর্ম্মভূমে' যে কাজই কেন করেন না, তিনি মনে করেন "আমি ভগবানের দাস"। বেণীকে "হৃদয়-হীন কোল্‌কাতার রাস্তা থেকে তুলে না আন্‌লে সে সেই খানেই মরে পড়ে থাক্‌তো" এবং তাহার শুশ্রূষা সম্বন্ধে বেণীই তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে "কি যত্নে আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে জাননা, ওর ঋণ আমার জন্মান্তরেও শোধ হবে না"। প্রকাশ ও স্বীকার করিতেছে "ও বড় সেবা জানে"। অন্যত্র তাহার কার্য্যসম্বন্ধে প্রবঞ্চনা-পরায়ণ প্রকাশ বলিতেছে "তুমি টাকা কোথায় পাও? অনেক সৎকার্য্য করো দেখ্‌তে পাই"। যে ভুবন সর্ব্বদা তাহার প্রতি বিরূপ ছিল, কৃতজ্ঞতা সহকারে সেও বলিতেছে "বাবা তুমি কে মহাপুরুষ? এ ঘোর শঙ্কটে আমায় উদ্ধার কর্‌লে, আমি অজ্ঞান, আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি"। নেশাখোর বটকৃষ্ট তাহার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে "আমি ভাব্‌তুম আপনি কি মতলবে পরোপকার করেন, আপনার অসীম দয়া, আমার নিশ্চয় জেল হ'তো, আপনার কৃপায় রক্ষা পেয়েছি"। প্রসন্নকুমারের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহদৃষ্টি ও সান্ত্বনায়, প্রকাশকে ক্ষমা ও সদুপদেশে, এবং ভুবনকে কুচক্রীদের হাত হইতে রক্ষা ও তাহার বিষয়-উদ্ধারে তাহার সহৃদয়তা ও পরোপকারের পরিচয় নাটকের অনেক স্থানে আছে। প্রত্যহ যে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা অনুষ্ঠিত হইত,

বটকৃষ্টের প্রতি তাহার কথায় সেই আভাস পাওয়া যায়—"তুমি কাল থেকে কাঙালীভোজনের কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, পরীক্ষা ক'রো, আর দাঁড়িয়ে থেকে কাঙালীদের খাওয়ার তদারক ক'রো।"

রঙ্গলাল ও পাগলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী কে, তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন, তবে এ পর্য্যন্ত বলা যায়, একজন কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করেন, একজন আপনাকে অনাথনাথ ঈশ্বরের দাসজ্ঞানে পরসেবা করেন। রঙ্গলাল বলেন "লোকে কর্ম্ম করে বেহস্ত বা স্বর্গে যাবে ব'লে, বৈকুণ্ঠে যাবে, খুব আমোদে থাক্‌বে। আমি ও সবের অতো তোয়াক্কা রাখিনে"। একস্থলে রঙ্গলাল গঙ্গাকে বলিতেছে "আমরা কাজ কর'বার জন্য এসেছি, কাজ ক'রে যাই"। অন্যদিকে আবার পাগল বলিতেছেন "দু'একটা কাজ সফল হ'য়ে আমরা মনে করেছিলুন, আমাদের পরোপকার ক'র্‌বার শক্তি আছে, হায় সে বৃথা দম্ভ, আমরা কেবল কার্য্যের অধিকারী, ফলাফল তাঁর" ৫ম অঙ্ক, ৬গ। পুনরায় হরমণিকে তিনি বলিতেছেন "আমরা যে পথে চ'লেছি, যদি ঠিক যেতে পারি স্বর্গের উপরে যেথায় স্বার্থশূন্য মহাপুরুষদের স্থান, সেথায় তাদের পদসেবা করবার জন্য ভগবান আমাদের নিযুক্ত ক'রবেন, স্থির হও, হেথায় কাজ শেষ করো"। অবশ্য রঙ্গলালও এ কথাই বলিয়াছিলেন "তুমি আমি চেষ্টা কর্‌তে পারি, কিন্তু যা মনে করি, তা হয় না"। কথাটী রামকৃষ্ণদেবের বটে, কিন্তু আদর্শ কর্ম্মীদ্বয় আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া যে পরকার্য্যে ব্যাপৃত, সে ভাবই এখানে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট—।

বিবেকানন্দের প্রধান শিক্ষা 'স্বার্থবিসর্জ্জনে পরহিত-সাধন' গিরিশচন্দ্রের উদ্ভাবনী শক্তির উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে ব্রহ্মবিদ্ তপোনিষ্ঠ বিশ্বামিত্র চরিত্রেও এই শিক্ষা প্রচার করিতে তিনি নির্ব্বাক্ থাকেন নাই—"কায়মনোবাক্যে পরহিতসাধনই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। শরণাগতকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ছার ব্রহ্মর্ষিত্ব, পরহিতসাধন ব্রতই শ্রেয়ঃ ব্রত।" ("তপোবল" ৪র্থ অঙ্ক ৪গ)। বাস্তবিক এই পরহিত সাধন বা সেবাধর্ম্মে মানুষ বুঝিতে পারে যে ব্রহ্ম তাহাতে বিরাজমান এবং ব্রহ্মদর্শন এই সেবাধর্ম্মেও সম্ভব। বিবেকানন্দ বলিতেন "উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম চণ্ডালকেও

আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বেদান্তের ইহাই লক্ষ্য, এবং মানবজাতি ক্ষমা, শৌচ, ত্যাগ ও ভক্তি অবলম্বন করিয়া অধ্যবসায়-সম্পন্ন হইলে ক্রমে ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ করিতে পারিবে"। কবি বিশ্বামিত্র চরিত্রে বেদান্তের এই উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

আকাঙ্খা আমার,
নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানবে।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।

তপোবল ৫ম অঙ্ক, ৬গ।

এই আত্মবোধ জ্ঞানই বেদান্তের চরমশিক্ষা এবং গিরিশ নাটক হইতে দেখিতে পাই উচ্চ অধ্যবসায়যুক্ত সাধনা—ও নরসেবা উভয়ই উহার প্রকৃষ্ট পন্থা। জয় বীবেকানন্দ!

সেবাশ্রমের ন্যায় "অনাথা-আশ্রম ও মাতৃমন্দির" প্রতিষ্ঠাও স্বামীজীর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাহা পূর্ণ করিতে দেয় নাই। তিনি বলিতেন "ধর্ম্মপরতা, ত্যাগ ও সংযম স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে, আর সেবাধর্ম্ম তাদের জীবনের ব্রত হবে"। আমরা অল্পদিন গত হইল, কাশীধামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংশ্লিষ্ট স্ত্রীমঠ ও তথায় সেবানিরতা ব্রহ্মচারিণী মহিলাগণকে দেখিয়া স্বামীজীর প্রস্তাবিত আশ্রমের কতকটা আভাস পাইয়াছি, কিন্তু উক্ত স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুদিন পূর্ব্বেই গিরিশচন্দ্র ঐ প্রকার পরোপকারনিরতা, ত্যাগশীলা ও সেবাধর্ম্ম-পরায়ণা মহিলাদিগের চিত্র হরমণি-চরিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং কি ভাবে এই সেবাপরায়ণা ব্রহ্মচারিণী-আশ্রম পরিচালিত করিতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত করিতে ক্রুটী করেন নাই। রঙ্গিণী, গঙ্গাবাই, জোবি, ও ফুলী পরের কাজ করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু হরমণির ফল-কামনাহীন কর্য্যে এই সাধনার পূর্ণ বিকাশ ও আশ্রমের ভিত্তি। গঙ্গা যেমন সর্ব্বদাই রঙ্গনাগের কাজ করিয়া আমোদ পাইত, হরমণি ও সর্ব্বদা পাগলের কাজ করিয়া বেড়ায় ও তাহারই সেবাপরায়ণতার প্রভাবে ক্রমে একটা আশ্রম গড়িয়া উঠে। জমিদারের তাড়নায় নিরাশ্রয়া হরমণির নামে ভয়ঙ্কর অপবাদ

রটে এবং কোথাও চাকুরি না পাইয়া অনাহারে সে গঙ্গায় ডুবিতে উদ্যত হইলে ছদ্মবেশী স্বামী 'পাগল' তাহাকে আশ্বাস দেয় "কেন আত্মহত্যা কর্‌বি? এখনও দেহ মন রয়েছে, দীনবন্ধুকে দে, দীনবন্ধু তোরে দেখবে"। পাগল তাহাকে একখানি কুঁড়ে ঘড়ে রাখিয়া কাজ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

কীর্ত্তন গান করিয়া ভিক্ষায় যাহা রোজগার হয়, হরমণি তাহাতে অনাথা কুঁড়াইয়া আনিয়া ঐ কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করে, এবং খরচ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয়, পরকার্য্যে পাগলের হাতে দেয়। এই স্থানে আশ্রমের সূত্রপাত হয়; এবং ঐ বালিকাগণ হরমণির হাতে কিরূপ শিক্ষা পায়, এখন তাহা বলিতেছি। সে ভুবনমোহিনীকে বলিতেছে "অনেকগুলি সোমত্ত মেয়ে, তাদের বে' দিতে পারি নাই, বড় সাবধানে রাখি। অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বল্‌তে দিই না, সে পুরুষমানুষই হোক্‌ মেয়ে মানুষ হোক—১ম অ ১ম গ। শত্রুর মত বিলাস ত্যাগ করতে শেখাই। পোড়া বিলাসই দুষমন ডেকে আনে। তাই সর্ব্বদা মেয়েগুলিকে কাজেকর্ম্মে রাখি। রোগীর শুশ্রূষা, অনাথাসেবা এই সব শেখাই"—২য় অঙ্ক ১ম গ। হরমণি নিজেই আশ্রমের সমস্ত ব্যবস্থা করে—"চল্লুম্‌ মা, রোগীদের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আস্‌ছি," ৩য় অ ৪গ। এবং অনাথা বালিকাকে উচ্চাদর্শে শিক্ষিতা করেন—

প্রভুর সেবা—অনাথা সেবায়
সে সেবায় হেলায় হব অপরাধী পায়,
কায়মনে রই সেবায় রত, ঘৃণালজ্জা ভয় ঠেলে।

৩য় অঙ্ক, ৪গ।

হরমণির আশ্রম অনাথা মাত্রেরই আশ্রয়, এবং অনাথাকে আশ্রয় দিতে তাহার কোন ভয় নাই। স্বামীগৃহ-তাড়িতা জাতি-ভয়ে পিতৃ-গৃহবঞ্চিতা প্রমদাকে আশ্রমে আসিতে অনুরোধ করিলে যখন সে বলিতেছে "কেন মা, তোমায় মজাবো কেন? আমার স্বামী উপদ্রব ক'রবে, আমার বাবার নামে নালিশ করুতে চায়"। হরমণি নির্ভয়ে তাহাকে আশ্বাস দিতেছে "পারে আমার নামে করবে, তাতে আমার ভয় নাই, এমন অনেকে

ক'রেছে। অনেকে বুঝে গিয়েছে, আমি অনাথা, আমি অনাথাকে আশ্রয় দিতে ভয় পাইনে"। ৩য় অঙ্ক, ৪গ। স্বামীর নৃশংস অত্যাচারে প্রমদার বাঁচিবার আশা ছিল না, কিন্তু হরমণি তাহাকে শুশ্রূষায় নীরোগ করিয়া এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা দেন যে তাহারই স্নেহশীল পিতাকেও সে উত্তর করিতেছে "যেমন আমাকে নিয়ে তোমার কলঙ্ক হয়েছে, আমি ভগবানের কার্য্যে দেহ দিয়েছি। তোমার সে কলঙ্ক দূর হবে, তোমার মেয়ের গৌরব অনাথা কর্‌বে—নিরাশ্রয় বালক কর্‌বে। বাবা আমি এতদিনে জীবনের সঙ্গী পেয়েছি, এতদিনে আমি ভগবানের ঘরে আশ্রয় পেয়েছি—ভগবানের সংসারে ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। সে শান্তিময় সংসার, সে সংসার থেকে আমায় এনো না"। ৪র্থ অঙ্ক, ২গ। রোগীর সেবাশুশ্রূষা ব্যতীত অপর শিক্ষা সম্বন্ধেও হরমণি বলিতেছেন "বাবা হাবু, তুমি দেখগে'—যে অনাথা বিধবাকে তুমি গঙ্গাতীর হ'তে এনেছিলে, সে ঘোষ বাবুদের সাবানের বাক্স কেমন সুন্দর তোয়ের ক'র্‌তে শিখেছে।"

পতিতা বিধবাকে আশ্রয় দিয়া ভ্রূণহত্যা নিবারণ ও হরমণির আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাহার যত্নে রক্ষা পাইয়া ভুবনমোহিনী বলিতেছে "আমার ছেলের মুখ দেখে মনে হয়, আত্মহত্যা ক'রে কি মহাপাতকই ক'র্‌তে ব'সেছিলুম। দিনের বেলায় তুমি নিয়ে যাও, আমি কতক্ষণে রাত হবে, কতক্ষণে বাছাকে দেখ্‌বো ব'সে ব'সে ভাবি।"

সদনুষ্ঠানে কখনও অর্থাভাব হয় না, তাই ভুবন বলিতেছে "আমার বোনের সঙ্গে আমিও তোমার কাজ ক'র্‌ব। আমার বিষয়ের উপস্বত্ব, যতদিন বেঁচে থাকি, তোমাদের কাজে দিও"।

শান্তি কি শান্তি ৫ম অঙ্ক, ৬ গ।

কিন্তু এই আত্মোৎসর্গরতা 'মহাব্রতধারিণী' সধবায় সন্ন্যাসিনী তাঁহার মহাকার্য্যের কৃতিত্বগ্রহণেও সম্পূর্ণ উদাসিনী। ভুবনকে তিনি উত্তর দিলেন ——"মা আমাদের কাজ নয়, ভগবানের কাজ, আমরা নিমিত্ত মাত্র"।

হরমণির ন্যায় মহাব্রতধারিণী মহিলাগণ কবির স্বপ্ন কি সফল করিবেন না, যাহাতে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শান্তিময় সংসারে নিরাশ্রয়া বিধবাগণ ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক নাটক

সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম্ *

১। উপক্রমণিকা

হতভাগ্য সিরাজ-চরিত্র ইতিহাসে বিকৃত মসীতে রঞ্জিত হইয়াছে। মদ্যপায়ী, লম্পট, দুর্ব্বৃত্ত, পরস্বাপহরক প্রভৃতি জঘন্য বিশেষণে তাঁহার নাম এরূপ কলঙ্কিত, যে শ্রবণমাত্রেই নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়। যুক্তিবিচার না করিয়া, সত্যানুসন্ধান না করিয়া কেবল কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই আমরা সিরাজের প্রতি এরূপ অন্যায় বিচার করিয়া থাকি। এই সংস্কার আবার প্রতিভাশালী কবির কল্পনা প্রভাবে আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। বাস্তবিক যে সমস্ত ঘৃণিত অপরাধ অন্য লোকের দ্বারা সংঘটিত, কবির কল্পনা-প্রভাবে তাহাও সিরাজ-চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে। যে সরফরাজখাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দীখাঁ বাঙ্গলার মস্‌নদ অধিকার করিয়াছিলেন, মাতামহ মুর্শিদ কুলিখাঁর অত্যাদরে যৌবনে তিনিও অত্যন্ত উশৃঙ্খল ছিলেন। জগৎশেঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া †

---

* ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে "সিরাজদ্দৌলা" "মিরকাসিম" ও "ছত্রপতি শিবাজী" নাটকের মুদ্রাঙ্কণ ও অভিনয় বন্ধ হয়। আমি "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী"তে এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া যে সমালোচনা পাঠাইয়াছিলাম, সম্পূর্ণ অংশই আমাকে প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া গভর্ণমেণ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। পাঠকবর্গ যে ঐ সমস্ত দুষ্প্রাপ্য নাটকের অন্ততঃ আংশিক পরিচয় লাভেও সমর্থ হইবেন, তজ্জন্য আমি গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পাঠকের জ্ঞাতার্থ সমগ্র চিঠিখানিই এখানে (পর পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইল—

† কিম্বদন্তী আছে লুতফ্ উন্নিসার রূপযৌবনে মোহমত্ত হইয়া মিরজাফর-পুত্র মীরণও বেগমের বেশে আলিবর্দ্দির অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার নির্ম্মলকুলে সরফরাজ যে কলঙ্ক-কালিমা সঞ্চার করিয়াছিল, কবি-কল্পনায় সিরাজের চরিত্রেই তাহা আরোপিত হইয়াছে—

কি বলিব আর
বেগমের বেশে পাপী পশি' অন্তঃপুরে
নিরমল কুলময়—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম, ভূভারত জুড়ে
প্রজ্বলিত—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।

পলাশীর যুদ্ধ—নবীনচন্দ্র ১ম সর্গ।

GOVERNMENT OF BENGAL.

Political Department.
Political Branch.
No. 318 P. D.

FROM—H. TUFNELL-BARRETT, ESQ., I.C S.,
Offg. Under-Secretary to the Government of Bengal,
TO—BABU HEMENDRA NATH DAS GUPTA,
Vakil High Court.

Darjeeling, the 2nd May 1927.

SIR,

With reference to your letter dated the 17th December 1926, submitting for censorship the comments on the proscribed dramas of the late Girish Chandra Ghosh and certain passages from "Serajuddowla" and "Mirkasim" which you wish to embody in the biography of the above author, I am directed to say that though some of the extracts are not altogether free from objection, Government do not wish to press for their excision and are accordingly pleased to permit their inclusion in the biography of the late Girish Chandra Ghosh.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd/ H. TUFNELL-BARRETT.

Offg. Under Secretary to the Govt. of Bengal.

Dft. appd. 2.5.
M.A. 2.5.

এইরূপে মাতৃস্বসা ঘেসেটী বেগম সিরাজের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আমিনা ও অন্যান্য বেগম সহ নিষ্ঠুর মীরণের চক্রান্তে ঢাকায় জলগর্ভে নিহত হওয়া সত্বেও কবির কল্পনা প্রভাবে সিরাজ যুদ্ধকালে ঘেসেটীর পরলোকগত আত্মাদর্শনে চমকিত হইয়া উঠিতেছিল—

সিরাজ, তোমার আমি পিতৃব্য-কামিনী
হরি মম রাজ্যধন, করি দেশান্তর
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর—

পলাশীর যুদ্ধ ৩য় সর্গ ২য় স্বপ্ন।

সত্যবটে কাব্য ইতিহাস নয়, কিন্তু মহাজন-রচিত চরিত্র যে তাঁহার চিত্রিত রূপেই লোকচক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। তবে কবিশ্রেষ্ঠ নবীনচন্দ্র উত্তর কালে গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা" পাঠে তাঁহারই কাছে একখানি লিপিতে আপনার ক্রটী স্বীকার করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন—"তুমি আমার অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্। আমি যখন পলাশীর যুদ্ধ লিখি, সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল"। বাস্তবিক গিরিশচন্দ্র সাময়িক ইতিহাস সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বাঙ্গলার তরুণ নবাবের যেভাবে চরিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে বহু বর্ষগত সংস্কার দূর হইয়া আমাদের সম্মুখে যে যথার্থ আলেখ্যচিত্র উপস্থিত হইয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতে পাই "রাজ্যাভিষেকের পর সিরাজদ্দৌলার অপরিণত বয়সের জন্য অস্থিরতা মাত্র ছিল, আর তাঁহার অন্য কোন দোষ ছিল না। বরং তিনি দয়ার্দ্র, ক্ষমাশীল ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন, কেবল শত্রু পক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক বন্ধুবর্গ তাঁহাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁহার শোচনীয় পরিণাম সাধন করিয়াছেন।"

গোলাম হোসেন প্রণীত সায়েরুল মুতাক্ষরীণ, রেয়াজ সউল সেলেতিন, অর্ম্মির হিন্দুস্থান, হলওয়েল লিখিত বিবরণ, Hastings' mss. in British Museum, ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস, Scrafton' Ives Journal, Despatch-

es to Court of Directors, Letters from Clive and Watson, Mill's History of British India, Hunter's Statistical Account of India প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ করিয়া ইতিহাসের মূলভিত্তির উপরই গিরিশচন্দ্র নাটক খানি সৃষ্টি করিয়াছেন। পাঠক অবগত আছেন ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় একখানি "সিরাজদ্দৌলা" লিখিয়া যশস্বী হয়েন। গিরিশের নাটকও সম্পূর্ণ অপর-তন্ত্র ভাবেই রচিত। তবে, সিরাজ-চরিত্রের সত্যোদ্ধার করিয়া অক্ষয় বাবু কেবল দেশ-বাসীর নিকট সম্মানিত নহেন, রাজকীয় সম্মানেও বিভূষিত হইয়াছেন, আর নাটকে ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দের শিক্ষাদান ও চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াও গিরিশচন্দ্র নাটক কয়খানির (সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী) অভিনয় এবং মুদ্রাঙ্কণের অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন! অবশ্য রাজকীয় সম্মানের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না। তবু চট্টগ্রাম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিসনার শ্রীযুক্ত স্ক্রাইন সাহেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আমাদিগকেও বলিতে হইতেছে How little does the world know of its greatest men!"

২। ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

সিরাজ যে মাতামহের অতিরিক্ত আদরে প্রথমে অত্যন্ত অসংযমী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনসম্মত। কুসংসর্গ, মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি তাহার চরিত্রগত দোষ কেহই অস্বীকার করিবে না। তবে অন্য কারণেও সিরাজের শত্রুর অভাব ছিল না। বিশেষতঃ মাতামহের পক্ষ-পাতিতায় আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণ করিত। অল্প বয়সেই আলিবর্দ্দি খাঁ সিরাজকে বিহারের শাসন-ভার প্রদান করেন এবং পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তাহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া পারিষদবর্গের সেই ঈষানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন। এই সময়ে তিনি নৌকাপথে গমনকালে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী দেবীর বিধবা কন্যা তারা দেবীকে হঠাৎ একদিন দেখিতে পাইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য এতদূর উন্মত্ত হইয়া পড়েন যে রাজা

মধ্যে সিরাজের চরিত্র-দোষ শত জিহ্বায় বিঘোষিত হয়। কিম্বদন্তী আছে যে ভবানী কৌশলে এক অলীক চিতা সজ্জিত করিয়া কন্যার মৃত্যু সংবাদ-প্রচারে চিতার সহিত সিরাজের বাসনানলও নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক অতঃপর আলিবর্দ্দি দৌহিত্রকে মৃত্যু সময়ে যে অমূল্য উপদেশ দিয়া যান, সিরাজ ইহার পর হইতেই সংযমী হইয়া মাতামহের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হয়েন, ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া পানদোষ ত্যাগ করেন—(Scrafton's Reflections)। অথচ পূর্ব্বোক্ত অপযশ রাশি স্কন্ধে বহন করিয়াই তাঁহাকে সেই বিদ্বেষ-বহ্নি-বেষ্টিত মস্‌নদে আরোহণ করিতে হয়। গিরিশচন্দ্র সিরাজকে নবাবী পদ লাভের অব্যবহিত পরেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করান, এবং তিনি নিম্নলিখিত ভাবে ইতিহাসের সত্যতা সমর্থন করিতেছেন—

স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত ছিলনা বিচার,—
মদ্যপানে করিয়াছি
শত শত দুর্নীত ব্যাভার।
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর,
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার।
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গলসাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে। ... ... ১ম অ, ৩য় গ।

এই আদর্শ ই নাটকে সম্পূর্ণ রূপে সংরক্ষিত হইয়াছে।

সুরা সম্বন্ধে করিমচাচাও বলিতেছে "নবাব যদি দুটি চোক্ লাল ক'রে হুকুম ঝাড়্‌তেন। নবাব মদ ছেড়ে খালি ভাবছেন, এখন কি করি, এ দু নৌকায় পা দিয়েই প্যাঁচে পড়েছে।"

যাহা হউক সিরাজের শত্রুবর্গের মধ্যে ঘেসেটী বেগমই সর্ব্বপ্রধান।

বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার তিন কন্যা ঘেসেটী বেগম, ময়না বেগম ও আমিনা বেগম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি মহম্মদের তিন পুত্র নওয়াজেস্ আহমেদ, সৈয়দ আহমদ ও জয়নদ্দিন আহমদের সহিত যথাক্রমে পরিণীতা হয়েন! আলিবর্দ্দি নওয়াজেস্ কে ঢাকার, সৈয়দ আহমদকে পূর্ণিয়ার ও জয়নদ্দিনকে পাটনার শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন। ঘেসেটীর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না এবং মধ্যমা কন্যার পুত্র মদ্যপায়ী, কুক্রিয়াসক্ত ও অপরিণামদর্শী সওকত জঙ্গকেও তিনি বাংলার সিংহাসনের অযোগ্য বিবেচনা করিতেন। স্নেহাধিক্যবশতঃই হউক, অথবা পূর্ব্বোক্ত কারণেই হউক, সিরাজকেই তিনি উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করেন। ঘেসেটী ও তাহার পোষ্যপুত্র এক্রাম উদ্দৌলা (সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) কে সিংহাসনে বসাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন্। নওয়াজেস্ তাহার স্ত্রী ঘেসেটী বেগমের পরামর্শক্রমে 'মতিঝিল' নামক সুরম্য উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় দাক্ষিণ্য ও সহৃদয়তায় জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও প্রাণাধিক এক্রামের অকাল মৃত্যুতে ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। স্বামি-পুত্র-বিহীনা ঘেসেটী এখন নিরুপায়া হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত, কৌশলী দাওয়ান রাজবল্লভের সহায়তায় এক্রামের নাবালক পুত্র মোরাদৌল্লাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। রাজবল্লভ আশা করিয়াছিলেন যে মোরাদ্দৌল্লাকে নামে মসনদে উপবিষ্ট রাখিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই নবাব হইবেন ও অব্যবস্থিত-চিত্তা ঘেসেটীকে তাহার ক্রীড়নক করিয়া রাখিবেন। এই হেতু বৃদ্ধ নবাবের অন্তিমদশা নিকটবর্ত্তী হইলে নিজপুত্র কৃষ্ণবল্লভকে প্রচুর ধনরত্নসহ পুরুষোত্তমে যাইবার ছলনায় কলিকাতা ইংরাজসকাশে নৌকা-যোগে পাঠাইয়া দেন। এই সমস্ত কারণেই উভয়ে সিরাজের বিষনয়নে পতিত হইয়াছিলেন। নবাবীপদ লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই সিরাজ মাতৃস্বসাকে মতিঝিল হইতে বেগম মহালে মাতৃসকাশে স্থানান্তরিত করিলেন ও মতিঝিল ভূমিসাৎ করিয়া কপট ষড়্‌যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিলেন। এই ঘটনায় রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও মিরজাফর প্রভৃতি অমাত্যগণ নবাবাদেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মোহনলাল মন্ত্রিত্ব ও মীরমদন

সেনাপতি-পদ লাভ করেন ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে ঘোর ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ হয়। গিরিশচন্দ্র এই ইতিহাস রক্ষা করিয়া মতিঝিল ও ঘেসেটী-সমস্যা উচ্চরাজনীতিমূলক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"জনশ্রুতি এইরূপ এক্রামউদ্দৌলার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়্‌যন্ত্র এই মতিঝিলে হয়—অচিরে সেই শিশুপুত্রের সিংহাসনলাভ হবে, রাজা রাজবল্লভ দেওয়ান হবেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হবো। এই সাহসে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসও ইংরাজ সকাশে কলিকাতায় আশ্রয় নিয়েছে। আপনি রাজপুরে অবস্থান করলে সে জনশ্রুতি থাক্‌বে না।" তাই অবাধ্য অমাত্যগণকে তিরস্কার করিতেছেন—"বিদ্রোহীর গৃহভঙ্গ, বিদ্রোহীর ধনলুণ্ঠন অন্যায় কার্য্য! কি সুহৃদ্বর্গে আমরা পরিবেষ্টিত!" কিন্তু মতিঝিল ধ্বংসের উচ্চ রাজনীতিমূলক কারণ থাকা সত্ত্বেও এই মতিঝিল ধ্বংসই সিরাজের কলঙ্ক ও অপবাদ প্রচারের প্রধান আয়ুধস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। গিরিশচন্দ্র এই নাটকে তাহাই বলিতেছেন—"তোমার কুলনারীর সম্পত্তি-হরণ তোমার প্রথম রাজকার্য্য। তোমার কুলনারীর অশ্রু, বারিধারার ন্যায় এই বাঙ্গালায় পতিত হবে কিন্তু সে অশ্রুবিসর্জ্জনে বঙ্গভূমি শীতল হবে না। সে অগ্নিময় অশ্রুধারায় নগর দগ্ধ হবে, হাহাকারধ্বনিতে দিঙমণ্ডল ব্যাপ্ত হবে।"

মোহনলাল ও মীরমদনকে উচ্চপদ-প্রদানে সিরাজদ্দৌলা সায়ের প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের লেখনীতেও কুসঙ্গী ও নীচের প্রতি পক্ষপাতিতা দোষে নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু মানুষের চরিত্রের পরিচয় তাহার কার্য্যে। যাহাদের বীরত্ব-কাহিনী কেবল কবিযশ গাথায়ই নিবদ্ধ নহে, বাঙ্গলার সেই দুর্দ্দিনে ঐরূপ স্বদেশপ্রাণ প্রভুভক্ত বীরদ্বয়কে উচ্চপদে নিয়োগ করায় নবাবের বরং দূরদর্শিতাই প্রমাণিত হইতেছে। মাতামহীর তিরস্কারে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা উত্তর প্রদান করিতেছেন—

রাজ্যের অবস্থা তুমি জাননা জননী;
স্বার্থপর অমাত্য সকল
করে সবে স্বার্থ-উপাসনা
কারো নাহি মঙ্গল কামনা

চলে জনে জনে, নিজ স্বার্থ অনুসারে ;
মাত্র বন্ধু মোহনলাল আর মীরমদন
যে দোঁহারে স্বার্থপর অমাত্য নিচয়
নীচ বলি করিছে ঘোষণা •
প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ দু'জন
চক্ষুঃশূল সবাকার সেই হেতু।

সওকতজঙ্গের বিদ্রোহও এই সময়ের বিশেষ সমস্যাপূর্ণ ঘটনা। তাহার পক্ষীয় লোকগণ সিরাজের অলীক কুৎসা রটনা করিয়া বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য জনবল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় এবং মিরজাফর জগৎশেঠ প্রভৃতি কুচক্রী কুমন্ত্রিগণও সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধন প্রদান করে। মিরজাফরখাঁ পুত্র-মীরণের দ্বারা তাহাকে বাঙ্গলায় আহ্বান করেন, আর জগৎশেঠও তাহারই পরামর্শে দিল্লী হইতে সিরাজদ্দৌলার জন্য ফারমান আনয়ন না করিয়া নিজব্যয়ে সওকতজঙ্গের জন্য ফারমান আনয়ন করেন। সওকতজঙ্গ বাংলা অধিকার করিতে আসিলে সিরাজ, বীর মোহনলালের সহায়তায় সম্মুখসমরে তাহাকে পরাভূত করিয়া পূর্ণিয়া অধিকার ও অতঃপরে প্রভুভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ মোহনলালকেই পূর্ণিয়ার শাসনভার প্রদান করেন। তখন নিন্দুকের কুৎসা কিরূপভাবে প্রচারিত হইত নাটকীয় চরিত্র দানসা ফকিরের কথায় তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়—

"নবাব্‌টা আস্‌তিছে হুঁস্ রাখনা, সহরে কোতল হুকুম দিতেছে কারো গর্দ্দানা থাক্‌বেনা। জোয়ান্ মেয়ের জাত খাতিছে পেটেপোয়ে দেখ্‌লেই প্যাট্ চিরে দেখতেছে, ছ্যালেটা কেমন থাকে।" ১ম অঙ্ক, ১১ গ।

আরও দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া সিরাজের শত্রুগণ সর্ব্বদাই সুবিধামত তাহার অজস্র নিন্দা করিতে ত্রুটী করিত না। এই দুইটি বিষয়েই নাট্যকার সিরাজকে সমর্থন করিতেছেন—প্রথমটী ফৈজীর প্রাণবধ, দ্বিতীয়টী হোসেন কুলির নৃশংস হত্যা। দুইটী ঘটনাই সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়। ফৈজী দিল্লীর প্রসিদ্ধা বারবিলাসিনী, সমগ্র হিন্দুস্থানে আদর্শ সুন্দরী বলিয়া তাহার খ্যাতি। সিরাজ তাহাকে প্রাণের সহিত

ভালবাসিয়াছিলেন। একদা তিনি তাহার ভগ্নীপতির সহিত ফৈজীকে প্রণয়ালাপ করিতে দেখিতে পাইয়া বলেন "সুন্দরি, আমি দেখিতেছি তোমার ও গণিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই"। ইহাতে নির্লজ্জা রমণী উত্তর করে "আমি যে গণিকা তাহাতো সকলেই জানে এবং আমি এই ভাবেই জীবনযাপন করিতেছি, কিন্তু গণিকাবৃত্তি তোমার জননীর পক্ষে নিন্দার বিষয়!" মাতৃ-অপবাদে ও প্রণয়িণীর বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তাহাকে রুদ্ধকক্ষে বায়ুবন্ধ করিয়া জীবন্ত সমাহিত করিবার আদেশ প্রদান করেন। জগৎশেঠের মন্ত্রণালয়ে সিরাজের দোষাবলী কীর্ত্তন করিয়া মিরজাফর বলিতেছে—"ফৈজী, আহা অবলা স্ত্রীলোক, তারে ছ্যালে গেঁথে মেরে ফেল্‌লে, এমন নিষ্ঠুরও জন্মায়"! তাহাতে করিম চাচা উত্তর করিতেছেন—

"চাচা, তোমার কি কোমলপ্রাণ দেখ্‌ছি, তুমি চাচীর পার্শ্বে আর একজন চাচাকে বসিয়ে সেলাম দিতে পার। চাচা, একবার চোখ খুলে কথা কও, ছোঁড়া প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিল, চক্ষের উপর জোড়া গাঁথা দেখলে। তারপর ফৈজীবেটী মেছুনীর অধম, মা তুলে গাল দিলে—নবাব-বাচ্ছা, অত বেইমানী বরদাস্ত হবে কেন? ওতো ছোঁড়া বয়সে ছ্যাল গেঁথে মেরেছে, তুমি হ'লে এই বুড়ো বয়সে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে"। ৩য় অঙ্ক, ২গ।

দ্বিতীয়—ঘেসেটী বেগমের চরিত্র কাহিনী ও হোসেন কুলির সহিত তাহার অবৈধ সম্বন্ধ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। নোয়াজিস্ খাঁ ছিলেন ক্লীব ও দুর্ব্বল-চিত্ত এবং তেজস্বিনী বেগমের স্বভাবতঃই ভৃত্যবৎ বশীভূত। নোয়াজিস্ ঢাকার কর্ত্তৃত্বভার হোসেনকুলি ও তাহার সহকারী রাজবল্লভের উপর প্রদান করিয়া স্বয়ং মতিঝিলের প্রমোদ কক্ষে (মুর্শিদাবাদে) দিন যাপন করিতেন। এই হোসেনকুলিই ঘেসেটীর প্রিয়তম প্রেমাস্পদ। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সিরাজজননী আমিনাবেগমও হোসেনের প্রণয়-ফাঁদে আকৃষ্টা হয়। ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিতা ঘেসেটী হোসেনকুলির দণ্ডবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদিকে পারিবারিক কলঙ্ক বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ায় নবাব আলিবর্দ্দি এবং তাঁহার বেগমও গোপনে কণ্টকমোচন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

একে নোওয়াজিসের বিশ্বাসী কার্য্যাধ্যক্ষ, তাহাতে আবার রাজ্যমধ্যে হোসেনকুলির অদ্ভুত প্রভাব! কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণা ঘেসেটীর পক্ষে স্বামীর সম্মতিলাভ সহজ সাধ্য হইল এবং সকলের সম্মতিক্রমেই সকলের প্ররোচনায় সিরাজ কর্তৃক হোসেনকুলির লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়; কিশোর সিরাজ ইহার উপলক্ষ্য মাত্র। গিরিশচন্দ্র করিমচাচার মুখে এই নৃশংস হত্যার কৈফিয়ৎ প্রদান করিতেছেন—

মাণিকচাঁদ—হোসেনকুলি ওর শিক্ষক ছিল, তারে রাস্তায় ধ'রে কেটে ফেল্‌লে!

করিমচাচা—চাচা, সকলেরতো তোমার মত বরদাস্ত নয়। আশ্লেফ বেপেতে ছে পড়িয়ে, অন্দরে ঢুকে মা মাসীর মাঝে গিয়ে বস্‌বেন, বেকুফ নবাব বরদাস্ত কর্ত্তে পারে নাই। সকলেরতো তোমার মত দেল্‌দরিয়া মেজাজ নয়। ৩য় অঙ্ক, ২গ।

ইহার পরে সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ইংরাজের সহিত বিরোধ। এই বিরোধেরই পরিণাম পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের পরাজয় ও হত্যা এবং তৎপরে বাঙ্গলায় ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠা। এই বিরোধেই অন্ধকুপহত্যা এবং তাহার পরেই মান্দ্রাজ হইতে ওয়াটসন ও ক্লাইভের কলিকাতা আগমন ও ক্রমে ভারতে অজেয় ব্রিটিসপতাকা সংস্থাপন। কিন্তু ঘুণাক্ষরে সংশ্লিষ্ট না থাকিয়াও অন্ধকূপহত্যা যাহার শাসনকে দুরপনেয় কলঙ্কে মসীমণ্ডিত করিয়াছে, সেই হতভাগ্যের ইতিহাস অধিক বিবৃত না করিলেও সহজেই অনুমেয়। এই বিরোধের মুখ্যকারণই রাজা রাজবল্লভ। ঘেসেটী বেগমের সহিত নবাবের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় সিরাজ ইতিপূর্ব্বেই তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন কৃষ্ণবল্লভকে (রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র) কলিকাতা ইংরাজ-সকাশে প্রেরণ করায় নবাবের রোষের আর পরিসীমা রহিল না। ইতিপূর্ব্বেই নবাবকে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের বলবৃদ্ধি ও শক্তি সংগ্রহ করায় উভয়ের মধ্যে বিরোধের কারণ বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আবার এই ব্যাপারে কলিকাতা হইতে নবাবদূত অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসায় নবাবের রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কাশিমবাজারস্থ কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌সকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া

কলিকাতায় ইংরাজসকাশে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর প্রাপ্ত না হইয়া অবিলম্বে কলিকাতা অভিমুখে স্বয়ংই সসৈন্যে অভিযান করিলেন। এদিকে রাজবল্লভ ও নবাবসহ ইংরাজ বিরুদ্ধে আসিতেছেন শুনিয়া কলিকাতায় ইংরাজ, কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। কলিকাতা-যুদ্ধে ডেক ও অন্যান্য ইংরাজগণ নৌকাযোগে পলায়ন করেন, কিন্তু হলওয়েল প্রমুখ ১৭০ জন ইংরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কলিকাতার নাম হইল 'আলিনগর', এবং রাজা মাণিকচাঁদের উপর বন্দীগণের ভার অর্পিত হয়। অন্ধকূপ হত্যা অনুষ্ঠিত হইলে, মান্দ্রাজ হইতে লর্ড ক্লাইভ্ ও আঃ ওয়াট্‌সন্ আসিয়া প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হয়েন। এই সময় মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ ও রায়দুর্ল্লভ প্রভৃতি অমাত্যগণ সিরাজের সর্ব্বনাশ সাধনে সুযোগ পাইলেন। ইংরাজ-সৈন্য নিশাযোগে আক্রমণ করিতে গিয়া মীরমদনের নিকটে পরাভূত হয় ও আলীনগরের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু ক্লাইভ অবিলম্বেই পলাশীক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদ অধিকার করেন, মোহনলাল ও মীরমদনের অসীম বীরত্বসত্ত্বেও মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বঙ্গ-স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। ক্লাইভ্ স্বয়ং রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু সন্ধির সর্ত্তানুসারে মিরজাফরকে গদিতে বসাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করিলেন। পরাজিত হইয়া সিরাজ ভগবানগোলায় দানশা ফকিরের পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ফকির তাহাকে মিরজাফরের জামাতা কাসেম আলির হস্তে অর্পণ করে। বেগমের সমস্ত ধনরত্ন অপহৃত হয় ও পরে মীরণের আদেশে মহম্মদীবেগ নামক একজন জহ্লাদ নবাবকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। হস্তিপৃষ্ঠে নবাবের মৃতদেহ সহরের চারিদিকে পরিভ্রমণ করাইয়া সমাধিস্থ করা হয়। এই সমস্ত ঘটনাই গিরিশচন্দ্র ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাটকের অন্তরালে বিবৃত করিয়াছেন। মাননীয় অক্ষয় মৈত্র মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অন্ধকূপ-হত্যাই অলীক ঘটনা, কেননা— অন্যকোন কাগজ পত্র কি গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। আলীনগরের সন্ধি, হেষ্টিংসের লিপিবদ্ধ কাগজাবলী (mss.) ও ক্লাইভের চিঠিপত্র ও এই

বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। গিরিশচন্দ্র এই ঘটনা অস্বীকার করেন নাই। তবে তাঁহার মতে সিরাজের অজ্ঞাতসারে মাণিকচাঁদের দ্বারাই এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া সিরাজ বলিতেছেন—"কি নিমিত্ত হলওয়েল কারারুদ্ধ হয়েছিল? হলওয়েল একটী লোমহর্ষণ সংবাদ প্রেরণ করলে। ঈশ্বর করুন, তার সংবাদ মিথ্যা। সংবাদ সত্য হ'লে নবাবী রাজ্যের চিরকলঙ্কস্বরূপ তাহা ভারতে ঘোষিত হবে। সংবাদ এই—"

৩। সিরাজ-চরিত্র।

এইতো গেল ইতিহাসের কথা, এবং এই ইতিহাসকে মূল ভিত্তি করিয়াই গিরিশচন্দ্র আমাদের সম্মুখে স্বদেশ-প্রেমিক সিরাজদ্দৌলার চরিত্র উপস্থিত করিয়াছেন! কিন্তু তাই বলিয়া তাহার যৌবন সুলভ দোষের উল্লেখ করিতেও তিনি ক্রুটি করেন নাই! মিরজাফর ও জগৎশেঠকে অপমানিত করিয়া পরক্ষণেই ক্ষমা চাহিবার সময়ে তিনি এই দোষ নিজ-মুখেই স্বীকার করিতেছেন—"বাল্যাবধি আপনাদেরই আদরে আমাদের চিত্তদমন করা শিক্ষা হয়নি, তার দায়িত্ব আপনাদেরই" ২য় অঙ্ক, ১ম গ। অপর সময়েও মাঝে মাঝে তাঁহার অনুশোচনা-সূচক আক্ষেপোক্তি শুনিতে পাই—"ক্রোধে বশীভূত হ'য়ে ওয়াট্‌স্‌কে অপমান করেছি। মাতামহ, ক্রোধ দমন করতে কেন শিক্ষা দাওনি?"

৩য় অঙ্ক, ১ম গ।

নাটকে সিরাজের স্বদেশভক্তি ও জাতীয়তাই সমধিকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিকথায় সেই ভক্তি উজ্জ্বল ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মীরজাফর ও জগৎশেঠের ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া যখন তাহাদিগকে বুঝাইতেছেন—

"হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না, কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গালার শত্রু নই। আপনাদের যদি বর্জ্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য্য প্রদান করবো, আপনাদের আত্মীয়-স্বজন স্বদেশীই নির্ব্বাচিত

হবে। হিন্দু মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙ্গলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবেনা। বঙ্গবাসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীই রাজকার্য্য প্রাপ্ত হবে।”——

কয়টী কথায় সিরাজের স্বদেশপ্রেম সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। অন্য সময়েও আবার তাহাদের হস্তধারণপূর্ব্বক নবাব ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—

ওহে হিন্দু মুসলমান,
এসো করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন;
হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন। ।/৮

হিন্দু মুসলমানের পরস্পর মিলন ব্যতীত বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তিনি মীরমদনকে উদ্দেশ করিয়া আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন—

“মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখনও হিন্দু-মুসলমান জন্মভূমির অনুরাগে ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক’রে পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চস্বার্থে চালিত হ’য়ে সাধারণের মঙ্গলের সহিত আপনার মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ-প্রবৃত্তি দলিত ক’রে স্বদেশবাসীর অপমান আপনার অপমান জ্ঞান করে, তবেই আশা, নতুবা সব নিষ্ফল—”

এই জাতীয়তা ও স্বদেশানুরাগ যে সম্পূর্ণ স্বার্থ-লেশশূন্য এবং আদর্শ শাসনকর্ত্তারই অনুরূপ, বেগম লুতফ উন্নিসার নিকটে তাঁহার উক্তিই সপ্রমাণ করিতেছে:— ... ...

... ... প্রজার মঙ্গলসাধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

[এই পুস্তকের ২৩৮ পৃঃ দেখুন]

অন্যত্র বলিতেছেন—“আমার রাজ্যত্যাগে যদি মুসলমান রাজ্য রক্ষিত হয়, এ ছার রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই।”

সিরাজদ্দৌলার সাহস ও বীরত্বের সম্বন্ধেও নাটকখানিতে অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। নির্ব্বিরোধে মতিঝিল ভূমিসাৎ ও বিনারক্তপাতে কাসিমবাজার অধিকার করার কথা ইতিবৃত্ত লেখক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। অন্ধকূপহত্যার পরেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শক্তিশালী ইংরাজ ইহার

সমুচিত প্রতিশোধ কল্লে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করিতেই ত্রুটী করিবেনা—তাই ভবিষ্যৎ অশুভ সূচনা লক্ষ্য করিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেছেন—"মীরমদন, আমি ভীত নই, দুর্গম রণসন্ধিতে আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ কর্‌তে দেখেছো, কিন্তু ইংরাজ-নামে আমার দেহ কম্পিত হয়"। নৈশযুদ্ধে তিনি রণক্ষেত্রে সম্মুখীন হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন আর পলাশীক্ষেত্রে বিশ্বাসী মীরমদনের আকস্মিক পতনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আমার হস্তী আনয়ন করো, আমার বীরবংশে জন্ম বিনা পরিচয় দিব"।

ভগবানগোলায় আশ্রয় লইবার সময় নিঃসহায়াবস্থায় তাহার অনুতাপ যেমন মর্ম্মস্পর্শী সেরূপ বীরোচিত। বেগম যখন তাঁহাকে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন, সিরাজ উত্তর করিলেন—

নাহি আর সম্ভাবনা তার—
নাহি হয় আশার সঞ্চার—,
মহাভয় উদয় হৃদয়ে
হেরি ভবিষ্যৎ ছবি তমোময়।
যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বালিকায়,
দোঁহে মিলি প্রবেশি সলিলে।
ধরাবাস কারাবাস সম—
হেরি মোরে নতশির হ'ত রাজাগণে
এবে দেবস্থানে বসিয়ে নির্জ্জনে
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ।
ভোজ্যহেতু পর-উপাসনা,
একমাত্র সুখকর মরণকল্পনা।

নাট্যকার সিরাজের মহত্ত্বচিত্রনেও অদ্ভুত ভাবে তুলি সঞ্চালন করিয়াছেন। সমগ্র নাটকখানিই সিরাজের মহানুভবতা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যে রাজবল্লভ তাঁহার এত শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন, কলিকাতা অধিকার করিয়াই ইংরাজ কর্তৃক অবরুদ্ধ তাহার

পুত্র কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদের বন্ধন মুক্ত করিয়া নবাব যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা কৃষ্ণদাসই কৃতজ্ঞতাশ্রু-গদ্‌গদ্‌-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন—

"অভিযোগ করেও মার্জ্জনা চাইলে, মার্জ্জনা পায়। যতই দোষ থাকুক মেজাজ অতি উচ্চ।" সিরাজও বলিতেছেন "কেউ শরণাগত হ'য়ে আশ্রয় পায়নি বা গুরুতর অপরাধ করে মার্জ্জনা প্রার্থনায় দোষ মাপ হয়নি, বোধহয় আমাদের শত্রুর মুখেও শুনবে না"। জগৎশেঠ, মিরজাফর প্রভৃতিকে বারম্বার ক্ষমা করায় করিমচাচাও ব্যঙ্গভাবে বলিতেছেন—

"এমন একজন নবাবের ব্যাটা নবাবকে বসাও। যে হেট বল্‌তে জুতোশুদ্ধ লাথি ঝাড়ে, যে কয়েদ্‌ ক'রে টাকা আদায় করে। টাকা ভাঙলে মাপ, শত্রুতা কর্‌লে মাপ, এ ব্যাটা কি নবাব! ছ্যাঃ"। রাজ্য-শাসন ব্যাপারে অবলম্বিত এই নীতি সিরাজের নিজের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়—"মার্জ্জনার সম নাহি উচ্চ রাজনীতি।"

এইরূপ মহানুভব, স্বদেশ-প্রাণ, সাহসী, আত্মত্যাগী, বীর সিরাজ মৃত্যুকেও যেরূপ নিঃসঙ্কোচে বরণ করেন, হত্যাকালে তাঁহার চরিত্রানুযায়ী নির্ভরোক্তিই সাক্ষ্য দিতেছে—"ঈশ্বর তুমি দয়াময়, প্যাগম্বরের বাক্য রক্ষা করো; আমার অনুতাপ গ্রহণ করো"। এই চরিত্রাঙ্কণে গ্রন্থকার সিরাজসম্বন্ধে প্রচলিত জনমত আমূল পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সিরাজের শোচনীয় মৃত্যুতে বাঙ্গলার আবাল বৃদ্ধ-বনিতা বঙ্গদেশের উদার-হৃদয় নায়কের অভাবই অনুভব করিয়া থাকেন। গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন বাঙ্গলার নবাব সিরাজদ্দৌলা আর মাতামহ-দুলাল, মাতাল, কুক্রিয়াসক্ত সিরাজে অনেক পার্থক্য, তাই নাটকের যবনিকা পতনের কিছুকাল পুর্ব্বে করিমচাচা জহরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

"কিন্তু চাচী, যে নবাব হোসেনকুলীকে কেটেছিল তার্‌তো কিছু ক'র্‌তে পার্‌লে না! সে ছিল মাতাল নবাব, আর এ হ'চ্চে প্রজা-পালক নিরীহ নবাব।"

৪। বাঙ্গলার অবস্থা।

নবাব-চরিত্র যতই মহৎ হউক্ না কেন, মোহনলাল ও মীরমদনের বীরত্ব বা প্রভুভক্তি যতই উচ্চরবে ঘোষিত হউক না কেন, মোটের উপর বাঙ্গলার অবস্থা এই বিবর্ত্তনকারী যুগসন্ধিতে সর্ব্ববিষয়েই হীন হইয়া পড়িয়াছিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, জাতীয়তা বা স্বদেশ-প্রীতি তাহাদের চিন্তার মধ্যেই আসিত না। এই নবজাগরণের দিনেও বঙ্গবাসী যে সেই অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন এমন মনে হয় না, এখনও যে ব্যক্তিত্বের স্বার্থ-যূপে জাতীয়তার বলিদান হয় না, এমন নয়। জাতীয় জীবনের দোষাবলীর বিরুদ্ধে গিরিশচন্দ্রের লেখনী ছিল অঙ্কুশের সমান। জহরা বলিতেছে—"মিরজাফর বল, ইয়ার লতিফ বল, রাজবল্লভ বল, সকলেই নবাবীর জন্য ব্যস্ত, রাজ্যের মঙ্গলার্থ নয়, দুর্দ্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়, **স্বার্থের জন্য**"। ৪র্থ অঙ্ক। করিমচাচাও ব্যঙ্গচ্ছলে তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছে "বাঙ্গলায় জন্মেছি, আপনার ভালই ভাল। কে কার জন্য ভাববো, কে কার জন্য ভাববো, আপনি গুছিয়ে নিই, পরকালের না হৌক্, ইহকালের তো কাজ হবে"। এই ভাবের চরম পরিপুষ্টি—করিমচাচার শেষোক্তিতে। কি নির্ভীকভাবে বাঙ্গালীর কলঙ্ক দূর করিতে নাট্যকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, পাঠক নিম্নলিখিত দুই একটী কথায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন—"জনাব, এই বাঙ্গলায় যদি তিনজনের দু'মত দেখাতে পারেন, তা হ'লে আমি নাকে খত দিয়ে আফিং ছেড়ে দেবো। যদি একমতে বাঙ্গলায় কাজ হ'তো বঙ্গবাসী একমতে চল্‌তে শিখ্‌তো, তা হ'লে বাঙ্গলার মাটী থাক্‌তো না, সোনা হ'ত। বাঙ্গলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচ ও তেমন ঝুড়ি ঝুড়ি"।

ক্লাইভ্‌কেও করিমচাচা যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছিলেন—"সাহেব, বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমানের চরিত্রই তোমাদের অনুকূল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা। স্বার্থসিদ্ধির আশা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজিত"।

পরবর্ত্তী "মিরকাশিম" নাটকেও এইভাব বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে—

বাঙ্গালায় পক্ষাপক্ষ নাই, একটা গোলযোগ চাই, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা চাই, বাঙ্গলার কেউ কারো মুখ চায় না।”

“মিরকাসিমে” সমসের খাঁর ব্যাঙ্গোক্তিও বাঙ্গলার এই অবস্থা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে “এখনও বোধ হয় দুদশটার আমাদের মত সুবুদ্ধি জোটে নাই। ছেলে পুলে, আত্মীয়স্বজন কোন কোন আবাগীর বেটা ‘দেশ’ কথাটাও মুখে আনে, এ সকল বাজে ভাবনাও ভাবে—সেই গুলো ম’লেই বাঙ্গলার সোনার শ্রীহবে”। অবশ্য বাঙ্গলার সে দুর্দ্দিন আর নাই, তথাপি এক এক সময় করিমচাচার কথায়ই বিশ্বাস জন্মে। মীরমদন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন “কেন, আমরা কি বাঙ্গালী নই” ? তাহাতে করিম উত্তর করেন—“এই রাজ-সভাসদের ন্যায় গোটাকতক আগাছা গজায়, নইলে বঙ্গভূমি রূপ সাধের উদ্যানে স্বার্থকুসুম ফুটেই রয়েছে ! ছোটবড় সব স্ব স্ব প্রধান—সুসৌরভে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ ! এ বাঙ্গলায় যিনি শান্তি স্থাপন কর্‌বেন, তিনি বিধাতা পুরুষ। বাঙ্গলা ফিরে গড়তে হবে, পুরানো বাঙ্গালায় চল্‌বেনা”। ২য় অঙ্ক, ৪ গ। নাট্যকার এ সমস্ত স্থানে অতি খাঁটি সত্য কথা বলিয়াছেন, কারণ এ যুগেও অনেক স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী মনে করেন “দেশোদ্ধার যদি হয়, আমার দ্বারাই হৌক্, নচেৎ হ’য়ে কাজ নেই”।

৫। ইংরাজের গুণ।

একদিকে যেমন গিরিশচন্দ্র সিরাজ-চরিত্রের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে কাহারও মতের অপেক্ষা করেন নাই, তীব্র কশাঘাতে বাঙ্গালীর কলঙ্ক দেখাইতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, অন্যদিকে ইংরাজ চরিত্রের গুণাবলী প্রদর্শন করিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। উদ্যমশীলতা, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি, সাধারণের প্রয়োজনে নিজ স্বার্থ-বলিদান প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া ইংরাজ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতি, গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে এই জাতির সহিত আমাদের সংস্রব যেন ভগবানের নির্দ্দেশক্রমেই সংঘটিত। কি কারণে নাট্যকার এইরূপ মত পোষণ করেন আমরা ধারাবাহিকভাবে এইখানে তাহার উল্লেখ করিব—

১। ইংরাজের জাতীয়তা—

কলিকাতা অধিকার করিবার পরে গভর্ণর ড্রেকের পলায়ন সম্বন্ধে সিরাজ কর্ত্তৃক ভীরুতা আরোপিত হইলেই তৎক্ষণাৎ হলওয়েল উত্তর দিলেন "জনাব, he is a brave man, অনুমান হয়, উল্টা বায়ুতে তিনি আসিতে পারেন নাই"। নবাবও এইরূপ জাতীয়ভাবাপন্ন সদুত্তরে চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রদান করিলেন—

"হল্‌ওয়েল্, তোমরা উচ্চজাতি, তার সন্দেহ নাই। **তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য।** ড্রেকের সম্পূর্ণদোষে বিপদগ্রস্ত হ'য়েও বন্দী অবস্থায় তার নিন্দার প্রতিবাদ করচ! তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। আমরা তোমার বীরোচিত ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আমি এখন বুঝ্‌লেম, কি নিমিত্ত অপরাপর পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে তোমাদের এত উন্নতি"।

"মিরকাশিমে", নবাবের নিজস্ব চিকিৎসক ডাক্তার ফুলারটনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইলে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আজ আমার স্মরণ হইতেছে বাউটন্ নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার স্বর্গীয় সম্রাট্ সাজিহানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বদান্য বাদসা তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলেন। বাদসাই পুরস্কারে বাউটন ক্রোরপতি হইতে পারিতেন, কিন্তু সেই true born Englishman আপনার স্বার্থ না দেখিয়া বাঙ্গলায় ইংরাজের বিনাশুল্কে বানিজ্যের সনন্দ লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার, আমি নবাব বেগমকে আরাম করিয়াছি, আর স্বদেশীর হত্যা দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণদণ্ড মকুফ হইল"!

এই নাটকেই হে সাহেব বলিতেছেন "আমরা ঘরের ভিতর ঝগড়া করে, এমন ঝগড়া করে, duel লড়ে, লেকেন্ দুসরা যখন দুষমন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। হামাদের সব শিখিতে পারিবে, হামাদের এইটা India শিখিতে পারিবে না। জাতের দুষমন সবার দুষমন, এ Indian লোক কখনও শিখিবেনা"।

"সিরাজদ্দৌলার" জহরাও এইকথা স্পষ্টভাবে বলিতেছে—"তোমাদের স্বার্থ একরূপ, পরস্পর স্বার্থের জন্য বিবাদ করো, কিন্তু ইংরাজশত্রুর বিরুদ্ধে সকলে মিলে ভ্রাতৃভাবে অস্ত্রধারণ করো।" ৪র্থ অঙ্ক……।

২। সূক্ষ্মবুদ্ধি।

ইংরাজের সূক্ষ্মবুদ্ধিতে মণিবেগমও বলিতেছে "ভেদমন্ত্রে তোমরা বিশেষ পারদর্শী, হিন্দু-মুসলমান তোমরা সম্পূর্ণ ভেদ করেছ, তোমরাই সমস্ত ভারতবর্ষে রাজা হইবার উপযুক্ত"। মিরকাশিম্ ২য় অঙ্ক, ৪গ। অন্যত্র "সিরাজদ্দৌলা"য় ফরাসীয় সিনফ্রে বলিতেছে—"ইংরাজের বুদ্ধিকে বাহবা দিতে হয়—ঘরোয়া মন ভাঙাতে এমন জাত আর দুটী নাই"। এই নাটকেই অন্যত্র করিমচাচা বলিতেছেন "ভাবছো গর্দ্দানা দিবে ইংরাজ আর নবাবী কর্‌বে তোমরা! সাদা চেহারা চেনোনা, সব পস্তাবে, ওরা খুব দাঁওবাজ, তা ওদের কাছে দাঁও চল্‌বেনা তোমরা চালচলনে মানুষ চেনোনা। আলিবর্দ্দি বর্গীর ভয়ে সকল জমিদারকে ফৌজ বাড়াতে বলেছিল, ইংরাজ তোফা কোল্‌কাতা গের্দ্দো করে নিলে। বল্‌লে বল্‌বে ব্যবসায়ী কুঠী, কিন্তু ওদের কুঠীর মত কটা নবাবী কেল্লা আছে বল।"

৩। ইংরাজের উদ্যমশীলতা।

গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলায় ইংরাজের উদ্যমশীলতা সম্বন্ধে প্রকাশ করিতেছেন—"উদ্যমশীল, একতায় আবদ্ধ উদ্যোগী পুরুষ সিংহ, কার সাধ্য তাদের দমন করে?" ২য় অঙ্ক, ৬গ। অন্যত্র মাণিকচাঁদ জগৎশেঠ প্রভৃতির নিকট বর্ণনা করিতেছেন "ইংরাজ অতি উদ্যমশীল, ইংরাজের রণতরী অতি অদ্ভুত চলত দুর্গ। এই রণতরী-বলেই ইংরাজ এত প্রতাপশালী।"

২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

ইংরাজের জাতীয়তা, অধ্যবসায়, উদ্যমশীলতা ও সাহসের জাজ্বল্যমান আদর্শ ক্লাইভ্‌চরিত্র। নাট্যকার অতি অদ্ভুত কৌশলে এই বীর, গুণগ্রাহী ও কৌশলী ক্লাইভ্‌চরিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে জহরা বলিতেছে "বিবেচনা ক'রে পৃথিবীতে কোন্ বড় কাজটা হয়েছে? তোমাদের ইতিহাসে শুনি সিজার ঝড় তুফানে রুবিকান্ পার্

হয়েছিল, সেকেন্দার সাহা শত্রুর মাঝখানে গে' ঝাঁপিয়ে পড়্তো, হানিবল না কে ছিল শুন্তে পাই হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় আল্পস্ পর্ব্বত পেরিয়ে শত্রুজয় ক'রেছিল, আর চক্ষের উপর দেখলেম্ ক্লাইভ ছ'শো সৈন্য নিয়ে লাখ্ নবাবী সৈন্য ভেকো ক'রে ছেড়ে দিলে। এর কোন্ কাজটা বিবেচনার কাজ ?"

ক্লাইভের অদ্ভুত ক্ষমতায় করিমচাচা যাইবার সময় ঠিকই বলিয়া গিয়াছেন "সাহেব, সেলাম, বড় জবর্ লোক তুমি, বাঙ্গলা কি সমস্ত ভারতবর্ষ তোমাদের !"

নাট্যকার নবাব-দরবারে ক্লাইভ ও মোহনলালকে একসঙ্গে উপস্থিত করিয়া উভয়ের চরিত্রের কিরূপ যোগ্য পরিচয় দিয়াছেন শেষ দরবার দৃশ্যে তাহা খুব স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধের পর বিজয়-গৌরবে দরবারে সমাসীন হইয়াছেন, নবাবী-গদির উপর মিরজাফর উপবিষ্ট, সকলেই বিচারালয়ে উপস্থিত, এমন সময়ে জনৈক সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় মোহনলালকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত ! বীরের উপযুক্ত সম্মান না করিয়া মিরজাফর ব্যঙ্গভাবে তাহাকে বলিয়া উঠিল, "মোহনলাল, এখন তোমার সে দর্প, সে দম্ভ কোথায় ?" শৃঙ্খলিত বীরকেশরী এই হীন কশাঘাতে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, সুপ্তসিংহ যেন জাগিয়া উঠিল, সমস্ত দরবার কক্ষ বিকম্পিত করিয়া বীর আপনার গর্ব্ব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার যোগ্য জবাব দিতে দ্বিধা করিল না—

"বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার, মুসলমান কুল-কলঙ্ক, আমার দম্ভ সমানই আছে। লজ্জাহীন, নীচাত্মা, গোলামী গদিতে ব'সে হুকুম দিচ্ছ? যার গদি তারে ছেড়ে দে, ক্লাইভ সাহেবকে দে—যার পদে দেশ, মান, মর্য্যাদা, মনুষ্যত্ব সকলই বিক্রয় করেছিস্, তারে গদী দিয়ে পদপ্রান্তে ব'স্। ক্রীতদাস, পরাধীন কুকুর, জীবনে মরণে আমার দম্ভ সমানই রইল, বঙ্গবাসীর হৃদয়ে আমার চির আসন রইল। ঘাতকের অস্ত্রে হত হ'য়ে আমার দম্ভ নষ্ট হবেনা, তুমি ক্লাইভের ভারবাহী গর্দ্দভ হ'য়ে থাক।"

কবিশ্রেষ্ঠ নবীনচন্দ্রের অদ্ভুত লেখনীপ্রভাবে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বীর

মোহনলালের আসন চির-প্রতিষ্ঠিতই রহিয়াছে। এই স্থানে ক্লাইভের উক্তিও সম্পূর্ণ বীরোচিত—

"মোহনলাল, আপনি বীরপুরুষ। আপনাকে খোলাসা দেবার আমার এক্তার নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি "you are a brave soldier, আপনি সত্যই বলিয়াছেন মৃত্যুতে আপনার গর্ব্ব খর্ব্ব হবে না। **you are a patriot**"।

মোহনলালের প্রতি বিশ্বাস ও উচ্চধারণায় ক্লাইভের চরিত্র যে আরও উজ্জ্বল হইয়াছে, নিম্নলিখিত উক্তি হইতে পাঠক তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইবেন। মিরজাফর নবাবী গদির মূল্য স্বরূপ সম্পূর্ণ অর্থ দিতে অক্ষমতা জানাইয়া জামিন চাহিতেছে, লোক-চরিত্রজ্ঞ ক্লাইভ উত্তর করিলেন—

"ঐ যে মোহনলাল যাহাকে ধরিয়া আপনার দূত হইয়া গেল, সে আসিয়া জামিন হইলে আমি প্রত্যয় করিতাম, আপনার কথায় প্রত্যয় করিতে পারি না।"

উমিচাঁদকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য যে জাল দলিলের সৃষ্টি হয় তাহাতে অনেক সমালোচক ক্লাইভের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন। কাজটী যে নীতিবিরুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু রাজনীতি-বিরুদ্ধ নয়। বিশেষতঃ উমিচাঁদ ও সহজ বিশ্বাসঘাতক ছিল না, আর ভবিষ্যতে যে কার্য্যে জাতির মঙ্গল, যাহাতে সমগ্র ব্রিটিস্ সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সুখ, সেই মহান উদ্দেশ্যে ক্লাইভের পক্ষে ঐরূপ অন্যায় কার্য্য-সাধন রাজনীতি-বিগর্হিত বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাস ও পুরাণে নীতি-বিগর্হিত হইলেও রাজনীতি-প্রসূত অন্যায় অনেক কার্য্য আদর্শ চরিত্রের দ্বারাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাই ক্লাইভ বলিতেছেন "আমি ব্রিটিস রাজ্য স্থাপনের জন্য আর উমিচাঁদের মত কপটলোককে দমন করবার জন্য এমন একশো কাজ কর্ত্তে প্রস্তুত"। অন্যত্র তিনি উমিচাঁদকে বলিতেছেন "উমিচাঁদ বাবু, আমাদিগকে অল্পই বুঝিয়াছেন। তোমার মত লোক যদি আমাদিগকে ভুলাইতে পারিত, তাহা হইলে জাহাজ ভাসাইয়া এতদূর আসিতাম না"।

ইংরাজ মহিলা বিবি-ওয়াটসের চরিত্রেও নাট্যকার এই জাতির জাতীয়

মহানুভবতা প্রমাণ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। সিরাজবেগম লুৎফুন্নিসার চেষ্টায় তাঁহার স্বামী কারামুক্ত হওয়ায় বিবি ওয়াটস্ এই উপকার কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সিরাজকে যখন বলপূর্ব্বক বেগমের নিকট হইতে লইয়া যাওয়া হয়, ওয়াটস-পত্নীই বেগমের একমাত্র সহায়া হন্। দুর্ব্বৃত্ত কামুক মীরণের হস্ত হইতে বেগমকে রক্ষা করিয়া তিনি বলিতেছেন "আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব promise (প্রতিজ্ঞা) করিয়াছিলাম, ইলণ্ড-দুহিতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।" নবাবকে ঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারায় তাহার দুঃখের পরিসীমা ছিল না, নিতান্ত অনুতপ্ত ভাবে কঁাদিয়া বলিলেন "আপনি আমার স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, বড়ই দুঃখ রহিল প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না।" তাহার এই মহানুভবতায় লুতফুন্নিসাও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন "দেবি, তুমি ঈশ্বর-প্রেরিতা, এখন বুঝলেম কি ক'রে তোমরা জয়লাভ ক'রেছ"।

ইংরাজের নিকট আমাদিগকে কিরূপ বিশিষ্ট জাতীয়তা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, নাট্যকার মেজর মন্‌রোর চরিত্রে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীর বাদসাহ সাহআলম্ ইংরাজসম্প্রদায়কে সনন্দ দ্বারা বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী ও অযোধ্যার উজিরি তাহার কাছে প্রদান করিতে চাহিলে, তিনি কাউন্সিলের বিনানুমতিতে উহা গ্রহণ করিবার লোভ সম্বরণ করেন। খোঁজা পিক্রু তাহাকে পীড়াপীড়ি করিলে তিনি এই উত্তর দেন—"মিষ্টার পিক্রু, তুমি ইংরাজের সহিত বেড়াইতেছ, কিন্তু এখন ও ইংরাজকে চেনোনা। দুই একটা লোভী ইংরাজ দেখিয়াছ, তাই ইংরাজকে বোঝো না।……………রাজ্য লইলে পালন করিবার ভার লইতে হয়……যদি কেউ এখানে অত্যাচার করে, পার্লেমেণ্টে তাহার impeachment হইবে। দু'একজন ইংরাজ অত্যাচারী হইতে পারে কিন্তু আমাদের জাতি ন্যায়বান্। ইউরোপে আমাদের ন্যায়বান্ বলিয়া প্রশংসা। ভারতে আমাদের শান্তি রাখিতে হইবে, সনন্দটা নিয়ে নিলেই হয় না। এখন আমরা মীরজাফরের আড়ে আছি, সনন্দটা নিলে সবকাজ একদম্ মাথায় পড়্‌বে। রাজা হইয়া অন্যায় করিলে আমাদের রাজ্য

থাকিবেনা, বল থাকিবে না। যেমন অন্য লোক হারিয়া যায়, আমরাও হারিয়া যাইব, আমাদের দূর হইয়া যাইতে হইবে"।

এরূপ জাতীয়তা-সম্পদ্ যে জাতির প্রধান আভরণ গিরিশচন্দ্র বলেন, সেই দুর্দ্দিনে তাহার প্রতিষ্ঠা ভারতে অবশ্যম্ভাবী। তাই সিরাজ মিরমদনকে বলিতেছেন "মিরমদন, তুমি জানোনা, মোগলবংশ উচ্ছেদ করতে ইংরাজ জন্মগ্রহণ ক'রেছে, শিখ্ গুরু তেগ্ বাহাদুরের অভিশাপ শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে মোগলবংশ উচ্ছেদ ক'রবে"।

সিরাজদ্দৌলা ২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গ।

জহরাও ক্লাইভকে বলিতেছে—ঐ শোন, গগনমার্গে বজ্রনাদে বিধাতা বলুচে তোমাদের জয়! ঈশ্বর দীননাথ, তিনি দীনের দুঃখ সহ্য করেন না, ভারতবর্ষে দীনপ্রজা হাহাকার করুচে, ভারতবর্ষ শান্তিহীন। হিন্দুর দৌরাত্ম্যে যখন প্রজাপীড়িত হয়, ভগবান ভারতবর্ষ আফগানদের প্রদান করলেন। আফগানের দৌরাত্ম্যে প্রজা পীড়িত হওয়ায় মোগলেরা শান্তিস্থাপন করুলে। এখন মোগলেরা অত্যাচারী, মারহাট্টা অত্যাচারী, দিনদিন যুদ্ধবিগ্রহে প্রজার শান্তি নাই, **সেই শান্তি স্থাপনের ভার ঈশ্বর তোমাদের প্রদান করুচেন। আবার তোমরাও যদি অত্যাচারী হও, তোমরাও রাজ্যচ্যুত হবে।**

সিরাজদ্দৌলা ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গ

"মিরকাশিমে" তারাদেবীও সম্রাট সাহআলম্ এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতকায় প্রকৃতভাবে বুঝিতে পারেন "হিংসাদ্বেষ, আত্মীয়হত্যায় ভারত জর্জ্জরীভূত, তোমাদের রাজ্যশাসনে তা দূর হবে। ভারতের শিক্ষার ভার, রক্ষার ভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই তোমরা পদেপদে জয়যুক্ত। **ভারতে এসে তোমাদের জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হয়োনা**"।

৫ম অ, ৯ম গ।

মিরকাশিম ঃ

এইবার আমরা নবাব মিরকাশিমের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইব। এই নাটকও ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই রচিত এবং ইহাতেও কোন ঘটনাই অতিরঞ্জিত বা বিকৃত নাই। নানারূপ ঘটনামূলক হইয়াও সিরাজদ্দৌলার ন্যায়ই নাটকখানি দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। উভয় নাটকই নাট্যকারের পরিণত বুদ্ধি, প্রবীণ বয়স ও অন্তর্জ্ঞান সমুদ্ভূত, তথাপি মনোজ্ঞ ঘটনা-সমাবেশ ও কলানৈপুণ্যে সিরাজদ্দৌলায় যাহার বিকাশ, তাহার মিরকাশিমে পূর্ণাবয়বতা।

উভয় নাটকের নায়কচরিত্রই অতি মহৎ।—উভয়েই সাহসী, বীর ও স্বদেশপ্রেমিক। উভয়েই স্বদেশের মঙ্গলবিধানার্থ ইংরাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, আবার উভয়েই স্বদেশীয় শত্রুর বিশ্বাস-ঘাতকতায় পরাভূত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন্। তবে আত্মীয় ও অমাত্যের চক্রান্তে সিরাজ ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন, আর মিরকাশিম ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন। সিরাজদ্দৌলার পদমর্য্যাদা বা পদলাভ সমস্তই মাতামহের প্রসাদে, আর কাশিমালীকে সবই নিজ ভুজবলে অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। স্বদেশে ষড়্যন্ত্র, প্রবাসে বিশ্বাস-ঘাতকতা, যুদ্ধে পরাজয়, হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া ফকিরবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ, —এইরূপ অদৃষ্টের বিড়ম্বনা তাহার ভাগ্যে নিতান্ত অপ্রতুল ছিলনা। বিশেষতঃ তাহার অভ্যুদয়কালে ইংরাজ আরও পুষ্ট, মোহনলাল, মীরমদনের ন্যায় বিশ্বাসী সেনানায়কের একান্ত অভাব, কৃতঘ্নতায় হিন্দু-মুসলমান সমধিক বর্দ্ধিত। কিন্তু এত শত্রুতা, বিপদ ও রণ-ঝঞ্ঝাসত্ত্বেও তিনি যে একা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা কেবল আশ্চর্য্য নহে, আদর্শ বাঙ্গালী নায়কেরই চরিত্রানুরূপ। যদিচ কর্ম্মচারীগণের বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্রায় সকল যুদ্ধেই পরাভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু শুধু জয় পরাজয়েই সর্ব্বদা বীরত্বের পরীক্ষা হয় না। জীবনসংগ্রামে, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে করিতে বাঙ্গালীর আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক নেতা শেষপর্য্যন্ত আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিরূপ স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইতে সমর্থ

হন্, নাট্যকার মিরকাশিম-চরিত্রে তাহা নিখুঁতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন আর ইহার আলোচনা অনাবশ্যক।

(১) আড়ম্বরশূন্যজীবন—মীরকাশিম সমস্ত বিলাসব্যসন বর্জ্জন করিয়া কিরূপ দীনভাবে দিনযাপন করিতেন, তাহা বেগমের কাছে তাঁহার কয়টী কথায় পাঠক পরিচয় পাইবেন "আর কি নবাবপুরে তোমার নুপুর-ঝঙ্কার শ্রবণ হয়? আর কি নবাবকে শতশত দাসদাসী বেষ্টিত দেখো? আর কি বেগমপুরে খোজাবাঁদীর কোলাহল শুন্‌তে পাও? আর কি নবাব-পরিচর্য্যার জন্য নানাদেশ হ'তে বহুমূল্য আহার্য্যদ্রব্য সংগৃহীত হয়? না, আমি বিলাসী নই, আমি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর"।

নবাব-সহচর আলি ইব্রাহিম্‌কেও তিনি বলিতেছেন—"এসো, একত্রে আহার করিগে চলো। আমার সামান্য আহার, সামান্য ভোজ্যবস্তু—আমার সহিত একত্র ভোজন করবার নিমিত্ত অপর কোন ব্যক্তিকে আহ্বান কর্‌তে সাহস হয় না"।

২য় অঙ্ক, ৩য় গ।

অন্যত্র লালসিংহের বীরত্বে পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি বলিতেছেন—"আমি নিঃস্ব নবাব, নবাবী যে বৈভব সে আমার নয়—রাজ্যের; আমার রাজভোগ অতি সামান্য ব্যক্তিও ঈর্ষা কর্‌বে না। মূল্যবান্ রাজপরিচ্ছদ সামাজিক প্রয়োজন, নচেৎ আমার প্রয়োজন নাই"। ৩য় অঙ্ক, ৬ গ।

(২) দেশহিতসাধন—এই প্রকার দারিদ্র্যব্রত যিনি গ্রহণ করেন, উচ্চলক্ষ্যই তাঁহার কর্ত্তব্য চালিত করে। মিরকাসিমেরও দেশহিতসাধনই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই তিনি বলিতেছেন—"আমার নবাবীগ্রহণ কার্য্যের নিমিত্ত, নবাবীর নিমিত্ত নয়। যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়, যদি ঈশ্বর অনুগ্রহে স্বর্গেও স্থান পাই, তথাপি আমার শান্তি হবে না। প্রজাদুঃখে আমি দিবারাত্র ব্যাকুল"।

(৩) আত্মত্যাগ—প্রকৃত দেশনায়কের কার্য্যই আত্মত্যাগ। আত্মবিসর্জ্জনব্যতীত দেশহিতৈষণা কেবল কথার কথা। এবং এই আত্মত্যাগ মন্ত্রেই নায়ক সমস্ত সহচরবৃন্দকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন; তাই

মিরকাশিম সেনাপতি তকিখাঁকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন—"অতি গুরুতর কার্য্য আমাদের উপস্থিত—কার্য্য আত্মত্যাগ। সকলকে বিনীতভাবে সন্তুষ্ট রাখ্‌বে, যাতে একতায় আবদ্ধ হয়, তার চেষ্টা পাবে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যা'তে একাগ্রতা জন্মে তারই প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌বে। আমাদের আত্মগৌরব ত্যাগ কর্‌তে হবে, যশোলিপ্সা ত্যাগ কর্‌তে হবে। বাঙ্গলার দীনপ্রজা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।"

এই প্রকার আদর্শ নায়ক নিন্দাভয় ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য করিতেন বলিয়াই বেগমও সেইভাবে শিক্ষিতা হইয়া তাহাকে উদ্দীপিত করিতেছেন "লোকনিন্দা! তুমিতো লোকনিন্দা উপেক্ষা ক'রে একার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ"।

এই প্রকার বীরকে উদারহৃদয় প্রতিপক্ষও উপযুক্ত মর্য্যাদা না দিয়া পারেন না। তাই মেজর মন্‌রো তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন —"তিনি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইংরাজ-চক্ষে তাঁহার মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয় নাই। তিনি ইংরাজদের একজন উপযুক্ত শত্রু, আমি অন্তরের সহিত তাহাকে মিরজাফর অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করি"।

আদর্শ নাট্যকার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন—ভাবের অগ্রদূত, প্রভাতের বিহঙ্গম। এইরূপ আদর্শ নায়কের আবির্ভাব প্রত্যাশা করিয়াই স্বদেশ-ভক্ত নাট্যকার মিরকাশিম-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তখন কি কেহ ভাবিয়াছিল বাঙ্গলায় এরূপ সর্ব্বত্যাগী বিলাসবিমুখ প্রজাহিতরত নেতার আবির্ভাব সম্ভব? হাঁ স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গলায় সবই সম্ভব। গিরিশচন্দ্রের স্বপ্ন সফল হইয়াছে, **বাঙ্গলা এইরূপ আত্মত্যাগী মহা-পুরুষ-সম্পদ্ লাভ করিয়াছিল**। হায়, বঙ্গমাতা ইহাও আজ তোমার অতীত ইতিহাস! গিরিশচন্দ্র এখন যে লোকেই অবস্থান করুন, তাঁহার পবিত্রাত্মা তাঁহার আদর্শকে এই বঙ্গ-ভূমিতেই মূর্ত্তিমান দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন।

অন্যান্য চরিত্রালোচনা।

(১) বেগম——উভয় নাটকের বেগমই পতিব্রতা, স্বামীসঙ্গিনী, তবে লুৎফুন্নিসা অপেক্ষা মিরকাশিম বেগম অধিক কার্য্যতৎপরা। সদা

উদ্যমশীল নবাবের জীবন সঙ্গিনী বেগমের কর্ম্মক্ষেত্র অধিক প্রসারিত বলিয়াই বোধহয় তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রেও বীরকরে অসি লইয়া স্বামীর সহযাত্রীরূপে স্বামীকে উদ্দীপিত করিতে দেখিতে পাওয়া যায়—"তোমার চিন্তাপূর্ণ মস্তিষ্ক কার সঙ্গীতে শীতল হবে, কার শুশ্রূষায় তুমি নিদ্রা যাবে? প্রভাতে কে তোমার রণসজ্জা করে দেবে? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ক'রে কে তোমায় যুদ্ধে পাঠাবে? আমি—। আমায় তুমি এই সকল শিক্ষা দিয়েছ, সেই শিক্ষার পরিচয় দেবো"। আবার যখন তাব্রীজ বালক তকিখাঁকে যুদ্ধগমন-প্রাক্কালে আশীর্ব্বাদে করিতে চাহেন, তিনি কর্ত্তব্যবোধে লোকনিন্দাও অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন তিনি স্বামীর অধীনস্থ **সৈন্যগণের জননী**—"আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাক্‌বো, প্রয়োজন হয় স্বদেশবৎসল বীরগণের সহিত যুদ্ধে দেহত্যাগ কর্‌বো"। স্বামীকে বলিতেন "আমি তোমার পত্নী, তুমি আমাকে বিলাসিনী রমণীজ্ঞানে উপেক্ষা ক'রো না"। এই বেগম নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা প্রতিরোধ করিয়া স্বামীর অপ্রীতিভাজন হইলেও তাহার সঙ্গত্যাগ করেন নাই এবং প্রবাসে স্বামীর বিপদ্‌কালে বালকবেশ ধারণ করিয়া তাহার সহায়তায়ও বিমুখ হয়েন নাই।

(২) মিরকাসিম নাটকের মণিবেগমকে নাট্যকার তেজস্বিনী রমণীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে নর্ত্তকী ছিলেন কিন্তু মিরজাফরের কৃপায় বেগম হইয়াছিলেন। সেক্সপিয়রের লেডী ম্যাক্‌বেথের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। পুত্রহীনা লেডী ম্যাক্‌বেথের এক আকাঙ্খা ছিল স্বামীর রাজ্যেশ্বরত্ব, মণিবেগমেরও প্রবল আকাঙ্খা ছিল স্বামীপুত্রের পদগৌরব। পুত্র নজমৌদ্দলার ভবিষ্যৎসমুন্নতি-আশায় ইনি কাশিমালীকে নায়েব-নবাবীপদ দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন সে নবাবকে পদচ্যুত করিয়া নিজেই সিংহাসনারূঢ় হইয়াছে, মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া পুনরায় স্বামীর নবাবীপদ লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লেডী ম্যাক্‌বেথ স্বামীর উচ্চপদলাভাকাঙ্খায় ডান্‌কানের হত্যাসাধন করিতে যেরূপ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, মণিবেগমও সেইরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পুনরায় স্বামীর

দ্বারা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাইয়া মিরকাসিমের পদচ্যুতির সমস্ত পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সত্য বটে, এই বন্দোবস্তে বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ, কিন্তু ভুয়োদর্শিনী বেগম বুঝিয়াছিলেন ইংরাজ-আধিপত্যই দেশের একমাত্র মঙ্গলকর ব্যবস্থা।

হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়া স্বামী সিংহাসন অধিকার করিলে লেডী ম্যাক্‌বেথ আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্বামীর বিপদ্ কালে তিনি নিজেই অপ্রকৃতিস্থা, আর বেগম স্বামীর বিপদ্‌পাতে নিজেই তাহার একমাত্র সঙ্গিনী। মহাব্যাধি স্বামীর সমস্ত দেহ অধিকার করিলেও তিনিই একমাত্র শুশ্রূষাকারিণী; তখনও বৃদ্ধ মীরজাফরই রূপসী যুবতীর জীবনের জীবন। তাহার শুশ্রূষায় ইংরাজ ডাক্তারও স্বীকার করিয়াছিলেন "আপনি সাধ্বী, আপনার পতিভক্তি অতি উচ্চ, ইংরাজ মেম মাত্রেই আপনার প্রশংসা করেন"।

"সিরাজদ্দৌলার" **জহরা**, মণিবেগম অপেক্ষাও অধিক দৃঢ়ব্রতা, অধিক তেজস্বিনী, অধিক বুদ্ধিসম্পন্না। এরূপ অদ্ভুত চরিত্র বোধহয় সেক্সপিয়রও কোন নাটকে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মণিবেগম, মিরকাশিম-বেগম ও হোসেনকুলির বিধবাপত্নী তিনজনই পতিব্রতা, কিন্তু বেগম ঐশ্বরিক শক্তি, মণিবেগম পার্থিব ও জহরা নারকীয় শক্তিসম্পন্না। বেগম সর্ব্বদাই স্বামীর মঙ্গল কামনায় উচ্চাদর্শে পরিচালিত হইয়াছেন, মণিবেগম সেই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব-যুগে স্বামীর পদগৌরবলাভে কোন্ অসদুপায় অবলম্বন করিতেই ক্রটী করেন নাই। (কিন্তু হোসেনকুলীর বিধবা পত্নী জহরা প্রতিহিংসা-তৃষা নিবৃত্তির জন্য যে জহরব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গলা ধ্বংস হইয়াছে, স্বামীর রক্তপাতের প্রতিশোধ হইয়াছে, ইংরাজ-রাজ্য বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (এই তিনজনই কর্ম্মকুশলা;) কিন্তু সিরাজের সর্ব্বনাশ আর ইংরাজের প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত আয়ুধই যেন জহরার করতলগত। ঘেসেটী বেগমের নিকট চাবি ও রত্নাদি লইয়া গোপনে উৎকোচপ্রদানে বিপক্ষকে বশীভূত করিতে, সিরাজকে জনসমাজে 'সয়তানের' অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে, যুদ্ধে সর্ব্বদা ইংরাজের সহায়তা করিতে, সে সর্ব্বদাই যেন বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ছিল। কখনও মন্ত্রীর

ন্যায় ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সকে পরামর্শ দিতেছে, কখনও সিরাজের গুপ্তসন্ধান বলিয়া ইংরাজকে সতর্ক করিতেছে, কখনও মিরজাফরের প্রাণে আকাঙ্খার ক্ষুধা জাগাইয়া দিতেছে। কিন্তু এত জঘন্য প্রতিহিংসা-পরায়ণতায়ও তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় না, কারণ অমাত্যগণের ন্যায় কোন স্বার্থই তাহাকে চালিত করে নাই। এইখানেই এই চরিত্রাঙ্কণে নাট্যকারের বিশেষত্ব। জহরা পিশাচী বটে, কিন্তু সিরাজের রক্তে পতির তর্পণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বামীর ভীতি-ব্যাকুল-মুখ দর্শনে, তাহার খণ্ড খণ্ড দেহ হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপিত দেখিয়া, ক্ষোভে রোষে অন্ধ জহরা বাঙ্গলা জ্বালাইয়াছে কিন্তু "পৃথিবীতে এমন রত্ন নাই, সমুদ্রগর্ভে এমন ধনরত্ন নাই, যে তাহাকে বশীভূত করিবে"। তাই আক্ষেপ করিয়া করিমচাচা বলিত— "এত ক'রেও ইতিহাসে স্থান হ'লো না, বিবি, নাটক নভেলেই স্থান হ'লো"। কিন্তু ইতিহাসমূলক না হইলেও নাটকে এমন স্থান হইয়াছে যে এরূপ দ্বিতীয় স্ত্রী-চরিত্র এযাবৎ অঙ্কিত হয় নাই। "ভীষ্ম" নাটকের 'অম্বা'য় ও "শ্রীকৃষ্ণ" নাটকের 'প্রাপ্তি'তে জহরার অর্দ্ধস্ফুট প্রতিবিম্ব প্রতীয়মান হয়।

মানবশরীরিণী হইলেও নাট্যকার জহরায় একটা অশরীরি শক্তি দেহান্তরিত করিয়া সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে মহাশক্তি দীনপ্রজার মঙ্গলবিধানের জন্য মুষ্টিমেয় ইংরাজকে বাঙ্গলার সিংহাসন প্রদান করিয়া ভারতে শান্তিসংস্থাপন করিয়াছে, যে শক্তি সিরাজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়া বিদেশীর নিকট বাঙ্গলার ভাগ্যফল অর্পণ করিয়াছে, প্রতিবিধিৎসা যাহার জননী, সয়তান যাহার সহায়, রণচামুণ্ডা ভাগ্যবিধাত্রী, জহরা সেই শক্তিরই ছায়া মাত্র। তাই "বায়ু যেমন উত্তপ্ত হ'য়ে ঘূর্ণায়মানা, সেও সেরূপ অন্তরতাপে দিবারাত্র ঘূর্ণায়মানা। তাহার হোসেনকুলির রক্ত যেখানে পড়েছে, সে তাহা অরণ্য করবে, তাই সিরাজের সর্ব্বনাশের জন্য সে যথা তথা ভ্রমণ করে"। আর এই মহদনুষ্ঠানে সয়তানই তাহার একমাত্র সঙ্গী; কারণ যে সয়তান মিরজাফরের উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, যে সয়তান জগৎশেঠ ও রাজবল্লভের কূটবুদ্ধিতে, যে সয়তান ঘেসেটীর প্রতিহিংসায়, জহরা স্বয়ং সেই সয়তানের

রাণী; সে সকল হৃদয়ে সয়তানের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সকলকেই বিভীষিকা-ছবি প্রদর্শন করাইতেছে। বাঁদি সাজিয়া ওয়াট্‌সের সঙ্গে পথে যাইতে তাহার সম্বন্ধে ওয়াট্‌সের মনের ধারণা (just the devil's sweet heart—যেন সয়তানের প্রেমিকা) বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিল "ভাব্‌চ সয়তানী, হাঁ, সত্য সয়তানী, প্রতিহিংসা-উদ্দীপ্তা রমণী"। সে নিজেও আপনাকে যথার্থ ধারণা করিতে পারিয়া বলিত "**আমি নারকীয়শক্তি-সম্পন্না, সয়তানকে আত্মবিক্রয় করেছি!** বাঙ্গলায় আগুন জ্বালাতে হবে, প্রতিহৃদয়ে সয়তান জাগরিত ক'র্‌তে হবে, আমার শক্তিতে সিরাজের নামে লোকের ঘৃণার উদ্রেক হবে, সিরাজ সয়তানের অবতার বলে ইতিহাসে উল্লিখিত হবে।" ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীগণ যেমন ম্যাক্‌বেথকে "All hail Macbeth, thou shalt be king here-after!" বলিয়া অভিনন্দিত করিতেই সে চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সয়তানী জহরাও তেমনি সিংহাসনলাভের ষড়্‌যন্ত্রের বহু পূর্ব্বেই "বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি, চিন্তার কারণ কি?" বলিয়া সম্বোধন করিতেই সয়তানের শক্তিতে মিরজাফরও চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর বাঙ্গলায় এই মহাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়াই জহরা যেন রণচামুণ্ডা। ক্লাইভের ন্যায় বীরের নৈরাশ্যও জহরাই অপনোদন করেন, বিপক্ষের বারুদের আবরণ খুলিয়া তিনিই জলসিক্ত করিয়া দেন, সিরাজকে রণক্ষেত্রে আসিতে তিনিই প্রতিরোধ করেন, মোহনলালকে সিরাজের রক্ষার্থ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বালকবেশে তিনিই অনুরোধ করেন, আবার যুদ্ধক্ষেত্রেও সমস্ত-রণকৌশল-নিপুণা সিংহবাহিনীরূপে এই জহরাই নিজে সর্ব্বদা যুদ্ধ পরিচালনা করে। তাহার উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া স্বয়ং ক্লাইভ্‌ বলিতেছেন—"Ah, Bellona herself, Oh, the battle rages hot!"

কিন্তু সমস্ত আয়োজন করিয়াও যুদ্ধাবসানে যখন তাহার প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইল, তখন জহরামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল, "সে তখন প্রেমিকা

লোহেনা—জহর নবাব শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে। আর সেই সয়তানী নাই, পতিব্রতা দেবীমূর্ত্তি"। জহরা এবং স্বার্থপর অমাত্যবর্গের মধ্যে পার্থক্য তাহার নিজের কথায়ই ব্যক্ত করিব। যখন রায়দুর্ল্লভ তাহার কাছে আসিয়া মিনতি জ্ঞাপন করে—"জহরা, তুমি এখানে? চলো, নবাব (মিরজাফর) তোমায় বিস্তর পুরস্কার দেবেন"—জহরা আবার রোষপ্রদীপ্তনয়নে বিরক্তির সহিত তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে "সরে যাও প্রভুহন্তা! নারীর পতিই সর্ব্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম্ম, পতি স্বর্গ, সেই পতির তৃপ্তির জন্য দুর্নীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম—**আর তোমরা স্বার্থপর, তুচ্ছপদ, ক্ষণস্থায়ী অর্থের জন্য জন্মভূমি কলঙ্কিত করেছ, ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক ঐশ্বর্য্য-লালসায় বাঙ্গলা জ্বালিয়েছ!** আমি প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়েছিলেম্! হোসেন, মার্জ্জনা করো, চরণে স্থান দাও"। গিরিশচন্দ্রের **সিরাজের** সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এতবড় প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীর সহায়তা ভিন্ন সমাধান অসম্ভব বলিয়াই বোধহয় এই চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, অথবা জহরা তখনকার বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব মাত্র!

এতদ্ব্যতীত বিশেষ আলোচ্য চরিত্রের মধ্যে মোহনলাল, মিরমদন আলি ইব্রাহিম, তকিখাঁ, বাগসিং ও সম্‌সের প্রভৃতির প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা নাটকে খুব উজ্জলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র "চন্দ্রশেখরে" তকিখাঁর বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করিয়া ইতিহাস বিকৃত করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক চরিত্রের উদ্ধারসাধন করিয়া বীরের যোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। কাটোয়ার যুদ্ধে তকিখাঁ যেরূপ প্রাণতুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সে বীরত্বকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে; নাটকে সে চরিত্র আরও উজ্জল হইয়াছে। সম্‌সের এবং আলি ইব্রাহিম্ উভয়েই নবাবের সহচর—সম্‌সের মিরজাফরের, আর ইব্রাহিম মিরকাসিমের,—উভয়েই স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ও প্রভুভক্ত। যে কারণে নিরীহ ইংরাজ-শিশুর বধাজ্ঞায়ও ইব্রাহিম্ বিকৃতমস্তিষ্ক মিরকাসিমের সঙ্গত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ প্রভুর মঙ্গলার্থেই সম্‌সের মিরকাসিমের

সর্ব্বনাশ করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছিল। উভয়েই স্বদেশপ্রাণ, তবে নিষ্কর্ম্মা, কুচক্রী ও বিলাসী নবাবের অকর্ম্মণ্য সহচরাপেক্ষা আদর্শ নেতা মিরকাশিম-সহচর আলি ইব্রাহিমের জীবন যে অনেক উন্নত ও স্বদেশ ও প্রভুর সভায় উৎসর্গীকৃত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই আলি ইব্রাহিম ও সিরাজসহচর করিমচাচায়ও আবার অনেকটা ঐক্য আছে, তবে করিমচাচার চরিত্র আরও সরস ও সজীব। 'জনা'র বিদূষক যেমন ভক্তি ও বিশ্বাসে, বিশ্বামিত্র-সহচর সদানন্দ যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে, করিমচাচাও সেরূপ দেশপ্রাণতায় এই শ্রেণীর সমস্ত চরিত্রাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বল। এ চরিত্র সরসতায় বিদূষককেও অতিক্রম করিয়াছে। করিমচাচা নির্ভীকতায় মিরজাফর, রায়দুর্ল্লভ প্রভৃতির কৃতঘ্নতা সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করে নাই, নবাবকে উপদেশ দিতেও বিরত হয় নাই, আর নবাবকে রক্ষা করিবার জন্য নবাবের সাজে প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেও একটুকু বিচলিত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, করিমের কথায় দর্শকগণ যেমন আমোদ উপভোগ করিতেন আবার হৃদয় ফাটিয়া তাহাদের ক্রন্দনও বাহির হইত। সিদ্ধি-প্রিয় বরুণচাঁদ ও নকুলানন্দের, রহস্যপটু বিদূষক ও সদানন্দের, প্রভুভক্ত বাতুল ও আকালের, এবং স্বদেশভক্ত ফকিররাম ও আলি ইব্রাহিমের একত্র সমাবেশ যেন করিমচাচায়। এমন সদানন্দ ও দেশভক্ত, বিষাদশূন্য ও ভয়রহিত চরিত্র-অঙ্কণে গিরিশচন্দ্র সাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন নাই। তাহার একমাত্র চিন্তা তাহার দেশ ও প্রভু। আর নবাবী পোষাক পরিহিত দেখিয়াও কেন যে শত্রুচরগণ তাহাকে আবদ্ধ করে নাই, এই চিন্তায়ই তাহার দুঃখ! বীর মোহনলালও স্বদেশদ্রোহিতার জন্য মিরজাফরকে তীব্র কশাঘাত করিয়া হৃদয়ভার লাঘব করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা-বিলোপে ফকীররামও আক্ষেপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আলী ইব্রাহিমও প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে সুজাউদ্দৌলাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভর্ৎসনা করিতে দ্বিধা করেন নাই, কিন্তু মৃত্যুসময়েও করিমচাচার স্পষ্ট-বাদিতা ও সহাস্য-উক্তি বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই। মিরজাফর প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকগণ তাহাকে 'বেইমান' উক্তি প্রয়োগ করিলেই তিনি সহাস্য-

মুখে প্রত্যুত্তর করিলেন—"বেইমানিতো আমার একচেটে নয়, আমিতো হংস মধ্যে বকো যথা। বেইমানির যদি সাজা থাক্‌তো তাহলে তো সারা-সারি মুণ্ড গড়াতো"। নাটকখানি থাকিলে পাঠক দেখিতেন এই চরিত্রটী কত মৌলিক ও সজীব।

সর্ব্বশেষে আমরা ব্রহ্মচারিণী তারার চরিত্র কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। স্বদেশানুরাগে 'সৎনামের' বৈষ্ণবী ও মীরকাশিমের তারার সামান্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয় চরিত্রই সম্পূর্ণ পৃথক্‌। অনেকে মনে করিতেন ইনি নাটোরের মহারাজকুমারী তারাদেবী——'ভবানীর কন্যা' স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বাঙ্গলার নরনারীকে স্বদেশী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া জাতীয়তা, সেবা ও প্রেম শিক্ষা দিতেছেন। বিস্তারিত আলোচনা আমরা "জাতীয়তা" অধ্যায়ে করিয়াছি।

ছত্রপতি শিবাজী

"**ছত্রপতি নাটকে**" গিরিশচন্দ্র মহারাষ্ট্র-প্রতাপ শিবাজীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শিবাজী কিরূপে মবালা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য স্থাপন করেন, পরে ভারতসম্রাট্‌ আওরঙ্গজেব বাদসাহের কৌশল ব্যর্থ করিয়া ফকিরের বেশে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন ও যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আদর্শ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রামদাস স্বামীর প্রতিনিধিরূপে উহা পরিচালনা করেন, সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব নাটকীয় সৌন্দর্য্যের অন্তরালে বিবৃত আছে। আমরা নানা কারণে সম্প্রতি উক্ত নাটকের সমালোচনায় বিরত রহিলাম।

"**ভ্রান্তি**" নাটকে উদয়নারায়ণ, মুর্শিদকুলীখাঁ ও সরফরাজ ঐতিহাসিক নাম মাত্র। সমস্ত ঘটনাই শ্রীগিরিশের কল্পনা-প্রসূত। তৎকালে কোন কোন নবাবের শাসনকালে অপরাধীকে কিরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইত সে বিষয়ে নাটকে কিছু উল্লেখ আছে——

২য় মুসলমান—আজম খাঁ সাহেব জমিদার ধরি আন্‌তিছে, ল্যাঙ্গা ক'রে রোদি রাখ্‌তিছে। সে দিন মুই দে'খে এলাম একটা জমিদারকে বাঁদছে, আর সে পানি পানি কত্তিছে।

১ম মু—তোমার নবাবী আমলে কি 'বৈকুণ্ঠ' ছ্যালো? এই বৈকুণ্ঠ মল্ডি জমিদারগুলাকে ঘোসাচ্ছে, আর তোবা—আল্লা ডাক্‌তিছে।

বৃদ্ধ মু—আরে কুত্তা খিলায়াকা সাম্‌নে বহুত থোড়া হ্যায়। টুক্‌রা টুক্‌রা গোস্ত ছিন্ লে···আর গিদ্দারক্‌ মাফিক্ চিল্লাও এ! ৪র্থ অঙ্ক, ৬গ।

সৈয়দ রেজাখাঁর সময়ে একটা দুর্গন্ধময় বৃহৎ গর্ত্তে অপরাধী জমীদার-দিগকে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিতে হইত এবং হিন্দুদিগকে উপহাস করিয়া উহার নাম রাখা হইয়াছিল "বৈকুণ্ঠ"।

রাজস্থান অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক নাটক **"চণ্ড"** রচিত হয়। ইহাতে প্রকৃত "দেশভক্তের" আদর্শ উল্লিখিত আছে।

স্বদেশী যুগের তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটক ভিন্ন গিরিশচন্দ্রের প্রধান ঐতিহাসিক নাটকই **"সৎনাম।"** "জাতীয়তা" অধ্যায়ে আমরা এই নাটকের আলোচনা করিয়াছি।

"ছত্রপতি" ও "সৎনাম" উভয় নাটকেই আওরঙ্গজেব-চরিত্রের যথার্থ পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাজাহান' ও 'দুর্গাদাস' নাটকে এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ "গোলকুণ্ডায়" এই চরিত্রের কোন কোন অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। "সৎনামের" আওরঙ্গজেব যেমন বুদ্ধিমান তেমন সাহসী, যেমন কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না—

> জানো তুমি বিধিমতে,
> আওরঙ্গজেব প্রত্যয় না করে কোন জনে।
> সুত, সুতা, জায়া
> অবিশ্বাস সকলের পরে! চতুর্থ অঙ্ক, ৫ গ।

তেমনই নিজের নীতি প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন না। বৈষ্ণবীর শাস্তিবিধানে তাহার দূরদৃষ্টির পরিচয়। তাহার বৃত্তিভোগী অনেক বৈজ্ঞানিক মহাকষ্টকর মৃত্যু কিরূপে হয় তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন—"অনাহারে মৃত্যু, দেহ হতে চর্ম্ম ছিন্ন দ্বারা মৃত্যু, চীন প্রথামত পাকস্থলী ছিন্ন ক'রে যন্ত্রণা প্রদান, অনিদ্রায় জীবননাশ—ইত্যাদি।" কিন্তু তিনি জানেন আত্মা দেহ নয়, দেহ মৃত্তিকা মাত্র, দেহ-নাশে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি। তাই বৈষ্ণবীকে তিনি চরম শাস্তি প্রদান করিলেন—"তুমি যথা তথা ভ্রমণ কর;

কিন্তু যথায় যাবে বাদসার দূত সঙ্গে থাক্‌বে। অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়ে স্বচক্ষে স্বদেশী স্বধর্ম্মীর পীড়ন দেখ, 'জিজিয়া' কর পুনঃ সংস্থাপিত দেখ, তোমার এই শাস্তি"। স্বদেশী স্বধর্ম্মীর ইহাপেক্ষা আর কঠোর মৃত্যু কল্পনায়ও আসে না। এই নূতন শাস্তি নাট্যকারের পরিকল্পনা।

গিরিশচন্দ্র আওরঙ্গজেবের মুখে আকবরের রাজনীতিরও কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন "আকবর যে হিন্দুদের উচ্চপদ প্রদান করতেন, তার অর্থ হিন্দুরা বশীভূত হোক্‌, সে কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে। সাজিহান সা আকবরের রাজনীতি বোঝেন নাই, তাই হিন্দু-মুসলমানকে সমান করেছিলেন"। ৫ম অঙ্ক, ২গ।

"আনন্দ রহো" বা আকবর নাটকে সামান্য ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। মানসিংহকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা কোন কোন ঐতিহাসিক সমর্থন করেন। কিন্তু 'বেতাল,' 'লহনা' প্রভৃতি চরিত্র অদ্ভুত ভাবে সৃষ্ট হইলেও নানা কারণে এই নাটকখানি বিশেষ আদৃত হয় নাই।

"সৎনাম" নাটকের ২।১ রাত্রি অভিনয়ের পরেই কতিপয় মুসলমানের অতিরিক্ত উদ্যমে ইহার অভিনয় স্থগিত রাখিতে হয়। কিন্তু আমরা বারম্বার পাঠ করিয়া নাট্যকারকে সমর্থন করিতে পারি যে…"মুসলমানের প্রতি রচয়িতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; এবং মুসলমান যে সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত, তাহা হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত, এইরূপ নাটককারের ধারণা। হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে আমরা এক হিন্দুস্থানবাসী—সুখদুঃখের অংশী। অতএব পূর্ব্বকালে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখে কোন জাতির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। বরং ইতিহাস দৃষ্টে উভয় জাতির পূর্ব্ব ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের দ্বন্দ্বসম্বন্ধীয় এবং রাউণ্ডহেড ও ক্যাভেলিয়ারের দ্বন্দ্বসম্বন্ধীয় সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস ইহার প্রমাণ।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সামাজিক নাটক

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। কি ঘটনা সমাবেশে, কি চরিত্র সৃষ্টিতে, কি নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে, কি রসের অবতারণায় কয়খানি নাটকই নাট্যসাহিত্যে অতুলনীয়। প্রতি নাটকই মর্ম্মস্পর্শী, কেননা প্রায় চরিত্রই তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত। রঙ্গালয়ের সংস্রবে থাকিয়া অতি হীন চরিত্রের সংসর্গ হইতে ভগবৎ-অবতারের অযাচিত করুণা পর্য্যন্ত লাভ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার অভিজ্ঞতা যেরূপ বিশাল—চরিত্রাঙ্কনও তদনুরূপ অভূতপূর্ব্ব।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক নানা বৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন—উচ্চ, নীচ, পাপী, পুণ্যবান, কর্ম্মী, নিষ্কর্ম্মা, উপকারী, অপকারী, আততায়ী ও রক্ষক প্রভৃতি চরিত্রের আলোক ছায়ার সংমিশ্রণ এবং নানারূপ অনুকূল প্রতিকূল ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি ও পুষ্টি। নাটক কয়খানি তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচিত, জীবনের বহু অভিজ্ঞতা-প্রসূত, চরিত্রের প্রশান্তি ও দৃঢ়তার সময় লিখিত। বস্তুতঃ ঘটনা-বহুল কর্ম্মময় জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়াই তাঁহার সামাজিক নাটক, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা, দৈনন্দিন জীবন ও বাঙ্গালী সংসার চিত্রের স্মৃতিলিপি। আমরা যতই দেখি বাঙ্গালী সংসারের বীভৎস চিত্র সম্মুখে দেখিয়া ততই শিহরিয়া উঠি। আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালী কি দুঃখে দিনপাত করিতেছে, জীবন সংগ্রামে নিষ্পেষিত হইয়া পড়িতেছে, তাহার অভাবে বৃহৎ পরিবারখানি কোথায় ভাসিতে ভাসিতে বিলীন হইতেছে। দেখিতে পাই একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে, বাঙ্গালী মোকদ্দমায় উৎসন্ন যাইতেছে, অনুকরণ তাহার কাল হইয়াছে, ধর্ম্মহীন শিক্ষা ঘোর অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। তাঁহার সামাজিক নাটক এক অফুরন্ত ভাণ্ডার, এ ভাণ্ডার চরিত্র গঠনের এক আদর্শস্থল। এ কল্পসরোবরে অবগাহন করিয়া যে মূর্ত্তি তুমি দেখিতে চাহিবে, তাহাই তোমার নয়নপথে উদিত হইবে।

যদি অসংযম ও কৃতঘ্নতার বিকট পরিণাম দেখিতে ইচ্ছা কর, প্রকাশ ও ভুবনমোহিনীর চরিত্র অনুধাবন কর; যদি স্নেহের মূলোচ্ছেদের নিষ্ঠুরতা দেখিতে চাও, রমেশ ও নীরদের হৃদয়হীনতা কল্পনা কর; যদি কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিরহিত ব্যবহার-জীবীর পৈশাচিক স্বার্থপরতায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে ইচ্ছা কর, তবে কৃষ্ণধন, সিদ্ধেশ্বর ও শিবুর চরিত্র অনুধাবন কর; যদি সমাজ ও পাড়ার জঞ্জাল দূর করিতে প্রয়াসী হও, সাতকড়ি, কালীনটক ও হীরুঘোষালের উচ্ছেদ সাধন কর; যদি নরপশুর নৃশংসতায় ক্রোধে আত্মহারা হইবার অবকাশ হয়, ঘেঁচি ও মোহিতের নির্ম্মমতার কথা ভাব'; যদি সমাজদ্রোহিতায় করুণাময়ের পরিণাম দর্শন করিয়া ব্যথিত হইয়া থাক, তবে পবিত্র উদ্বাহ-রীতি পুনরায় সংস্থাপিত কর। আবার যদি সৌভ্রাত্রের সুশীতল বটচ্ছায়ায় তাপিত হৃদয়ের শান্তি অনুভব করিতে ইচ্ছা কর, উপেন্দ্র ও যোগেশের চরিত্র লক্ষ্য কর, যদি বন্ধুর বিপদে সহমর্ম্মিতায় তাহার প্রতি সমবেদনা-প্রকাশ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক মনে হয়, তবে হরিশ, বৈদ্যনাথ ও শিবনাথের অনুসরণ কর। যদি পরোপকারী, কর্ম্মী ও স্বার্থত্যাগীর জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাইয়া কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা কর, তবে সম্মুখে কিশোর, মন্মথ ও পাগলের আদর্শ সংস্থাপিত কর। আর যদি পতিগত-প্রাণা সরলান্তঃকরণা কুলবধূর সতীত্বে মুগ্ধ হইয়া আদর্শ মাতার পুণ্যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে ইচ্ছা কর, সরোজিনী, প্রফুল্ল, সুশীলা, জোবি ও হরমণির চরিত্র-সৃষ্টিতে আনন্দে বিগলিত হও। যদি সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি এমন আদর্শ পত্নীর নিঃস্বার্থ সেবা—হিন্দুর কল্পনা নয়,—প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে অনুসন্ধান করিলে দেখিবে যে প্রতি হিন্দুগৃহে শোণিত-শোষিণী বাঘিনী তরঙ্গিণীর প্রভাব অপেক্ষা আজও লক্ষ্মী-স্বরূপিনী জ্ঞানদা, হৈমবতী, সরস্বতী ও পার্ব্বতীর প্রভাব কত অধিক! যদি বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মত্যাগ-প্রভাবে নিজগৃহ তপোবনের মত পবিত্র ও বিলাস-বর্জ্জিত রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে আশ্রিতা বিধবাগণকে অন্নপূর্ণা, বিরজা ও নির্ম্মলার আদর্শ অনুসরণ করিতে উৎসাহ ও শিক্ষা প্রদান কর, তুমিও তাঁহার পুণ্যে নির্ম্মল ও পবিত্র হইবে।

জমাদার কর্তৃক ধৃত হইয়া পলাইয়া যায়। তারপর এদিক ওদিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন শুনিতে পাইল মোহিনী শনি গয়লানীকে বলিতেছে "সুশীলাকে এনে দে, আমি যা চায় দেবো"। বিকৃত-মস্তিষ্ক হরিশ মোহিনীকে গুলি করে কিন্তু উহা মোহিনীর গায় না লাগিয়া কানের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। ট্রাজিডি আরম্ভ হইল, হরিশ বাঁশবনে, আনাচে কানাচে, নানাস্থানে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

"প্রফুল্ল" ও "হারানিধির" নায়ক চরিত্রে কতকটা ঐক্য আছে। উভয় নাটকের নায়কচরিত্রই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় ট্রাজিডির উপযোগী, তবে যোগেশের পক্ষে সুরা সে ট্রেজিডি আনয়ন করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, আর হরিশের পক্ষে সুরার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। উভয়ের অবস্থাই প্রায় তুল্যরূপ; একজন সহোদরের পৈশাচিক স্বার্থ-পরতায় বিপদাপন্ন আর একজনও সহোদর-তুল্য বন্ধুর কৃতঘ্নতায় গৃহ-বিতাড়িত, অপমানিত ও নানাভাবে লাঞ্ছিত। যোগেশের পারিবারিক জীবন কিরূপ সুখের ছিল তাহা তাহার কথাতেই প্রমাণিত হয়,——"বাড়ী আস্‌তেম, স্বর্গে আস্‌তেম," সেই বাড়াই পরে আবার নরক হইয়া দাঁড়ায়——"বাড়ী আমার নয়, জোচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে রয়েছি"। হরিশও আফিস হইতে যোগেশের মত "বাছাদের কোলে কর্‌তেন; তারা আধ আধ কথা কইতো, বোধ হ'ত যেন স্বর্গে" কিন্তু পরে বলিতেছেন "সে বাড়ী আমার নয়, চণ্ডালে অপহরণ করেছে"। উভয়েই দশজনের কথা ভাবেন; যোগেশ মধ্যবিত্ত অবস্থার পরিবারবর্গের সুবিধার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার ট্রাষ্ট ডিড করিয়াছেন। আর হরিশ ছা'পোষা লোক কিন্তু অনাথ বালকগণ তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই বাপের অধিক জানে—"সকালে স্কুলের ছেলেরা আস্‌বে, কেউ স্কুলের মাইনে চাবে, আহা অমন অনাথ বালকেরা এইখান থেকে দুটী শাক্ ভাত খেয়ে স্কুলে যেতো। বই বগলে ক'রে ব'সে কড়ায়ের ডালের ঝোল অমৃত বলে খেয়ে যায়, আমায় বাপের অধিক জানে।" ২য় অঙ্ক, ২গ।

যোগেশ যেমন সুনামলোপে অধীর হইয়া পড়েন, হরিশও "ঋণের দায়ে লুকিয়ে থাকৃতে হবে, নয় ইন্‌সলভেণ্ট হ'তে হবে, লোক জোচ্চোর বল্‌বে

জোচ্চোরকে কে চাকরী দেবে" বলিয়া অস্থির হয়েন। উভয়েই অভিমানী, কাহারও নিকট মাথা হেঁট করেন নাই। উভয়েই তুল্যভাবপ্রবণ, একজন কর্ম্মত্যাগ করিয়া 'একদিন যাহাদের ছুঁ'লে নাইতেন' তাহাদের সঙ্গী হইলেন আর একজন দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া কৃতঘ্নকে খুন করিতে উদ্যত হয়েন। যোগেশের ও যেমন সুনামই দেবতা, প্রকৃত ঈশ্বর-প্রত্যয় নহে, হরিশও সেইরূপ বলিতেছেন "কোথায় ঈশ্বর? ঈশ্বর নাই,—এ দৈত্যের সংসার"। যোগেশের আত্মীয়ের কাছে সে কোন সহায়তা পায় নাই—আর হরিশকে তাহার সহধর্ম্মিনী সর্ব্বদা প্রবোধ দিতেছে "তুমি বুক বাঁধ, সুদিন কুদিন আছে। সংসার পরীক্ষার স্থল, এতে যে চিরদিন সুদিন আশা করবে তার আশা নিষ্ফল হবে।" নীলমাধব বলিতেছে 'এতদিন আপনি সংসারের ভার নিয়েছিলেন। এখন সংসার আমায় দিন'। তথাপি সে বিপদ্‌পাতে একেবারে মুহ্যমান—'সুদিনের মূল উচ্ছেদ হয়েছে, হাস্যময়ী কন্যা বিধবা, পৈত্রিক বাড়ী অপহৃত, বৃত্তিনাশ! যুবা পুত্রের উৎসাহ ভঙ্গ, সুদিনের বীজ অঙ্কুরিত না হ'তে হ'তে দগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। ঋণের দায়ে কবে জেলে নিয়ে যায়।' ২য় অঙ্ক, ২ গ।

যোগেশ যেমন "চেষ্টা রহিত। যে পথে চলেছি সেই পথেই যাব" বলিয়া একেবারে সমস্ত উদ্যম চেষ্টা ছাড়িয়া দেন, হরিশও বাড়ীতে পেয়াদা বেলিফ দেখিয়া একেবারে দেহ ছাড়িয়া দেয় ও সকলের নিকট বিদায় লইয়া পুত্রকে বলে "নীলমাধব, আজ তুমি পিতৃহীন"। যোগেশ বুদ্ধি-হারাইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মহৎ জীবনটা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, আর বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হরিশও পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া জীবনটা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল। আরও ট্র্যাজিডি হইত, কিন্তু তাহার "হারানিধি"র (জামাতা অঘোরের) ক্ষিপ্রকারিতায় ও সুবুদ্ধিতে, প্রফুল্লের ট্র্যাজিডির পুনরভিনয় আর সংঘটিত হয় নাই। আবার মোহিনীর সহিত তাহার পুনরায় পূর্ব্ব-সখ্য সংস্থাপিত হইল।

যোগেশ ও হরিশের চরিত্রানুধাবণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে যিনি যত বড় চরিত্রবান্‌ ও নীতিশীলই হউন না কেন, বিপদের সময় যা ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে না পান তিনি সংসার তরঙ্গে বিচলিত হই

অনর্থ করিয়া ফেলেন। বিপদ তো সকল অবস্থায়ই সম্ভব, কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমরা ঈশ্বরে দৃঢ়প্রত্যয় হারাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি, তাহা হইলে 'সাজান' বাগান যে শুকিয়ে যাবে'—তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? নাট্যকার ভজহরি• ("প্রফুল্ল") নীলমাধব ("হারানিধি") ও পাগল ("শাস্তি কি শান্তি") চরিত্রের কথায় ও কার্য্যে এই তত্ত্বই বিশেষ স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন।

"মায়াবসানে" প্রফুল্ল এবং হারানিধি অপেক্ষাও উচ্চতর তত্ত্ব প্রকটিত।

কালীকিঙ্কর বসু বিদ্বান্, সঙ্গতিপন্ন, পরোপকারী ও সর্ব্বদা বিজ্ঞানালোচনায় কালক্ষেপণ করেন। সেকস্‌পিয়ারের প্রস্পেরোর (Tempest) সহিত এই চরিত্রের কতকটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্পেরো যেমন নিভৃতে প্রেত-তত্ত্ব ও যাদুবিদ্যার আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন, কালীকিঙ্করও সেইরূপ সর্ব্বদা তাড়িত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গবেষণা লইয়া থাকিতেন। বিজ্ঞানে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাসম্বন্ধে তিনি সাতকড়িকে বলিতেছেন,—"সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক'রে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার গতি লক্ষ্য করেছি। অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি, জীবন উপেক্ষা ক'রে তড়িতের পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজদেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি।*

"যা যা দেখেছি, যা, যা, ভেবেছি, সব ঐ বইতে টুকে রেখেছি।"

৫ম অঙ্ক, ২য় গ।

প্রস্পেরো বিদ্যার প্রয়োগ করেন নিজের ও স্বীয় কন্যার কল্যাণ-সাধনে; এই বিদ্যাবলেই তিনি নেপলসের রাজপুত্র ফার্ডিনাণ্ডের নৌতরী বিপদাপন্ন করিয়া রাজপুত্রের সহিত স্বীয় কন্যা মিরান্দার বিবাহ দেন ও স্বীয়রাজ্যে (মিলান) প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু কালীকিঙ্কর প্রস্পেরোর ন্যায় কেবল কাল্পনিক জগতেই বিচরণ করেন না, তাহার সমস্ত কার্য্যই পরোপকারের নিমিত্ত। বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ

---

* গিরিশ কিছুদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সায়েন্স্ এসোসিয়েসনে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন।

জোচ্চোরকে কে চাকরী দেবে” বলিয়া অস্থির হয়েন। উভয়েই অভিমানী, কাহারও নিকট মাথা হেঁট করেন নাই। উভয়েই তুল্যভাবপ্রবণ, একজন কর্ম্মত্যাগ করিয়া ‘একদিন যাহাদের ছুঁ’লে নাইতেন্’ তাহাদের সঙ্গী হইলেন আর একজন দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া কৃতঘ্নকে খুন করিতে উদ্যত হয়েন। যোগেশের ও যেমন সুনামই দেবতা, প্রকৃত ঈশ্বর-প্রত্যয় নহে, হরিশও সেইরূপ বলিতেছেন “কোথায় ঈশ্বর? ঈশ্বর নাই,—এ দৈত্যের সংসার”। যোগেশের আত্মীয়ের কাছে সে কোন সহায়তা পায় নাই—আর হরিশকে তাহার সহধর্ম্মিনী সর্ব্বদা প্রবোধ দিতেছে “তুমি বুক বাঁধ, সুদিন কুদিন আছে। সংসার পরীক্ষার স্থল, এতে যে চিরদিন সুদিন আশা করবে তার আশা নিষ্ফল হবে।” নীলমাধব বলিতেছে ‘এতদিন আপনি সংসারের ভার নিয়েছিলেন। এখন সংসার আমায় দিন’। তথাপি সে বিপদ্‌পাতে একেবারে মুহ্যমান—‘সুদিনের মূল উচ্ছেদ হয়েছে, হাস্যময়ী কন্যা বিধবা, পৈত্রিক বাড়ী অপহৃত, বৃত্তিনাশ! যুবা পুত্রের উৎসাহ ভঙ্গ, সুদিনের বীজ অঙ্কুরিত না হ’তে হ’তে দগ্ধ হ’য়ে গিয়েছে। ঋণের দায়ে কবে জেলে নিয়ে যায়।’ ২য় অঙ্ক, ২ গ।

যোগেশ যেমন “চেষ্টা রহিত। যে পথে চলেছি সেই পথেই যাব” বলিয়া একেবারে সমস্ত উদ্যম চেষ্টা ছাড়িয়া দেন, হরিশও বাড়ীতে পেয়াদা বেলিফ দেখিয়া একেবারে দেহ ছাড়িয়া দেয় ও সকলের নিকট বিদায় লইয়া পুত্রকে বলে “নীলমাধব, আজ তুমি পিতৃহীন”। যোগেশ বুদ্ধি-হারাইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মহৎ জীবনটা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, আর বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হরিশও পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া জীবনটা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল। আরও ট্র্যাজিডি হইত, কিন্তু তাহার “হারানিধি”র (জামাতা অঘোরের) ক্ষিপ্রকারিতায় ও সুবুদ্ধিতে, প্রফুল্লের ট্র্যাজিডির পুনরভিনয় আর সংঘটিত হয় নাই। আবার মোহিনীর সহিত তাহার পুনরায় পূর্ব্ব-সখ্য সংস্থাপিত হইল।

যোগেশ ও হরিশের চরিত্রানুধাবণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে যিনি যত বড় চরিত্রবান্ ও নীতিশীলই হউন না কেন, বিপদের সময় যদি ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে না পান তিনি সংসার তরঙ্গে বিচলিত হইয়া

অনর্থ করিয়া ফেলেন। বিপদ তো সকল অবস্থায়ই সম্ভব, কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমরা ঈশ্বরে দৃঢ়প্রত্যয় হারাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি, তাহা হইলে 'সাজান' বাগান যে শুকিয়ে যাবে'—তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? নাট্যকার ভজহরি• ("প্রফুল্ল") নীলমাধব ("হারানিধি") ও পাগল ("শাস্তি কি শান্তি") চরিত্রের কথায় ও কার্য্যে এই তত্ত্বই বিশেষ স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন।

"মায়াবসানে" প্রফুল্ল এবং হারানিধি অপেক্ষাও উচ্চতর তত্ত্ব প্রকটিত।

কালীকিঙ্কর বসু বিদ্বান্, সঙ্গতিপন্ন, পরোপকারী ও সর্ব্বদা বিজ্ঞানালোচনায় কালক্ষেপণ করেন। সেকস্‌পিয়ারের প্রস্পেরোর (Tempest) সহিত এই চরিত্রের কতকটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্পেরো যেমন নিভৃতে প্রেত-তত্ত্ব ও যাদুবিদ্যার আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন, কালীকিঙ্করও সেইরূপ সর্ব্বদা তাড়িত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গবেষণা লইয়া থাকিতেন। বিজ্ঞানে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাসম্বন্ধে তিনি সাতকড়িকে বলিতেছেন,—"সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক'রে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার গতি লক্ষ্য করেছি। অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি, জীবন উপেক্ষা ক'রে তড়িতের পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজদেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি।*

"যা যা দেখেছি, যা, যা, ভেবেছি, সব ঐ বইতে টুকে রেখেছি।"

৫ম অঙ্ক, ২য় গ।

প্রস্পেরো বিদ্যার প্রয়োগ করেন নিজের ও স্বীয় কন্যার কল্যাণ-সাধনে; এই বিদ্যাবলেই তিনি নেপল্‌সের রাজপুত্র ফার্ডিনাণ্ডের নৌতরী বিপদাপন্ন করিয়া রাজপুত্রের সহিত স্বীয় কন্যা মিরান্দার বিবাহ দেন ও স্বীয়রাজ্যে (মিলান) প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু কালীকিঙ্কর প্রস্পেরোর ন্যায় কেবল কাল্পনিক জগতেই বিচরণ করেন না, তাহার সমস্ত কার্য্যই পরোপকারের নিমিত্ত। বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ

* গিরিশ কিছুদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সায়েন্স্ এসোসিয়েসনে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন।

সমস্ত তত্ত্ব পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কেননা, ইহা "প্রকাশ ক'রলে মানুষের উপকার হবে।" ৫ম অঙ্ক, ২ গ।

তিনি পরোপকারী ও নিঃস্বার্থ। মারীভয় ও দুর্ভিক্ষের সময় কুটীরে কুটীরে ঘুরিয়া পরোপকার করেন এবং এমন কি, সামান্য জীবজন্তুর জন্যও কাতর হন। বিন্দু বৈষ্ণবী বলিতেছে "চাকর দাসী দিয়ে (আমি টের পেতুম না) ওঁরা দোকানকে দোকান কিনে নিতেন—ছোটবাবু কাপড়ের দোকান ক'রে দিলেন"। অন্নপূর্ণা বলিতেছেন "আমার এই দশা (বৈধব্য) হ'তে, কাকাবাবু তিন দিন মুখে অন্ন দেন নাই, ভাই পো-দের-অন্ত প্রাণ। ভাইপোদের মুখ চেয়ে বে' করেন নাই, আমি যদি কখনোও বল্‌তুম, হ্যাঁগা কাকাবাবু বে' ক'রবে না? তা বল্‌তেন, আমার সোণার চাঁদ ছেলে মেয়ে রয়েছে, আর আমি বে করবো কেন?"

১ম অঙ্ক, ৪ গ।

অন্যত্র তিনি নিজেই বলিতেছেন—"বিবাহ লইয়া বড় বউ ঠাকুরুণের সঙ্গে ঝগড়া হয়; তিনি সম্বন্ধ করেছিলেন ব'লে আমি তার কাছে সাতদিন খেতে যাইনি।—" ৫ম অঙ্ক, ২ গ।

অকৃতদার ও বিজ্ঞানানুশীলনে রত হইলেও তিনি কোন বিষয়েই উদাসীন নহেন। ভাইপোদের বলিতেছেন "আমি কাগজপত্র দেখেছি, কতকগুলা অন্যায় ক'রে বিষয় নেওয়া হ'য়েছে, ওসব ভাল নয়; নাবালক, দরিদ্র, বিধবা, সে সব ফিরিয়ে দে, যদি আমায় সাক্ষী দিতে হয়, সত্য বল্‌তে হবে, আমার বখরা থেকে যাবে লিখে দিচ্ছি!"

এ-পর্য্যন্ত নীতির ও হৃদয়বত্তার দিক্ হইতে কালীকিঙ্কর ও যোগেশ চরিত্রে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বরং পরের প্রাণরক্ষার্থ যে মিথ্যাপ্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত, যে মিথ্যা, স্বর্গবাসী দেবদূতগণ সত্যের অপেক্ষা উজ্জ্বলতার অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন—কঠোর ন্যায় ও নীতিপরায়ণ বৈজ্ঞানিক কালীকিঙ্কর সে করুণার ধর্ম্মও পালন করিতে কুণ্ঠিত। ইহা একেবারে Kant এর Categorical Imperative এর কঠোর নীতির অনুবর্ত্তন। খুব বড় গলা করিয়া তিনি বলেন—"বাপ হ'লে যদি সন্তানকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যাবলম্বন ক'রতে হয়, তা হ'লে ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমায়

সন্তান দেন নি। বাপ দাদার নাম? যদি মিথ্যা কথায় বাপদাদার নাম রক্ষা করতে হয়, তবে সে নাম লোপ হওয়াই ভাল; আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা যে মান, ধন, মমতা, প্রাণ, যে কোন প্রলোভনে মিথ্যার পথ অবলম্বন না করি, মিথ্যায় যেন আমার চিরদিন দ্বেষ থাকে"। তিনি এ সত্য একদিনও ভুল্‌লেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস "সত্যের সংসার, সত্যপথই নিরাপদ পথ"। ৪র্থ অঙ্ক, ২ গ।

এই কঠোর নীতি অবলম্বনীয় বলিয়াই যেখানেই সত্যানুরাগ ও পরোপকার বা দয়ার সংঘর্ষ হইয়াছে, সত্যনিষ্ঠাই তাঁহার চরিত্রে সর্ব্বদা জয়শ্রীলাভ করিয়াছে। মাধব (ভ্রাতুষ্পুত্র), উকীল কৃষ্ণধন ও সাতকড়ি চক্রান্ত করিয়া কালীকিঙ্করকে পাগল সাজাইবার জন্য অন্নপূর্ণার সহায়তায় পোর্টে বিষ মিশাইয়া দিল। বিজ্ঞানচর্চ্চাকে সকলেই পাগলের খেয়াল জ্ঞান করে। কালীকিঙ্কর ভূতাবিষ্ট হইয়াছে, ইহাই সকলের মনে ধারণা। হলধরও এই কথায় সায় দিতেছে। দশচক্রে ভগবান ভূত। অন্নপূর্ণা গণৎকারের সহায়তায় শ্বশুরকে আরোগ্যলাভের ঔষধ বলিয়া পোর্টের সহিত বিষ মিশাইয়া দিল। কালীকিঙ্কর পোর্ট পান করিয়াই বিষের ক্রিয়া বুঝিতে পারিলেন—

"মা কি করলে! সর্ব্বনাশ করলে, সর্ব্বনাশ করলে! মেরে ফেল্‌লে! বুঝেছি তোমায় পরামর্শ দিয়েছে তুমি বুঝতে পারনি।"

১ম অঙ্ক, ৫ গ।

এই স্থানে প্রথমেই স্নেহ তাহার সমস্ত দেহমনকে আবিষ্ট করিল, তিনি বলিলেন "মা চেঁচিও না, চেঁচিও না, আমার জ্ঞান থাকৃতে থাকতে লিখে দিই, যে আমি আপনি খেয়েছি"। কিন্তু যে শত্রু তাঁহাকে বিষ দিয়াছে তাহারই চক্রান্তে চিরস্নেহের কন্যা-স্বরূপা বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ অন্নপূর্ণাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, একথা বুঝিয়াও সংজ্ঞাহীনতার সঙ্গে সঙ্গেই যে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"না! মিছে হবে, তুমি ওষুধ মনে করে দিয়েছ।"

"কঠোর সত্যানুরাগই"——এ সকলের মূলে। চতুর্থ অঙ্কেও দেখিয়াছি এই সত্যাশ্রয়েই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া নিজে দণ্ড গ্রহণ করিয়া

বলিতেছেন "আমারই বিশ্বস্ত দুইজন আত্মীয় নিরপরাধীকে চোর ব'লে বাঁধায়, তথাপি আমি পুলিশে খবর দেই নাই, আমায় সাজা দিন্।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে বিষের ক্রিয়ায় কালীকিঙ্করকে উন্মত্তাবস্থায় থাকিতে হয়। উন্মত্তাবস্থার পূর্ব্বে যোগেশ যেমন জ্ঞানদাকে বলিতেন "এ কি জান, বিষ বল বিষ, অমৃত বল অমৃত।"

কালীকিঙ্করও অন্নপূর্ণাকে বলিতেছে—"এ কি জান? এ অনেকের জীবনরক্ষা করেছে, আর অনেক অট্টালিকা মাঠ করেছে।"

মদোন্মত্ত হইয়া যোগেশ যেমন বলিতেছে "উকীল কি চীজ্?"

বিষে জর্জরিত হইয়া কালীকিঙ্করও বলিতেছে—"উকীল আছেন, মাঠ হ'য়ে যাবে!…কৌন্সিলি, প্লিডার, মোক্তার ভ্রাতৃভাব! প্রেমভাব…"

যোগেশ বলিতেন "কোন্ যোগেশ আমি? একি সে?"—কালী-কিঙ্করও বলিতেছেন "রঙ্গিনী, বলতো আমি কটা?"

৩য় অঙ্ক, ৩য় গ।

যোগেশ বলিতেছেন "মা তুমি মানা কত্তে এয়েছ? আর মদ খাব না, কেন খাবনা?…"

কালীকিঙ্করও বলিতেছে—"রঙ্গিনী, তুমি পাগল হ'তে মানা করো না, বড় যন্ত্রণা! বড় যন্ত্রণা! বড় যন্ত্রণা!" যোগেশ যেমন বলিতেন "চিন্তা, চিন্তা, চিন্তায় চিরকাল গেল…" কালীকিঙ্কর বলিতেছেন "চিন্তা! চিন্তা! চিন্তা! চিন্তাস্রোত কালস্রোতের মতন চলেছে—অনিবার্য্য, অবিরাম গতি, এই স্রোতের নাম জীবন।" ৫ম অঙ্ক, ২ গ।

পাঠক দেখিয়াছেন যোগেশ আর সুস্থ হইয়া উঠিলেন না, আর রঙ্গিনীর শুশ্রূষা ও ইচ্ছাশক্তিবলে কালীকিঙ্কর শীঘ্রই ভাল হইয়া উঠিলেন, কারণ "যে মনে চৈতন্য উদয় হয়েছে, সে মন জড় বিষে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখতে পারে?" [রঙ্গিনী——৩য় অঙ্ক, ১ম গ]

আরোগ্যলাভের পরে দেখিলেন সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা। যে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় মাধব ও যাদব তাহাকে ঔষধের সহিত বিষ দিয়াছে, যাহাদের কুৎসিত চেষ্টায় মাতৃবৎ বড় ভাজ অন্নপূর্ণা জেলে যাইতে বসিয়াছিল, যাহারা সতীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়াছে, রঙ্গিনীকে কলঙ্কিত করিবার

জন্ম প্রয়াস পাইয়াছে——তাহারা এখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া জেলে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু তিনি ক্ষমা করিতে পারিলেন না। নানা বিপর্য্যয়ে ক্ষোভ, দুঃখ ও বিষাদে পূর্ণ হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহত্ত্বের যে উচ্চস্তরে আরোহণ করিলে সাধু, উদার দয়াবলে যুগপৎ পাপকে ঘৃণা করিয়া পাপীকে কোল দিতে পারেন, কাতর আশ্রয়-প্রার্থীকে ক্ষমা করিতে পারেন, কালীকিঙ্কর সে উচ্চস্তরে আরোহণ করেন নাই। তাই পিতৃমাতৃহীন অনুতপ্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় যখন কোথাও আশ্রয় না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "রক্ষা করিবার কি কেউ নাই?"—কঠোর নীতিব্রত কালীকিঙ্কর বলিয়া উঠিলেন—"দুর্জ্জনের সাজা হওয়াই উচিত।" এখানে কালীকিঙ্কর-চরিত্র-প্রসঙ্গে কবি দেখাইয়াছেন—কঠোর-নীতি-সর্ব্বস্বতা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের নিকট কত তুচ্ছ—কত অকিঞ্চিৎ-কর! ক্ষমাই ঈশ্বরপরায়ণতার বাহ্যরূপ। কঠোরনীতি যেখানে আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া পাপকে ক্ষমা করিতে পরাঙ্মুখ হয়, ঈশ্বর প্রত্যয় বলে "কার্য্য কারণ স্থির করা, কার্য্য-ফল বিচার করা, মানব শক্তির অতীত। হে জ্ঞানদাতা, রাজীব-পদে প্রার্থনা—আর যেন কার্য্য-গরিমা মনে স্থান না পায়। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা। ভাল মন্দ তোমার পায়ে অর্পণ করলুম।" কঠোর নীতি যেখানে বলে "পাপের দণ্ড হইয়াছে!" ঈশ্বরে একান্ত ভক্তিমান বলে "পাপের দণ্ড! মার্জ্জনা নাই? তবে তো মানব-দেহ ধারণ মহা বিপদ্! যদি মার্জ্জনা না থাকে কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব? এ জীবন কেবল কার্য্য-প্রবাহ, সকল কার্য্যই কলুষিত, এর যদি দণ্ড হয়, যদি মার্জ্জনা না থাকে, এ কার্য্যফল যদি ভোগ হয়, তা হ'লেতো অনন্ত কালেও নিস্তার নাই।"

এই স্থানে কালীকিঙ্কর যে ভ্রমে পতিত হন, যদি তাহারই হাতে শিক্ষিতা রঙ্গিনী আসিয়া তাহা দূর না করিত, তবে কঠোর নীতি কালী-কিঙ্করের ন্যায় আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও রক্ষা করিতে পারিত না। রঙ্গিনী বলিল—"মার্জ্জনা নাই! অতি ভয়ানক কথা। অকূল পাথার! আমার প্রাণ আকুল হ'চ্চে"—ইতিপূর্ব্বে শান্তিরামও বলিতেছিল "মনের

পচা পাঁক উট্‌কে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বল্‌তো নি।" কালীকিঙ্কর বলিলেন—

"কে বলে মার্জ্জনা নাই? ভগবান অপরাধভঞ্জন, তিনি মার্জ্জনা করবেন—"

রঙ্গিনী—তবে কি মার্জ্জনা কেবল মানুষের নিষেধ? তা হ'লে মানুষ অপেক্ষা হিংস্র জন্তু হওয়া ভাল, আমি কুকুরকেও মার্জ্জনা করতে দেখেছি। যদি মানুষের মার্জ্জনা নিষেধ হয়, তা হ'লে এমন হীনজন্ম আর নাই।

কালীকিঙ্কর শেষে বুঝিলেন—কৃপা না করিলে ভগবৎ কৃপাও পাওয়া যায় না—ক্ষমা না করিলে ক্ষমা মিলে না, বুঝিলেন—ভক্তমাত্রেরই প্রার্থনা হওয়া উচিত——

"The mercy I to others shew
That mercy shew to me". [Pope]

আর বুঝিলেন ক্রোধ ও প্রতিহিংসা হৃদয় অধিকার করায় "ভয়ার্ত্ত বালকদের" মার্জ্জনা করিতে পারেন নাই। মার্জ্জনাই মনুষ্যত্ব,—দেবত্ব,—ঈশ্বরত্ব। অভিমান বর্জ্জন করিলেন—কঠোর নীতির উপলকঙ্করের উপর বিমল শান্তির মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইল! এইস্থানে কঠোরনীতি ও ভগবানে বিচারভার-অর্পণের পার্থক্য উপলব্ধি হয়।

পঞ্চম অঙ্কে আর একবার কালীকিঙ্করের চিত্তের দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নপূর্ণা নিরুদ্দেশ, মাধব ও যাদব তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে; তাহাদের পত্নী মন্দাকিনী ও নিস্তারিণীও স্বামীর পথানুসরণ করিয়াছেন। "পূজার বাড়ী, অতিথিশালা, আলাদা আলাদা মহল, সব শূন্য, সব শূন্য, একা কালীকিঙ্কর দাঁড়িয়ে"। তাঁহার অবসাদ আসিল। তিনি উপলব্ধি করিলেন "বিদ্যার গৌরব, ধর্ম্মের গৌরব, চরিত্রের গৌরব, কথার গৌরব মাত্র—নিষ্ফল কাকবিষ্ঠা! জীবনে দুঃখই সার্থক। ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ—মরণে দুঃখ।" এখানে কালীকিঙ্কর একেবারে সোপেনহায়েরের মতাবলম্বী। এমন কি এত পরিশ্রম করিয়া আজীবন গবেষণার ফল, যাহা তিনি কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সাতকড়ি চাটুয্যেকে তাহা হরণ করিতে উদ্যত দেখিয়া

নির্ব্বিকারভাবে অনুমতি দিলেন "নিয়ে যাও, এতে মানব দুঃখের এক কণাও কম্‌বেনা"। এই অবসাদের অবস্থায় কন্যাসম পরম স্নেহশীলা অন্নপূর্ণার মৃত্যুশয্যায় পর্য্যন্ত "অনেক সয়েছি, অনেক দেখেছি, আর দেখবার সাধ নাই," বলিয়া তাহাকে দেখিতে চাহিলেন না। ঠিক যোগেশের মতই নিশ্চেষ্টতা আসিল, তাহারই মত তিনি বলিলেন "আমি কারুর নই, আমার কেউ নাই"। ৫ম অঙ্ক, ২গ।

যোগেশের ন্যায় হয়ত বা কালীকিঙ্করেরও জীবনের গতি বিষাদের দিকে প্রধাবিত, হইত যদি না তিনি রঙ্গিনীর নিকট সত্যের আভাস পাইতেন—— "জীবন সুখের জন্য নয়, জীবন সাধনের জন্য।" এ উক্তি একেবারে বৌদ্ধ শ্রমণের মত। তিনি বুঝিলেন "নিষ্কম্প দীপ সম্ভব—আত্মত্যাগে সম্ভব"। যোগেশ কর্ম্মত্যাগ করিলেন…আর কালীকিঙ্কর আত্মত্যাগের আভাস পাইয়া পরকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি রঙ্গিনীকে বলিলেন—"সুখ-আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করতে পরহিত করেছি……আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম।" ৫ম অঙ্ক, ৩ গ।

এই আত্মত্যাগ——নিষ্কামকর্ম্ম বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসই মায়ার অবসান—— কর্ম্মত্যাগে নয়। কালীকিঙ্কর-চরিত্রে গিরিশচন্দ্র এই তত্ত্বই প্রকটিত করিয়াছেন। 'ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য' ও 'ক্লৈব্য' ত্যাগ করিয়া ক্রমবিবর্ত্তনে এবার কালীকিঙ্কর গীতার কর্ম্ম সন্ন্যাসের স্তরে আরোহণ করিলেন।

"**বলিদান**" নাটকের নায়ক করুণাময়-চরিত্রে বিয়োগ, দুঃখ ও করুণরসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটকখানি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের উৎসাহে রচিত হয়। গিরিশচন্দ্র নাটকে বরপণপ্রথার কুফলে ঘরে ঘরে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে তাহারই ভীষণ চিত্র সহানুভূতিসিক্ত তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

অন্যের অনুরোধে লেখনী ধারণ করিলেও সিদ্ধহস্ত নাট্যকার করুণাময়-বসুকে কেবল সমাজ-যূপের জন্য উৎসৃষ্ট ছাগশিশুরূপেই উপস্থাপিত করেন নাই। মনুষ্যত্ব ও আত্মসম্মানরক্ষার্থে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবন-সংগ্রামে তিলে তিলে কিরূপ নিষ্পেষিত ও বিদলিত হয়, আর নিষ্ঠুর

নারকীয় সমাজের জনারণ্য সেই ধ্বংসানলে কিরূপ ইন্ধন যোগায়, মূলতঃ ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাই, যে সময়ে করুণাময় আত্মহত্যা করেন তখন তাঁহার আর শোচনীয় অবস্থা ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে গুণে অদ্বিতীয় আদর্শ চরিত্রবান রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ-বৃত্তিধারী কিশোরের হস্তে সমর্পিতা হইয়াছে, বড় মেয়ে কিরণময়ীর স্বামী মোহিত ফিরিয়া আসিয়াছে, সংসারের ভার লঘু হইয়াছে, বিবাহযোগ্যা আর কন্যাও নাই। তবে কেন এই ট্রেজিডি হইল? সেই করুণাময়ী কাহিনী যেমন মর্ম্মস্পর্শী, তেমনি উপদেশাত্মিকা; কেননা করুণাময় যোগেশের ন্যায় সুরা সেবনও করেন না, কালীকিঙ্করের ন্যায় তাহাকে কেহ বিষ প্রয়োগও করে নাই; অথবা হরিশের ন্যায় তিনি সহজে বিচলিতও হন নাই।

করুণাময় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সত্যসন্ধ। তাঁহার সত্যবাদিতায় রূপচাঁদের উকিলও মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে "কথার মানুষ বটে, শালওয়ালার মোকদ্দমায় একটা মিথ্যা কথা কইলে বেটার টাকা উড়ে যেতো, তা কইতে চাইলে না। Consent decree দিয়ে কিস্তিবন্দী কর্‌লে।" যোগেশপ্রভৃতির ন্যায় তিনি আত্মসম্মান বিশিষ্ট, কাহারও কথা শুনিতে পারেন নাই, কখনও ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট হন নাই।

করুণাময় চাকুরী করিয়া ১৫০৲ দেড়শত টাকা বেতন পান, তিনটী মেয়ে—কিরণময়ী, হিরন্ময়ী বিবাহযোগ্যা, জ্যোতির্ম্ময়ী মিশনারী স্কুলে পড়ে ও একমাত্র পুত্রও স্কুলে পড়াশুনা করে আর ফি বারে ফার্ষ্ট প্রাইজ পায়। পত্নী সরস্বতী অতিশয় স্নেহশীলা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা। একখানি বাড়ী ও স্ত্রীর গায়ের কয়েকখানি গহনা মাত্র সম্বল। অনেক খুঁজিয়া মোহিতের হস্তে জ্যেষ্ঠা কন্যা সমর্পণ করিয়াছেন। মোহিত বঁয়াটে, এফ্‌ এ ফেল করিয়াছে, মদ খায়, মতিয়া বিবি নাম্নী এক বারাঙ্গনায় আসক্ত। কিরণের শ্বাশুড়ীও বউ-কাট্‌কি—তাহার সম্বন্ধে করুণাময়ের ঝি বলিতেছে—"পাল্কী খুলে বউয়ের মুখ দেখে মাগী ওমনি ডুকরে কেঁদে উঠলো! বলে, ওমা, কোথাকার কাঠকুড়ুনী এলো গো—কোথাকার হাঘরের মেয়ে আনলুম গো—আমার মোহিতের বরাতে এই ছিল গো—"

অথচ প্রতিবেশিনীরা মোহিতের মাকে তিরস্কার করিতেছে "তোমার ভিটেয় কখন এমন মেয়ে এসেছে ?"

ইহা পরের ঘটনা। বিবাহ সভায়ই মোহিতের দূরসম্পর্কীয় মামা রমানাথ বিনাকারণে করুণাময়কে অপমান করিল। করুণাময় সরস্বতীকে বলিতেছেন—"এ-অপমান আমার জন্মে হয় নি, রমা দালাল সভার মাঝে হাত নেড়ে জোচ্চোর বল্লে! আমি মনিবের একদিন একটা কথা সই নাই, পাঁচ দোরের কুকুর, সেও আমায় জোচ্চোর বল্লে"।

অভিমানীর জীবনে এই প্রথম অপমান শেলের মত বাজিল। ফুলশয্যার টাকার জন্য গহনা বাঁধা দিয়া ঋণ করিবেন, এমন সময়ে কিশোর (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার) তিনশত টাকা লইয়া উপস্থিত। আনন্দ হইল, কিন্তু সে টাকা তুলিয়া রাখিলেন, 'ফিরাইয়া দিতে হইবে'। অভাব ও স্বভাবের দ্বন্দ্বে আত্মসম্মানের জয় হইল। সেই মর্য্যাদা, অভিমান বা আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলেই তিনি স্থির হইতে পারিতেন না।

দ্বিতীয় কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ উপস্থিত—পাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিপত্নীক। রূপচাঁদ মিত্র নামে এক ধনী প্রতিবেশী, তাহার বয়াটে, কুরূপ, কুচরিত্র পুত্র——দুলালচাঁদের জন্য এই মেয়েটি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে মোহিতের বাড়ী ক্রোক করিয়াছে, ঋণের জন্য মোহিতকে আবদ্ধ করিয়া জমাদারসহ বিবাহ সভায় লইয়া আসিয়াছে, আশা——মোহিতকে রক্ষা করিবার জন্য দুলালের হস্তে করুণাময় মেয়েকে অর্পণ করেন। এই বিভ্রাটে করুণাময়ের অপমানের পরাকাষ্ঠা হইল। তাহার পর হইতে দিন দিন বিভ্রাট, পাওনাদারের কটূক্তি, সুবোধ ছেলের বিদ্যালয়ত্যাগ। পরে পানওয়ালার দোকান হইতে ছেলের সিগারেট চুরি, সাধ্বী কিরণের নামে পাড়ায় মিথ্যা কলঙ্ক রটনা, রাস্তায় বেলিফ্ কর্ত্তৃক ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার, বাধ্য হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র সংস্থান চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণ এবং অবশেষে হিরন্ময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যা। করুণাময় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে জীবন-সংগ্রামে অকৃতকার্য্য হইয়া যে দুলালকে একদিন বলিয়াছিলেন "আরে চণ্ডাল, আরে নরাধম, আমাইকে জেলে দিবি, এই ভয় দেখাচ্ছিস? আমায় টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছিস্? আমি

বাগ্‌দত্তা কন্যা অপরকে দেব, আমায় সেই নরাধম মনে করেছিস? জামাই কি দেখাচ্ছিস্? যদি আমার মৃত্যু হয়, সপরিবার চক্ষুর উপর দগ্ধ হয়, আমার সর্ব্বনাশ হয়, নরাধম, তবু কি ভেবেছিস্, তোর মত পাপাত্মাকে কন্যা সম্প্রদান করবো?" আজ—নিরুপায় হইয়া সেই জামাইর সঙ্গে জ্যোতির সম্বন্ধ সুস্থির করিতে গেলেন। রূপচাঁদ মিত্র কণ্টাক্ট সহি করাইয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট চাদরে বাঁধিয়া দিলেন। এই অভাব ও বিতৃষ্ণার মানসিক দ্বন্দ্বে করুণাময়ের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু দ্বন্দ্বে তিনি মনে মনে জয়ী. মৃত্যুকালে সেই পাঁচ হাজার টাকার নোট দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—"এই যে আমার হীনতার সাক্ষী সঙ্গেই আছে, এখন আমায় পরিত্যাগ কর।" এদিকে কিশোর নিজেই পিতাকে পুত্র-বিক্রয়ের পঁচিশ হাজার টাকার লোভ দমন করিতে বাধ্য করিলেন এবং জ্যোতিকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিতে স্বীকৃত করাইলেন। কিন্তু যখন এই শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, করুণাময় অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। তাই কিশোরকে জামাতৃরূপে পাইয়াও, ভাবনার শেষ হইলেও কথার ব্যত্যয় হওয়ায়, মনঃস্থির করিলেন "বলিদান দিতেই হবে, বলিদান দিতেই হবে"। যখন সকলে শুভকার্য্যে ব্যস্ত, রূপচাঁদ উকিলসহ আসিয়া একটা বিভ্রাট করিয়া গেল, অপমানের শেষ হইল। করুণাময় গোয়াল ঘরে গিয়া রজ্জুবন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন। এই আত্মহত্যায় বুঝা যায় বাঙ্গালায় কন্যাসম্প্রদান নয়,—কন্যা-বলিদান। কিন্তু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে মনে হয় যোগেশের যেরূপ কল্পিত সুনাম-লোপে ট্রেজিডির সূত্রপাত হয়, করুণাময়েরও জীবন-সংগ্রামে শেষ সম্মানটুকুর বিলোপে ট্রেজিডির পরাকাষ্ঠা হয়। দুলালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব ও মৃত্যুরই অনুরূপ হইলেও, তখনও তাহা হয় নাই। স্বহস্তে প্রাণবিনাশ হয় মান ভঙ্গেই (**রূপচাঁদের সহিত কথার ব্যত্যয় হওয়ায়**) কারণ, করুণাময় নিজেই বলিতেছেন "এত দুঃখেও তবু মান ছিল, এত দুঃখেও সত্য-ভঙ্গ হয়নি। বুঝেছি, এখন চরম হয়েছে—তাই চরম সখা উদয় হয়েছে!"

করুণাময়ের অভিমান মনুষ্যত্বের অভিমান, তাই প্রতিকূল অবস্থায়

সহিত তাহার সংঘর্ষ ও অবশেষে পরাজয়ে যে মর্ম্মন্তুদ দুরবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে হৃদয় যেমন বিদীর্ণ হয়, মধ্যবিত্ত দুঃস্থ গৃহস্থ করুণাময়ের প্রতি তেমনি প্রত্যেক পাঠকের সর্ব্বাংশে শ্রদ্ধাই উৎপাদিত হয়। এইরূপ অদ্ভুত করুণ রসাত্মক সামাজিক চরিত্র এ'পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইয়াছে কিনা সন্দেহ। নানা প্রতিকূল অবস্থায় করুণাময়ের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা যোগেশ বা হরিশের ন্যায় আত্মকৃত নহে, এমন কি কালীকিঙ্করের মত কঠোর নীতির অছিলাও ইহাকে বিকৃত করে নাই। এ ক্ষেত্রে **অবস্থা নিশ্চয়ই বলবান,** জীবনসংগ্রামে অবস্থার প্রাবল্যে গৃহস্থের পরাজয়, তাই নাট্যকার করুণাময়ের মুখে বলিতেছেন "অদৃষ্ট মানো? মান্‌তেই হবে। কেউ ফেরাতে পারে না—রাজায় ফেরাতে পারে না;—অদৃষ্টের দাগ কে মুছবে! কর্ম্মস্রোত চ'লে আস্‌ছে! কোনদিকে চল্‌বে কেউ জানে না।" ৫ম অঙ্ক, ৪ গ।

"গৃহলক্ষ্মীর" উপেন্দ্রনাথ কালীকিঙ্করের ন্যায় সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। পিতা "পরকে বিশ্বাস ক'রে বিষয় খুইয়েছিলেন" আর তিনিও তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা (বিরজার স্বামী) দেইজীদের আর বুড়ো মল্লিকের গ্রাস হইতে বিষয় রক্ষা করিলেন। দাদা পরলোক গমন করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়া তাহার বিধবা ও নিজ অংশ উপেন্দ্রের নামে দানপত্র করিয়া দিয়াছেন। তিনিই কর্ত্তা, সংসারও বেশ সুন্দররূপে চলিতেছে, যোগেশের ন্যায় এখন একটু বিশ্রাম করিবার জন্য কনিষ্ঠ ভাই শৈলেন্দ্র ও পুত্র নীরদের হাতে সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু যোগেশের ন্যায় তাঁহারও অদৃষ্টের গতি অন্যদিকে প্রধাবিত হইল। শৈলেন্দ্র সুরা ও বেশ্যায় আসক্ত হইয়া অর্থব্যয় করিতে লাগিল। নীরদ ও তাহার মাতা (তরঙ্গিনী) শৈলেন্দ্রের বিরুদ্ধে উপেন্দ্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। 'মায়াবসানের' ন্যায় উকিল আসিল, সাতকড়ির ন্যায় হীরুঘোষালেরও অভাব হইলনা। উপেন্দ্র শৈলেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবেন স্থির করিলেন কিন্তু শৈলেন্দ্র উত্তেজনাবশতঃ উপেন্দ্রের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া কুমুদিনীর (বেশ্যা) বাড়ীতে চলিয়া যায়। বিরক্ত হইয়া উপেন্দ্র কাশী রওনা হন্। ইতিমধ্যে নীরদও হীরুঘোষালের চক্রান্তে কুমুদিনীর বাড়ীতে

শৈলেন্দ্রের নামে মিথ্যা খুনের অভিযোগ আনার ষড়্যন্ত্র হইল। কিন্তু ফুলীর ক্ষিপ্রকারিতায় সমস্ত সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল। উপেন্দ্র খবর পাইয়া কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শৈলেনের উপর ক্রোধ বশতঃ নীরদকে সমস্ত দানপত্র লিখিয়া দেন, ও পার্টিসন করিতে উপদেশ দিয়া আবার সেথানে চলিয়া যান; পার্টিসন স্যুট চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নীরদও পিতাকে পাগল সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কারণ তাহা না হইলে পিতা খোরাকীর জন্য যে কোম্পানীর কাগজ আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় না। মেডিকেল বোর্ড অপিনিয়ন দিলেন যে উপেন্দ্র পাগল নন্, কিন্তু অতঃপর এই সমস্ত বিপর্য্যয়ে উপেন্দ্রের চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়।

উপেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ। কাহাকেও তিনি প্রবঞ্চনা করেন নাই, সকলের হিতই তিনি করিয়া আসিয়াছেন। শৈলেন্দ্রকে বলিতেছেন "আমি বিষয় বাড়িয়েছি বই নষ্ট করিনি"—"তুমি খরচ কর্ত্তে গেলে আমি বাধা দিই, কিন্তু তুমি বুঝতে পারনা যে সে তোমারই ভালর জন্য": বিধবা ভ্রাতৃজায়া বিরজাকে বলিতেছেন দাদার উইলমতে তোমার বিষয়ের আমি একজিকিউটার, তুমি যেন আমাদের মাথার প'ড়ে আমার হাত তোলার উপর থেকে সংসারে বাঁদীর মত খাটছো, কিন্তু আমিত মনে জ্ঞানে জানি, তোমার বিষয় তোমার, আমরা তার অধিকারী নই"। নীরদকে বিষয় লিখিয়া দিবার পূর্ব্বদিন উপেন্দ্র-বরাবর বিরজার প্রদত্ত দানপত্রের পিঠে লিখিয়া দিয়া রেজেষ্টারী করেন যে "বিরজার দানপত্র (উপেন্দ্রের নামে) না-মঞ্জুর, কারণ দানপত্র স্থির মস্তিষ্কে লেখেন নাই; স্বামীর শোকে বিবাগী হবেন মনে ক'রে মস্তিষ্কের তাড়নায় দানপত্র লিখে দিয়েছেন, স্থির মেজাজে লেখেন নাই, সুতরাং তাহা না মঞ্জুর"। এই কার্য্যটীতেই পরে বিরজার চেষ্টায় পৈতৃক বিষয় রক্ষা পায়। একান্নবর্ত্তী পরিবারের এই প্রকার সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতাই আদর্শ হওয়া উচিত। যোগেশ নিজের অধ্যবসায়-বলে বিষয় করিয়াও সকলকে অংশ দিয়াছিলেন "আমার যা বিষয় আশয় তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী," কালীকিঙ্কর ভাই-পো'দের জন্য বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নাই, আর উপেন্দ্র পৈত্রিক সমস্ত বিষয়ে নিজে কর্ত্তা হইয়াও বিন্দুমাত্র অন্যায় বা স্বার্থপরতা প্রদর্শন করেন নাই।

উপেন্দ্রনাথ অন্যান্য নায়কদিকের ন্যায়ই চরিত্রবান্ ও পরিবারের সুনাম এবং সংসারের বন্ধনরক্ষণে সতত যত্নশীল। শৈলেনের সুরার প্রতি আসক্তির কথা শুনিয়াই তাঁহার উক্তি লক্ষণীয় "বড়বউ, সংসার রাখ্‌তে পারবেনা।" কুলটাকে অন্তঃপুরে দেখিয়া তাহার বিরক্তি প্রণিধানযোগ্য——

"তুমি কি সব ভুলেছ? তোমার বংশ ভুলেছ, মান ভুলেছ, মর্য্যাদা ভুলেছ…………আজও এমন বয়াটে নাই যে……সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গে কুলটাকে আলাপ ক'রে দিতে আসে।"

বিরজার প্রতি তাঁহার উক্তি——

"বড়বউ, বেশ্যা মাতাল কি পদার্থ তা যদি জান্‌তে, তাদের কি কুহক তা যদি তোমার ধারণা থাকতো!" ও

বৈদ্যনাথের কথা "তোমার মতন তো রাত্রে দু'জনকে পোলাও খাওয়ান নয়, আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিয়ে দু'টো খোস গল্প ক'রে টাকাটা সিকেটা দেওয়া নয়?" প্রভৃতিতে তাঁহার মার্জ্জিত রুচি ও চরিত্রবলের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহ যোগেশের ভ্রাতৃস্নেহ স্মরণ করাইয়া দেয়। যোগেশ যেরূপ সুরেশের 'চুরির' কথা শুনিয়া অধীর হইয়া বলেন "আজ হ'তে আমার চেষ্টা রহিত।" উপেন্দ্রও শৈলেন্দ্রের গৃহে কুমুদিনীকে দেখিয়া অধীর হইয়া বলেন "সংসার ছারেখারে যাক্, কীর্ত্তিকলাপ লোপ হোক্, বিষয় ছারখার হোক, পূজোর টাকা নেড়ে-প্যায়দায় খাক্"। যোগেশের "ওঃ, সব ভুল্‌তে পাচ্ছি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পাচ্ছিনি,"—উক্তি, উপেন্দ্রের স্নেহোচ্ছ্বাসেরই অনুরূপ,—"বড় মনে সাধ ছিল, একবার শৈলেন্‌কে দেখবো।" ইত্যাদি—

যোগেশ যেমন ভাই-অন্ত-প্রাণ ছিলেন—"এটা হ'লে আমি আর কিছু চাইনি, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বই জানেনা, কত মেরেছি, কত ধরেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায়নি।" উপেন্দ্রের উক্তিতেও ভ্রাতৃস্নেহের সরল অভিব্যক্তি দেখিতে পাই——"শৈলেনের সঙ্গে আমি প্রাণ ধ'রে পৃথক্ হ'তে পার্‌বনা",—"একবার শৈলেনকে দেখিয়ো, যতক্ষণ তারে না দেখি, এ পাপদেহে প্রাণ রাখবো"। উপেন্দ্রের সকল উক্তিই বড় প্রাণস্পর্শী। নিতাই

একটা ঘরোয়া পার্টিসন্ করিয়া দিয়াছে, শৈলেন্দ্র পৃথক্ হইতে চাহিতেছেনা, উপেন্দ্রের তখনকার অবস্থা কি হৃদয়-বিদারক ? "শৈলেন, তুই জানিস্‌নে তুই আমার কে ? আমার স্ত্রীপুত্র একদিকে, সর্ব্বস্ব একদিকে, আর তুই একদিকে", বলিয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই প্রকার ন্যায়নিষ্ঠ, চরিত্রবান্, স্নেহশীল চরিত্রও নাট্যকার এক দুর্ব্বল সূত্র ধরিয়া ট্রেজিডিতে পরিণতি দেখাইয়াছেন। যোগেশের ন্যায় তাঁহার ব্যাঙ্ক ফেল হয় নাই, কালীকিঙ্করের ন্যায় তাঁহাকে কেহ বিষপ্রদান করে নাই বা করুণাময়ের ন্যায় তিনি অবস্থারও ক্রীড়নক নহেন। কিন্তু এখানেও যোগেশের ন্যায় তাহার গুণই দুর্ব্বল সূত্র। যোগেশের সুনামে— উপেন্দ্রনাথেরও অপরিসীম ভ্রাতৃস্নেহে—আঘাত লাগিলেই ধৈর্য্যচ্যুতি হইত। এই প্রকারের অধীরতা ও অসংযমই উপেন্দ্র-চরিত্রে ট্রাজিডি সংঘটিত করে! কনিষ্ঠ শৈলেন্দ্র মদ ধরিয়াছে, শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন "ওর যা মন যায় তাই করুক, আমি কোথাও চলে যাই, ওর ভাবনা ঢের ভেবেছি আর পারিনা।" বাড়ীতে কলহ হইতেছে, স্ত্রী ও পুত্র একদিকে, শৈলেন একদিকে, তিনি শৈলেনকে প্রাণ ধরিয়া পৃথক্ করিতে পারিবেন না, অথচ পত্নী ও পুত্র বলে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছেই"—অসহিষ্ণু হইয়া উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন "সর্ব্বনাশ হোক, সর্ব্বনাশ হোক্, বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল তোল, পূজোর দালান ভাঙ।" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপরে লাঠির আঘাত ও বেশ্যাবাড়ীর কাণ্ড! তিনি ছেলের নামে সব দানপত্র করিয়া ও নীরদকে পার্টিসন স্যুট করিতে বলিয়া আবার কাশী চলিয়া গেলেন।

"মায়াবসানের" ন্যায়ই পুত্র নীরদ তাঁহাকে পাগল সাব্যস্ত করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে, বাড়ীতে আসিয়াছেন স্ত্রীর গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন, পুত্রকে 'কুলতিলক' বলিয়া গালাগালি দিতেছেন, কিন্তু তথাপি সেই ভ্রাতার প্রতি সমানই টান রহিয়াছে। অত্যধিক স্নেহপ্রবণতা ক্ষুন্ন হইয়াই অধৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটাইল। বিরজাই তাহার চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিতেছে—"তুমি রাগ্ ক'রেই সর্ব্বনাশ করলে, তোমার দোষেই সব গেল।" বাস্তবিক যোগেশ বরাবর

কাজ করিয়া শেষে বিরত-চেষ্ট হইয়াছেন, আর উপেন্দ্রনাথও বিষয় উদ্ধার করিবার পরে বিরজার স্বপক্ষে 'দানপত্র' ব্যতীত অন্যকোন উল্লেখযোগ্য কার্য্যই করেন নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিশচন্দ্র "গৃহলক্ষ্মী" নাটকের চারি অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। মামলা মোকদ্দমায় ধনী পরিবার কিরূপে উৎসন্ন যায়, সেই কুফল দেখাইবার জন্যই বোধ হয়, কোহিনুর থিয়েটারে থাকিতেই তিনি ইহা রচনা করেন। কিন্তু উক্ত থিয়েটারের এক্‌জি-কিউটার শিশির বাবুর সহিত তাঁহার নিজেরই মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় "গৃহলক্ষ্মীর" পাণ্ডুলিপি হাইকোর্টের নথিভুক্ত হয়। ইত্যবসরে তিনি মিনার্ভায় আসেন ও 'শাস্তি কি শান্তি' রচিত হয়। বহুদিন পরে 'গৃহলক্ষ্মীর' পাণ্ডুলিপি ফিরিয়া পাইয়াও আর উহা সংশোধন বা সমাপন করিবার সুযোগ পান নাই। স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা প্রবীণ সাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া পঞ্চম অঙ্কটী লিখিয়া দেন। দেবেন্দ্রবাবু 'গৃহলক্ষ্মীর' মর্য্যাদাসম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত উন্মাদ ও মৃত্যু-দৃশ্য অতীব মর্ম্মস্পর্শী ও করুণাত্মক।

"শাস্তি কি শান্তির" প্রসন্ন কুমার-চরিত্রও ট্রাজিডির সম্পূর্ণ উপযোগী। তিনি নীতিবান্ অর্থশালী ও সত্যবাদী। সংসারে কোন জিনিষেরই অভাব নাই। মনোবল ও ধনবল উভয় বলেই বলীয়ান যোগেশ প্রভৃতি অন্যান্য নায়ক-চরিত্রের ন্যায় তিনিও খাঁটি লোক; ঘেঁচি তাহার পিতাকে বলিতেছে "বাবা, তাহার (প্রসন্নকুমারের) কাছে মিথ্যা কথা ক'য়ো না। সে বড় খাঁটি লোক।" ২য় অ, ৩ গ।

তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল। মমতা ও করুণায় তাঁহার কোমল হৃদয় পরিপূর্ণ। কিন্তু সে হৃদয় সামান্য আঘাতেই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সামান্য কারণেই তিনি উত্তেজিত হইয়া ধৈর্য্য-সংযম হারাইয়া ফেলেন। এই ভাবপ্রবণতারই পরিণাম ফল সাংসারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা—নাট্যশিল্পে ট্র্যাজেডি।

স্নেহশীল পিতা পুত্রশোকে কাতর হইয়াছেন। হইবারই কথা। সহধর্ম্মিণীকে (পার্ব্বতীকে) বলিতেছেন "আমরা চিতেয় না পুড়ে

আর সুশীলকে ভুল্‌বো না"। এখন জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনীর স্বামী বেণীমাধব টম্ টম্ হইতে পড়িয়া ভগ্নজানু। 'অপারেসনের' প্রয়োজন। জামাতার পীড়ার সময় তিনি এক রকম উন্মত্তপ্রায়। তারপর স্ত্রীর কাছে মৃত্যু-সংবাদ দিতেছেন,—"ডাক্তার ডাকিয়ে বাছার পা কাটালুম, রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল! সেই রক্তে বেণীকে ভাসিয়ে দিলুম! চক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছি—মূর্চ্ছা যাই নাই! মৃত্যু হয় নাই! মরণ নাই, পাষাণ—পাষাণ—বুক আমার পাষাণ। এই দেখ—এই দেখ"—(বক্ষে করাঘাত করণ)। এইরূপ অধীরতা ও শোকোচ্ছ্বাস সংসার-সংগ্রামে পৌরুষ বা শৌর্য্য সূচনা করে না। পরক্ষণেই আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন "আমার কি ইচ্ছে জানো? তোমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি! এ যন্ত্রণা তোমায় না সইতে হয়।" ১ম অঙ্ক, ৫ গ। এই স্থানে মনে পড়ে কন্যার মৃত্যুতে করুণাময়ের উদ্বেলিত গভীর শোক,—"মা অন্ন দিতে পারি নেই। এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ, জল খেয়ে কি শীতল হ'য়েছ?" আবার সঙ্গে সঙ্গেই ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা "গিন্নি, কেন ভাবছ? এবার আমরা হিরণের দায়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। চলো—চলো, আর হিরণের ভাবনা নাই, আর হিরণের ভাবনা নাই।"

অতঃপর বিবাহের রাত্রে দ্বিতীয় কন্যা প্রমদাও বিধবা হইয়াছে। তিনি মেয়ের বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না। একাদশীর রাত্রিতে মেয়েকে দেখিয়া একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীকে বলিতেছেন—"তুমি ত স্থির আছ, দেখছি! কি ক'রে স্থির আছ, আমায় ব'লে দাও,—আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনে।"

পার্ব্বতী—কি উপায় আছে? কি করবো?

প্রসন্ন—কি ক'রবে কি! ছুটে পালাও,...কাপড় ফেলে দাও,—ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দাও, মেয়েটাকে বঁটি দিয়ে কাটো,—বউটাকে বঁটি দিয়ে কাটো।

এইরূপ অধীরতায় অনর্থ সংঘটন স্বাভাবিক। তারপরে স্ত্রী ও পুত্রবধূর সহিত বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তর্ক করিতে করিতে একেবারে উঠিয়াই গেলেন। "বেশ তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা নিয়ে থাকো, এ জ্যান্ত মরা আমি রোজ

দেখতে পারব না! যে দিকে হয় চ'লে যাই।" এই কথা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইল।

তারপরে অধীরতায় এক কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহে স্ত্রীর সম্মতি লইলেন। স্ত্রীকে বলিলেন,—"বিবাহ দিতে সম্মত হও, দাও সম্মতি দাও, কন্যাকে কঠোর যন্ত্রণা হ'তে ত্রাণ করো। (সম্মুখস্থ টেবিল হইতে ছুরিকা গ্রহণ) নচেৎ পতিহত্যা দেখ—স্বয়ং বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করো, তা হ'লে বুঝবে কি যন্ত্রণা! (বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবার উদ্যম) ২য় অ, ৭ গ।

মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন! বর ঘেঁচি একটা নরাকৃতি পশু। মেয়ের উপর অত্যাচার করে, তাঁহাকেও টাকার জন্য সর্ব্বদা অপমানিত করে। প্রমদা বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বিষ খেতে দাও, আপদ চুকে যাক্"। করুণাময়ও একবার হিরণ্ময়ীকে বলিয়াছিলেন "পাঁশ বেড়ে নিয়ে এসো, একত্রে ব'সে খাই"। করুণাময় যেমন পরে শোক করিয়াছিলেন "সন্তান হত্যা করলুম; বাছা জলে ডুবেছে কেন জান, ঘৃণায় ডুবেছে।" প্রসন্ন কুমারও পরে বলিতেছেন "মা, মা, আমার উপর অভিমান ক'রে গিয়েছিলে, মা?"—উভয়েরই কন্যাস্নেহ তুল্যরূপ হইলেও, করুণাময়ের স্নেহে উত্তেজনা বা অধীরতা ছিল না, আর তাঁহার দুর্দ্দশাও আত্মকৃত নহে। ঘেঁচিকর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া প্রমদা অবশেষে হরমণির আশ্রমে বাস করিতেছিল। পার্ব্বতী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে। তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে নির্ম্মলা বলিতেছে, "আমার শ্বশুর এক রকম হ'য়ে আছেন।" জ্ঞানদার মৃত্যুর পর যোগেশ বলিয়াছিল—"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল," প্রসন্নকুমারও পার্ব্বতীর মৃত্যুতে বলিতেছে,—"পাগল ফুরুলো—আর হেথায় কি করবো।" যাহা হউক অধীরতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই যখন ভুবনমোহিনীর কলঙ্কের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, তখন তাহার আত্মহত্যার চেষ্টায় ["আমি মলেই ফুরুবে। এ হেয় দেহভার কেন আর বইবো? শুনেছি হাইড্রোসোনিক এসিড অতি তীব্র বিষ;—মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না। কই, শিশিটে কিনে এনে কোথায় রাখলুম?"] যখন ঘেঁচি সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতি ইন্‌স্পেক্‌টার সহ তাঁহাকে মিথ্যা কন্যাহত্যার

অভিযোগে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, চিত্তেশ্বরী সে হত্যায় সহায়তা করার জন্য নির্ম্মলাকেও টানিয়া আনিতেছে, তখন প্রসন্নকুমার চিত্তেশ্বরীর গলা টিপিয়া ধরেন, ও ক্রোধে দন্ত ঘর্ষণ করিতে থাকেন। 'গৃহলক্ষ্মীর' উপেন্দ্র কর্ত্তৃক তরঙ্গিণীর প্রতি আক্রমণের পুনরভিনয় হইলেও, প্রসন্নকুমারের অধীরতায় বৈশিষ্ট্য আছে। অতঃপরে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হয়েন এবং স্বহস্তেই কলঙ্কিনী কন্যার হত্যাসাধন করিয়া নিজেও মৃত্যুবরণ করেন।

পূর্ব্বাপর দেখিলে মনে হয় এই অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণ হৃদয়ের অধীরতাই নাটকীয় ট্রেজিডির নিদান-স্বরূপ। সত্য বটে তাহার চিত্তবিকৃতির যথেষ্ট কারণ ছিল, উপর্য্যুপরি এত শোক অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সংসারে এরূপ দশাবিপর্য্যয় দৈনন্দিন ঘটনা। তিনি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে নিজেই বলিতেছেন—"এতো হয়? এক মেয়ে কলঙ্কিনী, এক মেয়ে ভিখারির আবাসে ভিখারিণী, ফৌজদারী আদালতে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়, হৃদিভঙ্গ হ'য়ে স্ত্রীর মৃত্যু, রাস্তায় হাত তালি দিয়ে ছেলেরা গায়ে ধূলো দেয়, যারা পদ লেহন ক'রেছে, তারা পশু অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে, সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, তাপিতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে আপনাদের ধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় দেয়, হাতে হাতকড়ি,...বিমল পুত্রবধূকে বর্ব্বরে টেনে আনে,...খুনে অপবাদ দেয়... এক জীবনে কি এতো হয়?"

অপমান ও লোকনিন্দা স্নেহশীল, সত্যপ্রিয় সহৃদয় খাঁটি মানুষকেও কিরূপ বিহ্বল করিয়া ট্রেজিডির উৎপাদন করে, নাট্যকার প্রসন্নকুমারের চরিত্রে দেখাইয়াছেন। কিন্তু সাংসারিক জীবনে এইরূপ ট্রাজিডি হইতে কিরূপে লোক রক্ষা পায়, তাহার উপায়ও তিনি পাগলের মুখে বিবৃত করিয়াছেন। শোকসন্তপ্ত প্রসন্ন কুমারকে পাগল বলিতেছেন...

"সত্য আপনার দুঃখের ভার অতিশয় অধিক, কিন্তু আমিও অনেক সহ্য করেছি। নিরপরাধে সেই জমিদারের তাড়নায় জেল খেটেছি। পাগলের মত পথে পথে ঘুরেছি। অবশ্য আপনার মত অত দুঃখ পাইনি, কিন্তু বোধহয় চেষ্টা ক'রলে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়। আমার হয়েছে, হরমণির হয়েছে, আপনারও হবে। পুষ্করিণী থেকে শাক তুলে বিক্রয়

করে ঈশ্বর কৃপায় আমার এই উন্নতি। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আমার গদি আছে। তাঁর কৃপায় এখন তাঁর দাস, শান্তিময় চিত্তে তাঁর কার্য্যে নিযুক্ত। আপনি তাঁর দাস হন্, তিনি শান্তিদাতা, শান্তি দেবেন।"

এই শান্তিদাতার ভরসা প্রসন্নকুমারের ছিল না। বরং তিনি বিধাতার সঙ্গে বিবাদ করিতেই বদ্ধপরিকর। তিনি সমাজ গ্রাহ্য করেন না, দেশাচার মানেন না, শাস্ত্রানুশাসনেও তাহার কোন শ্রদ্ধা নাই——

[নিষ্ঠুর লোকাচার!…শাস্ত্রের শাসন! নিষ্ঠুর শাস্ত্র! ধন্য দেশাচার,… সমাজ কই?] এদিকে শ্রীহরির চরণে নির্ভরশীলতাও তাঁহার নাই। যোগেশের মদ ছিল, প্রসন্নকুমারের মদ ছিলনা বটে কিন্তু প্রসন্নকুমার যোগেশের চেয়ে আরও অধিক মাত্রায় ভাবপ্রবণ ও বিচলিতচিত্ত, তাই তাঁহার পক্ষেও ট্রেজিডি অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

এই নাটকেই শ্যামাদাস (নির্ম্মলার পিতা) প্রসন্নকুমারের মতই ঝড় ঝাপ্‌টা খাইয়াছেন। তাঁহারও মেয়ে বিধবা, এবং বিবাহের রাত্রিতেই পুত্র (প্রমদার স্বামী) কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তথাপিও তিনি স্থির, ধীর। বোধহয় ভজহরির ন্যায় তিনিও ভাবিতেন "একে না পেলে মরবো, ওকে না পেলে মর্‌বো, তা হ'লে আর বাঁচা হয় না, দিনের ভিতর দুশো বার মত্তে হয়, মনে করেছেন কি আপনিই ঝড় ঝাপটা খাচ্ছেন, আর কেউ কখন খায়নি? তবে কাঁদচেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন?"

প্রফুল্ল ৫ম, অঙ্ক ২গ।

আমাদের নায়ক-চরিত্রের সমালোচনা একটু দীর্ঘ হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত চরিত্রের বিশ্লেষণ-সাহায্যেই নাটকের গতি প্রকৃতি ও বিবর্ত্তন ধারা বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রও নিজেই বলিতেন "নাটক লিখিবার পূর্ব্বে নাটকীয় গল্প রচনা না করিয়া আমি আগে নায়ক-চরিত্র কল্পনা করি, তারপর সেই চরিত্র ফুটাইতে ঘটনা পরম্পরার সৃষ্টি করি"।

(২) সামাজিক প্রশ্ন

ক। বিধবা বিবাহ

"শান্তি কি শান্তি" নাটকে শ্রেষ্ঠকলা ও সামাজিক প্রশ্নের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। অনেকেই নাটকখানি পাঠ করিয়া মনে করেন

গিরিশচন্দ্র "বিধবা বিবাহের" বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আজন্ম-সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা নাটকে পূর্ব্বাপর দেখিয়াছি, তিনি বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাবতীয় যুক্তির আলোচনা করিয়া এবং নিজের কোনই মতামত প্রদান বা সমাধান না করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন "শ্যামাদাস বাবু, বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা—শাস্তি কি শান্তি"? ৫ম অঙ্ক, ৬ গ।

সাধারণতঃ বুঝা যায় হিন্দুর আদর্শে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ নাট্যকার বিধবার ব্রহ্মচর্য্যেরই সমধিক পক্ষপাতী; প্রসন্নকুমারের পুত্রবধূ নির্ম্মলার চরিত্রেই তিনি হিন্দু বিধবার পবিত্র আদর্শ উজ্জ্বলতমভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রসন্নকুমার পার্ব্বতীকে বলিতেছেন "দেখছ কি সেই সর্ব্বনাশের দিন থেকে ব্রহ্মচারিণী সেজেছে! আমাদের গৃহীর সংসারে ব্রহ্মচারিণীকে রাখা বড় কঠিন, তা কি বুঝতে পাচ্ছনা?" প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী বিধবা মনে করেন তিনি যে কাজ করেন স্বামীর অনুদিষ্ট হইয়া। তাই নির্ম্মলা বলিতেছে——

"আমার স্বামী প্রত্যক্ষ নন, কিন্তু আমার অন্তরে আছেন। আমি আমার ইষ্টদেবতার সেবা কি ক'রে ক'র্‌তে হয়, তাঁর ধ্যান ক'রে জান্‌বো।…………আমি এখন তোমাদের বেটাবউ একত্রে। আমার কাজ আমার ইষ্টদেবতা আমায় দিয়ে গিয়েছেন। আমায় তিনি পরখ্ ক'র্‌তে লুকিয়ে আছেন! যেদিন আমার কাজ ফুরোবে, যেদিন আমি ক্লান্ত হবো, সেই দিন তিনি আমায় আদর ক'রে সঙ্গে নিয়ে যাবেন"। বিধবার কার্য্যসম্বন্ধেও নির্ম্মলা খুব তেজস্বিতার সহিত বলিতেছেন "বিধবার কি সংসারে কাজ নাই? ব্রহ্মচারিণীর কি প্রয়োজন নাই? এ কর্ম্মক্ষেত্রে বিধবার মত কার মহৎকার্য্য ক'রবার সুযোগ হয়? কে স্বার্থশূন্য হ'য়ে পরের ছেলে মানুষ ক'রতে পারে? বিধবা অপেক্ষা কে ব্রতধর্ম্ম পরায়ণা? কে নির্লিপ্ত সংসারী? কার স্বার্থশূন্য সেবা সংসারে আদর্শ?" ২য় অঙ্ক, ৪ গ।

ব্রহ্মচর্য্য ও সতীত্ব গৌরবের উচ্চ আদর্শ কেবল আমাদের দেশে নয়, যে সকল দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত সেখানেও অতি সম্মানার্হ

এবং সেখানেও "যে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য বরণ করে, সেই প্রকৃত সতী ব'লে গণ্য"। [পাগল—২অ, ৩গ]

বিধবার শিক্ষাও আবার ব্রহ্মচর্য্যানুযায়ী হওয়া চাই। বিলাস সর্ব্বথা তাহার পক্ষে বর্জ্জনীয়। হরমণি বলিতেছে "বিলাস বিধবারও নয়, অবিবাহিতা যুবতীরও নয়! যার পুরুষের আশ্রয় নেই, তারে সদাই কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকৃতে হয়, শত্রুর মত বিলাস ত্যাগ ক'রতে হয়, পোড়া বিলাসই দুষ্‌মণ ডেকে আনে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে—বলে মা—'পুরানো বসন ভাতি, অবলাজনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে'।" ১ম অঙ্ক, ১ গ।

বিধবার শিক্ষা যেরূপ কঠোর হওয়া চাই, বিধবার পিতামাতারও সেইরূপ সতর্কতা ও ত্যাগস্বীকারের আবশ্যক। বিদেশপ্রত্যাগত হরমণির স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আসিলে তাহার পিতা যেরূপ কঠোর আচারে থাকিতেন, গিরিশচন্দ্র হরমণির মুখে তাহার আভাস দিতেছেন——

"আমি বিধবা হবার পর আমার বাপ মা বিধবার অপেক্ষাও কঠোর আচারে রইলেন, আমার বাবার খাবার সময় একবার মার সঙ্গে দেখা হ'তো, আমাকেও বালিকা ব'লে মায়িক স্নেহ ক'রতেন না, শাস্ত্রমত বিধবার আচারেই রেখেছিলেন।"

যাহা হউক্, গিরিশচন্দ্র বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের সমধিক পক্ষপাতী হইলেও দেখা যায় অন্য দিকেও তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না, তাই প্রসন্নকুমারের মুখে তিনি বলিতেছেন——

"শিবপূজার যোগ্য নির্ম্মল ধুতুরা বিলাস-সজ্জিত সংসার-উপবনে সর্ব্বদা ফোটেনা, স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয়।"

বাস্তবিক নির্ম্মলার আদর্শ সকলের পক্ষেই একমাত্র বিধান হইতে পারে না। হরমণির শিক্ষাও সর্ব্বত্র সম্ভব নয়; আজ সেই একান্নবর্ত্তিতা নাই, পরিবারে বিধবার একাধিপত্য আজ সচরাচর দৃষ্ট হয়না। বিশেষতঃ দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়গ্রাম কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই অভিভূত করে। নিষ্ঠাচার, ধর্ম্মাচরণেও সর্ব্বদা উহা দমিত হয় না। প্রসন্নকুমারও তাহাই বলিতেছেন——

"ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম কিনা তোমার সন্দেহ আছে? পুত্রশোকাতুরা নারী বৎসর ফেরেনা, আবার পুত্র প্রসব করে, ইন্দ্রিয়-তাড়নায় উপপতির দাসী হয়, শোণিত সম্বন্ধ বিচার থাকেনা।" ২য় অ, ৪ গ।

এই অবস্থায় আদর্শব্রহ্মচারিণী নির্ম্মলার কথায়ই মনে হয়, সুবিধা হইলে তাহাদের বিবাহ অন্যায় নয়।—তাই প্রসন্নকুমার বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে বলিতেছেন "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, নীতিসম্মত। তবে নিষ্ঠুর লোকাচার? যা হ'বার হবে, লোকনিন্দা গ্রাহ্য ক'রবোনা।"

নির্ম্মলা—বাবা, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হ'তে পারে, নীতিসঙ্গত হ'তে পারে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ অন্যের বোঝবার নয়, **বিধবাই বুঝুক**! যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয়, নীতিসঙ্গত হয়, সে বিধবা আপনি বুঝে, ইচ্ছা হয়, বিবাহ করুক, অন্যে তার দরদী হ'য়ে বিবাহ দিলে পাপগ্রস্ত হবে।

এই সমস্ত স্থানে বিশেষতঃ যেখানে কঠোর নিষ্ঠা ও আচারেও সকল বিধবারই সংযম রক্ষা সম্ভব নয়, গিরিশচন্দ্র সেখানে কঠোর নিষেধ দিতেছেন না, তাই তিনি নীতিবান্ প্রসন্নকুমারের মুখে আরোপ করেন——

"হৌক্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, হৌক্ দেশাচারবিরুদ্ধ, বিবাহ দিলে তবু একটা নিয়মাধীন থাক্‌বে, ভ্রূণহত্যা হবেনা, কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হবেনা, একেবারে লোকধর্ম্মে ঘৃণিতা হবে না।" ২য় অ, ৪ গ।

কিন্তু স্থল-বিশেষে বিধবাবিবাহ ন্যায় সঙ্গত হইলেও সাধারণতঃ উহা অনুষ্ঠিত হয় না। গিরিশচন্দ্র প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী চরিত্রে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বেণীর পত্নী ও প্রকাশের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। এ ভালবাসা বাল্যকাল হইতে—উভয়েই একপাড়ার। ভুবনমোহিনী বলিতেছে, "প্রকাশ ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়ী আসে, কত আদর কর্‌তো, কত দিন আমার সঙ্গে খেলা করেছে।" এই প্রকাশ ছিল বেণীর অকৃত্রিম বন্ধু, বেণীও প্রকাশকে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অবাধে মিশিতে দিত, প্রকাশ "ভুবনের হয়ে বেণীর সঙ্গে ঝগড়া করে, ভাল গয়না কোথাও দেখ্‌লে জোর ক'রে কিনে আনে।" উভয়ে এক সঙ্গে গাড়ীতে থিয়েটার দেখিতে যায়, "প্রকাশের স্ত্রী কাজে যেত, সমস্ত

দিন দু'জনে ব'সে কথাবার্ত্তা কয়, প্রকাশ হারমোনিয়াম্ বাজায়, ভুবন গান করে," এরূপও অনেকদিন গিয়াছে। অবশেষে বেণী তাহার যথাসর্ব্বস্ব ও যুবতী স্ত্রী প্রকাশের হাতে সমর্পণ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ভুবন বাড়ীতে একা, কার্য্যের অছিলায় প্রকাশ যখনই আসিত, উভয়ে খুব একত্রে কথাবার্ত্তায় আনন্দে কাটাইত। ভুবনের বিলাস-মূলক শিক্ষাও প্রকাশের প্ররোচনায়ই, এবং অতঃপর ভুবনের প্রতি প্রকাশের এতদূর গাঢ় ভালবাসা জন্মে যে কাজকর্ম্মে তাহার অলসতা বোধ হয়, তাহার বাড়ী ভাল লাগেনা, রাত্রে সে ভুবনকে স্বপ্নে দেখে। তাহার কথায়ই তদানীন্তন অবস্থা বিবৃত করা যাইতে পারে—"আমার আবেগ ক্ষুদ্র বুকে ধরেনা, আমার আক্ষেপ হয় কেন দিবারাত্রি তোমার কাছে থাক্‌তে পারিনা, কেন দিনরাত তোমায় যত্ন ক'র্‌তে পারিনা। বিধাতার বিড়ম্বনায় কেন আমরা প্রভেদ।" ভুবনেরও প্রকাশের প্রতি এত অকপট ভালবাসা জন্মিয়াছে যে, প্রকাশের বিপদের সময় এক কথায় লক্ষ টাকা দিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। "আমি কার মুখ চেয়ে আছি? আমার যদি সর্ব্বস্ব যায়, তুমি যদি বেঁচে থাকো, আমার কি ক্ষতি হবে?"

মানুষ হিসাবে প্রকাশও যে খুব স্বার্থপর, নীচ ও কামুক তাহা নহে। কতবার সে বেণীকে কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। যাহা হউক অবশেষে উভয়েই বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া নিরয়-গামী হইল। কিন্তু যে প্রকাশ পূর্ব্বে বলিত, "ভালবাসায় পাপ কি? এ তো হয়েই থাকে, আমরা স্ত্রী-পুরুষের মত থাক্‌বো, আমি ইন্‌সলভেন্সি নিয়ে আবার কাজ কর্ম্ম ক'রবো। ভুবনকে কিছু জানতে দেবো না, সে যেমন আমার মাথার মণি আছে, তেম্‌নি থাক্‌বে। অকপট প্রণয়ে দোষ কি?" সেই প্রকাশই ভুবনকে বিপদ কালে রক্ষা না করিয়া তাহাকে বিপদের আরও গভীরতর কূপে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিল। শত প্রকারে লব্ধ খুঁটীনাটী অজস্র উপকার সমস্তই ভুলিয়া গেল,—আজ ইন্দ্রিয়লালসার যে উদ্দামতা নাই। নাট্যকার ভুবনমোহিনীর মুখেই তাহার তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন, "সে অনায়াসে আমাকে কলঙ্ক

থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তো, সে আমায় বিবাহ কর্‌লে সমাজে আমার মাথা হেঁট হ'তো না, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারতুম, আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেউ উপহাস ক'রতে পার্‌তো না। আমার গর্ব্ভের সন্তানকে পরের কাছে মানুষ কর্‌তে দিতে হ'ত না, আমার স্তন-দুগ্ধ গেলে ফেলে দিতে হ'ত না, আমি তারে পায়ে ধ'রে সাধলুম, সে আমায় তাড়িয়ে দিলে"। দেখা যায় প্রকাশ বন্ধুত্ব, কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্বের অনুরোধে ভুবনকে বিবাহ করিতে অথবা তাহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য হইলেও সে তাহা করে নাই। কার্য্যোদ্ধার হইলেই প্রকাশের ন্যায় প্রণয়ীও যে পলায়নের পথ সর্ব্বাগ্রে খোঁজে, পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়, আপনাকে বাঁচাইতে প্রণয়িনীকে আরও বিপদাপন্ন করে, নাট্যকার সে অবস্থাই নির্ভীকভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কাপুরুষ প্রকাশ যখন ভুবনকে বিবাহ করিল না তখন সে স্ত্রী-বর্ত্তমান থাকার অজুহাত দিল না—অজুহাত হইল নিজেরই ঔরসজাত সন্তানের অস্তিত্ব। এই অবস্থায় বিধবার নিজের ইচ্ছা থাকিলেও, বিধবার বিবাহ নীতি-সঙ্গত হইলেও, দেশকাল পাত্র হিসাবে প্রয়োজনীয় ও ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও তদনুরূপ নির্ভীক, ত্যাগশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বর পাওয়া অসম্ভব হয়। পাওয়া গেলে আর আপত্তির কারণ কি?

অনেকে বলেন, ঘেঁচির ন্যায় নরপশুর সহিত প্রমদাকে বিবাহ দেওয়ায় নাট্যকারের পক্ষপাতিতা দৃষ্ট হয়; কারণ অনেক স্থলে বিধবাবিবাহের পরিণাম তো শুভই হইয়াছে। যে সময়ে এই নাটক রচিত হয়, তখন হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, প্রকৃতি বা গঠন ছিল না, কাজেই সৎসাহস দেখাইয়া বিধবাবিবাহ করিবার লোকের অভাব ছিল। অর্থলোভে সমাজ-ভয়-বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্যতীত পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইত। এইরূপ স্থলে বিধবা-বিবাহের পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব। নাট্যকার তাই ঘেঁচির সহিত প্রমদার বিবাহ সংঘটন করিয়া প্রসন্নকুমারের ন্যায় ধৈর্য্যহীন পিতার অদূর-দর্শিতার পরিণাম প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমদা নিজের বিবাহের প্রয়োজন মনে করিত না, বিবাহের সময় পরপুরুষ-স্থানে বর দেখিয়া মুর্চ্ছিত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে প্রকাশে একান্ত অনুরাগিণী ভুবনের বিবাহের অত্যন্ত আবশ্যক

হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা ভুবনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অত্যধিক স্নেহ বশতঃ "বিধাতার সঙ্গে বাদ করিয়া" প্রমদার বিবাহে উদ্যোগী হইয়া পড়েন এবং কিরূপে পত্নীর সম্মতি লয়েন, তাহাও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তিনি পরে ঠিকই বুঝিয়াছিলেন "যত্ন ক'রে বিষ কিনে এনে গুলেছি, এখন গিল্‌তে হবে।"

তখনকার হিন্দুসমাজে বিবাহে অনিচ্ছুক বিধবার ভাগ্যে কিরূপ বর জুটিত—ঘেঁচি তাহারই চিত্র। আজ সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে এখনও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বর কচিৎ পাওয়া যায়।

যদিচ পাগলের কয়েকটি কথায় সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে নাট্যকারের আশঙ্কা আছে "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে দাম্পত্য-বন্ধন অন্যরূপ হবে, সতীত্বের উচ্চ মর্য্যাদা কতক পরিমাণে লাঘব হবে", তথাপি তিনি প্রকারান্তরে যখন ভুবনের বিবাহ অনুমোদন করেন ("বিধবা আপনি বুঝুক") ভুবনও প্রকাশকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে এবং অন্যত্র শ্যামাদাসের মুখে বলিতেছেন "যদি সমাজের প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রেই বিধি আছে—দেশকালপাত্র বিবেচনা ক'রে নিয়ম পরিবর্ত্তন ক'রবে" তখন নাট্যকারকে বিধবা বিবাহের একেবারে বিরোধী কিছুতেই বলা চলে না। তবে, তিনি সমস্ত অবস্থাই ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। কোন সমাধান করেন নাই, আর সমাধান সম্ভবও নয়, কারণ পাগল বলিতেছে "এ দেশে কন্যাভার এক মহাভার। অবলার দুঃখ মোচন করা যে কোন মহাপুরুষের সাধ্য তা আমি জানি না। যে যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, সেখানেও অনেককে কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত ক'রতে হয়।"

২য় অঙ্ক, ৬ গ।

উভয় পক্ষের যুক্তির আলোচনা করিয়া নাট্যকার দেখাইয়াছেন নূতন আদর্শ ও সাধনা ব্যতীত সমাজ রক্ষা হয় না। সাময়িক উত্তেজনায় কোন উচ্চগুণসম্পন্না বিধবা হঠাৎ পদস্খলিত হইলেই যে একেবারে পতিতা হইয়া থাকিবে অথবা বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হইলেই (যদিও তাহা অসম্ভব) যে সমাজ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইবে, তাহা নয়। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ কদাচিৎ পাপকার্য্য করে তবে তাহার জন্য গিরিশচন্দ্রের

সান্ত্বনার বাণী "পাপকার্য্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। ভগবান কৃপাসিন্ধু, মানুষ দুর্ব্বল তিনি জানেন। এখনও দেহ আছে অনেক কার্য্য কর্ত্তে পার্ব্বে"। আবার পতি-পরিত্যক্তা দুর্ভগা রমণীরও আশ্রয়ের ব্যবস্থা এই নাটকে দৃষ্ট হয়। নাট্যকার হরমণি চরিত্রের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া আমাদের অবলাগণের প্রাণে আশা দিয়াছেন। আমরা হরমণির আশ্রম সম্বন্ধে বিস্তৃতালোচনা বিবেকানন্দ অধ্যায়ে করিয়াছি। বাস্তবিক তাহার আশ্রমে ভুবনমোহিনীও আশ্রয় পাইয়াছিল, আজীবন তাহার কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল কিন্তু উন্মত্ত পিতার কঠোর হস্ত তাহা অপূর্ণ রাখিয়াছে। আর হরমণির সুশিক্ষা ও শুশ্রূষা গুণেই "বলিদানের" স্বামীহীনা, পিতার ভার, মাতার কণ্টক, নিরাশ্রয়া অভাগিনী হিরণ্ময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যা আর পুনরভিনীত হয় নাই।

খ। বরপণ প্রথা

গিরিশচন্দ্র "বলিদানে" বরপণ সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। কন্যাদায়ে প্রত্যেক গৃহস্থ কিরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে তাহার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন করুণাময়ের দুঃখের কাহিনী। এ দুরবস্থা কবির কল্পনা-প্রসূত নহে, ইহা ধ্রুব সত্য, ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা, প্রত্যেক মধ্যবিৎ গৃহস্থ ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কষ্টে স্বষ্টে দিনপাত করিতেছি, এক রকম চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু যাই একটী মেয়ের বিবাহ উপস্থিত হয়, অমনি চিন্তায় সারা হইয়া যাই, আহার নিদ্রা আর ভাল লাগে না, 'মেয়েকে সাম্‌নে দেখ্‌লে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়'। তারপর ধারকর্জ্জ করিয়া, বাড়ী বাঁধা গয়না বাঁধা দিয়া, দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ হইয়া গেলে যে অবস্থা হয়, তাহা আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। জামাইটি জোর বি, এ, পড়ে, সংসারের ভার গ্রহণ করিতে তাহার এখনও অনেক দেরী। এদিকে বিবাহে যে ঋণ হইয়াছিল তাহা আর শোধ হয় না, 'টাকা পেলেই হাতে মাথ্‌তে কুলোয় না'। আজ ইহার সুদ, কাল তাহার তাগাদা, পরশ্ব ছেলের স্কুলের বেতন, পরদিন ব্যারামের খরচা। গৃহস্থ এই প্রকারে তন্তুসার হইয়া যায়

এবং তখন ইচ্ছা হয় "কাপড় ফেলে পালাই বা সন্ন্যাসী হ'য়ে চলে যাই।" এ অবস্থায় যে ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রাণাধিকা মেয়েকে "আফিসে কাজ কর্‌তে কর্‌তে মনে হ'তো ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি, যে কাছে না বস্‌লে তার খাওয়া হ'তো না, যার প্রফুল্ল মুখ দেখে সাধ্ মিট্‌তো না," সেই স্নেহ-পুত্তলি মেয়ের মৃত্যু কামনা করিয়া বাপ্ তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন "কেন ছেলের স্কুল বন্ধ করেছি জান? তোমরা জন্মেছ ব'লে, কালসর্পিণী জন্মেছ ব'লে, হ'য়ে মরো নি ব'লে, কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন জোটাতে হবে ব'লে।" যাহাদের দেখিয়া মনে হইত, সংসারে সুখের অবধি নাই আজ তাহাদের দেখিলে তপ্তশলাকা-বেধের ন্যায় মনে হয়, "কি শুভক্ষণে জাত রক্ষার জন্য কন্যার বিবাহ দিয়েছিলুম, এখন পরম শুভ দিনের কত বাকী তাই ভাবছি।" যাহাদের দেখিয়া মনে হইত ইহারা রাজার ঘরে জন্মায় নি কেন, আজ পতিহীনা নিরাশ্রয়া মেয়েকে "স্বামী খেয়ে শ্বশুর খেয়ে বাপের বাড়ী এসেছো" বলিয়া মৃত্যু ব্যবস্থা দিতে দ্বিধা হয় নাই এবং মনে হয় "ইহারা ডোমের ঘরে জন্মিলেই বোধ হয় অন্ন খাইয়া থাকিতে পারিত।" এই ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের পারিবারিক অবস্থা, অথচ পরিধি বর্দ্ধিত করিয়া, গণ্ডী শিথিল করিয়া প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন প্রচলিত হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে "ধর্ম্মভীতু সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উত্থাপন কল্লে নাক সেঁটকান, এ দিকে যে ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ তা দেখেন না"। গণ্ডী ছাড়াইবারও সাধ্য নাই, অথচ বিবাহ দিতেই হইবে—— "বাড়ী বেচে দিতে হবে, কর্জ্জ ক'রে দিতে হবে, ভিক্ষা ক'রে দিতে হবে, চুরি ক'রে দিতে হবে, তারপর সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যেতে হবে, না দিলে নয়, পুণ্যাত্মা-সমাজ জাতে ঠেলবেন্, ঘৃণা কর্‌বেন, ধর্ম্মানুরাগ প্রদর্শন করবেন"। সমাজের এই অবস্থা, অথচ সভাসমিতি হইতেছে, উপদেশ বক্তৃতার অভাব নাই, কিন্তু এ প্রথা বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। "কারণ যার ছেলে আছে সে দাঁও ক'ষে ব'সে আছে। যার মেয়ে আছে সেই কেবল ক্যাঁ ক্যাঁ করে। যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, মেয়ের বে'তে খরচ কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেটীর

সঙ্গে সম্বন্ধের প্রস্তাব ক'ত্তে যাও, তিনি ব'লে পাঠাবেন, তাঁর ছেলের এখনও বিবাহ দেওয়ার সময় হয়নি ; এদিকে ঘটক পাঠিয়ে খুঁজছেন কে দশ বিশ হাজার ছাড়্‌চে।" এই অবস্থায় বাঙ্গলায় আজকাল যে বালিকা-হত্যা হইতেছে, তাহাদের হৃদয়-শোণিতে বাঙ্গলার অমর কবি বাঙ্গলার এই মর্ম্মভেদী অবস্থা অদ্ভুত কৌশলে তাঁহার অমর নাটক "বলিদানে" অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন——

——"এই কুপ্রথায় দেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম,আচার ব্যবহার সকলই নষ্ট হ'চ্ছে। সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে, বড় ঘর দেনদার হচ্ছে, গৃহস্থ ফকির হচ্ছে, বালিকা-হত্যা হচ্ছে, কন্যা-জন্ম ঘোর অমঙ্গল ব'লে গণ্য হ'চ্ছে"—। বাস্তবিক ইহাই বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থা—"কোথাও কন্যার আত্মহত্যা, পতি-গৃহ-পরিত্যক্তা, প্রতি গৃহে দরিদ্রতা।" কবি অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে এই অবস্থা অঙ্কিত করিয়াছেন। আর চক্ষুর সম্মুখে আমরা এই চিত্র প্রত্যহ সংঘটিত দেখিতেছি।

ইহাই যদি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর দৈনন্দিন অবস্থা হয়, এবং সমাজ যদি তাহার কোন প্রতিবিধান না করে, তবে কি কন্যাবিবাহ-সমস্যায় বাঙ্গলা একেবারে উৎসন্ন যাইবে ? কবি কি কেবল বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন, রক্ষার কোন উপায় উদ্ভাবন করেন নাই ? জাতীয় কবি জাতীয় শিক্ষক, তিনি কেবল ধ্বংস-বিধানই করেন না, গড়িবারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গিরিশচন্দ্র আমাদের সম্মুখে দুইটী উপায়ের পথ ধরিয়াছেন। প্রথম উপায় দেশের যুবকগণ। যাঁহারা বড় হিসাব করিয়া পদসঞ্চালন করেন, যাঁহারা নিজ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, সমাজ যাঁহাদের কল্পনায়ও আসে না, তিনি তাঁহাদের নিকট প্রার্থী হয়েন নাই। তাঁহার আশা কর্ম্মী যুবকগণ! সকল শিক্ষিত যুবকই সমান নহে। আজ দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতেছে, দেশের কত সোণার প্রাণ দুঃখীর দুঃখে, পীড়িতের সাহায্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছে। "বলিদানে" বান্ধব-সম্মিতির সভ্যগণের দ্বারা গিরিশচন্দ্র এই শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। কিশোর বিবাহ করে নাই। বিশ্বাস ছিল বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে পাঁচজনের উপকার করা যায় না, কিন্তু কন্যাভারগ্রস্ত

গৃহস্থের দুরবস্থা দেখিয়া স্থির করিলেন "আমাদের সকলেরই duty (কর্ত্তব্য) বিবাহ করা। যার কন্যাদায়, হয় উপযুক্ত পাত্র কোন রকমে জোটানো, নয় আমাদের ভিতর যার বিবাহ হয় নাই তার সেই কন্যা বিবাহ করা উচিত---কুরূপা হউক সুরূপা হউক।"

কথা হইতে পারে যে, পিতা মাতা আপত্তি করিবেন, কিন্তু বাস্তবিক যদি যুবকগণ এই অবস্থায় মর্ম্মাহত হইয়া থাকেন তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই কিশোরের মত তাঁহাদের পিতামাতাকে বুঝাইবেন যে "পুত্রের বিবাহ, আসুরিক সন্তান-বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র বংশের স্তম্ভ—পিণ্ড-অধিকারী, সেই পুত্রের পিতা তাহার মাতামহের সর্ব্বনাশের হেতু হবে?" তাঁহারাও নিশ্চয়ই পুত্রের সুবুদ্ধিতে তাহাদের সহায় হইবেন এবং ঘনশ্যামের মত, "স্বার্থত্যাগ ক'রে সমাজকে শিক্ষা দিবেন, বংশের গৌরব উজ্জ্বল ক'রবেন, পবিত্র বিবাহ-রীতি পুনঃ সংস্থাপন ক'রবেন, সমাজ তাহাদের দেখে ধন্য ধন্য করবে এবং তাহাদের কৃপায় আমরা ও ধন্য হব"।

প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত—তাহা হইলে সুবিধাও হয় এবং "physicallyও সন্তান ভাল হয় এবং fresh blood infused হয়!"

দ্বিতীয় বিধান—বালিকাগণের সুশিক্ষা প্রদান। মেয়েদের বিবাহের যখন সম্ভাবনা কম, বিবাহ দিলেই পিতাকে যখন পথে দাঁড়াইতে হইবে তখন ত বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিতেই হইবে। তবে কথা হইতে পারে "একটা evil হওয়ার সম্ভব, গরম দেশ age of puberty শিগ্‌গির আসে, ইহাতে কুমারীদের ব্যভিচার দোষ জন্মাতে পারে"। কিন্তু কেন জন্মিবে? কবিও সেই উত্তর কিশোরের মুখে প্রদান করিতেছন—

"অনেক বালবিধবারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যে সতীত্ব রাখ্‌তে পারে, কুমারীরা কেন পার্‌বে না? যদি পিতামাতা কন্যাকে যত্ন করিয়া সুশিক্ষা দেন, সৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, আপনাদের দৃষ্টান্তে দেখান যে দৈহিক স্পৃহা অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়, তবে উহা জন্মিবার সম্ভাবনা কম। আর যদি দু একটা হয়ও, এমন ত বিধবা কন্যা নিয়েও

ঘটিচে, সে আকস্মিক দুর্ঘটনা বিবাহ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার চেয়ে অথবা বালিকাকে বৃদ্ধের হস্তে দেওয়ার অপেক্ষা অনেক ভাল"! আমাদেরও তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষানীয়াতিযত্নতঃ"—মেয়েকে সুশিক্ষা দেওয়া চাই, সর্ব্বদা বিলাসবর্জ্জিত রাখা চাই, বড় সাবধানে রাখা চাই। "মায়াবসানে"ও কালীকিঙ্কর রঙ্গিনীকে বলিতেছেন "আচ্ছা, যদি কুমারী থেকে লেখাপড়া শিখ্‌তে চাও, আমি আপত্তি করিনা।" ১ম অ, ৫ম গ।

দেশের লোক কি কন্যাশিক্ষায় তৎপর হইবেন না?

৩। প্রকাশ

প্রকাশ চরিত্র আমাদের নিকট নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন—প্রকাশ একজন সাধুপ্রকৃতির লোক, মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল ও বন্ধুর উপকারীর প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ। ক্রমে বন্ধুপত্নীর প্ররোচনায় স্খলিতচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

পাগল—তুমি সাধু ছিলে, এখন ঘুম থেকে উঠে ফিট্ বাবু হ'য়েচ।

"শাস্তি কি শান্তি।" ৩য় অঙ্ক, ৫ম গ।

বেণী—আমি দু'তিনবার বিপদে পড়ি, প্রকাশ বাড়ী বাঁধা দিয়ে আমায় সাহায্য ক'রেছে—দু'বার কঠিন ব্যায়রাম হয়, প্রাণ উৎসর্গ ক'রে আমার সেবা করেছে— ১ম অ, ৪র্থ গ।

প্রকাশ—(পাগলকে), কেন ভাই, তুমি আমার বন্ধু। তুমি বেণীকে রাস্তা থেকে এনেছ, আমাকে কিনে রেখেছ। ঐ

প্রমদার স্বামীর কলেরার সময়েও প্রকাশের চিন্তা তাঁহার উদার চরিত্রের অনুরূপ। সে ডাক্তারকে বলিতেছে "ডাক্তার, তোমায় আজ আর আমি বাড়ী যেতে দেবো না"।

এই সব উক্তিতে প্রকাশের মহৎ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আর ভুবনমোহিনীর ঐকান্তিক আগ্রহেই সে চিত্ত স্থির রাখিতে পারে নাই। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ভুবনমোহিনী প্রকাশকে প্রলুব্ধ করিতেছে——

"তুমি তিন দিন আসো নাই আমার কি ক'রে কেটেছে তা আমিই জানি। আজ যদি তুমি না আস্‌তে, এ সাজানো ঘর দেখ্‌তে পেতেনা, আমি ফুলদান, ছবি, আসবাব সব দূর ক'রে দিতুম, তুমি আসো ব'লে সাজিয়ে রেখেছি, যদি তুমি না এসো, তা হ'লে আর এ সব কেন ?......

......তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাকো, আমার মনে হয় আমি বিধবা নই, মনে হয়, তোমায় কাছে রেখে সে কাজে বেরিয়ে গেছে; আমি যেমন আমোদ ক'র্‌তুম, তেম্‌নি আমোদ করি। আমার মনে অসুখ থাক্‌লেও তোমার সাম্‌নে প্রকাশ করিনা, পাছে তুমি অসুখী হও।"

এই সকল লালসা-মূলক প্রলোভনেই প্রকাশের সাধুচরিত্র বিচলিত হইয়াছিল। সে লোকনিন্দার ভয়ে আসিতে চাহিত না, ভুবনই লোক-নিন্দা উপেক্ষা করিয়া আসিতে পীড়াপীড়ি করিত—"তুমি সে ভয় ক'রোনা, যে যা বলে, বলুক।"

তৃতীয় অঙ্কে তাহার হৃদয়ে এই যে দেবাসুর দ্বন্দ্ব, তাহা তাহার মহৎ চরিত্রেরই অনুরূপ। তাই বোধহয় নাট্যকার প্রকাশের মুখ দিয়া তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"তুমিই তো আমায় কুপথগামী কর্‌লে,—আমার দেবতার মত চরিত্র ছিল।"

(৪র্থ অঙ্ক, ১ম গ)

কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রকাশ স্বভাবতঃই দুষ্ট প্রকৃতির লোক। বেণীকে ভালবাসিত তাহার প্রভূত অর্থ ও যুবতী স্ত্রীর সহিত অবাধ সঙ্গলাভ-প্রলোভনে। তাই পাগল প্রথমেই তাহাকে বলিতেছে "আমার বন্ধু হ'য়ে কি ক'রবে, আমার যুবতী মাগ্‌ও নাই, টাকাও নাই।"

১ম অঙ্ক, ৪ গ।

সরলহৃদয়া বিধবার উপরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিবার অভিপ্রায়েই সে প্রথমে সতর্কতাবলম্বন করিয়া তাহার কাছে আসিতে চাহে নাই। "তুমি অভয় দিলে আমার ভয় কি" ২য় অ ১গ। এই কয়টী কথায়ই তাহার সতর্কতা প্রকাশ পায়। নাট্যকারও ভুবনের মুখে তাহাই বলিতেছেন "না সে তার ভাণ, সে তার কপটতা, সে আমার অনুরাগ বাড়াবার জন্য আস্‌তে চায়নি"—(৫ম অ ৬ষ্ঠ গ)

প্রকাশ পূর্ব্বোক্ত অভয়বাণী পাইয়াই স্বভাব-বিলাসিনী ভুবনের প্রতি লালসাবর্দ্ধক আয়ুধ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল—মাথায় অডিকলন, ফুলের তোড়া, সাজসজ্জা, গ্রামোফন ও থিয়েটার ইত্যাদির সখ্। ভুবনের উক্তি "ফুল্ টুল্ ঘরে রাখ্‌লে লোকে নিন্দা কর্‌বে," "ছিঃ ছিঃ আমার কি এখন ওসব সাজে,"—"আমি একজনকে বলেছি তার গান শুন্‌বো"—(অর্থাৎ হরমণির)—ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে তাহার সংযমের আভাস পাওয়া যায়, এই ভাব স্থায়ী হইলে সেই পরিণাম নাও হইতে পারিত। প্রকাশের প্ররোচনায়ই বিধবার নিবৃত্তিমূলক আচারে তাহার বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা তাহার কথায়ই প্রকাশ—"বিধবা যেন চোর, সদাই ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়। এ শাস্ত্রতো মাগ্ ম'লে নাই? প্রকাশবাবু ঠিক বলে—যাদের বিধবাকে চিতের আগুণে পুড়িয়ে মার্‌বার নিয়ম, তাদের শাস্ত্রে আর কি হবে?"

২য় অঙ্ক, ১ম গ।

লক্ষটাকা—এমন কি—সর্ব্বস্বও ভুবন অকাতরে দিতে প্রস্তুত জানিয়াই প্রকাশের হৃদয় আবেগ তাহার মর্ম্মস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হয় এবং তাহার পর হইতেই সে অপূর্ব্ব প্রেমাভিনয় করে। ইহার পরের অবস্থা প্রকাশের কথায়ই প্রকাশ পায়—"তোমার বিষয় বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আমার দেনা শুধেছি, উপস্থিত পরিশোধের উপায় দেখ্‌ছি না। আমার কাজকর্ম্ম বিশৃঙ্খল হ'য়েছে"—৩য় অঙ্ক, ২য় গ। এক কথায় প্রকাশ হইতেই ভুবন সর্ব্বস্বান্ত। এই অবস্থায় যখনই সন্দেহ হইল, ভুবনকে হাত না করিলে কোন উপায় নাই, জ্ঞাতিবর্গের অভিযোগে ফৌজদারীতে সোপরদ্দ হইবেন—ইতিপূর্ব্বে যে প্রকাশ ভুবনের সহিত সম্বন্ধ লোপ করিতে আসিয়াছিল এখন স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাকে হাত করিবার জন্য বিমুগ্ধা প্রণয়িনীর শিরায় শিরায় অগ্নিময় রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল,——

"আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস, কেন চিরদিন পর হ'য়ে থাক্‌বো?"

ঘৃতকুম্ভে তপ্ত বহ্নি নিক্ষিপ্ত হইল—ভুবনের সর্ব্বনাশ হইল। স্বার্থান্ধ

না হইলে প্রকাশ দুর্দ্দম হৃদয়-দ্বন্দ্বে বোধ হয় বা বিজয়ী হইয়া প্রকৃত দেবত্বেরই পরিচয় দিতে পারিত; কিম্বা আত্মসংযম-ভ্রষ্ট হইয়াও ভুবনের রক্ষার জন্যই অধিকতর যত্নবান্ হইত। মৃত্যু সময়ে অনুতপ্ত প্রকাশও এইরূপ বলিয়া যায়—

"আমিই স্বার্থের জন্য তোমায় কুপথগামী করেছি।"

ভুবনের সর্ব্বনাশ-সাধন হইলে সে সদাশিব চায়েনরূপের গদীতে জাল হ্যাণ্ডনোট ডিস্‌কাউণ্ট করিতে যায় এবং সাধ্বী নির্ম্মলাকে বাগানে আনাইবার পৈশাচিক চক্রান্ত করিয়া, 'উপপতি আনত' এই মিথ্যা অপবাদে ভুবনের নিকট হইতে সাফাইনামা লিখাইবার উদ্যম ও তাহাকে হাতকড়ি দিবার ষড়যন্ত্র করিয়া এরূপ হীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে থাকে যাহা যে কখনও সাধু ছিল তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া কখনও সম্ভব নয়। প্রকৃত সৎলোক অবস্থার প্রভাবেও এত হীন কাজ কখনও করিতে পারে না।

উভয় বিশ্লেষণই প্রকাশচরিত্রে উপযোগী বটে কিন্তু প্রকাশ সম্বন্ধে নাট্যকারের প্রকৃত পরিকল্পনা কোন যুক্তিতেই ঠিক পরিস্ফুট হয় নাই। কারণ, যে স্বভাবতঃই স্বার্থপর, সে বন্ধুর বিপদে এতটা আত্মোৎসর্গ করিতে পারে না, আবার বন্ধুবৎসল অকৃত্রিম বন্ধু সরলহৃদয়া স্বার্থশূন্যা বন্ধুপত্নীর সহিত অবস্থার প্রাবল্যে প্রণয়াবদ্ধ হইলেও পদে পদে তাহার এত অভাবনীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারেনা। অর্থলোভে সর্ব্বনাশ করিবে——এই দুরভিসন্ধি পূর্ব্ব হইতেই প্রচ্ছন্ন থাকিলে দুর্দ্দম হৃদয়-দ্বন্দ্বে এত অভিভূত হয় না, আবার দেবচরিত্র হইলেও বন্ধুপত্নীর লালসা বৃদ্ধির আয়োজন সকল নিজ হাতেই যোগাড় করিয়া পরিশেষে তাহাকে কৃতঘ্নের ন্যায় লাথি মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করে না। স্বার্থপর পিশাচ হইলে অকপট ভাবে নিজ দুর্দ্দশার বর্ণনা করেনা, আর সাধু থাকিলেও এত জাল, জুয়াচুরিতে সিদ্ধহস্ত হয় না। প্রিয় বন্ধু তাহারই হস্তে পত্নীর ভার সমর্পণ করিয়াছেন, সে সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে এই অপরাধ দুরপনেয় হইলেও "অবস্থাই বলবান্ মানুষের বল নাই", সে ক্ষমার্হ। আবার "আশ্রিতা অনাথা বিধবাকে মজিয়ে তার নামে অপবাদ দিয়ে পীড়ন ক'রে

সাফাই লিখিয়ে নিতে যাওয়া” ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা, বন্ধুদ্রোহিতা ও মহাপাপ। একদিকে পৈশাচিক ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় সাধারণের নিকটই ঘৃণ্য, আবার অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়ায় সাধুরও কৃপাপ্রাপ্ত। এই জটিলচরিত্র সমালোচনা এক কঠিন ব্যাপার।

আমাদের মনে হয় প্রকাশ বাস্তবিকই বন্ধুবৎসল। বেণী তাহাকে উইলের এক্‌জিকিউটার করিয়াও অভিভাবকহীনা পত্নীর রক্ষার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া প্রথম হইতেই তাহাকে জড়াইয়া যায়। পাগলের নিষেধ সত্ত্বেও সে ভবিষ্যদাশঙ্কা ‘মনের দম্ভে বুঝিতে পারে নাই।’ ভাবিয়াছিল “আমার মনের বল আছে, কুপথগামী হবোনা, বিশ্বাসভঙ্গ ক’রবোনা।” সে তাহার ভ্রম, ‘অবস্থাই বলবান্, মানুষের বল নাই।’ এই পতন অন্যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে ইহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ভুবনের নিকট হইতে লক্ষটাকা নিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতেও কোন দুরভিসন্ধি ছিলনা। ভুবনের নিকট হইতে দূরে থাকিবার সঙ্কল্প কুচিন্তার সহিত সংগ্রামের ফল। ভুবনকে বলিতেছে—

“আমি আস্‌বোনা মনে করি, থাক্‌তে পারিনে। বাড়ী থেকে বেরুই, আবার ফিরে যাই। আমি কত রাত্রি তোমার বাগানের দোর দিয়ে ফিরে গেছি।” ৩য় অঙ্ক, ২য় গ।

ভুবনমোহিনীর নিকটে যখন বিদায় গ্রহণ করিতেছে, হৃদয়ে যখন দুর্দ্দম দ্বন্দ্ব, দুষ্ট সর্ব্বেশ্বর আসিয়া খবর দিল “বেণীবাবুর জ্ঞাতিরা কাল আপনার নামে নালিস ক’রবে, তাদের খোরাকী প’ড়ে গিয়েছে, আপনি একজিকিউটার হ’য়ে বিষয় নষ্ট কচ্ছেন তারা ভুবনমোহিনীর উত্তরাধিকারী—এই অভিযোগ ক’রেছে। বেণীবাবুর শ্বশুর তাদের পক্ষ হয়েছেন। দেহজীদের মাম্‌লা, উকীল বলেছে, ভুবনমোহিনী বিরূপ হ’লে সর্ব্বনাশ।” দুর্ব্বল হৃদয়ে খলের সাহচর্য্য! স্বার্থের জন্য প্রকাশ ভুবনমোহিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিল। অতঃপরে হুণ্ডির ‘চাপাচাপির’ সময় সর্ব্বেশ্বরের পরামর্শেই ‘জাল’ হ্যাণ্ডনোটের সৃষ্টি ও সদাশিব চায়েনরূপের গদিতে উহার ‘ডিসকাউণ্ট’ হয়। দুর্ব্বলহৃদয়ে দুর্ব্বৃত্তের সাহচর্য্যে

প্রকৃত পতনের প্রথম সোপান এবং পরে ক্রমে স্তরে স্তরে পতনের পরাকাষ্ঠা। এই অবস্থায় লোক 'সোজাপথ' ধরিতে পারিলে আবার রক্ষা পায়, "নয়ত বাঁকা পথে দ'কে দঁকে পড়ে।" প্রকাশ এইরূপ যখন রাস্তার তেমাথায় আসিয়া পড়ে, তখন পাগল সোজাপথ——"আঁতের ময়লা ধুয়ে জাল হ্যাণ্ডনোটের কথা খুলে বলা"——দেখাইলেও তাহা তাহার ভাল লাগেনা। এই সময় লোকভয়ে সোজাপথ ত্যাগই প্রকাশচরিত্রের এত অধঃপতনের কারণ। "মাকড়সা সুতো বুনে, আরো জাল বাড়ায়—জাল কমেনা।" নিজে সাফাই থাকিবার জন্য, লোকভয়ে অন্যায় ঢাকিবার জন্য ক্রমে দুর্ব্বলহৃদয় প্রকাশ বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, মনুষ্যত্ব সব বিসর্জ্জন দিয়া ভুবনের আরও অনিষ্ট সাধন করে। ক্রমে মিঃ বাসুর অর্থলোভে নির্ম্মলার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়া কিরূপ স্তরে স্তরে অধঃপতনের নিম্নতম সোপানে অবরোহণ করে—তাহা তাহার নিজের কথাতেই প্রকাশ—"কি ছিলুম—কি হলুম! অতি হীনকাজ! না ক'রলেও উপায় নাই। দু'দিন পরেই ব্যাটারা ফোরজারির (forgery) চার্জ্জে ওয়ারেণ্ট বা'র-ক'রবে—উপায় তো নাই। একজন মেয়েমানুষকে মজিয়েছি আবার একজনকে মজাতে হবে। এখন আর ভেবে কি ক'রবো, অন্যপথ তো নাই"—

৪র্থ অঙ্ক, ১ম গ।

তাই প্রকাশ স্বভাবতঃ হীন না হইলেও স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও দুর্জ্জনের সাহচর্য্যবশতঃ এরূপ পতিত হয় যে তখন আর অপর কাহারও মঙ্গলা-মঙ্গল তাহার ভাবনায়ও আসেনা, "যে মজে মজুক আমি আপনি বাঁচবার চেষ্টা পাই।" ৪র্থ অঙ্ক, ১গ। নিজে বাঁচিবার জন্যই ক্রমে ভুবনের অনিচ্ছায়ও ভ্রূণহত্যা করিবার জন্য দাই পাঠাইয়া দেয়,——ভুবনের নিকট হইতে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া নিজের সাফাইনামা লিখিতে আসে ও আত্মহত্যার মিথ্যা চার্জ্জ দিয়া জাল-পুলিসের সহায়তায় ভুবনের হাতে হাতকড়ি দিবার উদ্যোগ করে। যাহা হউক স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও সাফাই থাকিবার প্রবৃত্তিই প্রকাশকে হীন পথে টানিয়া নেয়। আর সয়তান সর্ব্বেশ্বরের সহায়তায় অবস্থার বৈগুণ্যে প্রকাশ কৃতঘ্নতার গভীরতম গহ্বরে পতিত হইলেও একেবারে নরপশু নয় বলিয়াই পরে অনুতাপানলে

দগ্ধ হয়। "আমার মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? বিশ্বাসঘাতক, বিধবার সম্পত্তি অপহারক, সতীর ধর্ম্মনষ্টকারী, বন্ধুদ্রোহী! শুনেছি নাকি তুষানল ক'রে পুড়ে মরে! দেখি, সে জ্বালায় যদি এ যন্ত্রণার উপশম হয়"। ৫ম অ, ৩ গ।

কিন্তু তখন ঘটনা-স্রোত নিবারণ করা অসম্ভব। তাই ভুবনের কাছে 'মাফ চাইতে এসে' ভুবনের পার্শ্বেই প্রসন্নকুমারের হস্ত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া আত্মহত্যা সাধন করে, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুতেও তাহার অনুতাপানল নির্ব্বাণ হয় না।

৪। ভুবনমোহিনী

ভুবনমোহিনী চরিত্র নাট্যকার খুব সরসভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার পদস্খলনে তাহার জন্য দুঃখ হয় বটে কিন্তু স্বামীর জীবিতাবস্থায় যে কুশিক্ষার বীজ তাহার হৃদয়ে রোপিত হয়, সেই শিক্ষাই তাহার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য দায়ী। প্রকাশের প্রতি ভুবনের উক্তিতে সে আভাস কতক পাওয়া যায়——

"তোমার আসা যাওয়া তো নূতন নয়? তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়ে থিয়েটার দেখে এসেছি। সে কাজে যেতো, তোমাতে আমাতে সমস্ত দিন দু'জনে কথাবার্ত্তা ক'য়েছি, আজ কেন কলঙ্কের ভয় দেখাচ্ছ?" ২য় অঙ্ক, ১ম গ।

বেণী ও সেইরূপ উৎসাহ দিত—"তুমি জেনো, তোমার মুখপানে যদি কেউ চায় আমার রাগ হয়, কিন্তু প্রকাশকে তোমার আছে একলা রেখে কাজে বেরিয়ে যাই। প্রকাশকে তুমি আপনার জেনো. কারুর কথা শুনে পর ক'রোনা, প্রকাশের যদি স্ত্রী না থাক্‌তো, আমি সমাজ মান্‌তুম্ না, আমি প্রকাশকে অনুরোধ কর্‌তেম্ তোমায় বিবাহ করে। যাক্ সে কথা, আমি তোমায় প্রকাশকে দিয়ে নিশ্চিন্ত।" ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গ।

এইরূপ অধিক মেশামেশি ও এইভাবে বন্ধুহস্তে সমর্পণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বেণীর এবং এই অবস্থায় তাহার স্ত্রীর চরিত্র অক্ষুন্ন থাকাই আশ্চর্য্য——পূর্ব্ব হইতে গোড়া ঠিক না হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে 'ঋষি প্রদর্শিত' ব্যবস্থামতে চলা তো

সম্ভব নয়! বিশেষতঃ বাড়ীতে এমন অভিভাবক ছিলনা যে ভুবনের ভার গ্রহণ করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে বেণী তাহাকে বলে——

"আমার বাপ ছিলেন না। আমার মা বে দিয়েই কাশীবাসী হ'য়েছেন, তোমার নামে আমি সব উইল ক'রে দিয়েছি, প্রকাশ তার এক্‌জিকিউটার। তোমার বাপ্ শোকাতাপা, দেইজীরা ঝগড়া ক'র্‌বে, তিনি নিরীহ মানুষ, এত জঞ্জাল তাঁর ঘাড়ে দিলুম না।" ১ম অঙ্ক, ৪ গ।

এই অবস্থায় পতন খুবই সম্ভব, এবং শোকার্ত্ত পিতা যে সময়ে ভুবনকে তাহার বাড়ী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আসে, তখন ফিরিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। বিধবা হইবার পরেই একমাত্র হিতৈষী বন্ধু প্রকাশের উপদেশানুযায়ী উদ্দীপক আহার ও অন্যান্য লালসামূলক ব্যবস্থা ঘৃতবহ্নিসংযোগের ন্যায় বিষময় ফল উৎপাদন করে। তবে এই অবস্থায় ভুবনের সরলতা ও যথাসর্ব্বস্বার্পণ করিয়াও স্বামীর বন্ধুকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার চেষ্টায় তাহার সরল হৃদয়ের গভীর ভালবাসা প্রকাশ পায়— "আমি যদি তোমায় লাখ টাকা দিই, সেইটে কি বেশী ক'র্‌বো? তোমার বিপদ্ কি আমার নয়? আমার যদি সর্ব্বস্ব যায়, তুমি যদি বেঁচে থাক, আমার কি ক্ষতি হবে?" (২য় অঙ্ক, ৫ম গ)।

ভুবনের প্রেম সামাজিক হিসাবে অবৈধ হইলেও তাহা আত্মোৎসর্গ, একনিষ্ঠতা ও গভীরতার জন্য হৃদয়ের দিক্ দিয়া অকপট। প্রকাশের জন্য সে বাপ ত্যাগ করে, মা ত্যাগ করে, আশ্রয়হীনা ভগ্নীকে বাড়ীতে জায়গা দেয় না। সর্ব্বনাশ হইয়াছিল অবস্থার বৈগুণ্যে, কিন্তু সরলা বালা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, কার্য্য উদ্ধার হইয়া গেলেই কৃতঘ্ন বন্ধুদ্রোহী প্রকাশ তাহাকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিবে, তাহার সোনার সংসারটী এরূপে ভাঙ্গিয়া যাইবে, ক্রমে ক্রমে তাহাকে আরও বিপন্ন করিবে। প্রকাশের ন্যায় হিতৈষীবন্ধু যখন বলে "আমি দেখছি জগতে তুমিই আমার আপনার আছ, আর কেউ নাই, তবে কেন তোমায় চিরদিনের জন্য পর ক'রবো! অকপট প্রণয় যদি দোষের হ'ত, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গৌরবের কেন?" [৪র্থ অ ২ গ] তখন কি ভুবনের ন্যায় সরলা অবলা প্রকাশের সরলতায় কখনও সন্দেহ করিতে পারে? আর প্রেমাস্পদ, স্বামিকল্প, অনুগৃহীত,

বিপদের একমাত্র হেতু, সংসারে একমাত্র আশ্রয় দাতাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করাতো স্বাভাবিক—

"(পদ ধারণ করিয়া) প্রকাশ, আমায় এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো। আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছ, তাতে আমি দুঃখিত নই! তুমি সাফাই লিখে নিতে চাও, আমি রাজী আছি,—আমায় কলঙ্ক থেকে মুক্তি দাও—**তুমি আমায় বিবাহ করো**। আমি তোমার গলগ্রহ হবোনা, আমি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে থাক্‌বো, ভিক্ষা ক'রে খাব, কিন্তু লোকে বেশ্যা বলে ঘৃণা ক'রবে—ভিক্ষা ক'রতেও বাড়ী ঢুক্‌তে দেবেনা, বাবা ভাই কাছে আসবেনা—আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। ৪র্থ অ, ১গ।

প্রকাশ যখন বলে "তুমি পেটের কাঁটা খসিয়ে ফেলো," তাহার ক্রোধ স্বাভাবিক—

"তোমার কি আর মনুষ্যত্ব নাই? একেতো মহাপাপ করেছি, তার উপর জীবহত্যা ক'রবো—ভ্রূণহত্যা ক'রবো!" বারবার বিবাহ করিবে আশা দিয়াও প্রকাশ যখন অবশেষে প্রত্যাখ্যান করে, স্বার্থের জন্য হীন ষড়্‌যন্ত্রের সহায়ে তাহাকে পুলিসের হাতকড়ি দেওয়ায়, তখন নিজে প্রকাশের কোন অনিষ্ট না করিলেও, মনে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে—

"আজও প্রকাশের সাজা হ'লোনা? পাগ্‌লা বাবা তারে ছেড়ে দিলেন? সাজা দেওয়ালেন না? সে জেল খাট্‌লো না?"

৫ম অঙ্ক, ৬গ।

ভুবনের শিক্ষানুসারে হিংসাদ্বেষ মন হইতে একেবারে পরিত্যাগ করা সহজ নহে, বিশেষতঃ,—কৃতঘ্নের এইরূপ পৈশাচিক ব্যবহারে। তবে সুশিক্ষায় আবার তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। যে পাগলের সতর্ক ইঙ্গিতে সে সর্ব্বদা রোষ প্রকাশ করিত (তুমি বল পাগল, দেখ্‌চ না বদ্‌মাইসি, আমায় ঠেস্ ক'রে কথা ক'চ্চে—৩য় অঙ্ক ৫ম গ), পিশাচের হস্ত হইতে তাহারই কৃপায় রক্ষা পাওয়ায় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া যায়ঃ—

"বাবা, তুমি কে মহাপুরুষ, এ ঘোর সঙ্কটে আমায় উদ্ধার ক'র্‌লে। আমি অজ্ঞান, আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি—৪র্থ অঙ্ক, ৫ম গ।"

ক্রমে হরমণির শিক্ষায় তাহার বিষয়-বিতৃষ্ণা ও কর্ম্ম-স্পৃহা জন্মে এবং প্রথম হইতে এইরূপ মহতের সঙ্গ লাভ হইলে তাহার প্রবৃত্তি সকল সম্ভবতঃ ত্যাগ ও উচ্চ-ব্রতেই বা প্রধাবিত হইত। হরমণিকে সম্বোধন করিয়া ভুবন বলিতেছে—"মা, আমার বিষয়ে কাজ নাই, তুমি আমায় একটু স্থান দিয়ো, আমার বোনের সঙ্গে আমিও তোমার কাজ ক'র্‌বো। আমার বিষয়ের উপস্বত্ব যতদিন বেঁচে থাকি, তোমাদের কাজে দিয়ো।"

৫ম অ, ৬ গ।

কলঙ্কাবস্থায়ও সন্তানরক্ষার আগ্রহে তাহার মাতৃত্ব ও মাতৃস্নেহ প্রকাশ পায়—

"আমার ছেলের মুখ-দেখে মনে হয়, আত্মহত্যা ক'রে কি মহাপাতকই কর্‌তে বসেছিলুম। দিনের বেলায় তুমি নিয়ে যাও, আমি কতক্ষণে রাত হবে, কতক্ষণে বাছাকে আবার দেখ্‌বো, ব'সে ভাবি।"

৫ম অ, ৬ গ।

অবশেষে তাহার অনুতাপে ও ভগবদ্‌চরণে আত্ম-সমর্পণে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পরিসমাপ্ত হয়—"আমার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দাও, আমায় মহাপাপ হ'তে উদ্ধার করো, তুমি কলঙ্কভঞ্জন, তোমার নামের সার্থকতা করো—৪র্থ অঙ্ক, ৫ম গ।"

শেষ দৃশ্যে এই কোমল-চিত্ত, কৃতজ্ঞ-হৃদয়, স্নেহময়ী রমণীর পিতৃহস্তে ছুরিকাঘাত এক ভীষণ দৃশ্য! নীতিপরায়ণ স্নেহশীল পিতা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে উন্মাদ-গ্রস্থ, তাহারই হস্তে কন্যাহত্যা tragedyর পরকাষ্ঠা এবং সেই পিতার শেষ আর্ত্তনাদে——

"গঙ্গাজল মুখে নে, যদি বেঁচে থাকিস্ শোন্, আমি তোরে মাপ করেছি। শুনে যা, ভুবন ব'লে ডাক্‌ছি শোন্—ভুবন, আমার ভুবন, মা আমার, না শুন্‌তে পেলিনে, চল্ তোর সঙ্গে যাই, তুই ছেলে মানুষ একলা যেতে পার্‌বি নি।"

——তাহার প্রতি পিতার গভীর স্নেহ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছ্বসিত দেখিতে পাই। এই হত্যাদৃশ্যেও 'বলিদানের' হিরন্ময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যার ন্যায় ভীতি সঞ্চার হয়। কিন্তু মর্ম্মভেদী হইলেও এই দৃশ্যে নাট্যকারের অন্তর্দ্দৃষ্টি উপলব্ধি হয়। ভুবনের মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধানই মৃত্যুতে। একদিকে যেমন সন্তানের প্রতি তাহার ঐকান্তিক স্নেহ, মমতা ও আকর্ষণ; অন্যদিকে আবার সেই সন্তানের জন্মদাতার বন্ধুদ্রোহিতা ও কৃতঘ্ন ব্যবহারে তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ও আক্রোশ। স্নেহ উদ্দীপ্ত হইতে না হইতেই প্রকাশের প্রতিমূর্ত্তি মনে পড়িয়া তথনই তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি উদ্দীপিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রকাশের দুর্ব্যবহারেই তাহাকে বরাবর অনুতাপ করিতে হইয়াছে—

"আমার ছেলের মমতায় ম'র্‌তে ভয় হয়েছিল, সে পাপ মমতা, সে আমার স্বামীর ছেলে নয়, প্রকাশের ছেলে।"

ঘটনা পরম্পরায় ট্রাজিডির সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডে মনে হয় পতিতা পুত্রবতী বিধবাকে হত্যা করিয়া সমাজের জঞ্জাল দূর করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য নহে, নাশ না করিয়া রক্ষা করিবার জন্যই হরমণির আশ্রম প্রতিষ্ঠা; বিশেষতঃ ভুবনের সন্তানতো হরমণির কাছেই প্রতিপালিত হইতেছিল। কিন্তু বিধবাহৃদয়ে যেখানে এইরূপ স্নেহ ও প্রতিহিংসা, মমতা ও বিদ্বেষ, দয়া ও আক্রোশ প্রভৃতি বিরোধীয় ভাবের সংঘর্ষ, সেইখানে এত বড় উদার বিরাট্ হৃদয় আর কতক্ষণ টিকিতে পারে? এইরূপ কোমলহৃদয়া হৃতসর্ব্বস্বা মহিলার মৃত্যুতে সমস্ত বিরুদ্ধ বৃত্তির সমাধান হওয়া সম্ভব, তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রসন্নকুমার বলিতেছেন—

"মৃত্যুতে শান্তি হয়, কন্যাকে শান্তি দেবার জন্য হত্যা করেছি।" ৫ম অ, ৬গ।

হরমণির ন্যায় মহদাশ্রয়েও ক্রমে প্রাণের শান্তি আসিতে পারে। উন্মাদগ্রস্ত নীতিবান্ পিতা নির্ম্মলার ব্রহ্মচর্য্য ও অথবা নীতিরক্ষাহেতু বিবাহ-জীবন—দুইটীর একটীই ভুবনে না দেখিতে পাইয়া তৃতীয় পন্থা—ব্যভিচারিতায়-জীবন যাপন—অসহনীয় মনে করিয়া স্বহস্তে কন্যার হত্যা-সাধন করিয়াছেন। চতুর্থ ও প্রকৃষ্ট উপায়—হরমণির আদর্শ—বোধ হয়

তাঁহার কল্পনায়ও আসে নাই। যাহাহউক, মানুষ দুর্ব্বল আমরা জানি, তাই নির্ম্মলার সহিত করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি—

"দীনবন্ধু, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আশ্রয় দিও। কলঙ্কিনীও তোমার শরণাগত, করুণা-নয়নে দেখো।"

৫। আদর্শ বিধবা

আদর্শ ব্রহ্মচারিণী পূতচরিত্রা অন্নপূর্ণা, নির্ম্মলা ও বিরজা-চরিত্র যেরূপ শিক্ষাপ্রদ, তেমনি বৈচিত্র্যময়। কালীকিঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ **অন্নপূর্ণা** ("মায়াবসান") তাঁহার সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধান করেন, দেবরদিগকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাহার পেটের সন্তান নাই, তাহারাই পেটের সন্তানতুল্য। একটী অতিথিশালাও আছে, কাঙ্গাল গরীব তাহাতে খাইতে পায়। তিনি করুণাময়ী, স্নেহময়ী ও মমতাময়ী। একান্নবর্ত্তী একটা বৃহৎ সংসারকে বাসুকির ন্যায় মাথায় করিয়া ধারণ করিয়া বহিতেন। তাহার সম্বন্ধে রঙ্গিনী বলিতেছে "মা, তোমার দেবদৃষ্টিতে পাপ ভস্ম হয়, তোমার দর্শনে মহাপাপীর পাপ যায়, দরিদ্রের অন্ন হয়, মৃত্যুশয্যায় প্রাণ পায়; আমার রাত্রিদিন প্রার্থনা, তোমার মত নির্ম্মল প্রকৃতি আমার হয়"। ৩য় অ, ৩ গ।

নাট্যকার দেখাইয়াছেন:—সংসারের হিতকারিণী এরূপ আদর্শ মহিলার দ্বারাও সংসারে পরিণামে অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে,—অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ অনুদার ধারণা পোষণে! কালীকিঙ্করের তাড়িত পরীক্ষা, মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ, ও মৃতশিশু সংরক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক অনুশীলন সমূহকে তিনি সন্দিগ্ধনেত্রে দেখিয়া মনে করেন—

"আইবুড়ো মানুষ, কিছু ত দৃষ্টিফিষ্টি লাগেনি?"

সকলেরই ধারণা কালীকিঙ্কর ভূতাবিষ্ট। পাছে শ্বশুরকে 'এসাইলামে' লইয়া যায়, তিনি কুচক্রী লোকের অনুরোধ ও উপদেশে তাহাকে পোর্টের সহিত বিষ মিশাইয়া দেন। ইহার ফল দেখিয়া পরে এতই অনুতপ্ত হন যে, শান্তিরাম তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিলে তিনি স্পষ্ট তাহাকে বলেন—

"আমি মহাপাতকী! আমার পুলিষ হওয়াই উচিত! বাপের অধিক খুড়শ্বশুরকে স্বহস্তে বিষ খাইয়েছি·········যে শত্রুকে বিষ দেয়, রাজার সুনিয়মে তার দণ্ড হয়; আমি আমার পরম মিত্রকে স্বহস্তে বিষ খাইয়েছি।······এ মহাপাপের যদি এখানে সাজা হয়ে ফুরোয়, তা হ'লেও আমি মঙ্গল জান্‌বো।"

ইনেস্পেকটার তাহাকে ধরিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলে তাহাকেও কর্ত্তব্য সাধনে পরামর্শ দিয়া নির্ভীকতার পরিচয় দেন।

অন্নপূর্ণা অতীব সরলহৃদয়া ও পরোপকারনিরতা। সাতকড়ি উন্মাদ কালীকিঙ্করের লাঠির ভয়ে আশ্রয় চাহিতেছে, অন্নপূর্ণা তাহাকে আপনার ঘরে আশ্রয় দিয়াছেন। এই সূত্র ধরিয়া দেবরেরা যে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়া তাহার খোরাক বন্ধ করিবেন, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার পর হইতেই তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইলেন। শ্বশুরের জন্য মর্ম্মপীড়া ও নিজের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কারোপে, যেই দেহ ও মন ইতিপূর্ব্বে তিনি সংসারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এখন সম্পূর্ণরূপে তাহা স্বামীর ধ্যানে সমর্পন করিলেন। তিনি বুঝিলেন—

"আমার স্বামী নাই, তত্রাচ আমার ব'ল্‌বার জিনিষ আছে, আমার গহনা, আমাদের বাড়ী, আমার খোরাকী, আমাদের ঘর। আমার আমার করেই দিন কাটাচ্ছি, তাঁর ধ্যান ত করিনাই।"

৩য় অঙ্ক, ৩ গ।

গৃহ ছাড়িয়া তিনি পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন (তপস্বিনীর বনেই স্থান) পতিধ্যান ব্রতে একদিন স্বপ্নালোকে দেখিলেন—

"স্বয়ং বিষ্ণু তাহার শিয়রে পতিরূপে বসিয়াছেন, বিষ্ণুদূতেরা গান করিতেছেন, এবং তিনিও তাহার হৃদয়-চন্দ্রে মিশিয়া গেলেন।"

(৫ম অঙ্ক, ৩ গ)।

অন্নপূর্ণার সংসার-মায়ার অবসান হইল। বৈধব্যাচারে আদর্শরূপা ও পতিগতপ্রাণা হইলেই হিন্দু বিধবার জীবন সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভ করেনা।—কারণ সে সংসারে বাস করে এবং সংসারের একজন প্রধান পরিজন—গৃহসংসারের সহিত তাহার বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। এইজন্য তাহাকে

সংসারে আদর্শ পরিজন ও মঙ্গল বিধাত্রী হইতে হইলে সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা উচিত নতুবা তাহার দ্বারাও সংসার ধ্বংসমুখে কবলিত হইতে পারে—নাট্যকার অন্নপূর্ণার চরিত্র-প্রসঙ্গে তাহাও দেখাইয়াছেন।

দ্বিতীয় বিধবা প্রসন্নকুমারের পুত্রবধূ **নির্ম্মলা** ("শাস্তি কি শান্তি")। বয়সে অন্নপূর্ণার ন্যায় প্রবীণা না হইলেও অধিকতর বুদ্ধিমতী, মার্জ্জিতরুচি ও যুগধর্ম্মের অধিকতর উপযোগিনী। প্রসন্ন কুমার বলিতেছেন "মা যদিচ তুমি বালিকা, কিন্তু দেখ্‌ছি বুদ্ধিতে আমার মায়ের মত।" অন্নপূর্ণা দেবর দিগকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, নির্ম্মলাও বলিতেছেন "আমি বাড়ীর বড় বউ, আমার সংসার·········আমি এখন সংসার কর্‌বো, আমি ঘরকন্না বজায় কর্‌বো, দেবরকে দেখবো, আইবুড়ো ননদকে দেখ্‌বো, তোমাদের দেখ্‌বো, আমি তোমাদের বেটাবউ একত্রে"। পতিব্রতায় অন্নপূর্ণা যেমন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, নির্ম্মলাও বলিতেছে "আমার স্বামী প্রত্যক্ষ নন্, তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমি আমার ইষ্টদেবতার সেবা কি ক'রে ক'রতে হয়, তাঁর ধ্যান করে জানবো।"

অন্নপূর্ণা ও নির্ম্মলা উভয়েই দয়ার্দ্রহৃদয়া ও সেবানিরতা। অন্নপূর্ণা বিন্দুর অসুখের সময় শুচি অশুচি জ্ঞান না করিয়া তাহার সেবা করিতেন, আর নির্ম্মলাও ননদ প্রমদাকে (জাতিভ্রষ্ট ঘেঁচির পত্নী) 'আমি সগ্‌রি নেব' বলিয়া সহানুভূতি দেখাইত। তবে নির্ম্মলা অধিকতর উদার মতানুবর্ত্তিনী, আর অন্নপূর্ণা কতকটা কুসংস্কারে অদূরদর্শিনী।

অন্নপূর্ণা লেখাপড়া জানিতেন না (তাহার চিঠিপত্র রঙ্গিনী পড়িয়া দিত ৩য় অঙ্ক, ৩গ) আর নির্ম্মলা বিদুষী ছিলেন (৪ অঙ্ক, ৩ গ)। প্রসন্নকুমারের সহিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তিতর্ক সে উত্থাপন করে তাহা সাধারণ মহিলার মুখে প্রত্যাশা করা যায় না।

আবার তাহার মতের বিরুদ্ধে প্রসন্নকুমার মেয়ের বিবাহ দিয়া পরে যখন অনুতাপ করিতেছেন "শুভক্ষণে মেয়ের দুঃখে দুঃখিত হয়ে আবার বে দিয়েছিলুম, কি যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা!" নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কৃতকর্ম্মের জন্য তিরস্কার না করিয়া সহানুভূতির সহিত বলেন—"বাবা, এ তো রাগের

সময় নয়, যন্ত্রণা ব'লে আর কি হ'বে, আমাদের হ'য়ে কর্ম্মভোগ কে ক'রবে? জামায়ের উপর রাগ ক'রে মেয়েকে কোথায় ভাসিয়ে দেবে।"

৩য় অঙ্ক, ২গ।

সমস্ত বিষয়েই সতর্কতাবলম্বন করিত বলিয়া তাহাকে কখনও অনুতাপ করিতে হয় নাই, আর অন্নপূর্ণার ত্রুটীতে সংসারে বিষম অনর্থ সংঘটিত হয়। "মা আমি এর সঙ্গে কথা কইলে দোষ হবে?" বলিয়া শাশুড়ীর নিকট হইতে হরমণির সঙ্গে কথা বলিবার অনুমতি-ভিক্ষা, গঙ্গার ঘাটে কুচক্রী কামুকের চিঠি পাইয়া হরমণির পরামর্শ গ্রহণ, এবং পিতাকে ডাকিয়া সমস্ত কথা তাহার নিকট প্রকাশ করায় নির্ম্মলার বুদ্ধির প্রখরতা ও সতর্কতা উভয়ই প্রকাশ পায়। এই সতর্কতা অন্নপূর্ণার ছিল না বটে, কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নহে। নির্ম্মলার শাশুড়ীর সুশিক্ষা ছিল, পিতৃতুল্য শ্বশুর ছিল; সমবেদনাময়ী হরমণি ছিল, এবং পরামর্শ দাতা পিতা ছিলেন, কিন্তু অন্নপূর্ণার মাথার উপরে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না, শ্বশুরও সর্ব্বদা বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত, দেবররা বলে 'কাকা ক্ষেপেছেন,' চাটুর্য্যেও তাহাতে সায় দেয়, অনুগত বিশ্বস্ত হলধরও তাহাই মনে করে। দশচক্রে ভগবান ভূত। তবে সোণা আগুণে পুড়িয়া খাঁটি হয়। এই অগ্নিপরীক্ষার পর অন্নপূর্ণা চরিত্রের এত দীপ্তি বাড়ে যে, ইন্‌স্পেক্টারকে নির্ম্মলা যেরূপ নির্ভীকভাবে প্রসন্নকুমারের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে অনুরোধ করে, ততোধিক নির্ভীকভাবে অন্নপূর্ণা ইন্‌স্পেক্টারকে বলেন—

"দিনু, তুমি মনে জ্ঞানে জান, আমায় ধরতে এসেছ, তবে কেন যার নেমক খাও তার কাজ কচ্ছোনা?"

এতদ্ব্যতীত অন্নপূর্ণার মৃত্যু সাধ্বীর পক্ষে অতি শ্রেষ্ঠ মৃত্যু।

"গৃহলক্ষ্মীর" **বিরজা** বর্ষীয়সী বিধবা। নাট্যকার তাঁহার আদর্শেই পুস্তকের নামকরণ করিয়াছেন। তাহার সংসার-পরিচালনা-দক্ষতা সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"বাসুকির মতন সংসার মাথায় ক'রে আছ, খাওয়াচ্ছ, দিচ্ছ—লোকজনকে প্রতিপালন কচ্ছ;"

অন্যত্র বিরজা বলিতেছেন—

"আমি আর কার সংসারে বাঁদীগিরি কচ্ছি? আমি হাতে তুলে দিলে তবে তোমরা খেতে পাও।"

সংসারের এক রকম সমস্ত ভারই (ভাঁড়ার ঘরের চাবি হইতে উপেনকে সৎপরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি সবই) তাঁহার হাতে। বাড়ীর কর্ত্তা উপেনের তিনি দক্ষিণ হস্ত।

শৈলেন্দ্র ও মন্মথকেও পেটের সন্তানের ন্যায় পালন করেন। মমতা ও মাতৃত্বে তিনি অতুলনীয়া। শৈলেন্দ্র সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"মেজবউ, তোরে ব'লব কি, ওকে মাই দিয়ে আমার বাঁজা মাইয়ে দুধ এসেছে……শৈলেন আমার আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পার্ত না, দাদা বক্‌লে আমার আঁচলে মুখ লুকিয়ে এসে কাঁদ্‌ত—যে দিন আমার দেহ প্রাণে ভিন্ন হবে, সে দিন শৈলেন আমার প্রাণ থেকে যাবে কিনা সন্দেহ।"

তাঁহার স্নেহে মন্মথ (উপেন্দ্রের শ্যালীপুত্র) বলিতেছে—

"বড় মা, তুমি যে আমার মা, তাকি আমি আজ জানি? আমার মা বেঁচে থাক্‌লে এত স্নেহ ক'রতেন কিনা জানিনা, আমার মনে হয় মা ভগবতীর মূর্ত্তি তোমার মূর্ত্তি।"

নির্ম্মলা যেরূপ দুর্গানাম জপে শান্তি পাইতেন, দীনবন্ধুর নাম করিতেন, অন্নপূর্ণা ঠাকুরকে তুলসী দিতেন এবং পরে যেরূপ ভগবানে মনপ্রাণ দিয়াছিলেন, বিরজাও সেইরূপ অতিশয় ভক্তিমতী। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—

"যে ধর্ম্মপথে থাকে, ধর্ম্ম তার রাত দুপুরে অন্ন জোটান।" তিনি জানিতেন—

"দেউজীরা তাহাদের বিষয় সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছিল কিন্তু রাধাবল্লভজী আবার পাইয়ে দিয়েছেন।" ৪ অ, ৪ গ।

তিনি তীর্থধর্ম্মাদি করেন এবং ঠাকুরসেবায় তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। ['মালা ফিরিয়েই শোব,' 'ঠাকুর সেবাটা চল্‌বে,' 'রাধাবল্লভজী কি এমনি ক'র্‌বেন,' 'আমি বৃন্দাবনে ব'সে খাই,' 'ঠাকুর দর্শন করি,' 'কাশীনাথ অপরাধ নিওনা' প্রভৃতি কথায় সে নিদর্শন পাওয়া যায়।]

একান্নবর্ত্তী পরিবারে যোগবন্ধন-রক্ষণে যে গাম্ভীর্য্য, সতর্কতা, ধৈর্য্য, সমদর্শিতা, অভিজ্ঞতা ও সহৃদয়তার আবশ্যক, একাধারে সে সমস্তগুণ থাকায় বিরজার সংসার-তরণী কখনও বিপথে চালিত হয় নাই। নীরদের দুষ্টবুদ্ধি ও শৈলেন্দ্রের কুসঙ্গপ্রিয়তার ফলে মামলা মোকদ্দমায় সংসার যখন বিপর্য্যস্ত, উপেন্দ্রও নানা বিপর্য্যয়ে বিকৃতমস্তিষ্ক, তখন দৃঢ়হস্তে কর্ণ ধারণ করিয়া ছিলেন—বিরজা। ["দশ বছর হ'ল আমার এই দশা হয়েছে……পেটভাতায় এদের সংসারে বাঁদীগিরি করছি। এখন কড়ায় গণ্ডায় আমার ভাগের ভাগ বুঝে নেব।" ৪র্থ অ, ৮ গ।] তাই সঙ্কটে তরী বাঁচিয়া গেল, বিষয় রক্ষা পাইল।

তারপর স্নেহ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা। শৈলেনও মন্মথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাহাদের সম্বন্ধেত কথাই নাই; সরোজিনীকে দেখিতে সতীতীর্থে গিয়া উপস্থিত হন এবং অভিমানী শৈলেনকে আবার ফিরাইয়া আনেন। বলেন—"শৈলেনকে? আমি যখন এসেছি, কান ধ'রে নিয়ে যাব।" নীরদ কর্ত্তৃক অপমানিত মন্মথকেও আবার মাতৃ-স্নেহে সান্ত্বনা দিতেছেন:—

"খবরদার যেতে পাবি নি, তুই কেন অভিমান করেছিস? তুই কি ওদের খাস্, না ওদের বাড়ীতে থাকিস্? আমি তোর মা! তুই আমার কাছে থাকিস্। আর রাগ ক'রে যে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিস্, আমি বুড়ো মানুষ, যদি ব্যামো স্যামো হয়, কে দেখ্‌বে? ওদের তো সব ভাগ-বখ্‌রা হ'তে চল্লো। আমায় দেখবে শুনবে কে? নে-নে, তুই রাগ করিস্ নি………………………দেখিস্ আমার দিব্যি কোথাও যাস্‌নি"………২য় অ, ৫ গ।

কিন্তু এদিকে আবার দেবরপুত্র কুচক্রী নীরদও বিপদাপন্ন হইলে সর্ব্বস্ব দিয়াও—তাহার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ["আমায় নিয়ে চল, আমি জামিন হ'য়ে ছোঁড়াকে খালাস ক'রে আনি।…যত টাকা লাগে যাও, যা ক'রতে হয়, নীরেকে খালাস ক'রে আন"]। তিনি যে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন তাহা বিষয় রক্ষার জন্য, রাধাবল্লভজীর সেবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য। তরঙ্গিণীর সঙ্গেও কলহ করিতে হইয়াছিল——

আমিও জলে ঝাঁপ দিব, আমার মান অপমান কি? ও যেখানে সেই আমার বাড়ী।"

সর্ব্ববিষয়েই স্বামীর অনুবর্ত্তিনী বলিয়া আদর্শসতী চরিত্রের স্বতন্ত্র স্বাধীন অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রতি সতী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। যখন হরিশ কৃতঘ্ন মোহিনীর চক্রান্তে নিরুদ্দেশ, রাস্তায় পাগলের ন্যায় ঘুরিতেছে, বনের পশুর মত লুকাইয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে ধরিবার জন্য সশস্ত্র পুলিস চতুর্দ্দিকে, মোহিনীর একমাত্র কন্যা হেমাঙ্গিনী ভয়ানক পীড়িতা, হৈমবতী. সুশীলা ও নীলমাধবকে না দেখিলে বালিকা সুস্থ হইবেনা, ধরণী ডাক্তার তাঁহাকে হেমাঙ্গিনীর কাছে যাইয়া তাহার প্রাণদান দিতে বলিতেছে, তখন তাঁহার পক্ষে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। একদিকে দুষ্টের শত্রুতায় স্বামীর দুরবস্থা, আর একদিকে সেই দুষ্টেরই একমাত্র নিরীহা কন্যার প্রাণদান! এই সমস্যায় মহত্ত্বেরই জয় হইল। নাট্যকার ধরণী ডাক্তারের মুখে বলিতেছেন—"বিপদ বড় নয়, মহত্ত্বই বড়, বিপদের মৃত্যুর পর অধিকার নাই, মহত্ত্ব চিরদিনের সাথী।"

হৈমবতী সুশীলা ও নীলমাধব সহ শত্রুর পুরীতেই আসিলেন। তিনি বুঝিলেন ক্ষমাই আবশ্যক, "নতুবা মধুসূদনকে ডাক্.ত পারিনি, আমার মন ভারী।"

হরিশ ইহা জানিতে পারিয়া এত সন্দিগ্ধ হয়েন যে একটা ভয়ানক অনর্থের সূচনা হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু সুশীলার স্বামীর ক্ষিপ্রকারিতায় তাহা হয় নাই। হৈমবতীর উদারতায় মোহিনীর ন্যায় চণ্ডালের হৃদয়ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া উঠে ও আনন্দোচ্ছাস বাহির হয়;—

"দেখনহাসি, তোমার পবিত্র মন ক্রোধ স্পর্শ ক'র্‌তে পারেনা, পৃথিবীতে দেবকন্যারা বাস করে, এ আমার স্বপ্নেও জ্ঞান ছিল না।"

"বলিদানের" **সরস্বতীও** সর্ব্ববিষয়েই স্বামীর অনুগামিনী। দুঃখে, বিপদে, অপমানে তাঁহার সহিষ্ণুতা হিন্দুগৃহিণীর অনুরূপ। যদিচ হিরণের শোক তিনি ভুলিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন কিরণের স্বামী ফিরিয়াছে, কিশোরও এই মাত্র জ্যোতির পাণিগ্রহণ করিয়াছে, ভাবনার

প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু যে স্বামী এতকষ্ট পাইয়াও সুদিনের আগমনে "মান যাওয়ায়, সত্য ভঙ্গ হওয়ায়" আজ চরমসথার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সে শেলাঘাত তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। জীবনে মরণে স্বামীর সহিত একাত্মবোধ হিন্দুরমণীর শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা—সরস্বতীর সহমরণে (Heart এর action stopped. Artery ছিঁড়ে 'গেছে) নাট্যকার সেই শ্রেষ্ঠ অবস্থা দেখাইয়াছেন॥ তাই সরস্বতী বলিতেছেন।—

"কারো কথা সইতে পারো না, বড় অভিমানে চলে গিয়েছ! আমার ভাবনাই ভেবেছ! আমি মাথা গুঁজে থাক্‌বো, তাই বাড়ী ঠিক করেছ! আমার পোড়া পেটের জন্য লোকের কাছে মাথা হেঁট করে এয়েছ, তাই আপনাকে বলিদান দিয়েছ·········আমায় ছেড়ে তো একদিনও থাকৃতে পারো না? আজ কেন ছেড়ে চলে যাচ্ছ? আমায় সঙ্গে নাও।"

এবং "কর্ত্তা আমায় ডাক্‌ছে" বলিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

পার্ব্বতী ও (শাস্তি কি শান্তি) সমস্ত অবস্থায়ই স্বামীগতপ্রাণা ——স্বামীকে সান্ত্বনা দেন, স্বামীর বিপদে সহানুভূতি দেখান। পুত্র ও জামাতার শোকে তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া প্রসন্নকুমারই স্তম্ভিত; তিনি নির্ম্মলাকে যখন বলিতেছেন "তোমার শাশুড়ী! বোধ হয় লোহা দিয়ে কে ওকে ফিরে গড়েছে, নইলে বুকে পাথর বেঁধে কি করে দাঁড়িয়েছে!" তাহাতে পার্ব্বতী উত্তর করেন ;—

"ঘর সংসার কি ভাসিয়ে দেব? এখনও তো ছেলেটী রয়েছে! যারা যাবার গেছে,—যারা রয়েছে তাদের তো তোমায় দেখতে হবে?"

২য় অ, ৫ গ।

জ্ঞানদা ও সরস্বতীর ন্যায়ই এই চরিত্র স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিলাভ করিলেও পার্ব্বতী চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব বড় স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। জ্ঞানদা ও সরস্বতী দারিদ্র্যের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছিলেন, তবে এত দুঃখেও তাঁহাদের হৃদয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতে হয় নাই, স্বামীর সহিত তাঁহারাও দুঃখকে জীবনের সঙ্গীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পার্ব্বতীকে ভাবপ্রবণ স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থ নিজ

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করে "প্রাণ দিয়ে প্রাণ কিনো, দেহ কিনোনা, প্রাণ পেলে প্রাণ জুড়োয়, দেহ পেলে নয়। সুখ চাওতো সুখী ক'রো। নইলে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ে। দরদী দরদ চায়, প্রাণ দিয়ে প্রাণ চায়, তার কাছে মাটীর দেহের কদর নাই" ৫ অঙ্ক, ৭ গ।

সেই 'জোবির' সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ সুপ্রত্যাশিত কিনা ঠিক বলা যায় না——

চরম দিন আজ উদয় হয়েছে——
আলো ক'রে আগে চল, পাগলিনী যাবে পাছে।

কিন্তু নাট্যকার এই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন "শান্তি কি শান্তিতে।" "মায়াবসানে" যিনি কালীকিঙ্করের অশান্ত প্রাণে আত্মত্যাগরূপ শান্তি দিয়াছেন, যে 'আত্মবিসর্জ্জনে' রঙ্গলাল ও গঙ্গাবাই "ভ্রান্তিতে" সেবাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে, যে আত্মত্যাগবলে "তপোবলে" তপোনিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রেরও জ্বালা দূর হয়, সেই ভাবস্রষ্টা নাট্যকারের লেখনীতে জোবির কার্য্য কিছুতেই পরিসমাপ্ত রহিতে পারেনা। তাই সে কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন **হরমণি**।

জোবির বরং স্বামী ছিল, সেই আনন্দেই সে উন্মত্ত। হরমণির বিদেশগত স্বামী ভরাডুবি হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন রটনা করিয়া স্বার্থপর দুশ্চরিত্র প্রতিবাসী তাঁহার চরিত্র নষ্ট করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াও যখন সফলকাম হয়না, তখন সেই দুরাত্মা সতীর পবিত্র নামে নানাপ্রকার মিথ্যাসংবাদ রটনা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেনা। জোবিকে বরং সকলেই আদর যত্ন করিত, কিন্তু হরমণির মিথ্যা কলঙ্কের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাহাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখিত। এই অবস্থায় বাঙ্গালী রমণীর গ্লানিময় দুঃসহ জীবন বহন অথবা উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন ভিন্ন আর কি কল্পনায় আসিতে পারে? হরমণি তাই শীতল হইবার জন্য জাহ্নবী বক্ষে আশ্রয় লইতে ছুটিয়া গেলেন কিন্তু নাট্যকার তাঁহার বিনাশ সাধন না করিয়া আমাদের আশ্রয়হীন স্ত্রীলোকগণের এক নূতন লক্ষ্য স্থির করিয়া এক উজ্জ্বল পবিত্র ও সেবারত ভিখারিণীচরিত্রসৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার ব্রত হইল "সেবা ও

পরহিত সাধন," এবং তাহারই স্পর্শে দুঃখিনী অনাথা রমণী বুঝিল তাহার জীবন নিষ্ফল নহে। তাই, "কাজ ফুরিয়েছে" বলিয়া যে জোবি মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, হরমণি রূপে সে আবার বলিতেছে—

"ভবে কাজ রয়েছে, কাজ ফেলে গেলে,
তার কাছে যাব কি ব'লে।
সুধান যদি গুণনিধি, 'কাজ কারে দিয়ে এলে।'

* * * *

কায়মনে রই সেবায় রত, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ঠেলে।

এই কাজ ভগবানে অর্পিত বলিয়াই হরমণি বলিতেছেন "আমার কাজ নয় মা, ভগবানের কাজ।" জোবি যেমন কিরণকে উপদেশ দেয়, সরস্বতীকে সান্ত্বনা দেয়, হরমণিও সেইরূপ নির্ম্মলা ভুবন ও প্রমদাকে উপদেশ দেন এবং প্রসন্নকুমার ও পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা দান করেন।

হরমণির অবশেষে স্বামীর দর্শন হইল কিন্তু উভয়ে যে পথে চলিলেন তাহা অতি নির্ম্মল, শান্তিময়। তাঁহার বিস্তারিত আলোচনা বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

৮। রঙ্গিণী ও ফুলী

"মায়াবসানের" রঙ্গিণী ও "গৃহলক্ষ্মীর" ফুলী চরিত্রে সৌসাদৃশ্য আছে, আবার যথেষ্ট বৈষম্যও দৃষ্ট হয়।

উভয়েই বাল্যদশা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কালীকিঙ্কর রঙ্গিণীকে বলিতেছে, "তুমি আর আমার কাছে এসো না, তুমি এখন যুবতী"। আর প্রথম অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্কে ফুলীর মাতা মণি কীর্ত্তনীর কন্যার সহিত নির্লজ্জ কুৎসিত প্রস্তাবে অনুমিত হয় ফুলিরও যৌবন আগত।

উভয়েই হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রঙ্গিণীর মাতা বিন্দুবৈষ্ণবী বলিতেছে "আমি আমার নির্ম্মল কন্যার নামে কলঙ্ক দিয়েছি, লোকে তারে বেশ্যার দুহিতা বলে।" ফুলীও চরিত্রহীনা কীর্ত্তনওয়ালীর মেয়ে, তাহার মা মেয়ের নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিতে লজ্জাবোধ করে না।

শৈলেন্দ্রও মত্ততাবস্থায় উপেন্দ্রকে বলিতেছে "ফুলী বাড়ীতে আস্‌তে পারে সে বুঝি শড়দ'র মা-ঠাকরুণ"—

১ম অঙ্ক, ৬ গ।

উভয়েই অবিবাহিতা, এবং উভয়েই মহানুভব প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সৎশিক্ষা ও আদর্শের প্রভাবে হৃদয়ের উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে—রঙ্গিণী কালীকিঙ্করের, আর ফুলী মন্মথের।

সত্যনিষ্ঠ কালীকিঙ্করের উচ্চাদর্শের কথা রঙ্গিণী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিতেছে"—

"আমি একজন দেবতার নিকট উপদিষ্ট, তিনি আমার গুরু ইষ্টদেবতা"।

রঙ্গিণী এই শিক্ষাগুণে অনেক উচ্চতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছে, উচ্চ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মে তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। সে হলধরকে বলিতেছে—

"ছোট বাবু তোমায় বারবার উপদেশ দিয়েছেন 'তুমি কারুর সাজা দেবার কর্ত্তা নও'। বিনাপরাধে কেউ সাজা পাবে, এ আমি কখনও দেখবো না। ছোটবাবুর মানা, ছোটবাবু আমাদের ইষ্ট, আমি তাঁর কথা কখনও ঠেল্‌বো না। তুমি যদি বাঁচিয়ে দাও, আমি আদালতে সব সত্য ব'লে খালাস্ কর্‌বো"।

অন্যত্র বলিতেছে—

"আমার অন্তরে ভগবান বল্‌ছেন, কৃতজ্ঞতাবলে সুমেরু হেলে যাবে, সাগর জলহীন হবে, তুমি বল্‌ছো বিপদ্ সাগর, আমি গোষ্পদ জ্ঞান কর্‌ছি"।

আবার বলিতেছে—

"আজ যে কাটালো, কালও সেই কাটাবে, মানীর মান ভগবান রাখবেন।"

পুনঃ বলিতেছে "আমি মিথ্যা শিখিনে, আমি শিখেছি, সত্য ভগবানের স্বরূপ, আমি বার বার পরীক্ষা ক'রে দেখেছি সরলান্তঃকরণে সরল বিশ্বাস কখনও মিথ্যা হয় না।"

যেমন চরিত্রোন্নতি সাধিত হইয়াছে, তেমনি বৈজ্ঞানিক বিষয়েও তাহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। বিন্দু বলিতেছে—"আমাদের রঙ্গি ছোট কর্ত্তা বাবুর কাছে শিখে শিখে যেত, একদিন জলে একটা কি ফেলে দিলে, দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো"।

কালীকিঙ্করও বলিতেছেন "যে দিন কোন নূতন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট ক'র্‌বো, পাঁচ জনের সঙ্গে এসে দেখো। আর যদি কোন ইনষ্ট্রুমেণ্টের প্রয়োজন হয় লিখে পাঠিয়ো, আমি পাঠিয়ে দেবো।"

ফুলী যদিও রঙ্গিণীর মত এরূপ উচ্চ শিক্ষা পায় নাই, তথাপি মন্মথের নিকট নূতন নূতন ফুল 'তৈরি' করিতে শিখিত ও ভাল ভাল গান শিখিয়া মনের আনন্দে গাহিয়া বেড়াইত। মন্মথ বলিতেছে—

"এ দিকে ও চমৎকার বোঝে, চমৎকার শেখে।" তবে ফুলী বিদ্যাবত্তায় অধিকদূর অগ্রসর না হইলেও মন্মথের শিক্ষাগুণে যথেষ্ট কার্য্যপটুতা লাভ করিয়াছে। মন্মথ যখন বলিতেছে—

"তুই অমন বুদ্ধি করিস্ তো আমার কাছে আসিস্ নি।"

ফুলী—অমন বুদ্ধিও ক'রবো, তোমার কাজ ক'রেও বেড়াব।

মন্মথ—আর তোকে আমার কাজ কর্‌তে হবে না, দূর হ—

ফুলী—দূর বল্লেই কি দূর হব? তা হব না। ২য় অঙ্ক. ৪ গ।

এখন কার্য্যপটুতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। জনৈক বৃদ্ধাকে লইয়া মন্মথ আসিয়া ফুলীকে বলিতেছে—

"এই যে ফুলী! দ্যাখ্—এই বুড়ীটা গাড়ী চাপা পড়েছে। ডান হাতটা একেবারে গেছে। একে হস্‌পিটেলে নিয়ে যেতে হবে। তুই একে নিয়ে ঐ গাছতলায় ব'স্, আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী নিয়ে আসি।" ১ম অঙ্ক, ৫ গ।

রঙ্গিনী ও ফুলীর মধ্যে অবস্থার এত পার্থক্য যে নানারূপ প্রলোভন ও দ্বন্দ্বসংঘর্ষে ফুলী-চরিত্র অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, আর রঙ্গিণী নিরবচ্ছিন্ন নিষ্কণ্টক পথে বিচরণ করিয়া সকলের সমবেত প্রভাববলে আপনার চরিত্র-মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রঙ্গিণীর মা চরিত্রবতী; অন্তঃপুরে অভিভাবিকা অন্নপূর্ণার আদর্শ, বাহিরে ঋষি কালীকিঙ্করের

আদর্শ। রঙ্গিণীর মাতা বিন্দুকে কোন প্রলোভনই বিচলিত করিতে পারে নাই। মেয়ের কাছে সে তাহার প্রলোভন জয়ের কথা বলিতেছে ঃ—

"পর পুরুষ ছুঁয়েছে, মেরেছে, কাম্‌ড়েছে, আঁচড়েছে, কিন্তু সূর্য্যদেব সাক্ষী, আমি বহু কষ্টে ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে পালিয়ে এসেছি, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় কি না জানি না, কিন্তু এ কথা তুমি বিশ্বাস করো যে, তুমি অসতীর গর্ভে জন্মাও নি।"

রঙ্গিণীও মাতার চরিত্রের সম্বন্ধে স্পষ্ট জানিয়া বলিতেছে "আমিও সূর্য্যদেবকে সাক্ষী ক'রে বলছি যে, আমার মা অসতী, এ কথা আমার ধারণা হয় না; আমার কথা ফুটতে ফুটতে কে আমায় দেবতার স্তব শিখিয়েছিল, কে আমায় সদুপদেশ দিয়েছিল, কে আমায় ছোটবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল, বড় বৌমাকে কে দেখিয়েছিল?" ৩য় অঙ্ক, ৫ গ।

আর ফুলীকে কত প্রলোভনের মধ্যে আপনার চরিত্র রক্ষা করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গঙ্গাতীরে ফুলী ভগবানের স্তোত্র গাহিতেছে, আর· মা আসিয়া প্রলোভন দেখাইতেছে "আচ্ছা তুই অমন করিস্ কেন? তোরে মাল্লিকবাড়ী কীর্ত্তন করতে নিয়ে গিয়েছিলুম। হীরুঘোষাল বলে, মল্লিকদের ছেলে তোকে চার হাজার টাকা দিতে চায়, আর দুশো টাকা ক'রে মাসোহারা দিতে চায়। কদিন আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে জুড়ী ক'রে ঘুরেছে—দেখেছি।"

গর্ভধারিণীর উত্তেজনা, অর্থের প্রলোভন। ফুলী এখন কি করে? সে স্থির করিল "আমি দোরে দোরে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে খাব। তুমি ওসব কথা যদি বল, তোমার বাড়ী থাকবো না।"

মায়েরও এক কথা—"যদি আমার মতে চলিস্, তবে বাড়ী ফিরিস্, নইলে এই গঙ্গাতীরেই থাক্—আর ভিক্ষে ক'রে খাস্—আমি তোরে বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না।"

এই মনের অবস্থায়, ফুলীর সংসারবিতৃষ্ণা জন্মিতেই গঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে,—"মা, এ পৃথিবীতে কি আশ্রয় পাব না, না পাই—তোমার কোলে আশ্রয় দিও।"——

মন্মথ ঠিক তখনই কাজ লইয়া উপস্থিত! ফুলীর প্রাণে শান্তি আসিল।

এইরূপ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল সংসারে নানারূপ বাধাবিঘ্নেই ফুলীর চরিত্রের বিকাশ! হীরুঘোষাল বলিতেছে "কি ফুলী, তোর বরাত খারাপ, আমার কথা কানে কচ্ছিস্ নি। শুন্‌লে এতদিন তে-তালায় থাক্‌তিস্, জুড়ী চ'ড়ে হাওয়া খেতিস্।"

নীরদ বলিতেছে "তুই বিশ্বাস করিস নি, আমি তোরে ভারি ভালবাসি, একদিন যদি তোরে না দেখি, আমার প্রাণ কেমন কর্‌তে থাকে! সত্যি ফুলি আমি তোর জন্যে মরি!" ৪র্থ অঙ্ক, ৫ গ।

নানারূপ সুশিক্ষা গুণে রঙ্গিণীর চরিত্র পুষ্ট হয়, "নির্ম্মল বালিকা পথফুলের মত ফুটেছে" আর এত প্রলোভন ও বিপদ সত্বেও ফুলী যে আপনার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য। আর এত বাধাবিঘ্ন প্রলোভন, উত্তেজনার মধ্যে চরিত্র পুষ্ট হওয়ায়ই রঙ্গিণী অপেক্ষা ফুলী পাঠক ও দর্শকের মনোযোগ, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা অধিকতর আকর্ষণ করে।

নীচকুলে জন্মিয়াও রঙ্গিণী যেমন স্বভাবতঃই পবিত্রচরিত্রা, ফুলীও চরিত্রহীনা মাতায় ঘরে প্রতিপালিতা হইয়াও নির্ম্মলা। কালীকিঙ্কর রঙ্গিণীকে বলিতেছে—

"তুমি আমার চক্ষের উপরে নির্ম্মল ফুলের মত ফুটেছ, তোমার গায়ে কেউ দাগ দেবে, এ আমার অসহ্য হবে!"

শান্তিরামও মাধবকে বলিতেছে "রঙ্গিণীকে তুমি চেন না, ও মৎলব করো না। ভাব্‌তিছ ছোট ঘরের মেয়ে, ছোট কর্ত্তা **আপনার বেটীর** মত মানুষ করেছে, রঙ্গির যদি নিশ্বাস পড়ে যেম্‌নি সোণার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল, তেম্‌নি তোমরা ছারখার হবে।"

ফুলীর সম্বন্ধেও মন্মথ বলিতেছে "ও ছোট ঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু ও নির্ম্মল।"

পুনরায় মন্মথ যখন ফুলীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তুই যে বড় মার পায়ে ধ'রে ও আমার সাম্‌নে ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে বলেছিস যে কুপথগামী হবিনি?"

ফুলীও জোরের সহিত উত্তর করিতেছে "তা তো হবোই না"।

উভয়েই কার্য্যতৎপরা। রঙ্গিণী যেমন তৎপরতার সহিত কালীকিঙ্করকে রোগমুক্ত করিল, অন্নপূর্ণার জামিন হইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিল, হলধরকে সদ্বুদ্ধি দিয়া, বিপদের সময় কালীকিঙ্করকে সুপরামর্শ দিয়া তাহার স্থৈর্য্য সম্পাদন করিল, ফুলীও মন্মথকে লইয়া গিয়া শৈলেনের প্রাণরক্ষা করিল, জাল হ্যাণ্ডনোট পোড়াইয়া ফেলিল, বিরজাকে লইয়া গিয়া শৈলেনকে বাড়ী নিয়া আসিল এবং অবশেষে মন্মথকে রক্ষা করিতে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী ঋষি কালীকিঙ্করের সহিত যুবক মন্মথের যেরূপ পার্থক্য, রঙ্গিণী ও ফুলীর কার্য্য প্রণালীর মধ্যেও সেইরূপ কিছু পার্থক্য আছে, তাই কালীকিঙ্করের শিক্ষায় রঙ্গিণী কখনও একটা মিথ্যা কথা বলে নাই, এমন কি হলধর মিথ্যার সহায়তায় দুষ্ট সাতকড়িও গণৎকারকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে রঙ্গিণী তাহাকে তিরস্কার করিয়া শাসিত করে—

"তুমি যদি বাঁধিয়ে দাও, আমি আদালতে গে সত্য ব'লে খালাস কর্‌বো"।

আর মন্মথ যেমন সদুদ্দেশ্যসাধনের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধা করে না, ফুলীও সেইরূপ দুষ্ট হীরু ঘোষালকে দরোয়ান কর্ত্তৃক প্রহৃত করে, গোপনে শরৎ ও নীরদের কুপরামর্শ শুনিয়া তাহা ব্যর্থ করে, ও নীরদকে শিবের মন্দিরে ভুলাইয়া লইয়া হ্যাণ্ডনোট পোড়াইয়া দেয়।

উভয়েই অবিবাহিতা। রঙ্গিণী কালীকিঙ্করকে বলে "আমি বিবাহ কর্‌বোনা," আর চরিত্রবতী হইলেও ফুলী যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে তাহার উপযুক্ত বরের সহিত বিবাহের সম্ভাবনা নাই। তবে উভয়েরই একটা প্রধান অবলম্বন ছিল—রঙ্গিণী কালীকিঙ্করকে গুরু, সখা ও মিত্রের ন্যায় ভালবাসিত আর ফুলী ও মন্মথকে নিঃস্বার্থভাবেই ভালবাসিত। তবে মন্মথ ও ফুলীর ভালবাসায় যুবক যুবতীর প্রেমের আভাষ পাওয়া যায়। মণি কীর্ত্তনী বলিতেছে—

মোনাবাবুর পীরিতে পড়েছ, মোনা বাবুকে বিয়ে ক'র্‌বে, নয়?

ফুলী "সে যে বড় ভাগ্যিমানী, যে মাথা কেটে তপিস্তে ক'রেছে, সে তার গলায় মালা দেবে, আমার যা জন্ম আমি তার পা ধোয়াতেও পারি না"।

অন্যত্র ফুলী মন্মথকে বলিতেছে "তুমি যা চাও, তা আমি কর্‌বো, তা তুমি বারণই করো, আর যাই করো।"

"অমন বুদ্ধিও কর্‌বো, তোমার কাজ ক'রেও বেড়াবো"।

"দূর বল্লেই কি দূর হবো ? তা হবে না"।

মন্মথও ফুলীর মৃত্যু সময়ে বলিতেছে "নীরদা, যে দণ্ড তুমি আমায় দিলে তার কাছে প্রাণদণ্ড অতি তুচ্ছ।"

সম্ভবতঃ এই প্রেম স্বার্থগন্ধশূন্য ও কতকটা Platonic, কিন্তু কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর ভালবাসা অনন্যসাধারণ। রঙ্গিণী কালীকিঙ্করের একেবারে কন্যা, ছাত্রী, সখাও শিক্ষাদাত্রী, (বালিকা আমার শিক্ষাদাত্রী, বালিকা আমার গুরু,) রঙ্গিণীর ঐকান্তিক ভালবাসার শক্তিতেই কালীকিঙ্করের উন্মাদ রোগ দূর হইয়া যায়, মাজিষ্ট্রেট-পত্নীও এই কথা বলিয়াছিল—

"ডিয়ার গ্রাণ্ট হার্ প্রেয়ার্, লভ উইল্ কিউর্ ম্যাড্‌নেস্"। কালীকিঙ্কর যখন তাহাকে কাছে আসিতে নিষেধ করে, রঙ্গিণী উত্তর দিতেছে"—

আপনি কি বোঝেন না যে আজ-ছ' বছর সকাল হ'লেই কতক্ষণে আপনার কাছে—পড়তে আস্‌বো, কতক্ষণে আপনাকে দেখ্‌বো, এই আমার চিন্তা ? যখন বাড়ী পাঠিয়ে দেয়, আমার মনে হয় কারাগারে যাচ্ছি ; রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে করি, সূর্য্যদেব শীঘ্র উদয় হও, দিন হ'লে আমি পড়তে যাব। আমি চল্‌লেম আর আস্‌বো না"।

উন্মাদের ঘোরে যখন কালীকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করিতেছে," তুমি কে আমার যে তোমার কথা শুন্‌তে হবে ?"

রঙ্গিণী উত্তর করিতেছে "আমি যদি তোমার কেউ না হই, তা হ'লে আমার সব শূন্য ! সংসার শূন্য ! জীবন শূন্য ! প্রাণ শূন্য ! মৃত্যু ! নরক ! অন্ধকার ! যন্ত্রণা ! আমি তোমার কে ছোটবাবু এ কথা আর

বলো না"। রঙ্গিণীর আরও অনেক কথায় এই গভীর ভালবাসার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়——

"আমি ভালবাসা তাঁর নিকট শিক্ষা করেছি। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নয়, তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নাই। আমার মন নয়, তাঁর মন, তাঁর মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি, আমার ভালবাসা তাঁর ভালবাসার একটী ক্ষুদ্র বীজ মাত্র। সেই বীজ তাঁর যত্নে অঙ্কুরিত হ'য়ে হৃদয়ে অমৃত-ফল ফলেছে।"

উভয়েই কাজ করিত। (রঙ্গিণীর কাছে কালীকিঙ্করের সেবাধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ উপস্থিত, আর মন্মথ ফুলীকে বুড়ীর শুশ্রূষার ভার দিয়া গাড়ী আনিতে যায়)। রঙ্গিনীর কথায় মনে হয় যে নাট্যকারই বালিকার মুখে নানাবিধ তত্ত্ব (philosophy) প্রচার করিতেছেন, আর ফুলীর কথাবার্ত্তা ও কার্য্যে এমন একটা বালিকাসুলভ স্বাভাবিক সরলতা দেখা যায় যে রঙ্গিণী অপেক্ষা ফুলীর পাগলামিই অনেক ভাল লাগে।

[মন্মথ—"ওর মা ঠিক বলে ও পাগল বটে, কিন্তু ও ছেলে-বেলা থেকে পাগলাটে, যা মুখে এলো ব'লে গেল"]।

রঙ্গিণী কালীকিঙ্করকে যে দয়া ও মার্জ্জনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিল তাহা অপূর্ব্ব ও চমৎকার হইলেও ফুলীর ক্ষিপ্রকারিতা, বুদ্ধি ও চটুলতাই অধিকতর স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী। রঙ্গিণীর মত তাহার চরিত্র সর্ব্বতোভাবে অকপট ও সত্যনিষ্ঠ না হইলেও নির্ম্মলতা ও পরোপচিকীর্ষার জন্য ফুলীর জীবন সরস মধুর। তাহার নির্ম্মল চরিত্র ও কৌশল সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচয় দিয়া নাট্যকারই তাহার মুখে বলিতেছেন, "আমি সাপের ছানা, বিষ দাঁতও উঠেছে, টের পেয়েছি, কিন্তু আমি কাম্‌ড়াব না, পারি যদি, কেউ কাম্‌ড়ালে বিষ তুলে নেব।"

শিক্ষা ও পরিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী উভয়ের কার্য্যপদ্ধতি ও আদর্শ স্বতন্ত্র হইলেও উচ্চজ্ঞান সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আবার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। রঙ্গিণী কালীকিঙ্করের নিকট হইতে তাহার ন্যায়ই আত্মত্যাগ ও উদারতার শিক্ষালাভ করিয়াছে, আর ফুলীর আত্মত্যাগ শুধু শিক্ষাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই, উহা কর্ম্মে প্রকটিত। নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন

দিয়া পরম প্রেমাস্পদকে রক্ষা করিয়া ফুলী নিষ্কাম কর্ম্মের চরম আদর্শ দেখাইয়াছে। আর এই আত্মবিসর্জ্জনই, "পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া, সুখের আশা, ধর্ম্মলাভের আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, সহস্র বার বেশ্যাজন্ম হোক্, বিষ্ঠার কীট নরকের কৃমি হয়ে আমি তবু লোকহিত করব **এর চেয়ে উঁচু কাজ আর নেই।**"

৫ম অঙ্ক, ৩ গ।

যদিচ এই আত্মবিসর্জ্জন যে অঙ্কে আছে তাহা নাট্যকারের রচিত নহে। ফুলীর এবম্বিধ পরিণতিই যে স্বাভাবিক। দ্বিতীয় অঙ্কের "মরি যদি, তা দেখবে কেমন করে মরি।" এ কথাতে যে classical irony ছিল তাহাতেই এই আত্মোৎসর্গের পূর্ব্বসূচনা ছিল। আর ফুলীর পক্ষে মন্মথের-জন্য-মৃত্যু অপেক্ষা সুখকর মৃত্যু আর কি হইতে পারে?

উভয় চরিত্রই নাট্যকারের অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রতিবাসিগণ যেমন রঙ্গিণীর সম্যক্ পরিচয় দিতেছে, "অদ্ভুত বালিকা ও দেবী অংশ, ও সব করতে পারে।" অবধূতের কথায়ও ফুলীর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—"বেটীর নায়িকা অংশে জন্ম। শাপভ্রষ্টা হ'য়ে বেশ্যার ঘরে জন্মেছিল। ও বেটী তখন কেঁদে কেঁদে বাবার কাছে গান ক'র্‌ত, বাবার গা জ'লে ভেসে যেত। ও বেটী না গেলে কি হরগৌরীর মিলন হয়?" ৫ম অঙ্ক, ৫ গ। এ দুটী চরিত্র একাধারে Bernard shaw এর Miss Warren's Profession নামক নাটকের 'ভাইভি'কে মনে পড়ায়।

৯। ব্যবহার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক পাঠ করিলে তাঁহার আইনে অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি কি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন ব্যবহারজীবী না হইলেও সমস্তই নির্ভুল হইয়াছে। নাটকের plot এর ভিতরে মোকদ্দমা সাজানোর কি ষড়্‌যন্ত্র গঠনে কি কার্য্যবিধি নিরূপণে সূক্ষ্মদর্শী আইনজ্ঞেরব দূদর্শিতা উপলব্ধ হয়। রমেশের ষড়্‌যন্ত্রে সুরেশকে চোর বলিয়া সাব্যস্ত করা, টাকা পাঠাইয়া

পীতাম্বরের জ্ঞাতিশত্রুকে বশে আনিয়া পীড়িতাবস্থায় ফৌজদারী মোকদ্দমায় তাহাকে ধরিয়া নিয়া যাওয়া (**প্রফুল্ল**), কালীকিঙ্করের ঝঞ্ঝাট-হীন সংসারে মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করা (**মায়াবসান**), জাল পুলিশ সাজিয়া ভুবনমোহিনীকে গ্রেপ্তার করা (**শাস্তি কি শান্তি**), মন্মথ কর্তৃক কেবল কাগজের সহায়তায় কৌশলে জাল দলিল তৈয়ারী (**গৃহলক্ষ্মী**) প্রভৃতিতে গিরিশচন্দ্রের সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানে আমরা ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার বিশাল অভিজ্ঞতার পরিচয় দিব।

ফৌজদারী (criminal) আইনের চক্ষে আসামীকে প্রথমে নির্দ্দোষ বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। তাহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সমস্ত প্রমাণ ও তৎপরে তাহার বক্তব্য (Statement) অপক্ষপাতে শুনিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। আইনের ভাষায় ইহাকেই বলে "Presumption of Innocence". উদাহরণ স্বরূপ,—"পূর্ণচন্দ্রে" রাণী ইচ্ছা রাজা শালিবানকে বলিতেছেন :—

শাস্ত্র নীতি বিচারপতির এই ভার
দোষী বা নির্দ্দোষী আগে বিচার না ক'রে
বাদী প্রতিবাদী প্রতি পক্ষপাত শূন্য,
দোষারোপ যার প্রতি শুনে তার বাণী।
একের বচনে অন্য নাহি করে দোষী।

পূর্ণচন্দ্র, ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

"গোবরার" বিরুদ্ধে Perjury (মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টির) মোকদ্দমা চলিতেছে, স্বয়ং জজসাহেব পারজারির সার্টিফিকেট দিয়াছেন—সহরে বড় ধুম পড়িয়াছে, কেহ জামিন হয় নাই, নিশ্চয়ই সেসন হইবে। সাত বৎসরের জেল কেহই ছাড়াইতে পারিবে না। মোকদ্দমার শেষ দিন, কিন্তু মণিবাগ্দিনী (গোবরার ভিক্ষামাতা) বাদীর স্ত্রীকে বসন্ত রোগে সেবা করিয়া বশ করিয়াছে, শুনানীর দিন বাদী উপস্থিত নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট সেসনে সোপরদ্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন, সেদিন মোকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া ভাবিলেন মহারাণীর উকিলের (Public prosecutor) দ্বারা

মোকদ্দমা চালাইবেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মণি আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীকে ভিক্ষা ও সেবায় বশ করিয়াছে, মেম্‌সাহেবের অনুরোধ, পরদিন আসিয়া বাদীর অভাবে তিনি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন।

এই সামান্য কয়টী কথায় অনেকগুলি প্রশ্নের সমাধান হয়। পারজারিয়র মোকদ্দমা সেসনে সপরদ্দ হইতে পারে, আর তাহাতে সার্টিফিকেটের (Sanction to prosecute—Secs. 476, 195 Cr. Pro. Code) আবশ্যক। আর বাদীর অনুপস্থিতিতে প্রমাণাভাবে সেসনে মোকদ্দমা সোপরদ্দ না হইয়া আসামী অব্যাহতি পায়।

[২৫৩, ২০৯ কার্য্যবিধি ফৌঃ]

"ক্রিমিনেল কেস বড় শক্ত ব্যাপার, দুদিক্‌ কাটে, প্রমাণ না হ'লে ওকেই জেলে যেতে হবে"। [মায়াবসান ২য় অঙ্ক, ৪ গ]

কৃষ্ণধন বসুর উপরি-উক্ত উক্তিতে নাট্যকার দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

"প্রফুল্ল" নাটকে কলিকাতা পুলিস কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সুরেশ ও শিবনাথের বিচার হইতেছে, উকীলগণ যথাক্রমে আসামীদের স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"আই এপিয়ার ফর্‌ দি ফাষ্ট প্রিজনার" ইত্যাদি, ইন্টারপ্রিটার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাণে কাণে বলিতেছে "ব্রেকিং বক্‌স্‌, ষ্টিলিং ইয়ারিং", রমেশ সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়াইয়া মিথ্যা হলফ লইয়া ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার (Oath) করিতেছে "যাহা বলিব, সব্‌ সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না," সুরেশ সেই মিথ্যা হলফে স্তম্ভিত হইয়া নিজেই স্বীকার করিয়া লইতেছে "আমি বাটালী দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ মাক্‌ড়ী গুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলাম।" "পাছে ওঁর ভাজকে (প্রফুল্লকে) সাক্ষী দিতে হয় এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছে," পীতাম্বর এই আর্জ্জি করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট Direct evidence 'বাই জোরুকা গাওয়া' চাহেন, কারণ Hearsay evidence admissible নয়। এবং সুরেশ তাহাতে আরও জোরের সহিত স্বীকার করে। উকিল "হি ইজ্‌ স্পিকিং অণ্ডার পুলিস পারস্যুয়েসন" বলিয়া পুলিসের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া দিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট

তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন "নো হেলফ, আই হ্যাব ওয়ারনড হিম" এবং "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ফিরাইয়া না লইলে তোমার দণ্ড হইবে" বলিয়া সুরেশকে সতর্ক করেন। তথাপি সুরেশ দণ্ড প্রার্থনা করিলে হাকিম তাহাকে এই স্বীকারোক্তির উপরেই "পোনর ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাগার," আর শিবনাথের বিরুদ্ধে কোন **প্রমাণ না থাকায়,** উকিলকে "মিষ্টার পিয়ারসন্,'আই ডিসচার্জ্জ ইউর ক্লায়েন্ট" বলিয়া শিবনাথকে ছাড়িয়া দেন। (ফৌঃ কার্য্যবিধি, ধারা ২৫৩)

এইখানে পাঠকের জানা উচিত যে আইনের চক্ষে নিজের স্বীকারোক্তি (পরে যাহা প্রত্যাহৃত হয় নাই—confession বা plea of guilty)ই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এবং এই জন্যই পীতাম্বর অনেক চেষ্টা করিয়াও হাইকোর্টে মোসন দায়ের করিতে পারে নাই ('বড় কৌন্সিলিকে কাগজ পত্র দেখালেম')। তবে হাকিমের দ্বারা সতর্কতা প্রদান ব্যতীত প্রকৃত একরার হয় না, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে ইহাতে আসামীর সাজা হইতে পারে। এই ক্ষেত্রেও ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন "Youngman, you will be punished for your confession." Sec. 164, 364 Cr. P. Code.

আবার হাকিমের কাছে একরার করিলে সাজা হয় বটে, কিন্তু পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে কোনও অপরাধ হয় না [Sec 25, Evidence Act]। তাই কৃষ্ণধন মাধবকে বলিতেছে :—

"আমি ঢের সত্যবাদী দেখেছি, আপনি জানেন না। অনেকে থানায় গে বলে, আমি খুন করেছি, আদালতে গে অস্বীকার করে। আপনাদের বউ ও তাই কর্‌বেন।" মায়াবসান, ২য় অঙ্ক, ৪ গ।

"মায়াবসানে" মিথ্যাভিযোগে অন্নপূর্ণার নামে ওয়ারেণ্ট হইলে রঙ্গিনী তাহা Cancel করিয়া লইয়া আসে, আর—"প্রফুল্লে" জগমণি রমেশ ও কাঙালীচরণের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকাশ করিয়া **রাজসাক্ষ্য-দাতীর সাক্ষী** (Approver or Queen's evidence) হইবে, অথবা 'একরারের' জন্য তিন জনেই দণ্ড পাইবে বলিয়া ভয় দেখায়।

এইখানে গিরিশচন্দ্র এপ্রুভারের মুক্তি লাভ সম্বন্ধে এবং আদালত কর্ত্তৃক না পার্‌ডন (ক্ষমা) পাইলে 'একরারের' জন্ম যে উহা করে সেও দণ্ড পায়, এবং কুকার্য্যের সঙ্গীও দণ্ড পাইতে পারে, তাহাই ইঙ্গিত করিতেছেন। [Sec 337, 338 Cr. P. C. Sec 30, Evidence Act]

রমেশ প্রফুল্লকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য (৩০২ দঃ বিঃ) এবং রমেশ, জগ ও কাঙ্গালী তিন জনেই ষড়্‌যন্ত্র করিয়া যাদবের প্রাণনাশের চেষ্টা করায়, তিনজনেই পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়, কেননা, "ক্রিমিনাল প্রসিডিওরে মার্ডার, এটেম্পট্ টু মার্ডারে 'বালা মল' দুইই পর্‌তে হয়।" (৩০৭ দঃ বিঃ।) প্রফুল্ল ৫ম অঙ্ক, ৪ গ।

আবার আফিম গুলিয়াছিল মাত্র, মুখে দেয় নাই, এইজন্য "শাস্তি কি শাস্তি"তে, Suicide (আত্মহত্যা) এর জন্য কোন Attempt হয় নাই, কেবল Preparation হইয়াছিল এইজন্য ভুবনমোহিনী ধৃত হয় না। "আফিং গুল্‌লে কিছু হয় না, খাওয়া চাই, তবে Attempt at suicide হবে"। ৪র্থ, অ, ৫ গ।

এইখানে বলা আবশ্যক যে তিনটী অবস্থা অতিক্রম না করিলে অপরাধ (Act) অনুষ্ঠিত হয় না :—(১) Intention মতলব, (২) Preparation আয়োজন, (৩) Attempt উদ্যম। প্রথম দুইটীতে কোন অপরাধ হয় না, কিন্তু তৃতীয়টীতে অধিকাংশ স্থলে অনুষ্ঠিত অপরাধের ন্যায় সমান দণ্ড হইয়া থাকে। [Vide Sec 511 I. P. C] তাই "হারানিধির" হরিশ প্রতিশোধ লইবার জন্য মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি ছুড়িয়াছিল কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় হরিশ এটেম্পট্ টু মার্ডার অপরাধে Abscond (পলায়ন) করে, কিন্তু পরে মোহিনী চার্জ্জ withdraw করায় আবার লোকালয়ে ফিরিয়া আসে। বন্দুকের যোগাড় করিলেই (অর্থাৎ Preparation)এ অপরাধ হয় না, কিন্তু লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেই অপরাধ হয় (লাগিলেও তদ্রূপ, না লাগিলেও প্রায় তদ্রূপ)। Attempt এর ন্যায় এবেট্‌মেণ্টে (Abetment—সহায়তা প্রদানে) ও তুল্য শাস্তি হয়। তাই "শাস্তি কি শাস্তিতে" প্রমদাকে খুন করিয়াছে বলিয়া নেঁচির মিথ্যাভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রসন্নকুমারের বিরুদ্ধে murder (দঃ বিঃ ৩০২) ও নির্ম্মলার বিরুদ্ধে

এবেটমেণ্ট অব মার্ডার (৩০২।১০৯ দঃ বিঃ) চার্জ্জ দিয়া ইন্‌স্পেক্‌টারের দ্বারা Arrest করান কিন্তু পরে সদাশিবের চেষ্টায় সেই ওয়ারেণ্ট ক্যান্‌সেল (Cancel) হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে আসিয়া ইন্‌স্পেক্‌টারকে অনুমতি করেন, ("Take off handcuffs"), ও নির্ম্মলার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন "Oh this is the daughter-in-law! Innocence herself! মাগ্নি, মার্জ্জনা করিবেন, আমি না বুঝিয়া আপনার বিপক্ষে ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলাম"।

আর Conspiracyতে যে সমস্ত Hell Hounds ছিল, তাহাদিগকে for aiding and abetting, handcuffs চড়াইতে হুকুম দেন ও সয়তানী চিত্তেশ্বরীকে ধরিতে হুকুম দেন :—Oh, is that চিত্তেশ্বরী? Arrest her also. [৫ম অ, ৫ গ] [১২০ বি, ৩০২।৫১১ দঃ বিঃ] এবং অবশেষে প্রমদাকে কোর্টে লইবার জন্য পাগলকে অনুযোগ দেন :— "সদাশিব, You could have spared the lady, your testimony was enough."

"গৃহলক্ষ্মীতে" স্ত্রী ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া উপেন্দ্রকে পাগল সাব্যস্ত করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত রুজু করিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ "এই জন্মেই সব হ'য়ে যাক" বলিয়া স্ত্রীর গলা টিপিয়া ধরিলে, পুত্র নীরদ পাগল অভিযোগে পিতাকে ধরিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টার বিনোদকে নিয়া আসে। কিন্তু সে উপেনকে না ধরিয়া নীরদকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দেয় :—

"পাগল হয়েছেন, না করেছেন, কিছু বুঝতে পারছি না। দেখে শুনে আমিই পাগল হবার যোগাড় হয়েছি"। আর তরঙ্গিণী ভাল সার্জ্জন আনিতে বলিলে তাহাকেও শুনায় :—

"হ্যাঁ মা, তাই ডাকান, আমার কর্ম্ম নয়"।

কুমুদিনীর বাড়ীতে নীরদের পরামর্শ ও ষড়্‌যন্ত্রে শৈলেন্দ্রের নামে মিথ্যা এটেম্পটের অভিযোগ ব্যর্থ হয়, কেননা শরৎ তাড়াতাড়িতে শৈলেন্দ্রের বাম হাতে পিস্তল (যাহা নীরদ শৈলেন্দ্রের নিকট হইতে ইতিপূর্ব্বে আনিয়া রাখিয়াছিল) দিয়া যায়, আর এই সমস্ত সন্দেহজনক প্রমাণ থাকায় নিতাই উকীল কৌশল করিয়া পুলিস কেস্ "কাটিয়ে দেয়"।

এই নাটকেই ("গৃহলক্ষ্মীতে") একটী নূতন রকমের জালের মোকদ্দমা উঠে। শরৎ কিছু টাকা পাইয়া শৈলেন্দ্রের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা নেওয়ার দরুণ দুই খানা হ্যাণ্ড্‌নোট দেয়। কিন্তু মন্মথের কৌশলে নীরদই পাঁচ হাজার টাকা দিয়া সেই দুই খানি হ্যাণ্ডনোট তাহার নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া আদালতে দাখিল করে, যেন সে শরতের রিভারসনারি রাইটটা Reversioner's right পাইয়া তাহাকে খুব জব্দ করিতে পারে। শরৎ নিজে সহি করিলেও মন্মথের পরামর্শে উত্তর দেয়—হ্যাণ্ডনোট জাল। আদালতে প্রমাণ হয় জাল, কারণ সহি থাকিলেও "যে কাগজে হ্যাণ্ডনোট দু'খানা লেখা, সে কাগজ স্বদেশী মিলের, মোটে মাস আষ্টেক হ'ল, ঐ মিল খোলা হয়েছে। আর হ্যাণ্ডনোটের তারিখ আড়াই বছর আগেকার। যখন হ্যাণ্ডনোট সই হয়, তখন সে কাগজ জন্মায় নি, ঐ কাগজেই জাল ধরিয়ে দেয়"। ৪র্থ অঙ্ক, ৬ গ।

ফলে জজ নীরদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে সোপরদ্দ হইবার হুকুম দেন। আদালতে কেউ জামীন হয় না, নীরদ হাজতে যায়। "ধর্ম্মের কল আপনিই নড়ে"। ৪৭১ দঃ বিঃ।

এই নাটক অভিনীত হইবার কিছুদিন পরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কালীজহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সম্পাদিত বলিয়া এক জাল উইল প্রোবেটের জন্য আলিপুর জজআদালতে দাখিল হয়। জজ সাহেব উহা 'জাল' মনে করিয়া ৩।৪ জন ভদ্রবংশীয় ব্যক্তিকে ফৌজদারীতেও সোপরদ্দ করেন। আলিপুর দায়রার বিচারে ঐ উইল জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মোকদ্দমার প্রধান প্রমাণ ছিল যে সময়ে উইল সম্পাদন করার তারিখ ছিল, সে সময়ে উক্ত কাগজ 'ইস্যু' হয় নাই। আসামীর পক্ষে নিম্ন আদালতে মিঃ সি, আর, দাস ও দায়রায় বিখ্যাত কৌন্সিলী মিঃ নর্টন, মিঃ এস, আর দাস প্রভৃতি মহারথিগণ উইলের সত্যতা সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর করিয়া চারি জনের শ্রীঘর বাসের হুকুম হয়।

"বলিদানে" মোহিত তাহার কোন ভাই নাই বলিয়া মিথ্যা affidavit swear করিয়াছিল। তাই রূপচাঁদের চেষ্টায় ওয়ারেণ্টে ধৃত হয়।

"শাস্তি কি শান্তিতে" প্রকাশ সদাশিব চায়েনের গদিতে জাল হ্যাণ্ডনোট ডিসকাউন্ট করিয়া টাকা লয়, কিন্তু পাগল ওয়ারেন্টের ভয় দেখাইলে প্রকাশ বাহাদুরি করে "দশ হাজার টাকা বইতো নয়, আজই সে টাকা ফেলে দিচ্ছি"। ঠিক আইনজ্ঞের ন্যায়ই নাট্যকার তাহাকে অব্যাহতি না দিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে দিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করান, কেন না "ফোরজারির চার্জ্জ টাকা দিলে কাটেনা, তবে আদালতে টাকা জমা দিলে সাজা কম হ'তে পারে"— ৪র্থ অঃ, ৪র্থ গ।

তবে পরে পাগলই তাহাকে ক্ষমা করিয়া সেই চার্জ্জ withdraw করে। প্রকাশের বিরুদ্ধে বেণীবাবুর দেইজীরা ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে চায় কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভুবন সাফাইনামা লিখিয়া দিয়া তাহাকে দায় মুক্ত করিয়া দিতে রাজী হয়।

"মায়াবসানে" রঙ্গিণী মিথ্যাপরাধে অভিযুক্তা অন্নপূর্ণা দাসীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট 'কেনসেল' করিয়া আনে, কিন্তু মিথ্যা চার্জ্জ দেওয়ার জন্য যাদব ও মাধবের ছয়মাস করিয়া জেল হয়। তবে ঋষিকল্প কালীকিঙ্কর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের সুপারিসিতে ছোটলাট সাহেব বাহাদুর হীরক জুবিলি উপলক্ষে অল্পদিন মধ্যেই তাহাদিগকে খালাস দেন।

"বাঙ্গাল" প্রবন্ধে হরেন্দ্রের মা দেওয়ানের কথা শুনিয়া পুত্রের নামে ওয়ারেন্ট বাহির করে ও মা ছেলেতে নানাপ্রকারের মাম্‌লা চলিতে থাকে।

"আয়নায়" সৃষ্টিধর তড়িৎসুন্দরীকে ভদ্রলোকের বাড়ী আসিয়া "মেয়ে বার করবার" জন্য trespass ও kidnapping এর চার্জ্জ দেওয়ার ভাণ করে (৪৪৭, ৩৬৩ দঃ বিঃ)।

"বলিদানে"ও কিশোর রমানাথের বিরুদ্ধে ঘড়ি চুরির অভিযোগ আনিবার ভয় দেখায়। কিন্তু রূপচাঁদ মিত্র সত্যসত্যই চক্রান্ত করিয়া একজন নির্দ্দোষ লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে, তবে কিশোরের জনৈক উকীল বন্ধুর চেষ্টায় বেচারা নির্দ্দোষ (not guilty) প্রমাণিত হয়।

"হারানিধির" মোহিনী নানারূপে ভ্রাতৃবধূর সর্ব্বনাশ করিলেও, মৃত্যুর

পূর্ব্বে বিধবা যে একটী এজেহার (Dying declaration) করে, তাহাতে প্রাণহন্তা দেবরকে না জড়াইয়া সে বেচারা উদারতার পরিচয় দেয়। [Evidence Act, Section 32]

(দেওয়ানী আইন সম্বন্ধে)

যোগেশ ইনসলভেণ্ট যাওয়ার ত্রাসে খুব মদ ধরিয়াছে, হরিশেরও সেই ভয়েই গৃহত্যাগ। রমেশ ব্যাপারীদের injunction এর ভয়ে যোগেশকে মদ খাওয়াইয়া মর্গেজ সহি করিয়া লইয়াছে, কিন্তু যোগেশ যখন বুঝিলেন যে দলিল অস্বীকার করিলে ভাই অপরাধী হইবে তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া নিজেই গিয়া রেজিষ্ট্রি করিয়া দিয়া আসেন।

রমেশ client এর behalf এ possession নিয়া ক্রমে ভজহরিকে জাল মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজাইয়া তাহার দ্বারা Reconveyance করিয়া registry করিয়া নেয়। রমেশ ডিক্রি করিয়া যোগেশকে ধরে এবং ভয় পাইয়া জ্ঞানদা হাজার টাকায় নূতন বাড়ী বেচিয়া ফেলে।

"হারানিধি"তে হরিশের বাড়ীর Sale সম্বন্ধে advertisement হয় কিন্তু sheriffi's sale এ নব দখল না ছাড়িয়া claim দিবে বলিয়া শাসায়। Bailiff সমস্ত seize করিতে আসিলে হরিশ 'স্ত্রীধন' বলিয়া আপত্তি করে, কিন্তু bailiff তাহাকে court এ claim দিতে উপদেশ দিয়া ক্রোক্ করে। হরিশ আক্ষেপ করিতে থাকে—

"স্ত্রীধন আবদ্ধ হইল, কবে দেহ আবদ্ধ হয়" (Body warrant.)

মোহিনী না বুঝিয়া তেজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে যে affidavit করিয়াছিল তাহাতে মোকদ্দমার শুনানির পূর্ব্বেই Police Suit হয় কিন্তু chamber এ বড় কৌন্সিলি দিয়া দরখাস্ত করা সত্বেও সে দরখাস্ত টেকেনা।

অঘোরের মামীর property যে Receiver এর হাতে ছিল, মামীর মৃত্যু হইলে তাহার share declare হয়। Identification এর পর উকিল receipt নিয়া সমস্ত টাকা অঘোরকে বুঝাইয়া দেয়।

"মায়াবসান" নাটকে কৃষ্ণধন উকিল বলিতেছে "আমরা professional men, instruction মাফিক্ কাজ করি," আবার খাবারের সঙ্গে বিষ ও

টাকা দিয়া buy off করিবার ইঙ্গিতও করিতেছে। অন্যস্থানে আবার বলিতেছে "মোকদ্দমার যোগাড় হচ্চে তদ্‌বির, আর সেই তদ্‌বির টাকায় হয়।" দালাল (Law broker) সাতকড়িকে বলিতেছে "আমি আপনার কাজ without feeতে করবো, we are friends."

কালীকিঙ্কর ও. উপেনকে পাগল সাব্যস্ত করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত দেওয়া হয়, কিন্তু মেডিকেল বোর্ড উভয়কেই 'পাগল নয়' বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। উপেন্দ্রের বাটীতে প্রথমতঃ ঘরোয়া Partition এর কথা হয়, পরে তিনি শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ও নীরদের 'কুচুটেপণায়' রাগ করিয়া নীরদের প্রতি দানপত্র করিয়া দিয়া পার্টিসন সুটের কথা বলিয়া কাশী চলিয়া যান।

আর বড় বউ ঠাকরুণ, (তাঁহার ধনুকভাঙা পণ) এই Partition suit এ আপনার অংশ কেয়ালো করিয়া নেয়। শৈলেনের নামে শিবু উকিলের নিকট উকিলের Cost বাবদ্ অনেক টাকা বাকী পড়ে। উপেন্দ্র নীরদকে তাহার অংশ দানপত্র করিয়া দেয় বটে কিন্তু বিরজা দেবরের নামে যে 'দানপত্র' করিয়াছিল, উপেন্দ্র "তাহার পিঠে লিখে দিয়ে রেজেষ্ট্রি ক'রে দেয় যে বিরজার দানপত্র স্থির-মেজাজে লেখা হয় নি, সুতরাং তাহা অসিদ্ধ।"

উপেন্দ্রের এই সাধুতায়ই বিরজা বিষয় ফিরিয়া পায়।

শৈলেন্দ্র যে সমস্ত 'উনপাঁজুরে' লোককে টাকা ধার দিয়া হ্যাণ্ডনোট নিয়াছিল, নীরদ তাহার অসুখের সময় দরদ দেখাইয়া সেইগুলি নিজের নামে এন্‌ডোর্স করিয়া নেয়। শৈলেন ফন্দী বুঝিতে পারেনা, কিন্তু নীরদ এখন এই সমস্তের বাবদ প্রায় একলক্ষ টাকার জন্য শৈলেন্দ্রকে দায়ী করে, শৈলেন নীরদের ভয়ে "নিজের share বেচে Court এর cost, দেনার কতক দিয়ে, আর কিছু টাকা দিয়ে তালতলায় স্ত্রীর নামে একখানি বাড়ী কিনে সেখানে থাকৃতে চায়," কিন্তু শিবু উকীল বিরজার দরুণ শৈলেন্দ্রের রিভারসনারি রাইট্‌টা আগেই Cost বাবদ রেজিষ্টারী করিয়া লইয়া এই বাড়ী বিক্রী সম্বন্ধে রেজিষ্টারী আফিসে বাধা দেয় ও ক্রেতাকে শৈলেন্দ্রের বিরুদ্ধে Cheating চার্জ্জ আনিতে উপদেশ দেয়।

বিরজা আপনার বিষয় পায় এবং নীরদ ও শৈলেনের নামে যে টাকার ডিক্রী করে, নিতাই উকীল সেই টাকার জন্য উহাদের বিষয় ক্রোক দিয়া বিরজার নামেই কিনিয়া লয়। আর উপেন্দ্রের এত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি ও হাইকোর্টের বিচার-ফল সম্বন্ধে উন্মত্তাবস্থায় তাহার শেষ উক্তি কি মর্ম্মস্পর্শী, কি হৃদয়বিদারক!—

"উপেন মরেছে, তার ছেলে দানসাগর করেছে—খুব দানসাগর হয়েছিল—বড় বড় উকীল কৌন্সিলি সভাস্থ হ'ল, কত আইনের বিচার হ'ল, খুব দরাজ কাজ করেছে। ঘটি, বাটি, ঘড়া, গাড়ু, খাট, বিছানা, গাড়ী জুড়ী বাগানবাড়ী সব দান করেছে। ভূদানে অশেষ পুণ্য, তাই তালুক মুলুক পর্য্যন্ত দান করেছে। আর সোণা রূপো মুটো মুটো দু'হাতে বিলিয়েছে! তারপর ভুরি ভোজন, খালি দীয়তাং ভুজ্যতাং—দীয়তাং ভুজ্যতাং—নেড়ে পেয়াদা পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।" ৫ম অঙ্ক, ৬গ।

এই অংশটুকু দেবেন্দ্র বাবুর রচিত। কিন্তু মূল নাটকের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে।

মোহিনী কাদম্বিনীর দলিল Collateral security স্বরূপ নিজ দখলে লইয়া যায়। [হারানিধি]

"বাচের বাজীতে" হেমের সহিত শুভবিবাহের অগ্রে বীরেশ্বর ভয় দেখায় "Contract ভঙ্গের নালিস্ কর্‌বেন, কারণ এই রকম নাকি সভ্য ইংরাজদের মধ্যে আছে"।

"বলিদানে" করুণাময় বাড়ী খানা Second mortgage পর্য্যন্ত দিয়া মেয়ের বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়াছেন। 'আজ ছোট আদালতের সমন, কাল ছোট আদালতের সমন'। 'কবে ইন্‌সলভেণ্ট যায়' এই ভয় দেখাইয়া রূপচাঁদ শালওয়ালার দ্বারা একখানা body warrant বাহির করিয়া bailiff এর দ্বারা তাহাকে ধৃত করায়। ইহার পর তিনি নিজের চাকুরীতে জবাব দেন বটে কিন্তু 'কথার মানুষ' একটা মিথ্যা কথা না বলিয়া Consent decree নিয়া কিস্তিবন্দী করিয়া লয়েন্। তাহার চিত্তবিকৃতির সময় রূপচাঁদ উকিলের সহযোগে বিবাহের এক Contract করিয়া লয় এবং তাহাতে উকিলের সার্ভিং ক্লার্কদ্বয় সাক্ষী হয়েন।

কিশোর ও জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহের সময় রূপচাঁদ উকিলসহ উপস্থিত হইয়া বাধা জন্মায়। ঘনশ্যাম টাকা দিতে চাহিলে উকিল ভয় দেখান "উনি Specific Performance of Contract এ বিবাহ দিতে bound, আমরা যদি টাকা না নিই"। কিন্তু দুলাল বিবাহ করিতে নারাজ হওয়ায় রূপচাঁদের সমস্ত দাবী-দাওয়া বিসর্জ্জন দিতে হয়। হতভাগ্য উকিল আক্ষেপ করিয়া গেল :—

"ইস্ মস্ত Caseটা হাত ছাড়া হ'ল, একটা nice point of law discuss হতো"।

উকিলের সম্বন্ধে "বেল্লিকবাজারের" 'খুদিরামের' মুখে একটু উক্তি আছে :—

"একটু ভাল সুট হ'লে খালি postpone লওয়া, opposite partyকে হয়রাণ করা, যত হয়েছে Coward, তেমন জিদি লোক হ'লে একটা Suit এ তিন generation কাটান যায়।"

এতদ্ব্যতীত "মায়াবসানে" বহুস্থানে পঞ্চায়েত সালিসের কথা আছে :—

("পঞ্চায়েত ক'রে মোকদ্দমার সর্ব্বনাশ করুন")

আবুহোসেন নাটকেও 'কাজীর বিচার' আছে।

সর্ব্বত্রই অভিজ্ঞতা লক্ষিত হয়।

৯০। MEDICINE

"মায়াবসানে" ডাক্তার গুঁই কালীকিঙ্করকে Asylumএ পাঠাইতে চাহেন ও বলেন যে সে উন্মত্ততাবশতঃ পোর্টের সহিত বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

"হারানিধির" ধরণী ডাক্তার Patientকে বাঁচাইবার জন্য দরওয়ানের খাটিয়া ভাড়া করিয়া দেয় ও Wardএ জায়গা না থাকায় Out Houseএ রাখিয়া দেয়।

"প্রফুল্লে" হাতুড়ে ডাক্তার কাঙালীচরণ যোগেশের "ঘামও হচ্ছে, শীতও কচ্ছে" দেখিয়া Alcohol এর Reaction বলিয়াছিল।

সুরেশ জেলে পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মেটের প্রহার খাইয়া রক্ত বমি করিয়া হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত হয়।

আর যাদবকে জল না দিয়া মারিবার চেষ্টা হইলে তাহার গায়ে ছুঁচ ফুটিতে থাকে ও আগুন জ্বলিতে' থাকে কিন্তু ঠিক সময়ে সুরেশ প্রভৃতি আসিয়া পড়িলে ডাক্তার বলে "কোন ভয় নাই, Pulse steady আছে" ও একটু দুগ্ধ দিয়া তাহাকে সুস্থ করে, যদিও ইতিপূর্ব্বে রমেশের ডাক্তার Delirium এর নাম শুনিয়া Blister এর ব্যবস্থা করিয়া ফি নিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

"হারানিধিতে" নব প্রভৃতির ষড়্‌যন্ত্রে হেমাঙ্গিনী অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা হয়। কিন্তু ধরণী ডাক্তারের সুব্যবস্থায় নীলমাধব, সুশীলা ও হৈমবতীকে দেখিয়া আরোগ্য লাভ করে।

"মায়াবসানে" কালীকিঙ্কর ঔষধের শক্তিতে উন্মাদ হয় কিন্তু রঙ্গিণীর শুশ্রূষা ও ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে আরোগ্য লাভ করে।

রঙ্গিণী—"আমি সত্যি বল্‌ছি, তুমি ভাল হয়েছ।"

কালী—"আমি ভাল হয়েছি, আর আমি পাগল নই।" ৩য় অঙ্ক, ৬গ।

"বলিদানে" মুকুন্দলালের একে "প্রস্রাবের ব্যামো তাহাতে আবার উরুস্তম্ভ কাটিয়া দেওয়ায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিতে হইত, কিন্তু 'অস্ত্রের রোগী যখন হিক্কা তুলিল' তখন আর উপায় রহিল না।"

জলে ডুবিবার পর হিরণ্ময়ীর Mortification set in করে, আর বাঁচিল না।

করুণাময়ও 'মা ডাক্‌চো' বলিয়া গলায় দড়ি দেয়। তাহার Nebulla ভাঙ্গিয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ কন্যাকে শীতল করিতে তাহার কাছে চলিয়া যায়; এদিকে স্বামিশোকে সরস্বতীর Heart এর action stopped হয়, Artery ছিঁড়ে যায় এবং সাধ্বী স্বামীর সহগমন করেন।

"শাস্তি কি শান্তিতে" গাড়ী হইতে পড়িয়া বেণী মর মর হয়, এবং Operation এ তাহার মৃত্যু হয়। প্রসন্নকুমার স্ত্রীর কাছে কাঁদিতেছেন, "ডাক্তার ডাকিয়ে বাছার পা কাটালুম, রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল, সেই রক্তে বেণীকে ভাসিয়ে দিলুম"।

আনৃছি, তোমার পায়ের গোলাম হয়ে থাক্‌ছি, তুমি আমায় দয়া কর, তোমার জন্যে প্রাণ যায়”—— ২য় অঙ্ক, ৪গ।

স্ত্রীর প্রতি পাশবিক আচরণে প্রফুল্লের প্রতি রমেশের ব্যবহারের কথা মনে হয়। ‘বিশ্বাস ভঙ্গ ক’রে বন্ধুর সর্ব্বনাশ,’ কাদম্বিনীর প্রতি কৃতঘ্নতা, বন্ধুকন্যার সতীত্ব-হরণের চেষ্টা, ভ্রাতৃবধূকে সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া পুনরায় সেই দোষ নিরীহ সদাশয় ডাক্তার (অঘোরের) উপর দেওয়ার চেষ্টায়, নাট্যকার মোহিনীতে উচ্ছৃঙ্খল, মনুষ্যত্ববিহীন, ‘বড়লোকের কলঙ্ক’—ধনাঢ্য-চরিত্র—অঙ্কিত করিয়াছেন।

স্ত্রীর কাছে সে বলিতেছে——

“তুমি মনে কর আমি মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে, গরীবের বাড়ী পাঠাই, দয়া শেখাতে? তা নয়—খবরের কাগজে লিখ্‌বে যে মোহিনী বাবু সদাশয়; তাঁর কন্যা দীনদুঃখীর বাড়ী বাড়ী গে, যার অন্ন নেই তারে অন্ন দেয়, দশটা বাড়িয়ে লেখে,—**এ খুন, দাগাবাজী, ঘর জ্বালানের হজমিগুলি।**

১ম অঙ্ক, ৬গ।

মোহিনী মনে করিত ধর্ম্মকর্ম্ম সব লোক শেখানো।

তবে রমেশের যেরূপ কোন সদ্‌গুণের লেশও ছিল না, মোহিনীর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল ঐকান্তিক কন্যাস্নেহ। মসীকৃত বস্ত্রে একটী সাদা চিহ্নেই অবশেষে তাহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি সে দুর্ব্ব্যবহারের অবধি করিত না কিন্তু মেয়ের প্রতি তাহার অগাধ স্নেহ ছিল। স্ত্রীকে ইতর ভাষায় কটূক্তি করিতে করিতে বলিতেছে——

“মেয়েটার জ্ঞান হয়ে অবধি তোর গায়ে হাত তুলিনি কিনা? তাই মার খাবার সক্ হয়েছে”——

অন্যত্র বলিতেছে——

“আমার মেয়ে না তোমার মত অপদার্থ হয়, মেয়েটাকে উচ্ছন্ন দিওনা—এই আমার কথা।”

হেমাঙ্গিনীর অসুখের সময় আর তাহার শত্রু মিত্র ভেদ নাই,

কন্যাকে নীরোগ করিতেই হইবে। তাহার বিশ্বাস নীলমাধবের (হরিশের পুত্র) ষড়্‌যন্ত্রে সে দুর্ব্বৃত্তের হস্তে প্রহৃত হইয়াছে, কিন্তু কন্যাটী আবার নীলমাধবকে দেখিলেই ভাল থাকে। এই মানষিক দ্বন্দ্বেও কন্যাস্নেহেরই জয় হইল, তাই

একবার ভাবিতেছে——"ওরি মতলবে হয়েছে। লুট করাবো, খুন ক'রবো, রাস্তার লোক দে বলাৎকার করবো, কাট্‌বো, মারবো, না হয় ফাঁসি যাব।" আবার হেমাঙ্গিনীকে বাঁচাইবার জন্যই এই শত্রুর সম্বন্ধেই ভাবিতেছে :——

"নীলকে দেখ্‌লে আমার মেয়েটা বড় ঠাণ্ডা থাকে, দূর হোক্, ও এই ষড়্‌যন্ত্রে থাকে থাকুক, ওরে ডাকাই, মেয়েটা ওকে দেখ্‌লে যেন রোগ সেরে যায়।.........যদি আমার হেমা ভাল হয়, নীলমাধব সহস্র-দোষে দোষী থাক্‌লেও ভুলে যাব!! ৪র্থ অঙ্ক, ৩গ।

এই মিলন হইতেই ক্রমে অনুতাপ এবং হরিশের সহিত পুনরায় সখ্যস্থাপন। এবং পরে হরিশের পুত্র নীলমাধবকে একমাত্র কন্যা অর্পণ করিয়া পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে।

১৩। নীলমাধব ও নীরদ

সহোদরচরিত্রের ন্যায়, পুত্রের মধ্যেও গিরিশচন্দ্র **নীলমাধবের** মত পিতৃমাতৃভক্ত, হৃদয়বান্ ও ঈশ্বরবিশ্বাসী চরিত্রও যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, আবার নীরদের ন্যায় হৃদয়হীন, কুচক্রী, কৃতঘ্ন পুত্রের দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত করিয়াছেন। পিতার দুর্দ্দশার সময়ে কর্ত্তব্য-পরায়ণ পুত্র নীলমাধব বলিতেছে "যদি সর্ব্বস্ব নিয়ে থাকে, আমি ত আছি—আমাকে ত মানুষ করেছেন; এতদিন আপনি সংসারের ভার নিয়েছিলেন, এখন সংসার আমায় দিন; সুখে নির্ব্বাহ ক'র্‌তে না পারি, দুঃখে নির্ব্বাহ করবো। আপনার চরণে আমার মতি আছে.........."

"হারানিধি" ১ম অঙ্ক, ৪গ।

নীলমাধব যখন কাদম্বিনীকে বলিতেছে——

"তুমি জাননা, ভগবান্ কলঙ্কভঞ্জন! তিনি তাপিতের আশ্রয়, তুমি

তাঁর শরণাপন্ন হও, দুর্ম্মতি দূর কর। এই মহারাজ্যে তোমার স্থান নেই, এ কথা মুখে আন? কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকলের স্থান আছে, আর তোমার স্থান নাই?"——

("হারানিধি" ২ অঙ্ক, ২গ)

তাহার ভগবদ্‌বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার পরিচয় পাই।

পিতৃশত্রু মোহিনীর সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত গুণনিধি সরকারকে যখন সে বলিতেছে—

"একবার লোভের বশীভূত হ'য়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ—, এবার রাগের বশীভূত হয়ে আর একজনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চাচ্ছ? ছিঃ ছিঃ বয়েস হয়েছে এখনও শেখ; এস তোমায় কোলে ক'রে নিয়ে যাই, এ গলির রাস্তায় ত গাড়া পাওয়া যাবে না।"——

তাহার অদ্ভুত ক্ষমাশীলতার পরিচয় পওয়া যায়। আবার অঘোর, নব ও কাদম্বিনীর চক্রান্তে যখন দুষ্ট মোহিনী লাঞ্ছিত হয়, মোহিনীকে রক্ষা করিয়া সে অসীম উদারতার পরিচয় প্রদান করে।

মহানুভব যুবক কাদম্বিনীকে বলিল——

"যদি প্রতিশোধের ইচ্ছা ছিল, অন্য প্রতিশোধ কি নাই? যে তোমায় ঘৃণা ক'রে ত্যাগ করেছিল, তারে তুমি জগতের হিত ক'রে দেখাতে পার্‌তে যে তুমি মহতের অপেক্ষাও মহৎ".........

৪র্থ অ, ৩য় গ।

নব ও অঘোর আর মোহিনীর নিকট হইতে হরিশের বাড়ীর যে দলিল বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিল, মোহিনীকেই তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া সেই মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এবং ইহার চরম পরিচয় পাই যখন সে মাতা ও ভগ্নীসহ মোহিনীর বাড়ী আসিয়া হেমাঙ্গিনীর প্রাণ রক্ষা করে।

কিশোর কেবল পিতৃমাতৃভক্তই নয়, দশের এবং দেশের উপকারই তাহার জীবন-ব্রত। তাহার সৎযুক্তিতেই পিতা বরপণস্বরূপ প্রচুর অর্থলোভ পরিত্যাগ করে। যাহা হউক বিবেকানন্দ অধ্যায়ে ও নানাস্থানে এই চরিত্রের অল্পবিস্তর অলোচনা হইয়াছে।

নীরদ আবার ইহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। একান্নবর্ত্তী পরিবারে এইরূপ চরিত্র একটী প্রধান কণ্টক। এই চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকারের অদ্ভুত দক্ষতা প্রকট হইয়াছে।

তাহার সম্বন্ধে শরৎ বলিতেছে—

"যে বিচ্ছু দেখছি, সব প্যারো বাবা।"

"গৃহলক্ষ্মী" ৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গ।

পিতা শৈলেন্দ্র ও নীরদকে ঘরে কাজকর্ম্ম দেখিবার ভার দিয়াছেন, নীরদ রমেশের ন্যায়ই পিতার সহিত বেশ টিপিয়া টিপিয়া কথা বলিতেছে, আবার শৈলেনের সঙ্গে অশান্তি করিতেও বেশ সিদ্ধহস্ত—ঝগড়া করিয়া নহে, গালাগালি দিয়া নয়, মুরুব্বিয়ানা করিয়া, অস্ত্রের ঘায়ে লবণের ছিটা দিয়া। ঘরোয়া পার্টিসনের সময় শৈলেন্দ্র উপেনকে একসঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

শৈলেন্দ্র—নিতাইবাবু, আপনি বলুন, উনি আমায় শেখান, ঐ নীরের সঙ্গে আমি পারিনে। ও টিপে টিপে বুড়ো পিতামহর মত কথা কয়, আমার সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যায়।

নীরদ—কেন কাকাবাবু, আমি আপনার কখনো অসম্মান করি নাই, তবে কেন বাবার কাছে এমন মিছে বল্‌লেন।

নিতাই—নীরদ, তুমি এখান থেকে যাও।

নীরদ—(উঠিয়া) আমি যাচ্ছি, কাকাবাবু অন্যায় বল্‌ছেন। যেমন নিয়ম বাবা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই নিয়মে আমি চল্‌তে চেয়েছি—এই আমার দোষ। বাবার কাছে হিসেব নিয়ে আমায় যেতে হতো, উনি তো যেতেন না।

শৈ—নীরো, ব'স, আমি তোর নামে লাগাই নি, তুই যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া কত্তিস্, গালাগালি দিতিস্, তাতে আমার কিছু হ'তো না। আমি বল্‌তুম—'বাবা, আমার খরচটা না হ'লে চল্‌বেনা, তুই মেজদাদাকে ব'লে এটা পাশ ক'রে দিস্।' তুই 'ন্যায্য—অন্যায্য—উচিত—অনুচিত' এই সব বল্‌তিস—তাই তো আমার—

নী—তাইতে বল্‌তেন—'তোর তো বাপের বিষয় খরচ কচ্চি নে'।

শৈ—সেটাকি আমি সত্যি সত্যি বলেছি? তা হ'লে ভয় ক'রে তোর কাছে চাইবো কেন?

নী—সত্যি মিথ্যে আমি জানিনে, সে আপনারা বুঝুন।

২য় অঙ্ক, ১ গ।

এই স্থানেই চরিত্রটী বেশ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে শৈলেন্দ্র ও মন্মথের সহিত ঝগড়া করিয়া হীরুঘোষালকে সমর্থন করায় তাহা আরও পুষ্ট হইয়াছে। শৈলেন্দ্রের মুখের উপরে বলিতেছে—

"আপনি একজন ভদ্রলোককে অপমান ক'রে তাড়াতে পারেন না, আপনার একলার বাড়ী নয়।"

শৈ—একলার বাড়ী নয়? তোর বাড়ী, দেখি তুই কি ক'রে হীরেকে রাখিস্? মোনা, বেটার হাত ধ'রে বার ক'রে দে।

নী—ওঃ তাইতো বলি ভেতুড়ের এত আস্পর্দ্ধা হলো কি ক'রে? আপনিই সব শিখিয়ে শিখিয়ে দেন?

শৈ—শিখিয়ে দিই—খুব করি! (হীরুঘোষালের প্রতি) বেরো শালা—দরোয়ান—দরোয়ান—

নীরদ—দরোয়ান ডাক্‌বেন না, দরোয়ান আমাদেরও মাইনে খায়। হীরুবাবু, বাবার বৈঠকখানায় গিয়ে বসুন। ২য় অঙ্ক, ৪গ।

গিরিশচন্দ্র এই চরিত্র আরও পুষ্ট করিয়াছেন যখন উপেন্দ্রের সম্মুখে নীরদ শৈলেন্দ্রকে বলিতেছে—

"উনি এখন কত রকম বল্‌বেন! উনি আমার নামে কি না বল্‌ছেন!"

শৈ—কি কি? তোর নামে কি কি বলেছি বল্।

নী—আর কি বল্‌বেন? বাবা কবে মর্‌বেন, আমি টাঁকছি, আমি কার সঙ্গে ইসারা করি! আর কি ব'লে সন্তুষ্ট হন—শোন। আমি সত্য পথ ধ'রে আছি, আমি তাতে ভয় করি না।

শৈ—তোর আগাগোড়া মিছে!

নী—আপনার মত অত শিক্ষা আমার নাই।

শৈ—দেখ্, ছুচোঁ জুতো খাবি!

নীরদ—দেখুন, আমার অপরাধ দেখুন।

২য় অঙ্ক, ৭গ।

শৈলেন্দ্রের মর্ম্মে আঘাত করিয়া পিতার নিকট তাহাকে রাগত দেখাইয়া নীরদ আপনার বেশ ছাপাই প্রমাণ করিল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে এই চরিত্র আরও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে সরলপ্রাণ শৈলেন্দ্রের নিকট হইতে রিভলভার লইয়া গিয়া পাঁচহাজার টাকায় শরৎকে বাধ্য করিয়া কুমুদিনীর বাড়ীতে শৈলেন্দ্রের নামে মিথ্যা attempted murder খুনের অভিযোগ উপস্থিত করে।

শৈলেন্দ্র যখন উপেনকে লাঠি মারিয়া কুমুদিনীর বাড়ী চলিয়া যায়, তখন তরঙ্গিণী কথা বলিতে উপক্রম করিলে নীরদ বিশেষ কৌশলে তাহাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করে, যেন ভাইএর রাগ তাহাদের উপর না পড়ে।

ক্রমে শৈলেন্দ্রের অসুখের সময় সেবাশুশ্রূষার ছলে অনেকগুলি হ্যাণ্ডনোট এনডোরস্ করিয়া লইয়া পার্টিসন সুট করিয়া শৈলেনের সব টাকা কড়ি হাত করে। আবার "লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে মন্মথের উপর আর বিরজার উপর শৈলেনের মত ভাঙ্গিয়ে," এবং 'বাবা পাগল হয়েছে বলে' আদালতে দরখাস্ত করে।

আমরা নিম্নে এই পুত্রের সম্যক পরিচয় পাই যখন সে উপেনকে ধরিবার জন্য ইনস্পেক্টার নিয়া আসিয়াছে, নিতাই উকিল সার্জ্জনকে সব বুঝাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি উপেন্দ্রকে লইয়া যাইতেছেন—

উপেন্দ্র—দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাছার মুখকান্তি দেখছি, চাঁদমুখ দেখছি, আমার বংশের তিলককে দেখছি——

বৈদ্য—এসো, এসো।

নীরদ—(তরঙ্গিণীর প্রতি জনান্তিকে) মা, দেখ না, আমি যদি গারদে না দিই তো আমার নামই নয়!

উপেন্দ্র—মরি মরি নীরদচন্দ্ররে! ৪র্থ অঙ্ক, ৮গ।

উপেন্দ্রের কথায়ই নীরদের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়—

"কুলতিলক, কুলতিলক, বংশ পবিত্র ক'রে জন্মেছ!—ধন্য তুমি, তোমার গর্ভধারিণী ধন্য, তোমার জন্মদাতা ধন্য!"

নীরদের চরিত্রও যেমন নিখুঁতভাবে সৃষ্ট, আবার ইহার উপর মায়ের প্রভাবও সম্পূর্ণরূপেই প্রতিফলিত। খিরজা মন্মথ সম্বন্ধে তরঙ্গিণীকে যে দুইটী কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই উহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়:—

"নীরে পড়া পার্‌তোনা, স্কুল পালাতো, ও সব বল্‌ত ব'লে সেই ইস্তক তোমাদের রাগ।" তরঙ্গিণীরও অভিযোগ—"দিদি, তুমি নিরেকেই দোষো।" ২য় অঙ্ক, ৪র্থ।

পঞ্চম অঙ্কে দেবেন্দ্রবাবুর হস্তেও নীরদ-চরিত্র সমভাবেই পুষ্ট হইয়াছে।

"মায়াবসানে" **মাধব ও যাদবের** সহিত নীরদের কতকাংশে ঐক্য থাকিলেও, রমেশের ন্যায় নীরদেরও তুলনা নাই। যাদব ও মাধবের বরং কিছু এজুকেশন ছিল; উকিলের সহিত কথোপকথনে, শান্তিরামের কথায় 'তোমাদের লেখাপড়ার গুণ,' তাহাদের মুখনিঃসৃত বড় বড় কথায় "Unparliamentary" "Political education," "Female emancipation" প্রভৃতি কথায় ইংরাজী শিক্ষার কতক পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু নীরদের পড়াশনা কিছুই হয় নাই। মাধব-যাদবের কালীকিঙ্করের সহিত বাক্যালাপে বরং কিছু শিষ্টতা আছে, কিন্তু নীরদ কেবল অশিক্ষিত নয়, পিতাকে "কেন মশার, আমি তো কিছু বলি নাই" উক্তিতে শিষ্টাচারের বিন্দুমাত্র লেশও পাওয়া যায় না।

নীরদ যেমন ফুলীকে প্রলোভিত করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া পেত্নী-বেশিনী বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়, মাধবও রঙ্গিণীকে 'কলঙ্কিত কর্‌বার ইচ্ছায় চাকর শান্তিরামকে টাকা কবলিয়েছিল'। তবে বাঘিনী মাতা তরঙ্গিণীর ও পুত্রশিক্ষায় উদাসীন পিতার পুত্র নীরদ অবশেষে নরঘাতক পিশাচরূপে পরিণত হয় কিন্তু মাধব এবং যাদব কর্ত্তৃক প্রথমে বহু অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও ক্রমে অনুতাপ-বলে উহারা আত্মাপরাধ স্খালন করিতে সমর্থ হয়। গিরিশ ইনস্পেক্টার দীনুর মুখে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"পুলিসের চাক্‌রীতে রকম রকম দেখ্‌তে হয়। গোড়ায় ভাল বীজ পড়েছে, বোধহয় এ্যাদ্দিনে কাঁটাবন ঠেলে তাই গজাচ্ছে। বিপদের কোদালে বড় কাঁটাগাছ চেঁচে ফেলে।"

"মায়াবসান" ৪ অঙ্ক, ২ গ।

১৪। ভজহরি, অঘোর ও হলধর।

"প্রফুল্লের" **ভজহরি** "হারানিধির" **অঘোর** ও "মায়াবসানের" **হলধর,** তিনজনই বয়াটে, কিন্তু বুদ্ধিমান। কয়টী চরিত্রসৃষ্টিতেই নাট্যকারের অদ্ভুত দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়; ইহারা কলার দিক্ দিয়া যেরূপ সরস, নাটকেও খুব ভাল জমে। ভজহরি সম্বন্ধে রমেশের ন্যায় বুদ্ধিমান উকিলও সার্টিফিকেট দিতেছে "খুব চালাক"। কেবল সার্টিফিকেট নয়; ভজহরির বুদ্ধির কাছে রমেশের সমস্ত ষড়্‌যন্ত্রই একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়। অঘোরও বুদ্ধির প্রভাবে দরোয়ানের বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা চুরি করে, জমিদার তেজবাহাদুর সাজিয়া মোহিনীকে নানারূপ ফাঁদে ফেলে, অবশেষে মোহিনীর নিকট হইতে হরিশের দলিল কাড়িয়া লয়। অঘোরের বুদ্ধি সম্বন্ধে সে নিজেই বলিতেছে——

"জোচ্চোর সেয়ানা হয় রে ব্যাটা?"

নব—হয় না? এই যে তুই বেটা ঘাগি!

অঘোর—সেয়ানা কিসে দেখলে? বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে দরওয়ানের বাক্স ভাঙ্গি, ক্যাস বাক্স (Cash box) রাহাজানি করি, অন্ধ নাচার্ সেজে পেঁচার মতন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই; সেয়ানা হলেম?··· সাত ঘাটের পানি খেয়ে বেড়াচ্ছি, কোন ব্যাটা চিন্‌তে পারলে সেয়ানাতামো বেরিয়ে যাবে, সেয়ানা হ'লে কি বাবা দুর্ম্মতি হয়?——

২য় অঙ্ক, ৫ গ

আর হলধরকে ক্ষণজন্মা সাতকড়িও বলিতেছে——

"তুমিও ক্ষণজন্মা, তোমার যা কৌশল, আমি তোমার কাছে কোথায় লাগি।···ফন্দীবাজ না হ'লে ব্যাটাছেলে?

"মায়াবসান" ৩য় অঙ্ক, ২ গ।

তিন জনেই প্রায় অশিক্ষিত, তবে হলধর কেবল আমোদ করিয়াই বেড়ায়, শান্তিরামের সঙ্গে একটু আধটু ইয়ারকি দেয়, সাতকড়িকে মার খাওয়ায় ও নাকাল করে। তবে তাহার চরিত্রের কোনও দোষ সম্বন্ধে নাটকে উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ভজহরি সম্বন্ধে কাঙ্গালীচরণ বলিতেছে——

"আমার একটা বওয়াটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মত চালচলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চলে যায়।"

৩য় অঙ্ক, ১ গ।

রমেশকেও ভজহরি বলিতেছে :——

"আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্ণৌয়ে পুটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে। শ'দুই টাকা নইলে ফের ঢুক্‌তে পারবোনা," ৪র্থ অঙ্ক, ২ গ।

তৎপরে বলে "আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্গটা খাবো, সব কথা কি মনে থাক্‌বে? কাল টাট্‌কা টাট্‌কা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব।"···

অন্যত্র শিবনাথকে সে বলিতেছে :——

তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও। তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও পুটিয়াকে নিয়ে থাক্‌বো——

৪র্থ অঙ্ক, ৫ গ।

আর বওয়াটের শিরোমণি অঘোর নিজের পরিচয় নিজেই দিতেছে—

সে (স্ত্রী) আমায় চিন্‌তে পারবে কেন? বে হ'য়ে জোর দিন পোনের ঘর করেছে; তা তৃতীয় প্রহরে মদ ভাঙ খেয়ে গিয়ে পড়তুম, ভোর না হ'তে হ'তে সর্‌তুম; বাবাকে শুধু জানান যে, রাত্তিরে বাড়ী এসেছি।

১ম অঙ্ক, ২ গ।

কালীকিঙ্করের বৃহৎ সংসারে কাহারও নিকট হলধরের যত্নের ক্রটী ছিল না, আর অঘোর 'সৎমার তাড়নায় ও বাপের অযত্নে এণ্ট্রান্স ফেল হ'য়ে পড়াশুনা ছাড়ে' ও ঘুরে ঘুরে বেড়ায়··· ৫ম অঙ্ক ২ গ।

কিন্তু ভজহরির দুঃখের সহিত কোন দুঃখেরই তুলনা হয় না। ভজহরি সুরেশের নিকট আত্মচরিত ব্যক্ত করিতেছে :—

"একদিন খেলে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীশুদ্ধ কাঁদছে! কি সমাচার? না জমিদার আমার বাবাকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝ'রে পড়েছে, প্রাণ ধুক্ ধুক্ কচ্ছে, সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরেন। তারপর জমিদার বাহাত্তর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন, ছেলেপেলে নিয়ে মা ঠাকুরুণ বেরুলেন, দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দু'টী পান আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান। একদিন তো গাছতলায় পড়ে মরেন—

—তারপরে ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাই গুলো সব একে একে পড়লো আর মলো, বোনটাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদতে লাগলেম। তারপর আর সন্ধান নাই।...তারপর মামা বাবুর কাছে গিয়ে পড়লুম। গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রান্না, মামাবাবুর বেত আর মামী ঠাকরুণের ঠোণার সঙ্গে ফেণে ফেণে ভাত? জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।"

৫ম অঙ্ক, ২ গ।

'অশোকের' আকাল ও 'শ্রীবৎস চিন্তার' বাতুলের দুঃখের সহিত ভজহরির দুর্দ্দশার তুলনা হইতে পারে। আকাল ও বাতুল রাজানুগ্রহে প্রাণরক্ষা পাইয়া যেমন প্রাণদাতা রাজার মহোপকার সাধন করে, ভজহরিও সুযোগ পাইয়াই সুরেশের সহায়তা করে, নিজের মামামামীকে বিপদাপন্ন করিয়াও যাদবের প্রাণরক্ষা করে। ইহার পরে আর এই সরস ও সংক্ষিপ্ত চরিত্রের অন্য কোন পরিচয় না থাকিলেও নাট্যকার ভজহরির পরবর্ত্তী চরিত্রের কতক পরিচয় দিয়াছেন। প্রফুল্লের মৃত্যুতে ভজহরি বলিতেছে——

"মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়।"—

নাট্যকার একটী নারীরত্নের প্রভাবে অঘোরেরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। এ নারী অন্য কেহ নহে, অঘোরেরই স্ত্রী—হরিশের কন্যা সুশীলা। নানারূপ ফন্দী ও রাহাজানি করিয়া পরের সর্ব্বনাশ করিলেও, খুড়শ্বশুর নব'র সঙ্গে আসিয়া রাত্রিতে দূর হইতে দেখিতে পায় সুশীলা তাহারই একখানি ফটো লইয়া প্রাণ ভরিয়া তাহা পূজা করিতেছে। ধ্যান নিরতা সাধ্বী পত্নীর দিব্য ছবি দেখিয়া অঘোরের এই

প্রথম ধারণা জন্মিল "নারীরত্ন!" ক্রমে তাহার সুপ্ত বিবেক জাগ্রত হইল, কিন্তু তবু সে পত্নীর সহিত দেখা করিতে পারে না। মনে ভয়ানক সংগ্রাম চলিল, এই প্রথম ভাবিতে লাগিল "আমি চোট্টা, জেলে যাব, মাগ নিয়ে ঘরকন্না কি আমার সাজে? এ রত্ন আমার ঘরে ছিল, বিনা আলোতে ঘর আলো কর্‌তো, কাদায় ছুঁড়ে ফেললুম। একবার একজামিনার সাহেবকে (Examiner Shaheb) মনে পড়ে, যদি তিনটে নম্বর দিয়ে পাশ করে দিত, বোধহয় আর এক রকম জীবন হ'ত। হাতে পেয়ে চিন্‌তে পারিনি বাবা! বানরের গলায় মুক্তার মালা পড়েছিল, দাঁতে কেটেছি।" ৩য় অঙ্ক, ২ গ।

এই বিবেকের তাড়নায় অঘোর সেস্থান পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু একবার দূর হইতে বলিয়া গেল "সুশীলা! যদি দিন পাই দেখা হবে।"

ক্রমে অঘোর সুশীলার উপযুক্ত স্বামী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যে একদিন স্ত্রীকে দেখিয়া বলিয়াছিল "পুলিশের হাত এড়াব, **আমার মতি ফিরবে**, তবে ত এ রত্ন পাব! সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।"—তাহার বাস্তবিকই মতি পরিবর্ত্তিত হইল, সুশীলার প্রভাবে সে খাঁটী মানুষে পরিণত হইল। ভাগ্যক্রমে যখন মামীর উত্তরাধিকার-বলে উকীলের আফিস হইতে ৬০০০৲ প্রাপ্ত হয়, তখন ধনীরাম, গুণনিধি হইতে মোহিনী পর্য্যন্ত যাহার যাহার নিকট হইতে জুয়াচুরি করিয়া লইয়াছিল সকলকেই অতিরিক্ত টাকা দিয়া পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিল। তাহার এই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তেজবাহাদুর সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"মিতে, আমি তোমায় সহজে মিতে বলিনে, আমি লোকের দোষ স্বীকার ক'র্‌তে শুনেছি, চেপেচুপে যেখানটা না বল্‌লে নয়; কিন্তু তুমি যখন অকপটে দরওয়ানের দশটাকা চুরি পর্য্যন্ত সমস্ত বল্‌লে, তখন আমি ভাবলুম অতি মহৎলোক; দৈববিপাকে এই সব হয়েছে।"

৫ম অঙ্ক, ১গ।

এত শীঘ্র অঘোর কিরূপে 'মনের ময়লা তুল্‌তে' সমর্থ হয়, সে সম্বন্ধেও

নাট্যকার স্পষ্টই বলিয়াছেন। অঘোর যখন সকলের সমক্ষে তাহার দেবীমূর্ত্তির পরিচয় দিতেছে——

"যে উজ্জল মূর্ত্তি প্রাণের ঘোর তম নাশ করে, যে বিমল-প্রতিমা পাষাণ হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি অঙ্কুরিত করে, আমার হৃদয়ে অনুতাপ আনে, সেই দেবীকে তখন দর্শন করেছিলুম——সে বিধাতার ধ্যানের সৃষ্টি! নন্দন-কুসুম অকলঙ্ক-শশী! সে প্রতিমার তুলনা নাই; প্রাণময়ী—প্রেমময়ী মূর্ত্তি!"——

উকীল-প্রমুখ সকলেই বুঝিতে পারিল—

"ক্লীয়ার, ক্লীয়ার এ্যাজ ডে লাইট, গিভ্ মি ইয়োর হ্যাণ্ড, ইউ আর এ চেঞ্জড্ ম্যান"—"clear clear as daylight! give me your hand, you are a changed man."

মিলনের পূর্ব্বেও অঘোর স্ত্রী সম্বন্ধে বলিতেছে——

"এ রত্ন আমার নয়, এক রকম ধ্যানের পূজোয় আছে, সে বেশ।"

আর মিলনের পরেও বলিতেছে "ময়লা ধুলে যায় না বাবা, কিন্তু চুরিটে চামারিটে করছি নি, ঐ (সুশীলা) জামিন রইল।"

এই অঘোরই হরিশের **"হারানিধি।"**

ভজহরি ও অঘোরের পূর্ণাভিব্যক্তিই রঙ্গলাল (ভ্রান্তি) বা পাগল (শাস্তি কি শান্তি)। গিরিশচন্দ্র রঙ্গলালের মুখে বলিয়াছেন "সংসারে এসে যে পুড়তে পারে, সেই নবযৌবন পায়।" "শাস্তি কি শান্তি"তে পাগলও "প্রকাশকে বলিতেছে" যেমন সাধু ম'রে লোচ্চা জোচ্চোর হয়, তেমনি লোচ্চা জোচ্চোর ম'রে আর এক জন্ম নিতে হবে।" এই সমস্ত চরিত্রও মরিয়া ও পুড়িয়াই খাঁটী মানুষে পরিণত হয়।

হলধরের উপরও রঙ্গিণীর প্রভাব দেদীপ্যমান, রঙ্গিণীর সদাদর্শেই সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারে। উপরিউক্ত দুইটী চরিত্রের——ভজহরি ও অঘোরের সহিত হলধরের কিছু সামান্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও "গৃহলক্ষ্মী"র **মন্মথের** সহিতই তাহার তুলনা করা যায়।

সাতকড়ির প্রতি হলধরের উক্তি "দাদার এ তত্ত্বজ্ঞানটুকু আছে নাকি?" হীরুঘোষালের প্রতি মন্মথের উক্তিরই অনুরূপ—"তা ঘোষাল

মশায় সেথায় যান নাকি?" মন্মথ "পরোপকার করে, রাস্তা থেকে লোক তুলেনে'গে সেবা করে, নিরন্নকে অন্ন দেয়" হলধর সম্বন্ধেও কালী-কিঙ্কর বলিতেছেন "তুমি লেখা পড়া শেখনি, তাতে আমি দুঃখিত নই। তুমি পরের উপকার ক'রে বেড়াও শুন্‌তে পাই, তাতে আমার আনন্দের সীমা নাই।"

মন্মথকে যেমন বৈদ্যনাথ বলিতেছেন "মন্মথ, তুমি কি মনে করেছ, কোন কুকার্য্যের দ্বারা সৎকার্য্য হয়?" হলধরের প্রতিও কালীকিঙ্কর সেরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন "যদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি কুকাজ দ্বারা কখনও সুফল ফলে না।"

যাহা হউক এই সমস্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ মনে করেন রঙ্গিণী ফুলীর বা মন্মথ হলধরের নামান্তর মাত্র—তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইবেন। মন্মথ শিক্ষিত যুবক, "পড়াশুনায় ওর সঙ্গে কোন ছেলে পারে না" গার্হস্থ্য ও সূপকার্য্যে নিপুণ এবং ফুলের ব্যবসায় (Nursery) করিয়াও বেশ দু'পয়সা রোজগার করে, (সাহেবরা খুব পছন্দ ক'রে খুব দাম দিয়ে ফুলের তোড়া কিনে নিয়ে যায়)। এক কথায় উপেন্দ্রের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হয়—"ওর মতন ছেলে হাজারে একটা দেখ্‌তে পাই না।"

"গৃহলক্ষ্মী" ১ম অঙ্ক, ১ গ।

আর হলধরের পড়াশুনা কিছুই হয় নাই, "চিরকাল বাউণ্ডুলী ক'রে বেড়ায় ও বাণ খেলে।" অন্নপূর্ণা বলিতেছে—"লেখাপড়া শিখ্‌লিনে, একটা কাজ কর্ম্ম কর, তা নইলে বেটা ছেলে বাড়ীতে ব'সে থাক্‌লে মেজাজ খারাপ হ'য়ে যাবে।"

মন্মথের কুকার্য্যে হস্তক্ষেপ সদুদ্দেশ্যে। তাহার মাতৃতুল্যা স্বার্থত্যাগের জ্বলন্তমূর্ত্তি বিরজার সংসার নীরদ জুয়াচুরি করিয়া নষ্ট করিতেছে, নীরদের জুচ্চুরি নষ্ট করাও তাহার সর্ব্বনাশ করাই [আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেখ্‌বো ওর কত জুচ্চুরি?] মন্মথের চিন্তা। আর হলধরের কুকার্য্য কেবল নিষ্ফল আমোদের জন্য, তামাসা দেখিবার জন্য। হলধর সংসার ভাঙে, আর মন্মথ সংসার গড়ে। তাই হলধর বলিতেছে—"পাপের রীতি

বটগাছের বীচি বাবা! **চাতুর্য্যেকে প্রোক্ষা দিতে** পাপের বীচি পুঁতলুম, দিব্যি ফলফুলে দিগ্ব্যাপী সাজন্ত গাছটী হ'য়ে উঠেছে! বটগাছ বাড়ী ভাঙে, আমি গাছ পুঁতে সংসার ভাঙলুম!

৫ম অঙ্ক, ২য় গ।

আর মন্মথ সংসার রক্ষা করিতে বিরজাকে যথেষ্ট সহায়তা করে।

এতদ্ব্যতীত ফুলীর ও মন্মথের প্লেটোনিক ভালবাসা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। মন্মথের প্রতি ভালবাসার বলেই ফুলী ছায়ার ন্যায় তাহার সমস্ত কাজ করিয়া বেড়াইত, আর রঙ্গিণীর ও হলধরের পরস্পরের প্রতি বিশেষ কোন টান ছিল বলিয়া মনে হয় না। সত্য বটে রঙ্গিণীর উদ্দীপনায় হলধর অলস কৌশল পরিত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণাকে বাচাইতে দৃঢ়পরিকর হয়, কিন্তু তাহাতে ভালবাসার কোন লক্ষণ বা ইঙ্গিত কুত্রাপি নাই।

ভজহরি, অঘোর ও হলধরের ন্যায় দুলাল ও মোহিত চরিত্রেরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। 'বেলেল্লাগিরিতে' যাহার দ্বিতীয় নাই, মেয়েমানুষ ছাড়া যাহার মুখে কথা নাই, "কুঁজো ও ল্যাং" লইয়া করুণাময়ের কন্যা জ্যোতিকে বিবাহ করিবার জন্য যে পাগলের ন্যায় কোন অপকার্য্য করিতে ক্রটী করে নাই, **সেই দুলালচাঁদ এখন** জোবির কৃপায় দরদ চিনিল, ভালবাসা কি বুঝিল, জ্যোতিকে দেখিয়া দুনিয়াকেই আর এক চক্ষে দেখিল, তাহার মনের ময়লা কাটিয়া গেল। আপনাকে ভাসাইয়া দিল, জ্যোতিকে মায়ের পেটের ভগ্নীর ন্যায় সুখী করিতে প্রাণ ভরিয়া যৌতুকসহ কিশোরকে সম্বর্দ্ধনা করিল। 'প্রেমে' দুলাল মানুষ হইল।

তাই দুলাল বলিতেছে—"জ্যোতিকে দেখে অবধি আমি এক রকম হ'য়ে গেছি। দেখছো তো, বাড়ী থেকে বেরুই নি। ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি নি। বাগানে যাইনি। বাবা, কিশোরবাবুর সঙ্গে আমোদ ক'রে বে' দিয়ে ঘরে ফিরে চলো।"

সকলেই দেখিল দুলালের 'আত্মা কর্ত্তা মহাম্।'

রূপচাঁদ মিত্রের চরিত্রও খুব নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার পুত্র দুলালের মুখে তাহার চরিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। রূপচাঁদ পুত্রকে বলিতেছে ঃ—

"অ্যাঁ, তুই কি বল্‌ছিস্‌! তুই করুণাময়ের মেয়েকে জোর ক'রে বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিলি?"

তদুত্তরে দুলাল পিতার মুখের উপরই শুনাইয়া দিল—

"কেন বাবা, দোষ কি বাবা,—'বাপকো বেটা, সেপাই কো ঘোড়া!'—বিন্দি বামনীর কথা তো শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতি লোপাট করেছিলে বাবা! আমি তো ততদূর যাইনি বাবা!"

"বলিদান" ১ম অঙ্ক, ৩গ।

অন্যত্র দুলাল পিতার সম্মুখেই মায়ের কাছে বলিতেছে—

"বাবা ফন্দী ক'রে লোকের বিষয় গেঁড়া করতে পারে।"

২য় অঙ্ক, ১ম গ।

এই রূপচাঁদই করুণাময়কে জব্দ করিতে দৃঢ়ব্রত হয়—

"আচ্ছা দেখি, আমারও নাম রূপচাঁদ মিত্তির!"—

করুণাময়ের অপরাধ—সে তাহার বড় মেয়েকে দুলালের ন্যায় অপদার্থ জামাতার হস্তে অর্পণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

ক্রমে রূপচাঁদ কিরূপে মোহিতকে মিথ্যা এফিডেভিটে বাড়ী বিক্রী করিবার জন্য অভিযুক্ত করিয়া পুলিসের সহায়তায় হিরন্ময়ীর বিবাহের সময় বিবাহ সভায় লইয়া আসে,—যেন করুণাময় বিপন্মুক্ত হইবার জন্য দুলালের হাতে বাগ্‌দত্তা কন্যা অর্পণ করে—পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। কিন্তু রূপচাঁদের সব ষড়্‌যন্ত্রই নিষ্ফল হয়। দোকানদারদিগকে নালিশ করিতে উপদেশ দিয়া শালওয়ালারযোগে Body warrant (গ্রেপ্তারী পরওয়ানা) এর সহায়তায় বেলিফ দ্বারা করুণাময়কে রাস্তায় ধৃত করিয়া এবং বিপদাপন্ন করুণাময়কে আবার দরদ জানাইয়া ও সহায়তা করিয়া রূপচাঁদ যে সমস্ত ফাঁদ পাতিয়াছিল, নাটকে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ সময়ে করুণাময়কে তিরস্কারও ("তুমি না বড় সজ্জন লোক, তোমার না বড় কথার ঠিক?") নাটকে বেশ জীবন্ত

হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ এই চরিত্রাঙ্কনেও নাট্যকারের তুল্য দক্ষতাই লক্ষিত হয়।

রমানাথ সমাজের জঞ্জালস্বরূপ, হ্যাণ্ডনোটের দালাল, মদ খাইয়া স্ত্রীকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। পরের মেয়ে বাহির করিয়া মোহিতের সহায়তা করিতে দ্বিধা করে না, জোবিকে (অবশ্য তাহাকে সে চিনিত না) চুরি করিতে উপদেশ দেয়, নিজে ঘড়ি চুরি করে এবং Cruelty ইন্‌স্পেক্টার সাজিয়া লোকের নিকট হইতে পয়সা আদায় করে। জোবির ন্যায় পতিগতপ্রাণা পরহিতরতা গরীয়সী সহধর্ম্মিণীও তাহার চরিত্রের সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। এই চরিত্রাঙ্কণেও নাট্যকারের বিশেষ দক্ষতাই দৃষ্ট হয়।

"শাস্তি কি শাস্তির" **ঘেঁচি** ও "বলিদানের" **মোহিত** উভয়ই হৃদয়হীন পশু বিশেষ। ইহারাও বয়াটে, তবে অঘোর প্রভৃতি অন্যায় কার্য্যেও যেরূপ উন্নত-হৃদয়, ইহারা সেরূপ নহে। নৃশংসতায় ইহাদের তুলনা নাই। ঘেঁচি বিলাত হইতে আসিয়া সাহেব সাজিয়া নানারূপ বিদেশী জোচ্চোরিতে সিদ্ধহস্ত, আর মোহিত বিলাত না গিয়াই সকলকে Damn it বলিয়া অগ্রাহ্য করে। মোহিতের মতিয়া ও বিলাতপ্রত্যাগত ঘেঁচির পার্টিতে অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে নাচ্‌ প্রায় একরকমেরই। উভয়েই সুরাসক্ত। ঘেঁচি টাকা আদায়ের জন্য স্ত্রী প্রমদাকে চাবুক মারিয়া গৃহ-বিতাড়িত করিয়াছিল, আর মোহিত স্ত্রীকে 'নূতন মেয়ে মানুষ বাহির হ'য়ে এসেছে' বলিয়া দুলালের বাগানে লইয়া যাইতেছিল। মাতঙ্গিনীর অভিভাবকত্বে পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল, সর্ব্বেশ্বরও (ঘেঁচির পিতা) পুত্রের কুক্রিয়াসক্তিতে সহায়তা করিতেছিল। তবে মোহিতের মন প্রথম হইতেই কুটিল নয় বলিয়া তাহার রক্ষা হয়, আর কুমতলব, প্রবঞ্চনা ও অসৎভাব ঘেঁচির অস্থি-মজ্জা-গত থাকায় শেষ সময়েও সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আস্ফালন করে—

"বাবা, ম্যাজিষ্ট্রেট জুলুম কচ্ছে।"

মোহিত জীর্ণ মলিনবেশে কিশোরের নিকট যে অকপটচিত্তে

আত্মপাপ নিবেদন করিতেছিল সে দৃশ্যটী অতি চমৎকার। এই স্থানে অঘোরের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। অঘোরের যেরূপ স্ত্রীর প্রভাবে পরিবর্ত্তন, সেইরূপ মোহিতেরও।

"জেল থেকে এসে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম—স্ত্রী নিজে উপবাস গিয়ে আমায় অন্ন এনে দিতো। একদিন সে মূর্চ্ছা যায় তাই দেখলুম, কিন্তু কে জানে সেইদিন থেকে মনটা যেন আর একরকম হ'য়েছে। আর স্ত্রীর মুখের ভাত খেতে যেতেম্ না। দক্ষিণেশ্বরে সদাব্রতে খেতেম্, পঞ্চবটীতে প'ড়ে থাক্‌তেম্, পড়ে পড়ে কত কি মনে হ'তো।"

'সেবাধর্ম্মের' জনকস্বরূপ মহাপুরুষের লীলাস্থানে বার বার সেবাধর্ম্মই তাহার মনে আলোড়িত হইতে লাগিল। কিশোরের আদর্শে তাহার অসম্ভব পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং সমিতির সকল সভ্যই একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল :—

"মোহিত বড় চমৎকার লোক।"

অঘোর প্রভৃতির ন্যায় **মোহিত**ও "মরিয়া" নূতন মানুষ হয়।

মদন দাদা, গণৎকার ও শুভঙ্কর

চরিত্র কয়টী প্রায় একরকমের এবং নাটকে বেশ ফুটিয়াছে। মদনচরিত্রের বিয়েপাগ্‌লামিতে দীনবন্ধুর রাজীব মুখুর্য্যের কতক ছায়া পড়িয়াছে। মদনের 'বংশরক্ষা' ও গণকের "বিবেক করুণগো" মর্ম্মভেদী দৃশ্যের পর চাট্‌নির মত বেশ রুচিকর। উভয়ই আবার শেষ অবস্থায় একটী হিতকার্য্যসাধন করিয়া নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। মদন পাগল, আর গণৎকার হলধরের ভাষায় বলিতে গেলে 'এ ব্যাটা মানুষ মারে'। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে পাগল মদনেরও হৃদয়ের সংগ্রাম অত্যন্ত স্বাভাবিক। একদিকে পাহারাওয়ালার (জগমণির) ভয়, অন্যদিকে যাদবকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্র যাতনা।

প্রফুল্ল যখন বলিতেছে——

"কে ধরবে? ছেলে মারবে কি? আমায় শীগ্‌গির বল"—— মদনের উত্তরে তাহার হৃদয়-গত এই দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

মদন—না না, বল্‌বো না, আমি তার ভয়ে সিন্দুক ভেঙ্গে দলিলচুরি

ক'রে আনলেম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়লে না; ছেলে মারবে, না খেতে দে মার্‌বে, আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম। তাই *বেঁচে আছে—না না—দুধ দিই নি। আমি পালাই।"*

এই নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের মানসিক পরিবর্ত্তন দীনবন্ধুর বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োকে সজীবতা ও দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছে। প্রফুল্লের শিক্ষায় মদন মানুষ হয় এবং প্রথমে ধরিয়া লইয়া গেলেও সে পরে যাদবের প্রাণরক্ষা করে, আর রঙ্গিণীর শিক্ষায় গণৎকার তাহাকে "আজ থেকে তুই আমার মা, তুই যা বলবি আমি তাই শুনবো" বলিয়া হীনবৃত্তি ছাড়ে, অন্নপূর্ণার মোকদ্দমার সময়ে বিষ দেওয়া সম্বন্ধে সত্য কথা বলে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে তাহার প্রাণরক্ষা করে, আর আপনাকে অন্নপূর্ণার মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া "বিষের থলেটা গঙ্গায় দিলেম্, আর দুটো উদরে দিলেম্" বলিয়া নিজের সাজা নিজেই গ্রহণ করে।

শুভঙ্করের স্বস্ত্যয়নে যেমন "দক্ষিণেটী ও হাতে করা আর, ওর মেয়েটীর ও হাতের খাড়ু খোলা।" গণৎকারের ও "চণ্ডীটী ও পড়া আর বড় ছেলেটী ও মরা"। শুভঙ্করও গণৎকারের ন্যায় পাগলের শিক্ষায় আচার্য্যগিরি ছাড়িয়া কাঙালীদের পাত 'কুড়িয়ে' খাইতে প্রস্তুত হয়।

মদন ও গণৎকার প্রভৃতির সরলতায় তাহাদের পরিবর্ত্তন সাধন হয় কিন্তু প্রকৃতিগত কুপ্রবৃত্তি যাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে তাহাদের পরিবর্ত্তন একেবারে অসম্ভব। তাই জোবির মত 'সাক্ষাৎ দেবী' স্ত্রী পাইয়াও, কিশোরের তাহাকে 'স্থিতু কর্‌বার' যত্ন সত্ত্বেও তাহার চরিত্র 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং' ই থাকে। নাটকে এই চরিত্র কয়টীই চমৎকারভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

পীতাম্বর ("প্রফুল্ল") বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও শান্তিরাম ("মায়াবসান") বিশ্বস্ত ভৃত্য। প্রভুভক্তিতে উভয় চরিত্রই অতি সুন্দর হইয়াছে।

"প্রফুল্লের" কাঙালীচরণও খুব আশ্চর্য্য সৃষ্টি। তাহার পরিচয় ভজহরির কথায় পাওয়া যায়ঃ—

"মামাবাবু, মামীমা, তোমাদের তিনের ভিতর যে কে কম্ এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কর্ত্তে।"

সাতকড়ি, কালীঘটক ও হীরু ঘোষাল তিনজনই সমাজের জঞ্জাল বিশেষ। তবে কালীঘটক ও হীরু ঘোষাল লাভের জন্য সমস্ত কাজই করিতে পারে কিন্তু সাতকড়ির পরের অনিষ্ট সাধনে লাভালাভ নাই। Mischief for mischief's sake 'পরের অনিষ্ট হউক' ইহাই তাহার আনন্দ, এবং ইহাই তাহার জীবনের কাজ। সাতকড়ি চরিত্রে গিরিশচন্দ্র ফরাসী পণ্ডিত Rochefoucold (রুকোফুকোর) নীতি "পরের দুঃখই মানুষের আনন্দ" প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইলেও, আর্টের দিক্ হইতে কোন ত্রুটীই লক্ষিত হয় না। তিনটী চরিত্রই বেশ ফুটিয়াছে এবং তিনজনই বেশ রহস্যপ্রিয়; নাটকের অন্যান্য চরিত্র ইহাদের সংস্পর্শে বেশ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। কালীকিঙ্করের উন্মত্তাবস্থায় সাতকড়িকে গাউন পরাইয়া 'থলের' ভিতর প্রবেশ করান Shakespeare এর Merry Wives of Windsor এর "Falstaff" কে ঝুড়িতে পূরিয়া মলিন বস্ত্রে রজকগৃহে পাঠাইবার অনুরূপ।

উপরিউক্ত দুইজন গ্রন্থকারের নাম গিরিশচন্দ্র স্বয়ংই কথাপ্রসঙ্গে নাটকে উল্লেখ করিয়া পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন।

১৫। অবধূত।

"গৃহলক্ষ্মীর" **অবধূত** কবির অদ্ভুত সৃষ্টি। অবধূত স্নেহশীল, অকপট, অন্নদাতার পরিবারের হিতসাধনে যেরূপ তৎপর, দুষ্টের দণ্ড বিধানেও সেইরূপ সিদ্ধহস্ত।

অবধূত কখনও দুষ্ট হীরু ঘোষালকে দণ্ড বিধান করিতেছে—

("চাঁড়ালের ভূত কিনা, ভারী জোর করেছে, একটা ছাঁদন দড়ি পেতুম, কেমন চাঁড়াল ভূত দেখতুম, তোমায় আড়কাটায় টাঙাতুম")
—১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

কখনও উপেন্দ্রকে সদুপদেশ দিতেছে—

("একটা কুনো পেত্নী মজবুত পাই তবে তো। এ সেঁজো পেত্নীর হাত ছাড়াতে কুনো পেত্নী পারে, আর কারো সাধ্য নাই"),

কখনও ফুলিকে সহায়তা করিতেছে,——

"আজ দুপুর রাত্রে বেহ্মদত্যির বেটার বে, আমায় পুরোহিত্তগিরি কর্‌তে হবে"

আবার কখনও কুচক্রী নীরদকেও বিপদের সম্মুখীন দেখিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে:—

"আজ বড় ফ্যাঁসাদ, স'রে পড়ো—আজ স'রে পড়ো—চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাই।"

"মুকুলমুঞ্জরার" বরুণচাঁদের ন্যায় এবং "আনন্দরহোর" বেতালের ন্যায় অবধূতও 'তুরিতানন্দ' সেবন করিত। "মুকুলমুঞ্জরার" 'পরীর রাজা' 'ওড়াও' 'ভাঙ্গা মন্দির' প্রভৃতি কথা গৃহলক্ষ্মীতেও পুনরুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অবধূতের হেঁয়ালীগুলি নিরর্থক প্রলাপ নহে—ব্যঙ্গার্থে পরিপূর্ণ। যখন সে বলে "সেঁজো পেত্নীতে পেয়েছে," "ঐ ভুঁতো চাঁড়াল জুটিয়েছে," তখন সে হীরুঘোষালের দালালিতে কুমুদিনীর প্রতি শৈলেন্দ্রের আসক্তি জন্মিয়াছে এই ইঙ্গিত করিতেছে।

যখন সে বলে "রোগী গাঙ না পার কর্‌লে উপায় নাই," তখন সে উপেন্দ্রকে শৈলেন্দ্রের সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে বলিতেছে।

যখন সে বলে 'সেঁজো পেত্নীর তিন পুকুরে একটা ভূত থাকে'

তখন সে কুমুদিনীর ভালবাসার লোকের (শরতের) কথা বলিতেছে।

"আর জন্মে যখন রাজপুত্র ছিলেম, ঐ সেঁজো পেত্নীর ঝাঁকে পড়ি।"

এই কথায় সে বোধ হয় নিজের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতেছে।

"না ও বড় খারাপ, আমার ঘাড়ে চড়বে।"

"ফের বেটী বাবা, তোমার মা গছাবে?"

"ভৈরবীর ঝাঁক এসে পড়বে, গোপিনী বেটীরা ধরাখানাও কেড়ে নিবে"——

প্রভৃতি কথায় তাহার কামিনীতে ভয়ের অর্থ বুঝায়।

তবে যখন বলে——

"আমি নন্দের গোপাল, হামা দিয়ে বেড়াব" "আমি কার্ত্তিক হব, পূজো খেয়ে মা ব'লে ফুরুক উড়বো"——

তখন তাহার কথায় বুঝায়, মাতৃ-জ্ঞানে স্ত্রীলোকের সম্মুখে যাইতে সাহস হইতে পারে, কিন্তু মা বলিয়াই অধিকক্ষণ না তিষ্ঠিয়া প্রস্থান করিবে—অর্থাৎ তাহার আত্মপ্রত্যয় এখনো দৃঢ় হয় নাই বুঝিতে হইবে। যখন বলে "কিরে বেটী ওড়্‌তে চল্লি," তাহার অর্থ——"ষড়্‌যন্ত্র নষ্ট কর্‌তে যাচ্ছিস্।"

শরৎকে বলিতেছে "তুই মুচি ভূতের বাচ্চা।" অর্থাৎ "তুই সব অপকর্ম্ম কর্‌তে পারিস।"

নীরদের পরামর্শে শরৎ যখন শৈলেনকে আহত করিতে কুমুদিনীর বাড়ীর দিকে চলিয়াছে, অবধূত ঠিক বুঝিয়া বলিতেছে——

"ইস, একটা ঝনঝনে ভূত তোর পেটের ভেতর সেঁধিয়েছে।"

নীরদকে যখন বলিতেছে,

"সরে পড়ো, আজ সরে পড়ো, আজ ঝুঁাক পরী উড়ে এসে ঐ বেলগাছে বসেছে!"——

তখন সে নীরদকে অতিথিশালার অভ্যন্তরে আসিতে নিষেধ করিতেছে।

৪র্থ অঙ্ক, ৬গ—

"ইস বাঁধতে হবে, নইলে আজ খুনখারাপি কর্‌বে।"

কথায় যেন মনে হয় অবধূত নীরদের ভবিষ্যৎ কীর্ত্তিকাহিনী তাহার মুখে স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখিতেছে।

ফুলীকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও স্নেহের চক্ষে দেখে! শিবভক্ত অবধূত তাহাকে খাবার দিয়া বলিতেছে——

"নে গোটা কতক তুলে নে, কুমারী সেবা হোক্।"

আবার বলিতেছে

"বেটীর ডাকিনী অংশে জন্ম,—না যোগিনী অংশে—না নায়িকা অংশে।" ৩য় অঙ্ক, ৪গ।

এই সমস্ত কথায় মনে হয় কীর্ত্তনওয়ালীর কন্যা এই ফুলিকে সে মা ভগবতীর অংশজ্ঞানে কন্যারূপী মহামায়ার ন্যায় স্নেহ করিত।

পঞ্চম অঙ্কেও এই ভাবটীই সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। ফুলীর মৃত্যুতে অবধূত যেন হরগৌরীর মিলনের সূচনা দেখিয়া বলিতেছে——

"আজ বাবার বিয়ে, ও বেটী না গেলে কি হরগৌরীর মিলন হয়?"

অবধূতের স্নেহ সম্পূর্ণ উচ্ছ্বসিত দেখিতে পাই ফুলীর প্রতি তাহার স্বাভাবিক ও সরল কথাগুলিতে—"

"যা বেটী হরগৌরীর মিলন দেখগে যা! বেটী নায়িকা ছিল কি না! বাবার মন্দিরে যখন যেত, পায়ে নূপুর বাজত—শুনতুম। বেটী শাপভ্রষ্টা হয়ে বেশ্যার ঘরে জন্মেছিল। ওর মা কীর্ত্তন গাইত কিনা! এ বেটী ত যখন বাবার কাছে কেঁদে কেঁদে গান করত, তখন দেখতুম, বাবার গা জলে ভেসে যাচ্ছে। ও বেটী না গেলে কি হরগৌরীর মিলন হয়? দেখ. বেটী, এই ফুল নিয়ে যা,—বাবাকে মাকে সাজাবি।"——

সব কথার অন্তরালেই ফুলীর নারীত্বের প্রতি অবধূতের অগাধ শ্রদ্ধা প্রকটিত—অবধূত নারীর মধ্যে দেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তারপর শেষ কথা—

"বেটী আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে।"—

ফুলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবধূত ও বুঝিল—

"মিছে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনই সুখ।"

গিরিশচন্দ্রের নাটক সমালোচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে গৃহলক্ষ্মীর পঞ্চম অঙ্কের অবধূত এবং অন্যান্য চরিত্র যেরূপ নাটকের সঙ্গে এরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে ইহাতে স্বতঃই ধারণা হয় যে ইহার লেখক গিরিশচন্দ্রের ভাব, ভঙ্গি ও চিন্তাধারার সহিত আপনার মনের একীনতা অনুভব না করিলে এরূপ ভাবে কখনও উপসংহার করিতে পারিতেন না, আর প্রথমের সহিত শেষের এমন অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যও রক্ষা করিতে পারিতেন না। দুই কবির ভাষায়, ভাবে ও নাটকীয় আদর্শবোধে বেশ যোড় মিলিয়া গিয়াছে। নাম প্রকাশিত না হইলে কেহ ধরিতে পারিত কিনা সন্দেহ যে পঞ্চম অঙ্ক স্বয়ং নাট্যকারের রচিত নয়।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু

৩৬। হেবো।

আর একটী চরিত্র সমালোচনা করিয়াই এই অধ্যায়ের শেষ করিব। চরিত্রটী যেমনি সরস, তেমনি আবার শিক্ষাপ্রদ। **হেবো** সরলতায় শিশু, প্রাণটী তাহার একেবারে সাদা এবং হরিমণির শিক্ষায় প্রায় জড়াবস্থা হইতে সে মানুষ হয়। সৎকার্য্যের প্রভাবে সদাদর্শে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য চরিত্র কিরূপে সমাজের হিতকারী হইয়া উঠে এই সরল ও জীবন্ত চরিত্রটি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

হেবোর চেহারা সম্বন্ধে তাহার পিতা বটকৃষ্ণ বলিতেছে,—"দুটো তিনটে সম্বন্ধ তো ছেলে দেখ্‌তে এসেই ভেঙ্গে গেল।"

এদিকে আবার তাহার সাহেব ও ঘোড়া রোগ। পিতাকে বলিতেছে——

"বেণীবাবু ব'লেছে আমি ইংরিজি শিখ্‌লেই সাহেব ক'রে দেবে। চাঁদনি থেকে পোষাক কিনে দিয়েছে। একটা সিগারেট দিতে পার্‌তে তো দেখাতুম কেমন সাহেবের মত সিগারেট খাই, আমি ঠিক সাহেবের মত দৌড়তে শিখেছি।" ১ম অঙ্ক, ২গ।

অন্যত্র বলিতেছে "হরমণি বল্‌লে 'তুই সাহেব হতে পার্‌বি'।"

ঘেঁচিও বলিতেছে——

"তুই ঘোড়া চড়্‌তে চেয়েছিলি, ঘোড়া এনে তোকে চড়িয়ে নিয়ে যাব।"

৪র্থ অঙ্ক, ৩গ।

কিন্তু প্রাণটী এমন কুটিলতালেশহীন যে, যখন পিতা বলিতেছে,——

"হ্যাঁরে হেবো, তুই হরমণির কাছে যাস্ শুন্‌তে পাই, তার টাকা-কড়ি এদিক্ ওদিক্ পড়ে থাকে, কিছু সরাতে পারিস নি?"

উত্তরে হেবো বলে——

"তোমার ওবুদ্ধি আমি কর্‌বো না।"

সরল হেবোর মিথ্যায়ও অত্যন্ত ঘৃণা। ঘেঁচির বিবাহে নিতবর হইবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু চিত্তেশ্বরী যখন তাহাকে বিধবাবিবাহের সময় নাপিত সাজাইতে চায়, সে উত্তর করে "অ্যাঁ জুচ্চুরী! তবে আমি নিতবরও হব না।"

বেণী তাহাকে ভালবাসে। তাই বেণীবাবুর জন্য তাহার অত্যন্ত মমতা। পিতাকে বলিতেছে——

"আমি বেণীবাবুকে দেখ্‌তে চল্লুম, যদি ডাক্তার ডাকৃতে বলে, এক দৌড়ে ডেকে আন্‌বো।"

ঘটকৃষ্ণ——আর তোর বেণীবাবু—সে যেতে বসেছে……

হেবো—না, অমন কথা বলো না বল্‌ছি!

হরমণির সুশিক্ষায় সে এমনি তাহার বাধ্য যে, ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, রোগীর সেবা করা, পাল্কী লইয়া আসা——সমস্ত কাজই খুব উৎসাহের সহিত করে। সে বলিতেছে—

"হরমণি ওষুধ আন্‌তে পাঠিয়েছিল, আমি এক দৌড়ে এনে দিলুম"—

অন্যত্র হরমণি প্রমদার জন্য পাল্কী আনিতে বলিলে——

—হেবো বলিতেছে—

"এত রাত্রে পাল্কী কোথায় পাবো? তুই বলিস তো আমি ওকে কোলে ক'রে নিয়ে যাই।"

আর হরমণি যদি ভ্রম বশতঃ ও 'বাবা হাবু' বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার অভিমানের সীমা থাকে না।

হর—বাবা হাবু তুমি দেখগে…………

হেবো—না—আমি যাবো না। আমি হেবো,—নেকা বেটী আমায় বল্‌ছে, হাবু—হাবু!—হাবু তো বোকা!

হর—না না, হেবো—হেবো!

(সাদরে পৃষ্ঠে আঘাত করণ)

হাবু—হিঃ হিঃ হিঃ!………

(বিশেষ আহ্লাদের সহিত প্রস্থান)

এই সরল চরিত্র আবার এমনি ক্ষমাশীল যে, পত্নীর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য যে ঘেঁচির সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে হেবো বলিয়াছে—

"আমি যদি চাবুক মার্‌তে দেখ্‌তে পেতুম্, তা হ'লে ঘেঁচিকে এক থাব্‌ড়ায় ঘুরিয়ে দিতুম!"—

সেই ঘেঁচিই যখন পরোপকারের দোহাই দিয়া (রোগীর জন্য মদ চাই বলিয়া) তাহার সাহায্য চায়, হেবো ঘেঁচির জামিনস্বরূপে শুঁড়ীর দোকানে বসিতেও দ্বিধা করে না।

হেবো হরমণির হাতে এমন শিক্ষা পাইয়াছে যে বাবু সাহেবরা যখন নির্ম্মলাকে জোর করিয়া লইবে পরামর্শ করে, সে শুনিয়া হরমণিকে বলিয়া দেয় এবং তাহাতেই হরমণি দুষ্টের ষড়্‌যন্ত্র ভাঙিতে সমর্থ হয়।

সরল বোকা চরিত্র সদাদর্শে ভাল হইয়া সংসারের অনেক হিতকার্য্যে আসিতে পারে, এই চরিত্রটীতে আমরা সেই শিক্ষা পাই।

১৭। কিরণময়ী, সুশীলা, সরোজিনী।

এই তিনটী চরিত্রে হিন্দুর গতানুগতিক সতীত্বের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। পুরাতন আদর্শের হইলেও ইহাদিগকে গিরিশচন্দ্র সজীব ও মূর্ত্ত করিয়া গড়িয়াছেন। তিনটী সতী চরিত্রের প্রভাবেই তাহাদের বয়াটে ও বেশ্যাসক্ত স্বামী পুনরায় সৎপথে আসে। কিরণময়ী (করুণাময়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) স্বামীর ধ্যানে ত সর্ব্বদা ছিলই, এমন কি মোহিত যখন মেয়ে মানুষ নূতন বেরিয়ে এসেছে বলিয়া দুলালের বাগানে লইয়া যাইতে চায়, কিরণ শুনিয়া স্বামীকে বলে—

"কি, কি ব'ল্লে? বল—মিথ্যা কথা বলেছ! যদি সত্য হয়, তবু বলো—মিথ্যা কথা বলেছ! আমার হৃদয়েশ্বর—ইষ্টদেবতা—পদাঘাতে ভেঙ্গে দিওনা। বলো—মিথ্যা কথা বলেছ—তোমার প্রতি আমার ঘৃণা না হয়; যেমন তোমার ধ্যানে ছিলুম, সেই ধ্যানে যেন থাক্‌তে পারি; বলো—বলো—মিথ্যা কথা বলেছ।"

বলিদান ৩য় অঙ্ক, ৬গ।

কিন্তু যাহার প্রভাবে মোহিত পরে 'চমৎকার লোকে' পরিণত হয়,

এই সেই তাহার সহধর্ম্মিণী কিরণ। অনুতপ্ত মোহিত কিশোরের কাছে কিরণ সম্বন্ধে বলিতেছে—

"জেল থেকে বেরিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লেম, পাগলী জোবী দেখা করিয়ে দিলে। দেখলেম চুরির সামগ্রী কিছু নাই। তবে—স্ত্রী নিজে উপবাস গিয়ে আমায় অন্ন দিতো, তাই আহার কর্‌তেম, আর পাঁচ ধান্দায় ফিরতেম। আজ মাস দুই হলো, আমার স্ত্রী আমার জন্যে ভাত এনে দিলে, কিন্তু আপনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। জোবির ঠেঙে শুনলুম, সে অনাহারে থেকে আমায় খাওয়ায়। এতদিন স্ত্রীকে ভাল ক'রে দেখি নি; যে দিন মূর্চ্ছা যায়, সে দিন দেখলুম। সে আমায় রোজ আপনার কাছে আস্‌তে বল্‌তো, আমি তো স্ত্রৈণ নই যে, স্ত্রীর উপদেশ নেব, কিন্তু কে জানে সেই দিন থেকে মনটা যেন আর একরকম হয়েছে; আর স্ত্রীর মুখের ভাত খেতে যেতেম না।"

অতঃপরই মোহিত ভাল হইয়া উঠিল।

সুশীলা অঘোরের স্ত্রী। নিরুদ্দেশ স্বামীর ধ্যান ও তাহার ফটো পূজা করে। সে স্বামীর নিন্দা শুনিতে পারে না। তাহার সতীত্ব ও প্রেমের আদর্শ তাহার নিজের মুখের কথায়ই পাই :—

"আমি পোনের দিন শ্বশুর ঘর করেছি, তাহাতেই একটী আশ্চর্য্য দেখেছি আমি যখন মনে করতুম আমার স্বামী আস্‌ছেন, তখনই দেখেছি, তিনি আস্‌তেন। বল্‌তে পারিনি, এখনও আমি ধ্যানে বসি, আমার বোধ হয়, তিনি এসেছেন, আমার ফুলের মালা পরেছেন, এক দিনও আমি মনে করিনি যে আমি বিধবা।"

"হারানিধি" ৫ম অঙ্ক, ২গ।

ইষ্টদেবের ন্যায় স্বামীও যে ধ্যানের মূর্ত্তি এবং সাকার ফটো পূজায়ও ইষ্টদেব স্বামীর দর্শন পাওয়া যায়, কবি এই চরিত্রে তাহার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই দেবীমূর্ত্তির প্রভাবেই অঘোরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

তৃতীয় চরিত্র গৃহলক্ষ্মীর **সন্তোষিণী**। স্বামী মন্তপায়ী

বেশ্যাসক্ত, কিন্তু তাহার ভক্তি অচলা। অনুতাপের সময় শৈলেন্দ্র যথন বলিতেছে—

"তুমিও মনে মনে কত গালাগাল দিয়েছ?"

সরোজিনী উত্তর করে "আমি তোমায় গালাগাল দেব?"

স্বামীর অনুরক্তা কুমুদিনীকে বাড়ীতে আনিতে সরোজিনীই বলিয়া দেয়, এবং শৈলেন্দ্র যথন জিজ্ঞাসা করে—

"এখানে আনলে তোমার মনে রিষ হবে না?"

সরোজিনী উত্তর করে—

"কেন রিষ হবে? তুমি যদি দশটা বিয়ে করো, তা হ'লে কি তুমি আমার পর হবে?"

অন্যত্র বলিতেছে—

"তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, সে তোমায় ভালবাসে, আমি তারে বোনের মত ভালবাস্‌বো।"

সরোজিনী অতীব সরলা, বিরজা বলিতেছেন—

"ছোঁড়া ছুঁড়ী দু'জনেই সংসারের ভালমন্দ কিছুই জানে না।"

অবস্থা বিপর্যয়ে সরোজিনী স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়—

"তুমি ভেবো না, দিন একরকম ক'রে যাবে। আমি রাঁধবো, বাড়বো, তোমার সেবা করবো তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

তাহার বিশ্বাস ছিল "রাধাবল্লভজীর কাছে দুঃখ জানাইলেই তিনি উপায় করিবেন।"

শৈলেনও ক্রমে তাহার প্রভাবে ভাল হইয়া উঠে।

এইরূপ পতিগতপ্রাণ চরিত্রে আধুনিক শিক্ষিত যুবক কি শিক্ষিতা নারী শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু লোকচরিত্রজ্ঞ নাট্যকার জানিতেন এইরূপ সতীত্বের আদর্শও আবশ্যক, অন্যরূপ আচরণ শৈলেন্দ্রের ন্যায় চরিত্রের পক্ষে অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, তাই তিনি বৈদ্যনাথের মুখে বলিতেছেন ;—

"ফেরাতে হ'লে একেবারে লাগাম কস্‌লে ফিরবে না ; একটু ছুটতে দিতে হবে।"

১৮। বিন্দুবৈষ্ণবী

গিরিশচন্দ্র রঙ্গিণীর মাতা বিন্দুবৈষ্ণবী চরিত্রে নিরাশ্রয়া বিধবা আত্মনির্ভরশীলা হইয়া যাহাতে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে এবং শিক্ষিত প্রতিবেশী যেন খুব পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তাহার সহায়তা করেন তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন। বিন্দু নিম্নতরজাতীয়া, বৈষ্ণবের মেয়ে, তাহার মেয়ে রঙ্গিণীকে সে বলিতেছে——

"ভাল হ'লে ছোটবাবু আমায় বাসা ক'রে দেন, তিনি দোতালা বাড়ী ভাড়া করেছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম করে এসে খোলার ঘরে রইলেম; তিনি টাকা দিতে চেয়েছিলেন আমি নিই নে; বড় বৌ-ঠাকুরুণের কাছে দশটী টাকা ধার করে মুড়ি ভাজতুম, চিঁড়ে কুটতুন, চালছোলা ভাজতুম। ওরা কি করতেন জান? চাকর দাসী দিয়ে, আমি টের পেতুম না, দোকানকে দোকান কিনে নিতেন। তারপর এই করে কিছু টাকা হাতে হ'লো, ছোটবাবু কাপড়ের দোকান করে দিলেন; তাইতে বাড়ী ঘর দোর করলুম, আরও দশটাকা হাতে করলুম, দুঃখে সুখে তাই থেকেই চলে যাচ্ছে।"

"মায়াবসান" ৩য় অঙ্ক, ৫গ।

উপসংহার।

আমরা বিভিন্ন দিক হইতে গিরিশের সামাজিক নাটক বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, বিভিন্ন চরিত্রের পরিপুষ্টি, ক্রমোদ্বর্ত্তন ও অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছি, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি প্রবৃত্তিবৈশিষ্ট্য, মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়াছি। দেখিয়াছি কিরূপ ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া, নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতে ও মানসিক পরিবর্ত্তনে, পরোপকারী, সত্যবাদী ও বাঙ্গালীর আদর্শ যোগেশ স্ত্রীহত্যা-জনিত পাতকপঙ্কে নিমগ্ন হয়, রাস্তার মাতালের সহিত নৃত্য করে ও তাহার 'সাজানো বাগান শুকাইয়া' ফেলে। দেখিয়াছি কিরূপে নীতিজ্ঞ, পরোপকারী, বন্ধু-বৎসল হরিশ আবার বন্ধুরই প্রাণবিনাশার্থ গুলি

ছুঁড়িতে দ্বিধা করেনা এবং পরে আবার তাহারই কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ-সূত্রে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয়, তাহার লুপ্ত চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসে। দেখিয়াছি কিরূপে ঋষিকল্প কালীকিঙ্করের কঠোর নীতিতে ও আত্মত্যাগে নিষ্কাম ধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়, এবং দুঃসাধ্য হইলেও কেমন করিয়া কালীকিঙ্করের পক্ষে গীতার ধর্ম্মার্থ জীবনে অভিব্যক্ত হয়। আবার কিরূপে অবস্থার বিবর্ত্তনে সত্যবাদী ও সহিষ্ণু করুণাময় বসু উদ্বন্ধনে চরমসখার আশ্রয় গ্রহণ করে; নীতিব্রত স্নেহশীল প্রসন্নকুমার নিজহস্তে কন্যার হত্যাসাধন করে, কিরূপে ন্যায়-পরায়ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রধানকর্ত্তা সঙ্গতিপন্ন, সম্পূর্ণপ্রকৃতিস্থ উপেন্দ্রনাথ পারিবারিক অশান্তিতে গৃহত্যাগ করিয়া ক্রমে উন্মাদগ্রস্ত হয়েন। এই মানসিক পরিবর্ত্তনেই ভজহরি 'মানুষ হয়', বরাটের শিরোমণি অঘোর হারানিধিতে পরিণত হয়, দুলালের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। 'দুর্গম হৃদয়-দ্বন্দ্বে' আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া বন্ধুবৎসল প্রকাশ ক্রমে বন্ধুদ্রোহী নরপিশাচে পরিণত হয়; ভ্রাতৃবৎসল শৈলেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে লাঠিপ্রহারে আহত করিয়া বেশ্যালয়ে চলিয়া গেলে সেই কুৎসিত স্থানে রক্তারক্তি অনুষ্ঠিত হয়। স্ত্রীর প্রভাবে মোহিত ভাল হইয়া উঠে এবং জগমণির কথায় মদন যাদবকে ধরিয়া আনিয়া আবার তাহারই প্রাণরক্ষা করে।

আবার নারীচরিত্রে দেখি কিরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের অন্তর্দ্বন্দ্বেই প্রফুল্লকমল দিন দিন শুকাইয়া যায়, নৃশংস স্বামীর কঠোরহস্তে বলিস্বরূপ আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া বংশের দুলাল যাদবকে রক্ষা করে, স্বামীধ্যানজ্ঞান জোবি স্বামী ছাড়িয়া মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করে, সরোজিনী ঐকান্তিক স্বামীভক্তিতে লাগাম দিয়া (স্বামীর কুসঙ্গপ্রিয়তার কঠোর শাসন না করিয়া, ক্রমে লম্পট ও পানাসক্ত স্বামীর সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিতে সমর্থ হয়, কিরণময়ী নিজে অনাহারে থাকিয়া স্বামীর আহার জোগাইয়া আপনার দুশ্চরিত্র স্বামীকে পুনরায় ফিরিয়া পায়। দেখিতে পাই—কিরূপ দৈবের নির্ব্বন্ধে রাজরাণী স্বামি-সোহাগিনী জ্ঞানদা স্বামীর লাথিতে একেবারে শক্তিহীন অবস্থায় গৃহ-বিতাড়িত হইয়া ভিখারিণীর ন্যায় রাস্তায়

মরিতে আসে, সংসারের সর্ব্বময়কর্ত্রী অন্নপূর্ণা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া খস্তায় মহাপ্রস্থান করে, পার্ব্বতী হৃদয়গত সংস্কার ও স্বামি-ভক্তির অন্তর্ব্বিপ্লবে উন্মাদভাবাক্রান্ত হয়, ফুলী ও রঙ্গিণী 'আত্মবির্জ্জনের' আভাস পায়, সমাজধর্ষিতা হরমণি কর্ম্মভূমে এক নূতন কর্ম্মপথ অবলম্বন করে।

সকল দিক হইতেই নানাবিধ চিত্র গিরিশের সামাজিক নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, ও রিপুর দুরন্ত আবেগে কিরূপে নীরদ নানারূপ অপকর্ম্মে লিপ্ত হয়, হাতে সর্ব্বস্ব পাইয়াও আপনার দুরন্ত স্বার্থপরতায় উহা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়, তাহার পাপের সংসার ভাঙ্গিয়া যায়। বিরজার ধর্ম্মের সংসার তাঁহার মনের দৃঢ়তায় বাঁধিয়া উঠে। যোগেশের সোণার সংসার ছিন্ন হয়। নীলমাধবের সংসার তাহার আস্তিকবুদ্ধিতে গড়ে। উপেন্দ্র উন্মাদগ্রস্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, রোগমুক্ত কালীকিঙ্কর আবার অসীমে মিশিয়া যায়, সমস্ত তত্ত্বই আমরা পাঠকের নিকট পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, প্রতিক্ষেত্রেই দেখিতে পাই নানারূপ অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশে নাটকীয় গল্পের সৃষ্টি ও পুষ্টি এবং নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতে বিভিন্ন রসের অবতারণা ঘটিয়াছে।

আবার এই সকল নাটকীয় বৈচিত্র্যের মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কেবল চরিত্রসৃষ্টিতে নহে—নানারূপ নৈতিক আদর্শ স্থাপনেও। একদিকে নাট্যকলার অপূর্ব্ব বিকাশ, অন্যদিকে সাহিত্যের উচ্চাদর্শ ও নানারূপ সামাজিক, পারিবারিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধান। বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্য, কলা ও লোকশিক্ষার এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ অল্পই দৃষ্ট হয়। দুই একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

গিরিশচন্দ্র সর্ব্বদা গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিতেন না, ভাষায়ও নহে, ভাবেও নহে—এমন কি আদর্শ প্রচারেও সর্ব্বদা তাঁহাতে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত। পাঠক সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবেন।

গিরিশচন্দ্র নাটকাঙ্কনে যেমন খাঁটি, অবিমিশ্র, মাতৃস্তন্যচ্যুত দুগ্ধের ন্যায় নির্জ্জলা মাতৃভাষা ব্যবহার করিতেন, সর্ব্বদা সেইরূপ ভাষার সামঞ্জস্যও রক্ষা করিতেন। এক নায়ক-চরিত্রেই এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। দার্শনিক কালীকিঙ্করের ভাষা ও উপেন্দ্রনাথের ভাষা সর্ব্বত্র একরূপ নয়। "যদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মও পরিবর্ত্তন হয়," "নির্ব্বাণ দীপ," "নিষ্কম্প দীপশিখা," "চৈতন্যের বিকাশ" "আত্মত্যাগের আভাস" প্রভৃতি কথা কালীকিঙ্করের মুখেই শোভা পায়। তারপর শান্তিরামের সরল পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা, শিক্ষিত কিশোরের ভাষা, মন্মথের ভাষা, জ্ঞানদার ভাষা, প্রত্যেকের ভাষাই পরস্পরের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং সেই সেই চরিত্রের উপযোগী।

ভাষার ন্যায় চরিত্রগত ভাব-সম্পদও সম্পূর্ণ পৃথক্। জোবির মুখে স্বামীর কথা যেরূপ শোভা পায়, হরমণির মুখেই সেরূপ লোকশিক্ষানু-যায়ী উপদেশ ভাল মানায়। যোগেশের কথায় ব্যবসায়ীর গ্রহণীয় বিষয়গুলির অবতারণা বিশেষরূপে পাওয়া যায়—"বিশ্বাস ব্যবসায়ের মূল" "সুনাম রাজমুকুট অপেক্ষাও অধিক শোভা পায়"; ছাপোষা করুণাময়ের মুখে অদৃষ্টের কথাই ভাল শুনায়, আবার সাম্যবাদী প্রসন্নকুমারের মুখেই 'ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম' প্রভৃতি কথা ভাল মানায়, মন্মথের মুখে নহে। কন্যাশোকে 'হিরণ আমার' বলিয়া সরস্বতীর যে ক্রন্দন, তাহা গম্ভীর স্বভাব করুণাময়ে খাটেনা, তাই তাহার গভীর অন্তর্দ্দাহ কেবল মাত্র দুই একটী হৃদয়-বিদারক কথায়ই পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া ফেলে—

"মা—মা, অন্ন দিতে পারি নেই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছো! আহা, জল খেয়ে কি শীতল হ'য়েছ মা?"

এই তো গেল বাহিরের কথা। আদর্শ স্থাপনেও গিরিশচন্দ্র সর্ব্বত্র প্রচলিত নীতি অনুসরণ করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গিরিশচন্দ্র হিন্দুর সতীধর্ম্ম ও সতীত্ব-গৌরবে সমধিক মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন বটে, এবং প্রচলিত পন্থা—সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শে—তাঁহার যাবতীয় সতীচরিত্র সৃষ্টি করিলেও তিনি সতীত্বের অন্যতর দিকটী দেখাইয়া বহু শতাব্দীব্যাপী নীতির ব্যতিক্রম করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

আধুনিক সময়ে আত্মমর্য্যাদা-বিহীন সতীত্ব জড়, নিশ্চল। গিরিশচন্দ্র বর্ত্তমান ও অতীতের সমাধান করিয়াছেন প্রফুল্ল ও জোবি চরিত্রে। এমন কি ভাষায় সীতারও এবম্বিধ আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। সতীত্ব পরীক্ষার জন্য বারম্বার অগ্নিপরীক্ষা আত্মমর্য্যাদার পক্ষে একান্ত হানিজনক। তাই পাতাল-প্রবেশকালে আদর্শ-সতী সীতা স্বামীর অবাধ্য হইয়াও বলিয়া যাইতেছেন ;—

হে প্রভু!
জন্ম জন্মান্তরে—
যেন পাই তোমা সম স্বামী।
কিন্তু এক ভিক্ষা গুণনিধি
নাহি দিব পরীক্ষা অনলে।

সীতার বনবাস, ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গ।

প্রফুল্ল চরিত্রেও কবি সতীত্বের অন্যতর দিক্‌টী দেখাইয়া প্রচলিত নীতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তথাকথিত সতীধর্ম্ম অপেক্ষা প্রকৃত সত্যধর্ম্ম যে ঢের বড়, প্রফুল্ল চরিত্র তাহাই প্রমাণ করিতেছে। স্বামীর পরম ও চরম কল্যাণ সাধনই সতীর প্রধান ধর্ম্ম—এ জন্য সতীকে যদি কঠোর হইতে হয়, এজন্য যদি পতির অবাধ্য হইতে হয় তাহাতেই প্রফুল্ল প্রস্তুত। প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াই সে পতির পরম কল্যাণ চাহিয়াছে.— স্বামীকে গভীরতম পাপপঙ্কে মগ্ন হইতে প্রাণ দিয়া সে বাধা দিয়াছে। মানবের চরম কল্যাণ কিসে, একথা যাহারা ভাবিয়া দেখিবে না, তাহারা প্রফুল্লকে সতীর আদর্শ কিছুতেই বলিবে না। গিরিশচন্দ্র তাহাদের জন্য প্রফুল্ল চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই।

জোবিকে দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রাণরক্ষা করিতে, অপরাধী স্বামীকে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিতে, আফিংখোর স্বামীকে ভিক্ষা করিয়া দুধ জোগাইতেও দেখা গিয়াছে, কিন্তু আবার যখন সে দেখিতে পায় কোনরূপ সুশীলতা ও বশ্যতাচরণই স্বামীর চরিত্র সংশোধনে সমর্থ হইল না, যখন বুঝিল তাহাকে বাঁচাইয়া অসত্যকে জোর করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, তখন পতিগর্ব্বিতা জোবিই স্বামীকে জন্মের মত ছাড়িয়া কোথায়

চলিয়া গেল! কিন্তু এখানেও আবার নাট্যকার স্বামিত্যাগে জোবিকে অন্যের আশ্রয়ে লইয়া যান নাই, একেবারে মধুসূদনের শরণাগত করিয়া দিয়াছেন:—

একলা নারী রইতে নারি
থাক্‌বো গিয়ে তোমার কাছে।

রক্তমাংসে গঠিত সহস্র দোষ-গুণে জড়িত অপূর্ণ মানুষ স্বামী হইলেও তাহার চেয়ে যে সত্য ঢের বড়—সত্যনারায়ণ অনেক উচ্চে, গিরিশচন্দ্র বারবারই তাহা দেখাইয়াছেন। এইখানেই গিরিশ পারমার্থিক গতানুগতিকের জড়তা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন।

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধেও এইরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। গিরিশ প্রাচীনতন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু যুগে যুগে ঋষি-প্রবর্ত্তিত সমাজনীতির ও সংস্কারের প্রয়োজন আছে, একথা অস্বীকার করিতেন না। তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারগত রক্ষণশীলতার মধ্যে ওতপ্রোত আছে সত্য—সত্যনিষ্ঠ ন্যায়ানুব্রত কবি সমাজের যুগসঞ্চিত জঞ্জাল ও মানবচরিত্রের পঙ্কিলতাকে কখনো সহ্য করেন নাই। তাই দেখিতে পাই, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিয়া যেমন ব্রহ্মচর্য্য ও সতীত্ব-আদর্শের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন, আবার প্রসন্নকুমারের মুখেও ইন্দ্রিয়তাড়নার দুর্দ্ধর্ষতা দেখাইয়া তেমনি আমাদের দুর্ব্বল চিত্তবৃত্তিকে সাবধান ও সতর্ক করিয়াছেন। পাগলের মুখে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, আবার ভুবনমোহিনীর মুখে আধুনিক বিধবাদের অকথিত নিভৃত মর্ম্মব্যথা ও গূঢ়তম মনোবৃত্তির কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন—"সে অনায়াসে আমাকে বিবাহ ক'রে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্ত্তে পার্ত্তে."। কিন্তু 'ইহ বাহ্য'। কেবল বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদানে ও সমদর্শিতায়ই তাঁহার বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ হয় না, তিনি সংস্কার সাধনে গতানুগতিক—এদিক্ কি ওদিক্—প্রথার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। তাই বিধবাবিবাহ অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শ দেখি হরমণির বিধবাশ্রমে; সেইরূপ বর-পণের দ্বন্দ্বসমস্তাপূর্ণ বিচার করিতে করিতে পাঠকের দৃষ্টি আসিয়া পড়ে বান্ধবসমিতির কার্য্যপ্রণালী ও রায়চাঁদ

প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী কিশোরের ত্যাগধর্ম্মে ; পরোপকার ও অহিংসার যুক্তি অপেক্ষা প্রাণ আঁটিয়া ধরিতে চায় 'পাগলের' সেবাধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শ ; স্ত্রীশিক্ষার যুক্তি অপেক্ষাও লোকে সমধিক আগ্রহান্বিত হইবে চন্দ্রা ও জ্যোতির্ম্ময়ীর শিক্ষাপ্রণালীতে !

অন্যদিকে আবার গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টিনৈপুণ্যে সর্ব্বত্র কেবল চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়া উঠে নাই। চরিত্রগুলি কবির মানস পুত্র—পুত্র কতক কতক পিতার দোষগুণত পায়ই। কবির নিজস্ব সহৃদয়তা তাঁহার অধিকাংশ চরিত্রেই ফুটিয়াছে। তাই দেখিতে পাই কিশোর, মন্মথ, পাগল প্রভৃতি চরিত্র যেরূপ পাঠকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করে, ভজহরি, অঘোর ও হলধর প্রভৃতিও সেইরূপ সহানুভূতি আকর্ষণ করে ; সুশীলা, হরমণি, প্রফুল্ল, জোবি, ফুলী ও রঙ্গিণী চরিত্রে যেরূপ শ্রদ্ধা হয়, ভুবনমোহিনী, কাদম্বিনী প্রভৃতি চরিত্রেও সমান সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। নীলমাধবের ন্যায় শৈলেন ও সুরেশের প্রতি সমান স্নেহ বর্ষিত হয়, মদন ও গণৎকারের প্রতি অনুরাগ আকৃষ্ট হয়, মাধব ও যাদবের ন্যায় দুলালের 'আত্মবিসর্জ্জন'-শিক্ষালাভেও সমান আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। এবং ক্রমে ক্রমে ইহাদের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন-সাধনে নাট্যকারের বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় !

এদিকে আবার তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রই জীবন্ত। যোগেশ হরিশের ন্যায় রমেশও মোহিনী ; নীলমাধবের ন্যায় নীরদ ; পীতাম্বর, নব ও শান্তি-রামের ন্যায় সর্ব্বেশ্বর, রমানাথ, কাঙালী ও শরৎ প্রভৃতি চরিত্রে তুল্য নিপুণতা দৃষ্ট হয়। এমন কি মাতঙ্গিনী ও তরঙ্গিণী, জগমণি ও চিত্তেশ্বরী চরিত্রেও তুল্য সরসতাই বিদ্যমান দেখা যায়।

অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই চরিত্র-সৃষ্টি করিতে করিতে, নাটকের ঘাতপ্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাইতে দেখাইতে, রসোৎপাদন করিতে করিতে, চরিত্রবিশেষের মুখে গিরিশচন্দ্রের নিভৃত প্রাণের কথা ফুটিয়াছে, কোথাও জীবনের অতীত কাহিনী ভাসিয়া উঠিয়াছে—কোথাওবা কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার মহদ্বাক্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই বলিদানে ঘনশ্যামের মুখে কবি-বাক্য প্রকাশ পাইয়াছে—

"আমাদের সমাজের এই দুরবস্থা, ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা…

বাঙ্গালায় কন্যা-সম্প্রদান নয়—বলিদান!" বৈদ্যনাথের মুখে মন্মথকে উপদেশ দিতেছেন—

"তুমি কি মনে কর কোন কুকার্য্যের দ্বারা সৎকার্য্য সাধিত হয়?"

যোগেশ বলিতেছে "উকীল কি চীজ্?"

কালীকিঙ্করের মুখে প্রাণের কথা বাহির হইয়াছে "বিদ্যার গৌরব, ধর্ম্মের গৌরব, চরিত্রের গৌরব কথার গৌরব মাত্র. নিষ্ফল কাক-বিষ্ঠা! জীবনে দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ—মরণে দুঃখ।"

পাগলের মুখে বলিতেছেন—

"কাপুরুষে পরের জ্বালা ভুলে আপনার জ্বালা নিয়ে বিব্রত হয়!"

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

এইরূপে হলধর, ভজহরি, অঘোর, প্রমুখ চরিত্রে কবির জীবনকাহিনী ব্যক্ত এবং রঙ্গিণী, নীলমাধব, কিশোর, মিরকাশিম, করিমচাচা, আলি-ইব্রাহিম প্রভৃতি বহু চরিত্রে তাঁহার বাণী সফল হইয়াছে। সর্ব্বোপরি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই তাঁহার জ্বলন্ত লেখনীতে বাঙ্গলার সমাজ—বাঙ্গলার গৃহস্থ, বাঙ্গালার কেরাণী, গোলাম, ভৃত্য, উকীল, প্রবঞ্চক—বাঙ্গালার সমাজের স্বামী, সতী, কন্যা—বাঙ্গালার যুবক—বাঙ্গলার আশা, সঙ্কল্প ও ত্যাগনিষ্ঠতা—বাঙ্গলার কর্ম্মী, বাঙ্গলার স্বদেশ সেবক। করুণাময় ও হরিশ প্রভৃতি চরিত্র যেরূপ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-বাঙ্গালীর মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করিতেছে, প্রসন্নকুমার ও মুকুন্দলালের গৃহে যেমন বাঙ্গালার সমাজ অভিব্যক্ত, রমেশ শিবু প্রভৃতি চরিত্রে যেরূপ বাঙ্গলার উকীলসমাজ পরিচিত, পাগল ও রঙ্গলাল যেমন বাঙ্গালী কর্ম্মীর আদর্শ, মোহনলাল ও তকীখাঁ যেমন বাঙ্গালার স্বদেশসেবক, কিশোর ও মন্মথও তেমনি বাঙ্গালার আশা।

সকল দিক্ হইতেই গিরিশের বিশালতা উপলব্ধি হয়—মনে হয় 'তাঁহার তুলনা তিনিই'।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ

গিরিশ বিশ্লেষণ

(১) গিরিশচন্দ্রের নৈতিক আদর্শ।

(১) (ক) কুকার্য্যের দ্বারা সৎকার্য্য সিদ্ধ হয় না (গৃহলক্ষ্মী)

(খ) যদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মও পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি কুকাজ দ্বারা কখনও সুফল ফলে না (মায়াবসান)

(গ) অনুতপ্ত মাধব বলিতেছে—
কুকার্য্য দ্বারা সৎ অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না (বিষাদ)

(২) সোজা পথ সহজ পথ (শাস্তি কি শান্তি)

(৩) সত্য পথই নিরাপদ পথ
সত্য ভগবানের স্বরূপ } (মায়াবসান)

(৪) সত্যাশ্রয়ী প্রাণের ভয় করেনা (কালাপাহাড়)

(৫) মিছে কথা কইলে নরকে যায় (প্রফুল্ল)

(৬) যে ধর্ম্মপথে থাকে, ধর্ম্ম তার রাত দুপুরে অন্ন জোটান্ (গৃহলক্ষ্মী)

(৭) ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের স্মরণাপন্ন হও (প্রফুল্ল)

(৮) যে লাভালাভ বিবেচনা করে, সে ধর্ম্ম পথে চল্‌তে পারেনা

(৯) ধর্ম্মপথ অতি কঠিন পথ, কণ্টকময় পথ। (শাস্তি)

(১০) লুকোনো কাজ একটাও ভাল নয় (বলিদান)

(১১) লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়, দুঃখ পেতে হয়, (ভ্রান্তি)

(১২) পরোপকার সুদে খাটাইবার জিনিষ নয় (হাবা)

(১৩) যে বিপদকে ভয় করে, যার পরোপকারের জন্ম প্রাণ না নৃত্য করে, সে পরোপকার কর্‌তে পারেনা (মায়াবসান)

(১৪) বিপদ বড় নয়, মহত্ত্বই বড় (শা)

(১৫) সরলান্তঃকরণে সরল বিশ্বাস কখনও মিথ্যা হয় না (ঐ)

(১৬) কৃতজ্ঞতা বলে সুমেরু হেলে, সাগর জলহীন হয়
(১৭) অকৃতজ্ঞতা-বিষ রাবণের চুল্লীর মত জ্বলে (ঐ)

(১৮) সতীত্ব অমূল্য রত্ন (চন্দ্রা)

(১৯) সতীত্ব পরম রত্ন যার আছে পাপ পুণ্য নাই (মনের মতন)

(২০) কামান্ধ পুরুষের কাছে সম্পর্কের বিচার নাই (নসীরাম)

(২১) প্রবল ইন্দ্রিয়াদি সামান্য প্রশ্রয় দিলে দানবের ন্যায় বলবান্ হয়।

(২২) নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়,

(২৩) রমণীর সকলই বিচিত্র
মহামায়া নারীরূপা,
দয়া, মায়া, ঘৃণা, উপেক্ষা নারী-
প্রলোভন নানারূপ ধারণ করে।
(সৎনাম)

(২৪) জীবনের কোন ঘটনাই বিফল নয় ঐ

(২৫) দৃঢ়প্রতিজ্ঞের কোন বন্ধন নাই, ভয়ও নাই (সৎনাম)

(২৬) সিন্ধু শোষে, মেরু টলে ,,
প্রতিজ্ঞার বলে।

(২৭) দুর্জ্জনের কলঙ্ক নাই, সজ্জনেরই কলঙ্ক (মায়াবসান)

(২৮) দরদী (প্রেমিক) দরদ্ চায় (বলিদান)

(২৯) আত্মত্যাগ প্রেমের লক্ষণ (পাণ্ডবগৌরব)
স্বার্থ বিসর্জ্জন যেন প্রেমের লক্ষণ (মুকুল মুঞ্জরা)

(৩০) আজ যে কাটালো, কালও সে কাটাবে
মানীর মান ভগবান রাখবেন (মায়াবসান)

(৩১) ধর্ম্ম-প্রচার মানবের হিত (সৎনাম)

(৩২) সাজা দেবার কর্ত্তা একমাত্র ভগবান্ (শাস্তি কি শান্তি)

(৩৩) দেহীর ধৈর্য্যাবলম্বন একমাত্র শান্তির উপায় (অশোক)

(৩৪) মানুষই দেবতা আবার মানুষই কলির চেলা (শা)

(৩৫) পোড়া বিলাসই দুষ্মন ডেকে আনে (শা)

(৩৬) যার স্বামীর আশ্রয় নাই, বিলাস বর্জ্জিত হ'য়ে অনাথ সেবাই তার আশ্রয় (শা)
(৩৭) স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয়। (শা)
(৩৮) হেন শিক্ষা আছে কি ভুতলে, স্বভাব করিবে জয়? (নসীরাম)
(৩৯) পরিশ্রমীকে পরমেশ্বর সাহায্য কর্‌বেন
(৪০) মানবজীবনের যন্ত্রণাই বন্ধু (মনের মতন)
জীবনে দুঃখই সার্থক (মায়াবসান)
সাধনা দুঃখময়, সাধনা শান্তিময় (মনের মতন)
জীবন সুখের জন্য নয়, সাধনার জন্য (মায়াবসান)
(৪১) সুনাম রাজমুকুট অপেক্ষাও অধিক শোভা পায় (প্রফুল্ল)
(৪২) মার্জ্জনাই মনুষ্যত্ব, দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব। (মা)
(৪৩) নির্ম্মল হৃদয়ে 'মারের' অধিকার নাই (অশোক)
(৪৪) অহঙ্কার মানবজীবনে ভ্রম মাত্র (চন্দ্রা)
(৪৫) অহঙ্কার দুস্তর নরক বিশেষ (কালাপাহাড়)
(৪৬) প্রারব্ধই বলবান্‌ (অশোক)
(৪৭) অবস্থাই বলবান্‌, মানুষের হাত নাই (শাস্তি কি শান্তি)
(৪৮) অদৃষ্টের দাগ কে মুছবে (বলিদান)
(৪৯) নিন্দুকের জিহ্বা যাহা সৃষ্টি করে, পাঁচটা ব্রহ্মা তাহা পারেনা (বড়বউ)
(৫০) অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থে মনে শান্তি থাকেনা (বাচের বাজী)
(৫১) পাপই পাপের দণ্ড দান করে, অন্য বাহ্যিক দণ্ডের প্রয়োজন নাই। (সই)
(৫২) আত্মগ্লানির অপেক্ষা নরক শতগুণে শ্রেষ্ঠ (সৎনাম)
(৫৩) অপবিত্রের সহবাসে পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিনাশ পায় (চন্দ্রা)
(৫৪) পাপকার্য্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না (শা)
(৫৫) ভোগব্যতীত পাপের নাশ হয় না (শঙ্করাচার্য্য)
(৫৬) বটবৃক্ষমূলের ন্যায় পাপবৃক্ষ হৃদয় অধিকার করে (অশোক)
(৫৭) পাপের বীচি বট গাছের বীচি (মায়াবসান)

(৫৮) অন্তরে আঘাত ব্যতীত পাপের মূল নির্ম্মূল হয় না। (অশোক)

(৫৯) অনুতপ্ত হৃদয়ে গুরুসদনে পাপের ভীষণমূর্ত্তি প্রকাশ করিলে মহাপাপ দগ্ধ হয়। (শঙ্করাচার্য্য)

(৬০) কঠিন অন্তঃকরণ কঠিন শিক্ষা ভিন্ন কোমল হয় না।

(৬১) পৃথিবীতেই পাপের সাজা আরম্ভ হয়, শেষ হয় না। (মনের মতন)

(৬২) পুণ্য কার্য্যের কল্পনা ও অনুষ্ঠানে আত্মপ্রসাদ ও পাপ সর্ব্বদাই সন্দেহজড়িত। (মনের মতন)

(৬৩) সদ্‌গুরুর চরণ ব্যতীত পাপ-বাসনার মুক্তি হয় না, (বাঙ্গাল)

(৬৪) শ্রদ্ধা—সকল উচ্চস্থানেই যায়। (শাস্তি কি শান্তির উৎসর্গ)

(৬৫) ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপূজা হইয়া থাকে। ঐ

(৬৬) যার স্বামীর আশ্রয় নাই, বিলাসবর্জ্জিত হ'য়ে অনাথসেবাই তার আশ্রয়।

(৬৭) পোড়া কলির দৃষ্টি বিধবার উপরেই বেশী।

(৬৮) সমাজের সম্মতি ব্যতীত দেশাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করা স্বেচ্ছাচারিতা হয়।

(৬৯) কাপুরুষে পরের জ্বালা ভুলে আপনার জ্বালা নিয়ে বিব্রত হয়। (শাস্তি কি শান্তি)

(৭০) যে মন থেকে পরহিংসা ছাড়ে—জগতে তার শত্রু থাকে না, হিংস্রক জন্তুও তাকে হিংসা করে না, ক্রূর সর্পও তাকে দংশন করে না। (ঐ)

(৭১) কর্ম্মভূমে কথাবার্ত্তারও অবকাশ নাই। (ঐ)

(৭২) পরের অনিষ্ট করা নয়, আপনার অনিষ্ট করা। (ঐ)

(৭৩) কার্য্যের ফলাফল তাঁর। (ঐ)

(৭৪) সংসার পরীক্ষার স্থল; এতে যে চিরদিন সুদিন আশা করবে, আশা নিষ্ফল হবে। (হারানিধি)

(৭৫) পরিশ্রমীকে পরমেশ্বর সাহায্য করেন। (ঐ)

(৭৬) কঠিন অন্তঃকরণ কঠিন শিক্ষা ভিন্ন কোমল হয় না। (হারানিধি)

(৭৭) তর্কবুদ্ধি নাশ হেতু
তর্ক প্রয়োজন।

(৭৮) প্রঃ—সকলের চেয়ে পাপী কে ?
উঃ—যে আমোদপ্রিয় ব্যভিচারী, সেই মহাপাপী। ব্যভিচারী চোর হয়, খুনে হয়, বংশের পিণ্ড-দাতা [illegible], নিজে কলুষিত হয়, স্ত্রীকে কলুষিত করে, সন্তানকে কলুষিত করে, বংশের ধারা কলুষিত করে। (গৃহলক্ষ্মী)

(৭৯) কামনা অপেক্ষা হীনকার্য্য আর পৃথিবীতে নাই।
শঙ্করাচার্য্য ১ম অ, ৪গ

(৮০) পরকার্য্যে দেহ অর্পণ মানবের উচ্চ কর্ত্তব্য।
শঙ্করাচার্য্য ৫ম অ, ২গ

(৮১) নিষ্কাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি অন্য আধারে বহুদিন অবস্থান করেনা। শঙ্করাচার্য্য ৫ম অ, ২গ

(৮২) ভোগব্যতীত পাপের নাশ হয় না। " "

(৮২) দুঃখের তাড়নাতেও বাসনা-সাগর নিবৃত্ত হয় না। (বাঙ্গাল)

(৮৩) কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন। (বিল্বমঙ্গল)

(৮৪) বিষয়-বাসনা-জড়িত মনুষ্য ছার অকিঞ্চিৎকর লোভ ত্যাগ করতে পারে না। (মণিহরণ)

(৮৫) পাপ ইচ্ছা লুক্কায়িত রহে ধর্ম্মভাণে,
ভুলায় মানবে, পুষ্ট হয় হৃদি মাঝে,
শেষে করে আপন প্রকাশ, কৃতদাস
হেরে যবে মন। পশি স্তরে স্তরে বদ্ধ-
মূল বসে সে অন্তরে, নারে হীনবল
নরে, তারে করিতে উচ্ছেদ, প্রিয় হয়
প্রাণের সুসার সম।

(৮৬) ধীর জন মুগ্ধ হয় নারীর কৌশলে। (মুকুলমুঞ্জরা)
ধীর জন মুগ্ধ হয় রমণীর ছলে। (পূর্ণচন্দ্র)

(৮৭) কখনও কখনও দুর্ঘটনা হ'তে শুভ সূচনা হয়। (মুকুল)

(৮৮) নারীর মনের কথা দেবতারাও বুঝতে পারে না।

(৮৯) বাক্য, যথা কার্য্যের অভাব (দক্ষযজ্ঞ)

(৯০) বিশ্বাস ব্যবসার মূল (প্রফুল্ল)

(৯১) কালের ঔষধ নাই (ভ্রান্তি)

(৯২) সংসারকে যে সাগর বলে, একথার ঠিক কুল কিনারা নাই। তাতে একটী ধ্রুবতারা আছে—দয়া। দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় না বাদশাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে।

(৯৩) সামান্য হৃদয়ে কামবৃত্তিও কখনো দয়ার আকার ধারণ করে।

(৯৪) দুর্জ্জনের দণ্ড, কপটতার শাস্তি বল্‌তে কইতে বড় সোজা; কিন্তু মনটা উট্‌কে পাট্‌কে দেখ্‌লে, কজন বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারে আমি দুর্জ্জন নই, আমি কপট নই?

(৯৫) মনের পচা পাঁক চট্‌কে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বল্‌তো নি।

(৯৬) সতী আশীর্ব্বাদ করলে কালীর কৃপা হয় (বিবাদ)

২। স্ত্রীশিক্ষা

মাতৃরূপিণী মহিলাদের শিক্ষা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র কতদূর উদার মত পোষণ করিতেন, তাহা আমরা তাঁহার নিজের কথায়ই ব্যক্ত করিব। তিনি বলেন "বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার পদ্ধতি দেখিয়া সমাজ বিদ্যাবতী মহিলার প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন, কিন্তু শিক্ষা শিক্ষাই। শিক্ষা কখনও বিড়ম্বনা হয় না, শিক্ষার অভাবই বিড়ম্বনা।"

গিরিশ বলেন "স্ত্রী-শিক্ষা আজকাল প্রচলিত তাহা নহে, বহুদিন ভারতবর্ষে আছে। কবিতা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিবে। বৌদ্ধ ইতিহাসে শিক্ষিতা স্ত্রীর কথা পত্রে পত্রে। পূর্ব্বতন মহাপুরুষেরা আমাদের অপেক্ষা কম হিন্দু ছিলেন না! কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় ঘৃণা করিতেন না, শিক্ষার অভাবই ঘৃণ্য।"

প্রাচীন ভারতের দেবহুতি, অরুন্ধতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা,

লীলাবতী প্রভৃতি গরীয়সী মহিলাবর্গের কথা স্মরণ করিলেই তাঁহার এই উদার মত পোষণ করা যায়।

তিনি বলেন "অশিক্ষিতা মাতা, শিশু সন্তানকে শিক্ষিত করিতে পারে না, এই বঙ্গদেশের প্রধান বিড়ম্বনা। কিন্তু শিক্ষিতা মহিলার প্রভাব সেদিনও হিন্দুসমাজে দেখিয়াছি, হিন্দুসমাজ-স্রষ্টা শিক্ষিতা হিন্দুমহিলার কোলে স্তন্যপান করিয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে কৃষ্ণের সহস্রনাম শুনিয়া শিক্ষিত। ঠাকুরমার কাছে গল্পচ্ছলে রামচরিত, যুধিষ্ঠির চরিত শ্রবণ করিয়া বলবান হৃদয় লাভে সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন। শিক্ষিতা পিতামহী, শিক্ষিতা মাতা, শিক্ষিতা ভগিনীর ও শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণীর শিক্ষায় তিনি সমাজ-স্রষ্টা, মাতৃদুগ্ধের সহিত ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়া স্বেচ্ছায় কখনও অধর্ম্মকথা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, চেষ্টায় কখনও পর-অহিত সাধনে সমর্থ হন নাই, স্বার্থতাড়নে পরধন অপহরণে সমর্থ হন্ নাই, সঞ্চয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াও ভিখারীকে বিমুখ করিতে প্রয়াসী হন্ নাই। ধর্ম্মশিক্ষা অস্থির সহিত, মজ্জার সহিত, শিরার সহিত, শোণিতের সহিত এক হইয়া তাঁহাকে সমাজ-স্রষ্টা করিয়াছে। তিনি সৃষ্টি করিব বলিয়া সমাজ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার আচার ব্যবহার রীতিনীতির আদর্শে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে; অতি কদাচারী ব্যক্তিও তাঁহার ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ প্রভাবে চরণে আসিয়া অবনত হইয়াছে, কঠোর হৃদয়ে দয়া প্রবেশ করিয়াছে, দুঃশীলা শান্ত সহধর্ম্মিণী হইয়া কুলব্রতে নিযুক্তা। ইন্দ্রিয়-প্রবলা বিধবা তাঁহারই উচ্চ আদর্শে ব্রহ্মচারিণী: বালিকা তাঁহারই মিষ্ট উপদেশে বাল্যচপলতা পরিহারপূর্ব্বক মাতার নিকট কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠান দীক্ষার্থী। চঞ্চল বালক সমবয়স্কের সহিত বিদ্যানুশীলনে রত। পরস্পর কলহ করে না, প্রহারের ভয়ে নয়, অন্য কোনও ভয়ে নয় —ভয় পাছে শিক্ষিতা স্ত্রী দীক্ষিতা সমাজস্রষ্টা মনোক্ষুণ্ণ হন্। শিক্ষিতা স্ত্রী দীক্ষার সমাজ এত বলশালী। শিক্ষার অভাবই ঘৃণ্য, শিক্ষা ঘৃণ্য নয়।"

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের অভিমত এই। এখন দেখা যাউক্, কোন্ প্রকার শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন,—ধর্ম্মবিরহিত পাশ্চাত্য

শিক্ষায়, কি সনাতন-ভিত্তি-অবলম্বিত ধর্ম্মশিক্ষায়? তিনি বলেন "আধুনিক শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়, বাঙ্গালা ভাষাও পাশ্চাত্য ভাবে পরিপূর্ণ। বঙ্গমহিলা বাঙ্গালা বা ইংরাজি বিদ্যা যাহাই লাভ করুন, তাহাতে পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ করেন মাত্র। আর পাশ্চাত্য বিদ্যায় ধর্ম্মদীক্ষা ও বৈষয়িকী দীক্ষা স্বতন্ত্র! পাশ্চাত্য দীক্ষায় বঙ্গমহিলা কেবল বৈষয়িক দীক্ষাই পান—ধর্ম্মদীক্ষার অভাব রহিয়া যায়, এই ধর্ম্মদীক্ষার অভাব লক্ষ্য করিয়া সমাজ শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় যত দোষই থাকুক্, নীতিশিক্ষাদানে পরাঙ্মুখ নহে। পাশ্চাত্য বিদ্যা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, অনর্থাচারের নয়। স্বাধীনতায় উপদেশ দেয়, আপনার ভার কাহাকেও দিব না, আপনার সংসার আপনি রক্ষা করিব, আপনার সন্তানের নিমিত্ত আপনি দায়ী, আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভরণপোষণ আপনার দ্বারাই নির্ব্বাহ করিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষত্ব এই স্বাধীনতা শিক্ষায়। বাঙ্গালী মহিলাও এ স্বাধীনতা নূতন শিখিতেছে না। প্রপিতামহী ধারাক্রমে তাহার প্রপিতামহী হইতে ধারাবাহিক এই স্বাধীনতা শিখিয়া আসিতেছে। সেই শিক্ষা বলে আজও দেখা যায় যে অসূর্য্যম্পশ্যা বাঙ্গালী নারী দুর্দ্দিনে নিপতিতা হইয়া পরগলগ্রহ অবস্থাকে ঘৃণা করিয়া পরগৃহে সামান্য রন্ধন কার্য্যে নিযুক্তা। আর যে পাশ্চাত্য বিবির অনুকরণ ঘৃণ্য' বলি, সে বিবির কার্য্য কেবল বেশভূষা নয়। যে বেশভূষা সমাজ দেখিতে পায়, তাহা বিবির নিজের নিমিত্ত নহে, স্বামীর প্রীত্যর্থে। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সুসজ্জিতা ও হাস্যমুখী দেখিবেন, এই নিমিত্ত সুসজ্জিতা হইয়া হাস্যমুখে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। এ কি রন্ধন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া? তাহা নয়। আর বেশী নয়,—বাবুর্চ্চি নাই, তাঁহারই যত্নে স্বামীর নিমিত্ত সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। রীত্যনুসারে স্বামীর সহিত একত্র ভোজন করেন বটে,—কিন্তু সে সময় দৃষ্টি ভোজনের উপর নয়, একত্রে বসিয়া তিনিই পরিবেশন করিতেছেন, কোন বস্তুর অভাব হইতেছে কাঁটা চাম্‌চের দ্বারা স্বামীর পাতে দিতেছেন,—ছেঁড়া ষ্টকিং তাঁহার শিল্প-কৌশলে নূতন হইয়াছে, সার্ট কাটিয়া রাখিয়াছেন, আগামী কল্য দর্জ্জির

বাড়ীর অপেক্ষা সুন্দর সার্ট প্রস্তুত হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র বাগানে যে সকল সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে, সাহেব দেখিবেন তাহা কুসুম-তত্ত্ববিদ্ পত্নীর যত্নে। এই নিমিত্তই সাহেব বিবিকে এত সম্মান করেন; নচেৎ সাহেব একটা বাঁদর নয়, একটা অনাচারিণী নারীর অত আদর করে না।"

যাহা হউক্ মোটামুটি বুঝিতে পারা যায় যে গিরিশচন্দ্র বালিকাগণের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তিনি এই স্থানেই স্থির থাকেন নাই, শিক্ষা সম্বন্ধে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষাই যথেষ্ট নয়—কেননা—তিনি বলেন "সত্য বটে পাশ্চাত্য শিক্ষা নীতি-বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু হিন্দুহৃদয় নীতিগঠিত নয়, ধর্ম্মগঠিত, ধর্ম্মের অন্তর্গত নীতি। ধর্ম্মের ভিত্তি হৃদয়ে না থাকিলে কেবল নীতিশিক্ষা ফলপ্রদ হয় না। কতক আচার-ভ্রষ্টও হয়, অনুকরণ আসিয়া পড়ে। বাহ্যিক দৃশ্যে হিন্দুর পক্ষে বিবির আচার সঙ্গত নয়; সুতরাং ইংরাজী শিক্ষায় বাঙ্গালী মহিলার ইংরাজী অনুকরণে আচার কতকটা অমঙ্গল হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে ঘৃণার কারণ নাই। যাহা অসঙ্গত, তাহা বালিকার পিতামাতা, যুবতীর স্বামী, সদুপদেশ, ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহারের পার্থক্য বুঝাইয়া, বিজাতীয় আচারের অনুপযোগিতার দোষ বুঝাইয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুশিক্ষিতা কুললক্ষ্মী গৃহে স্থাপিত করিতে পারেন। আবার দেখিতে পান যে শিক্ষিতা গিন্নীর অভাবে গৃহে বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, সেই গিন্নী ফিরিয়া আসিয়াছেন,—আবার সংসার সেইরূপ সুশৃঙ্খলায় আবদ্ধ। সমাজ বুঝিতে পারিবে, স্ত্রীশিক্ষা দোষের নয়, শিক্ষার অভাবই দোষ।"

এই ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবের জন্য সমাজই দোষী, এবং সমাজেরই এই দোষ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজ অন্য কিছুই নয়, আমরা সকলে মিলিয়াই সমাজ। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন কার্পেট জুতা নির্ম্মাত্রী বালিকা অপেক্ষা সত্যবাদিনী বালিকার অধিক আদর করি? কয়জন পিতা বিশ্রাম সময়ে স্বীয় কন্যার মুখে "কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা," শ্লোক না শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম বা শিবস্তোত্র বলিতে উৎসাহ প্রদান করি? কয়জন স্বামী স্বীয় পত্নীকে কন্যার ধর্ম্মোন্নতির প্রতি দৃষ্টি

রাখিতে আদেশ করি? আমাদের উচিত যে শিক্ষার অভাব তাহার পূরণ করা, শিক্ষার দোষ দেওয়া উচিত নয়।

অতএব গিরিশচন্দ্র বলেন "ধর্ম্মশিক্ষা বঙ্গমহিলার প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যশিক্ষায় অনুকরণাদি দোষেরও আশঙ্কা আছে। তবে সেই শিক্ষা দিই কেন? বৈষয়িক-শিক্ষা ও নীতি-শিক্ষার প্রয়োজন—তাই। গৃহে ধর্ম্মশিক্ষা পাইলে, বৈষয়িক ও নীতি শিক্ষায় অমৃত ফল ফলিবে। বিদ্যালয়ে কন্যা এই সকল নীতিশিক্ষা পাইতেছে, নচেৎ মহাশয়কে সেই সকল শিক্ষা দিতে হইত। পাশ্চাত্য শিক্ষক আপনার গুরুভারের অনেক লাঘব করিয়াছে। সুযোগ্যা নীতিশালিনী বৈষয়িক-গৃহিণী পাশ্চাত্যশিক্ষার ফল। গৃহধর্ম্ম-শিক্ষায় সেই ফল ঐহিক ও পারমার্থিক অমৃতদানে সক্ষম হইবে।"

স্ত্রী-শিক্ষার উচ্চ আদর্শ কেবল প্রবন্ধে নয়, গিরিশের নাটক নভেলেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"চন্দ্রা" উপন্যাসে পাদরী মিসনরী স্বয়ং ডাফ্ সাহেবের শিক্ষায় সুশিক্ষিতা চন্দ্রার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। চন্দ্রা সংসারে একাকিনী, আর বাঙ্গলায় স্ত্রীশিক্ষার তখন প্রথম প্রাদুর্ভাব। মিসনরীরা তাঁহাকে লিখিতে পড়িতে শিখায়; সংগীত ও চিত্রবিদ্যায় নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু দেখেন যে খ্রীষ্টান হইতে তাঁহাকে সকলেই অনুরোধ করে। "খ্রীষ্টান হইব" কথাটিতে তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিত। বাল্যকালে দেখিয়াছেন তাঁহার মাতা প্রাতঃকাল হইতে দুইপ্রহর পর্য্যন্ত পূজা করিতেন, স্বর্গ-কামনায় মহাপথে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। খৃষ্টান হইলে মানিতে হয়—"তাঁহার মাতা কুসংস্কারবশতঃ আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা হিন্দু ছিলেন কুসংস্কার বশতঃ স্বর্গে যাইতে পারেন নাই।"

কিন্তু শিক্ষিতা চন্দ্রা বলিতেন "কখনই না, আমার পিতামাতা স্বর্গে!"

ডফ্ সাহেব যেখানে সেখানে চন্দ্রার সুখ্যাতি করিয়া বেড়ান। সকলেই বলেন "ভারতবর্ষে এমন স্ত্রীলোক আর দেখি নাই।"

একজন মেম তাঁহার বাড়ীতে অতিথি ছিলেন—তিনি দেশভ্রমণ

করিতে আসিয়াছিলেন, বলিলেন "সত্যবটে, যেরূপ বর্ণনা করিলেন; এরূপ স্ত্রীলোক বিরল ; কিন্তু——"

এই কথা হইতেছে এমন সময়ে চন্দ্রা আসিয়া পৌছিলেন। ডফ্ সাহেব অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। চন্দ্রা বলিলেন——

"সাহেব, আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি"

"কোথায় যাইবে ?"

"পশ্চিমে"

"কেন চন্দ্রা ? পশ্চিমে এখন হুলস্থুল।"

"সাহেব, আমার বিশেষ কার্য্য।"

"কি বিশেষ কার্য্য ? তুমি যাইতে পারিবে না।"

"সাহেব আমার ঠিকুজিতে লেখা আছে উনিশ বৎসর বয়সের সময়ে আমার মৃত্যু হইবে। প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া, কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিব।"

ডফ সাহেব উত্তর করিলেন "চন্দ্রা, তোমার কুসংস্কার গেল না। ঠিকুজি কি সত্য, প্রতারক ব্রাহ্মণেরা এইরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করে।"

চন্দ্রা বলিলেন "সাহেব এ বিষয়ে আপনার সহিত চিরদিন আমার ভিন্নমত।"

ডফ সাহেব বড় দুঃখিত হইলেন। বিস্তর বুঝাইলেন, চন্দ্রা স্থির-প্রতিজ্ঞ রহিলেন। ডফ সাহেব অগত্যা বিদায় দিলেন, কিন্তু কন্যাকে বিদায় দিয়া পিতা যেরূপ ব্যাকুল হয়, মহাত্মা ডফ ছাত্রীর জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হইলেন। বলিলেন——

"চন্দ্রা, কোন রূপেই থাকিবেনা ?"

"না"

"তবে যাও। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।"

চন্দ্রা চলিয়া গেলে ডফ্ সাহেব বলিলেন—

"ভারতের কুসংস্কার কত প্রবল দেখুন! উহার মাতা অ্যাড্মিনিষ্ট্রেটারের জিম্মা দিয়া কেদারনাথে যাইয়া প্রাণত্যাগ করে।"

"আত্মহত্যা করে ?"

"আত্মহত্যাই বটে, মন্দিরের একটী দ্বার খুলিয়া যায়, আর ফিরে না। জাতীয় সংস্কার বহুদিনে দূর হয়। এত লেখা পড়া শিখিয়াছে, তবু তীর্থে চলিল।"

চন্দ্রা, ৭ম বিভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ।

কবি এখানে ইঙ্গিত করিয়াছেন——

পাশ্চাত্য শিক্ষায় চন্দ্রার মত উচ্চশিক্ষিতা হইয়াও চন্দ্রার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা——আমাদের মহিলাগণের আদর্শ হওয়া উচিত।

দ্বাদশ বৎসর বাদে আবার গিরিশ "মায়াবসানে" হিন্দুর শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, চিরকুমারী-আদর্শ নারী-চরিত্রের আদর্শ উপস্থাপিত করেন। রঙ্গিণী অন্ত্যজাতীয়া দরিদ্রের কন্যা, কিন্তু কালীকিঙ্করের সযত্ন-শিক্ষিতা। রঙ্গিণীকে তিনি বলিতেছেন——

"আচ্ছা, যদি কুমারী থেকে লেখাপড়া শিখ্‌তে চাও, আমি আপত্তি করি না, কিন্তু বোঝ সংসারে বিস্তর প্রলোভন, মন স্থির রাখা অতি কঠিন……"

অবশ্য কালীকিঙ্করের উচ্চাদর্শে ও সৎশিক্ষায় রঙ্গিণীর চরিত্র-গৌরব অক্ষুণ্ণই থাকে।

অতঃপরে "বলিদানে" ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার ভগ্নিকে বলিতেছে——

"আমি সংসার চালাবো। আমি মোজা বুন্‌তে শিখেছি। মেম্ সাহেব জাপান হ'তে কল কিনে দিয়েছেন, তিন আনা ক'রে মোজার জোড়া, আমি দিনে রেতে আট জোড়া ক'রে মোজা বুন্‌তে পারি।…… আমরা ক' বোনে মেহনৎ করে সংসার চালাতে পারবো না?"

৪র্থ অঙ্ক, ৪ গর্ভাঙ্ক।

শিক্ষার চরম আদর্শ ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও স্বদেশানুরাগে। **হরমণি**, **বৈষ্ণবী** ও **তারা** চরিত্রে ইহার পূর্ণ বিকাশ।

৩। প্রেম (LOVE)

"দক্ষযজ্ঞে" গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"প্রেম-ডুরি সৃষ্টির বন্ধন।"

"ভ্রান্তিতে"ও লিখিয়াছেন "প্রেমই মানব-জীবনে সর্ব্বস্ব।"

বাস্তবিক সংসারই প্রেমে চলিয়াছে। প্রেমিক আপনার অন্তর পরীক্ষা করিয়া বুঝে তাহার "প্রণয়ীই তাহার জগৎ। জগৎ আর স্বতন্ত্র নয়, তাহার নিকট ভূত-ভবিষ্যৎ নাই, সমস্তই বর্ত্তমান'। বুঝিতে পারে, সে অবস্থার অধীন নয়, বিশ্বধ্বংস হইলে তাহার ভাবান্তর ঘটিবে না, জগতে আর কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল প্রেমের স্রোত দেখে। তাহার দৃষ্টিতে প্রেমের জগৎ, প্রেমভিন্ন পদার্থই নাই। এই প্রেমে অমৃত-লহরী অহোরাত্রিই খেলিতেছে, প্রেমিক হৃদয় সেই তরঙ্গে অহোরাত্রিই ভাসমান। বিরাম নাই,——একস্রোতেই দিবারাত্রি চলে।"

"লীলা"—প্রবন্ধ।

কিন্তু এ কোন্ প্রেম? রবীন্দ্রনাথ যে ভালবাসার কথা বলিয়াছেন—

ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে
আমার নামটী লিখিও তোমার
মনের মন্দিরে;
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তানটি শিখিয়ো তোমার
চরণ মঞ্জীরে।

অথবা মধুসূদন যে প্রেমের কথা লিখিয়াছেন—

"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি,
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে?"

এ কি সেই প্রেম? গিরিশের প্রেম ইহাপেক্ষা অনেক উচ্চে, আরও মহৎ। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ হইতে ইহা উদ্ভূত হইলেও ক্রমে গিয়া একেবারে প্রেমের রাজ্যে উপস্থিত হয়, মানুষের সুখ-দুঃখ হইতে একেবারে ভাগবতসত্যে গিয়া পরিণত হয়। *

চণ্ডীদাসে যেমন—

চলে নীলসাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

* * *

হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইলে সে।

গিরিশের প্রেমেরও উৎপত্তি যৌনবন্ধনে বটে, কিন্তু আত্মত্যাগে ইহার পরিপুষ্টি এবং পরিণতি ইহার বন্ধনমুক্তিতে। রক্তমাংসের দেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই চরম নয়, ইহার চরম পরিণতি নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণে।

"লীলায়" সুরো তাহার প্রেমিক সম্বন্ধে লীলার গলা ধরিয়া বলিতেছে——

"দিদি, তুমি স্নেহবশতঃ এরূপ আশঙ্কা করিতেছ। সে আমার, আমি আমার প্রাণ দিয়া তাহা বুঝিয়াছি, তাহার মুখ দেখিয়া, চোখ দেখিয়া, অঙ্গস্পর্শ করিয়া, অঙ্গস্পর্শে পুলকিত হইয়া, মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, চোখে চোখ মিশাইয়া বিভোর হইয়া, সরল অন্তরে সরল অন্তরের ভাব বুঝিয়া জানিয়াছি যে সে আমার। কায়মনোবাক্যে আমার,—জীবনে আমার—**মরণে আমার—অনন্ত কাল আমার**—আমারই প্রাণেশ্বর, অন্য কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই।" বলিতে বলিতে সুরো এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। বদনে নয়নে যেন স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। লীলা নিস্তব্ধ—সুরো নিস্তব্ধ—উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এই অঙ্গস্পর্শের অবস্থা হইতে 'অনন্ত কাল আমার'—প্রেমের বিভিন্ন রূপ আমরা গিরিশের বিভিন্ন নাটক হইতে বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইব।

প্রেম অর্থে কবি বলেন—"দুজনের মন মিলে এক হ'লে প্রেম বলে; যখন একপ্রাণ হ'ল, তখন আপনার প্রাণ কাঁদলেই বুঝতে পারে যে তার প্রাণ কাঁদছে।" আর প্রেম এমনি জিনিষ যে ভালবাসিলে 'তাকে দেখতে ইচ্ছা করে—তার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করে—না দেখলে প্রাণ কাঁদে।'

কিন্তু এই প্রেমে বিচ্ছেদই বিরহ। গিরিশচন্দ্র 'বিষাদের' মুখে প্রেমে বিরহের গান গাহিয়াছেন :—

প্রেমের এই মানা
না হ'লে প্রেম ত রবে না।
প্রিয়া বিনে কারুর পানে চাইতে পারে না॥
প্রেমে সদাই অভিমান।
প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ
সয়না কথার টান,
প্রেম সরু সুতায় বাঁধা বাঁধি
বাতাসের ত ভর সবে না॥

বিষাদ, ২য় অ, ৩ গ।

এখন এই প্রেমের বিরহে যে কতরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, গিরিশচন্দ্র উপরি-উক্ত নাটকেই মাধব ও ফকিরগণের মুখে একটী সঙ্গীতের সহায়তায় সমস্ত ভাব আরোপ করিয়াছেন :—

আমরা চার রকমের চার বিরহিনী
বিচ্ছেদে মনের খেদে ঘুরি দিবা যামিনী।
কারুর বুকে ছার পিরীতের ধামা ধরেছে,
কেউ পিরীতের কম্বনীতে জ্যান্তে মরেছে
কারুর লজ্জা সরম, ধরম করম
সকল হরেছে,
কেউ পিরীতে উঠি পড়ি, তবু পিরীত ছাড়িনি,
প্রেম ক'রে কেউ আড় নয়নে চায়
কেউ ধূলো মাখে গায়,
পিরীত তোরে বলিহারি হায়!
কেউ নয়ন জলে গাঁথি মালা
কেউ বা প্রেমে মানিনী।

বাস্তবিক প্রেমের কত বিভিন্ন রূপ! কেহ প্রেমে দুরু দুরু বুকে প্রেমিকার দিকে 'আড় নয়নে চায়,' বুকে বিষম ভার, কতই যন্ত্রণা, কেহ

বা প্রেমাস্পদলাভের জন্য জীবন্মৃত, কেহ 'উঠি পড়ি, তবু পীরিত ছাড়িনি,' 'কেহ ধূলো মাখে গায়,' রূপরসে মজিয়া বা ব্রজের ধূলায় লুটাইতে লুটাইতে বিভোর হয়, কেহ প্রেমে লজ্জা, সরম, ধরম, করম, সব পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ প্রেমে কলঙ্কিনী, কেহ বা প্রেমে নয়নজলে মালা গাঁথেন, আর কেহ বা প্রেমে 'মানিনী'।

প্রেমের লক্ষ্য রক্তমাংসময়ই হউক আর চিন্ময় ভগবানই হউন, প্রেমধারা পতিতপাবনী, নিত্য শুদ্ধা। যিনি ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, পরিত্যাগ করিয়া একমনে প্রেমিকের দিকে প্রধাবিত হন, তিনিই প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পান, প্রেমে তাঁহার সমস্ত মলিনতা ভাসিয়া যায়। এই অনন্যশরণ প্রেমিকের প্রাণই রক্তমাংস হইতে ক্রমে চিন্ময়ে পৌছায়।

এবম্বিধ স্বার্থশূন্য প্রেম——যাহাতে ক্রমে ভগবদ্দর্শন লাভ হয় সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ প্রেম। তাই গিরিশচন্দ্র বারবার বলেন——

(ক) আত্মত্যাগ প্রেমের লক্ষণ।

পাণ্ডব গৌরব

(খ) স্বার্থ বিসর্জ্জন, জেনো, প্রেমের লক্ষণ।

মুকুল মুঞ্জরা

(গ) ধন, মান, জীবন, যৌবন—সমস্ত অর্পণ করলে তবে প্রেম লাভ হয়···

বিষাদ, ৩ অঙ্ক, ২ গ।

(ঘ) ভালবাসার সুখই তো যারে ভালবাসি তারই সুখে সুখ—

ভ্রান্তি

এইরূপ একনিষ্ঠ প্রেম "বিষাদে" সরস্বতী চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রেমে সরস্বতী বালক-বেশ ধারণ করিয়া বারাঙ্গনা-গৃহে আসিয়া স্বামীর সেবকের কার্য্য গ্রহণ করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরণ স্পর্শে যেমন কারাগারও স্বর্গ হইয়াছিল, প্রেমের অধিষ্ঠানে নরকসদৃশ গণিকালয়ও তখন স্বর্গে পরিণত হইল। স্বর্গ, জ্যোতিষ্কের পরিবেশমণ্ডলের ন্যায় প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই যায়,—তা সে দণ্ডকারণ্যই হোক্ আর

দণ্ডারণ্যই হোক্‌। প্রেম-বলে সে জানে প্রেম প্রেম, ইহাতে স্থানের বিচার নাই, লাভালাভ নাই, হিসাব গণনা নাই। বিষাদ বলিতেছে—

"ভালমন্দ যে করে বিচার,
প্রেম কোথা তার?
প্রেম—বিমল গগন-বারি
সুস্থান কুস্থান নাহি জ্ঞান
সমভাবে হয় বরিষণ।
ভালবাসা স্বভাব যাহার
ভালবাসে, লাভ মন্দ গণনা না করে।"

৩য় অঙ্ক, ২ গ।

বাস্তবিক প্রেম ব্যবসায়ে খাটাইবার জিনিষ নয়। পাইবার আশায় বা লাভালাভে প্রকৃত ভালবাসা হয় না।

কেনা বেচা ভালবাসা, শিখিনি সই
শিখ্‌ব না আর,
ভালবেসে হেরে জিনে, ভালবাসা সাধ
থাকে যার।

মুকুল মুঞ্জরা ৫ম অঙ্ক, ১ম গ।

এই প্রেম-বলে পতির উদ্দেশে সরস্বতী অন্তঃপুর ছাড়িয়া নরকের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ঘৃণ্যা বারাঙ্গণার দাস তাহার স্বামী, তাহাকে পরম পুণ্যবতী মনে করে, পরমপবিত্রজ্ঞানে সেই নারীর চরণস্পর্শে পবিত্রা হইতে আসে। সে জানে যে নারী তাহার স্বামীর ভালবাসার পাত্র সে অপবিত্রা নয়, পুণ্যবতী—তাহার সেবাই প্রকৃত সেবা। তাই সরস্বতী মন্ত্রী শিবরামকে বলিতেছে—

মন্ত্রি! তুমি নাহি জান বিবরণ,
হেন ঘৃণ্য বারনারী নহে কদাচন
পাপ সহচরী কেমনে তাহারে কহ?
যারে মম স্বামী সমাদরে,
তার সম পুণ্যবতী কে আছে জগতে?

আমি ঘৃণ্য—কভু নাহি দাসীযোগ্য তার!
মন্ত্রি! রাখ প্রাণ, রাখহ বচন—
দেখাও সে রমণী রতন,
যার প্রেমে মাতি দিবারাতি
পতি মম ফেরে সাথে সাথে!
সত্য কহি, দাসী হ'ব তার
দিবানিশি সেবিব তাহার পদ
আমি অপবিত্রা পতি ঠেলেছেন পায়
যেই জন তাঁর আদরিণী, মম ঠাকুরাণী!
পবিত্র হইব তাঁর চরণ পরশে।

সরস্বতী প্রেম জানে, প্রেমের কাঙালী, এবং প্রেমের জন্য যথাতথা ভ্রমণ করিতেছে——

আশ্রয় বিহীন, ভ্রমি দেশে দেশে
পূরে যদি মন-আশ
প্রেমিক হেরিয়ে জুড়াইবে আঁখি
প্রেমিকের হব দাস।

পতিপ্রেমের জন্য পতির সন্ধানে অন্তঃপুর ত্যাগ, দেশে দেশে ভ্রমণ ও বেশ্যাগৃহে-বাসই সরস্বতীর স্বর্গবাস, কারণ "চকোর যদি চন্দ্রলোক পায়, আর কোথাও কি যেতে চায়?" বেশ্যার লাঞ্ছনাও সরস্বতী গ্রাহ্য করে না—

যেহেতু——

লাঞ্ছনা গঞ্জনা—প্রেমিকের আভরণ
ফণীর মাথার মণি যেই জন চায়,
দংশনের ডর সে কি করে?
করি, ভয় মধুমক্ষিকায়
মধু কে হরিতে পারে?
প্রেম সুধা সে ত নাহি পায়,
লাঞ্ছনায় ডরে যেবা!

প্রেমে তাহার আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াছে বলিয়াই সে বলিতেছে—

করিয়াছি আত্মবিসর্জ্জন—
এই মাত্র আছে স্মৃতি।
কিন্তু আমি আর নাহিত আমার,
ভাল মন্দ নাহিক বিচার!

ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রী যখন রাজার মঙ্গলের জন্য সরস্বতীর ভ্রাতা জিতসিংকে সংবাদ প্রেরণ করে, রাণী স্পষ্ট বলিয়া দেয়—

হয় যদি অনিষ্ট রাজার
কভু প্রাণ ধরিতে নারিব।

উজ্জ্বলার ষড়যন্ত্রে যখন রাজা বন্দী ও অচেতন, সরস্বতী বুদ্ধিপ্রভাবে তস্করগণের সহায়তায় তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লয়। অলর্ক তাহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইতে পাইতেই, উজ্জ্বলার দূত আসিয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাত করে! আর সতীর মৃত্যুকালে এই খেদ রহিয়া যায় "যে প্রাণ দিয়ে স্বামীর প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে পাল্লে না।" সরস্বতীর স্বামিপদতলে প্রাণ-বিয়োগ প্রেমের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও উজ্জ্বলতম নিদর্শন সূচনা করিতেছে।

মহাকবির দ্বিতীয়া পত্নী বিয়োগের পরে 'বিষাদ' নাটক অভিনীত হয়। বাহিরেও যেমন বিষাদ, কবির অচঞ্চল হৃদয়ের গভীর গূঢ়তম অন্তস্তলেও তখন পত্নী-বিয়োগ জনিত তেমনই বিষাদ। বিষাদে ক্ষরিত হৃদয়শোণিতে এই বিষাদ চরিত্র অঙ্কিত, তাই ইহা এত মর্ম্মস্পর্শী। বিষাদে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর কবিলেখনীতে "প্রফুল্ল" আসে। কিন্তু এখানেও হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ একেবারে থামে নাই। জ্ঞানদার মৃত্যু সেই শোকেরই দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

"ভ্রান্তির" **অন্নদা** চরিত্রেও এইরূপ স্বার্থশূন্য পতি-প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণের সহিত ভালবাসা হয়, তাহার পিতা বিবাহ দিতে চাহেনি বলিয়া "গঙ্গাসাক্ষী ক'রে, সূর্য্যি সাক্ষী ক'রে মালা বদলে বিবাহ হয়।"* তাহাদের কন্যা মাধুরীকে উদয়নারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী প্রতিপালন করে। পিতার মৃত্যুর পরেও উদয়

তাহার পত্নী অন্নদাকে ঘরে আনে নাই। অন্নদা পতি-প্রেমে উন্মাদিনী-বেশে যথাতথা ভ্রমণ করে। তাহার 'পতি প্রেম' সম্বন্ধে সে নিজেই পুরঞ্জনকে বলিতেছে—

"আমি পতি-প্রাণা—
পতি-প্রেমে ভিখারিণী—
উন্মাদিনী পতিপ্রেমে আমি,
পতি ধ্যান, জ্ঞান ;
পতি হেতু করিয়াছি আত্ম-বিসর্জ্জন ;
রাখিবারে পতির সম্মান
ভ্রমি দেশে দেশে ভিখারিণী-বেশে,
রাজরাণী কেহ নাহি জানে।"

৫ম অঙ্ক, ৭ গ।

এই আত্মত্যাগিনী নারীর অনন্ত স্বার্থত্যাগ তাহার স্বামীর মানরক্ষার জন্য, নতুবা স্ত্রীর অধিকার দাবী করিতে আর তাহার অন্তরায় কি ছিল? অন্নদার দুঃখময় জীবন কিরূপে অতিবাহিত হয়, তাহা সে নিজেই বলিতেছে—

"দেখেছ আমায় তব বিবাহের দিনে।
হয় কি স্মরণ—এসেছিল উন্মাদিনী ?
সেই আত্মত্যাগী কাঙ্গালিনী।
স্বেচ্ছায় করেছি শিরে কলঙ্ক ধারণ,
করি কুক্কুটের উচ্ছিষ্ট অশন,
শয্যা ধরাতল, আচ্ছাদন নীলাম্বর।"

স্বামীর মৃত্যুর সময়ে তাহার চিতায় একত্র শয়ন করিয়া প্রকাশ্যে তাহাদের নিভৃত-পোষিত পবিত্র সম্বন্ধের সার্থকতা সম্পাদন করে।

"মনের মতনে" ও প্রেমিকা বেগম গোলেন্দাম মির্জ্জান (বাদসাহ)কে বলিতেছেন——

"বাদ্‌শা, তুমি শিক্ষার্থী হয়ে সংসারে ভাস্‌বে—সে শিক্ষা সতী নারীর নিকট শিখে চলে যাও। তুমি প্রেম দেখ নাই—প্রেমের প্রভাব দেখে চলে

যাও। প্রেম-বন্ধনে সংসার চলে, তা জান্‌লে তোমার অন্তরে সন্দেহ থাক্‌বে না!"

প্রকৃত প্রেমিকের অবস্থা কাউলফের চরিত্রেও প্রকটিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেমিক সর্ব্বদা তাহার প্রেমাস্পদের ধ্যানে ডুবিয়া থাকে। তাহাকে বিস্মৃত হওয়া কি সহজ, অন্তরের নিধিকে কে ভুলিতে পারে? তাই কাউলফ্ দেলেরার সম্বন্ধে বলিতেছে—

"না—না কেন ছাড়্‌বো? জ্বালায় যে সুখ আছে, সে যে জ্বলেছে সেই জানে। তারে ভেবে সুখ, তার কথা ক'য়ে সুখ, সে মুখ অন্তরে আঁকা, একে ছাড়্‌বো? কেন ছাড়্‌বো, এ জ্বালাই যে তার জীবন!"

প্রেমে তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয়——পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, জড় চৈতন্য লাভ করে, দুর্ব্বল অসীম শক্তি লাভ করে। প্রেমে মূকেরও ভাষা ফোটে। **"মুকুল মুঞ্জরায়"** মুকুলের চরিত্রে প্রেমের এই অদ্ভুত প্রভাব বিকসিত, প্রেমে মুকুল মঞ্জুরিত—প্রফুল্ল। পাণ্ডীয়ানাধিপতি বীরসেনের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মুকুল বোধশক্তিরহিত ও জড়ভাবাপন্ন—

ভুবন মোহন এই সুন্দর কুমার
কিন্তু হায় কি কহিব কপালে অঙ্গার!
এ হেন সুন্দর কায় জ্ঞান জ্যোতিহীন,
শূন্য হৃদি, প্রশস্ত ললাট ধী-বিহীন;

তাহাকে সকলে জড়, অপ্রকৃতিস্থ, উন্মাদগ্রস্ত বলিয়াই জানে। কিন্তু কেরোলির রাজকন্যা মুকুলের সহিত প্রথম সন্দর্শনে তাহার এই জড়ত্ব ঘুচিয়া গেল। বিমাতার নিগ্রহে বনবাসী মুকুল অলক্ষ্যে থাকিয়া মুঞ্জরার মুখে 'বেশ ফুল ফুটে রয়েছে' শুনিয়া, অনেকগুলি ফুল তুলিয়া লইয়া "তুমি ফুল চাচ্ছিলে, এই নাও," বলিয়া মুঞ্জরাকে অর্ঘ্য প্রদান করে। কথায় কথায় যেন তাহার একটু জ্ঞান সঞ্চার হইল। মুঞ্জরা যখন জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার কিছু বাল্যকালের কথা মনে হয় না?"

মুকুল—না, আমার সব ছায়া ছায়া মনে হয়, আমার যেন রাত হয়েছিল, তোমায় দেখে যেন দিন হয়েছে, আমি আর ফুল তুলে আন্‌ব ?

প্রেমবলে ক্রমে এই জড়ের কিরূপ জ্ঞানচৈতন্যের উন্মেষ হয় আমরা স্বামী অচ্যুতানন্দের মুখে সেই পরিচয় পাই——

"প্রেমে বিকসিত হয় কুঞ্চিত হৃদয়,
সুধাকর করে যথা কুমুদী মোদিনী,
শুভক্ষণে দরশন রাজপুত্রী সনে।
বিন্ধিল যুগল হৃদি হানি পঞ্চশর।
কোমল বন্ধনে রতি বাঁধিল অন্তর।
প্রেমশশী উদিল তিমির হ'ল নাশ,
সৌরভে গৌরবে হৃদি হইল বিকাশ।"

৩য় অঙ্ক, ৪ গ।

মুকুলও বলিতেছে——

"আমার হৃদয়-পটে সকল কথাই অঙ্কিত ছিল, অজ্ঞান-অন্ধকারে আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু তোমায় হৃদয়ে ধরে আমার হৃদয় আলোকময়, সকলি দেখ্‌ছি, সকলই স্মৃতিপথে উদয় হচ্ছে।"

যে প্রেমের কথা আমরা বলিলাম, তাহার উদ্ভব যেখানেই হউক্, তাহা নিঃস্বার্থ পরিণাম-পবিত্র। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'মুকুল মুঞ্জরায়' এই নিঃস্বার্থ প্রেম মুকুল ও চন্দ্রধ্বজ চরিত্রে আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বামী অচ্যুতানন্দ ইহাদের প্রেম খাঁটি কিনা তাই পরীক্ষা করিবার জন্য বলিতেছেন——

স্বার্থ বিসর্জ্জন জেন প্রেমের লক্ষণ।
পরসুখে সুখী যেই প্রেমিক সে জন।
কামগন্ধহীন যে পবিত্র ভালবাসা,—
ভালবাসে, কিন্তু দেছে বিসর্জ্জন আশা!
স্বর্গীয় সে প্রেম। তার তুলনা কি হয় ?
হেন প্রেমিকের স্পর্শে ধরা প্রেমময়!

কামের ছলনা—কিবা পবিত্র প্রণয়,—
পরীক্ষা করিয়া তার লব পরিচয়। ৪র্থ অ, ১ম গ।

রাজকুমারী মুঞ্জরার কাছে আসিয়াছে বলিয়া মুকুলকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার আদেশ প্রচার হইয়াছে। সে কিন্তু মুঞ্জরাকে দেখিতে আসিয়া বলিতেছে—

"আর আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।"

মুঞ্জরা তাহাকে বারবার যাইতে বলিলে সে উত্তর করে "আমি তোমায় অকপটে ভালবাসি, সে ভালবাসার প্রাণদান ভিন্ন পরিণাম নাই।"

চন্দ্রধ্বজ আসিয়া তাহাকে অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছে, কিন্তু তাহার একই উত্তর—"তুমি প্রেম শিখেছ—প্রাণ দিতে কি শেখনি।"

অতঃপরে মন্ত্রী এবং অচ্যুতানন্দ আসিয়া এক আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এ আজ্ঞা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অপেক্ষাও কঠোর, স্বহস্তে প্রণয়পাত্রী পরার্থে উৎসৃষ্ট, কিন্তু তাহা প্রণয়িনীরই জীবন-রক্ষার্থে। স্বামীজী বলিলেন—

"হাস্যমুখে মহারাজ বীরসেনের পুত্রকে যদি রাজকুমারীকে অর্পণ কর্‌তে পার, বীরসেনের পুত্রের সহিত পরিণয়ের পর যদি রাজকুমারীর সহিত থাকৃতে স্বীকৃত হও, তা হলে, তার জীবন রক্ষা হবে।"

মুকুল জানিত না সে নিজেই বীরসেনের পুত্র! উত্তর করিল—

"প্রভু এ কঠিন আজ্ঞা করছেন।"

অচ্যুত—এ আমার আজ্ঞা নয়, রাজ-আজ্ঞা। তুমি রাজকুমারীকে ভুলিয়ে বনে এনেছিলে, প্রাণ দিলে তো সব ফুরিয়ে গেল, তা হ'লে তোমার অপরাধের শাস্তি কি হল?

মুকুল—এতে রাজকুমারী সম্মত হবেন?

অচ্যুত—তুমি সম্মত হ'লেই রাজকুমারী সম্মত হবে।

মুকুল—প্রভু, অতি কঠিন আজ্ঞা, তথাপি আমি সম্মত। যাতে মুঞ্জরা সুখী হয় সেই আমার ইষ্ট, আমি আত্মত্যাগে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

মুকুল পরীক্ষায় জয়লাভ করিল। বুঝিল "রোদনই হৃদয়ের উচ্চশিক্ষা, প্রেমের সার রোদন, তাই প্রেমই পরম বস্তু।"

মুকুল-চরিত্রে প্রেমের সঞ্চার, বিকাশ ও পরীক্ষা এবং প্রেমের জন্ম আত্মত্যাগ শ্রেষ্ঠ কলা কৌশলের পরিচায়ক।

মুকুলের সহোদরা তারা ভ্রাতৃস্নেহে মূকভাব অবলম্বন করে। যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ এই বালিকাকে ভালবাসে এবং তাহার হৃদয়ে বালিকা ভিন্ন অন্য কাহারও স্থান নাই। কিন্তু বাক্‌শক্তি ত্যাগ না করিলে ইঙ্গিতে তাহার অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিবে না। তাই সে স্বেচ্ছায় মূকত্ব বরণ করিয়া লয়। জীবনে কখনও কথা কহিবে না সঙ্কল্প করে।

পরে মুকুলের বিপদে তাহার প্রাণরক্ষার্থই ব্যাকুল হইয়া কথা কয়।

এ প্রেমধারাও কামগন্ধলেশহীন, জাহ্নবীধারার ন্যায় পরম পবিত্র। **চন্দ্রধ্বজও** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

এই নিঃস্বার্থ প্রেমের মন্ত্রেই **দুলালচাঁদ** মানুষ হয়। প্রেমে দেওয়ানা **জোবি** তাহার শিক্ষাদাত্রী। তাহারই শিক্ষায় দুলাল বুঝিতে পারে "আপনাকে ভাসিয়ে দেওয়া পরের সুখে সুখী হওয়া জ্বালার ওষুধ। দরদী দরদ চায়, প্রাণ দিয়ে প্রাণ চায়, তার কাছে মাটীর দেহের কদর নাই।" আত্মবলিদানের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুলাল দুনিয়াকেই ভিন্ন চক্ষে দেখিল, ও বুঝিল—"কি শান্তি, আর জ্বালা নেই, প্রাণ জল হ'য়ে গিয়েছে।"

"স্বপ্নের ফুলে" ও এই প্রেমের প্রভাব দৃষ্ট হয়। মনহারা ও সখীগণ গাহিতেছে—

> যার বুকে জলে বিষের আগুন
> নিবিয়ে ফেল প্রেম-জলে,
> প্রেম-পরশে নেভে আগুন,
> দিবা-নিশি নয় জলে।

প্রেমে দৃষ্টি উন্মীলিত হয়—তাই "ভ্রান্তি" নাটকে **অন্নদা** পুরঞ্জনকে বলিতেছে——

"তুমি এ পথে আসবে, আমি জানি, কে যেন আমায় ব'লে দেয়, আমি আপনার লোকের সব কথা জানি। আমার মন তোমাদের কাছে প'ড়ে আছে, একবারও আমার কাছে থাকে না, তোমাদের সঙ্গে থাকে,

যেখানে থাক, সেখানে থাকে।" স্বামী, কন্যা, জামাতা সকলের মনের কথাই জানিতে পারিয়া অন্নদা সেই মত কার্য্য করে।

চঞ্চলারও প্রেমে দিব্যদৃষ্টি জন্মিয়াছে। প্রেমে বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ,——সবই তাহার গোচরান্তর্গত।

প্রেমে দিব্যদৃষ্টি উন্মীলিত হয়। প্রেমে চঞ্চলার ভূত, ভবিষ্যৎ গোচরান্তর্গত, তাই সে ইসানকে বলিতেছে——

যত্নে প্রেম ধরি হৃদিমাঝে, প্রেমে
খুলেছে লো খুলেছে নয়ন!

কালাপাহাড়।

রাজা মুকুন্দদেবের দ্বারা তাহার বাসনা পূর্ণ হওয়ার কোন সহায়তা না হওয়ায়, তাহাকে চঞ্চলা স্পষ্টভাবে বলিতেছে——

"নহি ভিখারিণী, প্রেমরত্ন ধরি হৃদে!
প্রেমের বৈভবে অসাধ্য সুসাধ্য
মম; প্রেমে ভূত ভবিষ্যৎ অবগত
ভিখারিণী; সাগর-গহ্বরে তুঙ্গ শৃঙ্গধরে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলপুরে কিবা,
: . : প্রেমদৃষ্টি করে ভেদ;

অতঃপরে যখন মুকুন্দদেব তাহাকে উড়িষ্যার ভাবী দশা বর্ণনা করিতে বলেন, তাহার প্রেমদৃষ্টি আরও খুলিয়া যায়—"খোল দৃষ্টি।" দিব্যদৃষ্টিতে সে দেখিল হতাশ নিঃশ্বাস——

"মহামার,
রুধির পাথার! ধূ ধূ ধূ ধূ মহা-অগ্নি
জ্বলে! ভস্মপ্রায় দারুদেহ মহানলে!
মেদ অস্থি স্তূপাকার! যবন প্রবল।
যবন প্রবল! ছারখার—হাহাকার!"

ফলেও তাহাই হইয়াছিল, কিন্তু চঞ্চলার প্রেমে একনিষ্ঠতা থাকিলেও নিঃস্বার্থতা না থাকায় তাহার ফল বিষময় হয়, প্রেমে প্রতিহিংসা উদ্দীপিত হয়। তথাপি প্রেমবলে তাহার শক্তি অপার। চঞ্চলা বলিতেছে——

টলে হিমাচল,
শোষে সিন্ধু জল, হীন-বল সমীরণ,
অনল শীতল, রবি শশী গ্রহ তারা-
দল নভস্তলে যদি নাহি ফোটে, টোটে
বিশ্বের বন্ধন, সাধু যদি ধর্ম্ম ত্যজে,
প্রেমিকায় বারে, শক্তি কেবা ধরে।
প্রেম বল প্রেমিকার! ৪র্থ অঙ্ক, ৩ গ।

এই প্রেম বলেই **জহরা** অপূর্ব্ব শক্তিশালিনী। সিরাজের রক্তে পতির সমাধিতে তর্পণ করিয়া তাহার সহগামী হইতে সমস্ত আয়ুধই তাহার করতলগত। ঐতিহাসিক নাটকে বিস্তারিতভাবে এই চরিত্র আলোচিত হইয়াছে।

"সৎনামের" প্রেমিকা **গুলসানা** চরিত্রও বড়ই অদ্ভুত। সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন "রমণীর সকলি বিচিত্র, আমারও জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।" প্রেম ও প্রতিহিংসার অপূর্ব্ব সম্মিলন এই চরিত্রে। প্রেম-প্রত্যাখ্যানে চঞ্চলার ন্যায় গুলসানার প্রতিহিংসা উদ্দীপিত হয় নাই। জহরার ন্যায় স্বামি-প্রেমে অন্ধ প্রতিহিংসাও তাহার নয়। যাহাকে সে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, সেইপদে আপনাকে সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়া এবং তাহার প্রসাদ লাভ করিয়াও পিতৃহত্যাজনিত প্রতিহিংসা সাধনে সেই স্বামীরই সর্ব্বনাশে এই চরিত্রের বিশেষত্ব।

গুলসানা মুসলমান কারতরফ খাঁর কন্যা, হৃদয় দয়ায় ভরা, হিন্দু শিশু ও স্ত্রীহত্যা করিতে পিতাকে প্রতিরোধ করিতেছে, এমন সময়ে হিন্দু ফকিররামের অস্ত্রে তাহার পিতা নিহত হয়। পিতৃহত্যায় প্রতিবিধিৎসা তাহার জীবনের ব্রত হইল। হিন্দু সৎনামী-সম্প্রদায় তখন বীরত্ববলে বাদশাকেও স্তম্ভিত করিয়াছে। বীর রণেন্দ্র এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নেতা, কিন্তু প্রণয় তাহার ধর্ম্মের নিষেধ। 'প্রণয়' স্পর্শ করিলেই সৎনামী নেতার মুকুট শত্রুপদ স্পর্শ করিবে। গুলসানা প্রণয়ে তাহাকে বিদ্ধ করিতে আসে। কিন্তু বিদ্ধ করিতে না করিতেই নিজেও তাহারই

প্রেমানলে দগ্ধ হয়। তাহার পিতৃকার্য্য সফল হয়। রণেন্দ্র বন্দী হইয়া বাদশাহের হস্তনিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হন। কিন্তু প্রেমে গুলসানা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার পরেই স্বামীর পদতলে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। প্রেমে সে ময়ূর-সিংহাসন তুচ্ছ জ্ঞান করে, আওরঙ্গজেব-প্রদত্ত প্রচুর সম্মান উপেক্ষা করে, ধরায় পিতৃসত্য পালন করিয়া স্বর্গে স্বামীর পদসেবার অধিকার পাইতে হিন্দুর নিয়মে স্বামি-সহগামী হয়।

নিঃস্বার্থ প্রেমের অন্যতম প্রকট চরিত্র "কালাপাহাড়ে" **ইমান**। কালাপাহাড়ের ইষ্টই তাহার একমাত্র ব্রত, নিজের সুখ সে চাহে না। চঞ্চলা চাহে নিজের সুখ। উভয়েই কালাপাহাড়কে ভালবাসে, কিন্তু উভয়েই এই প্রভেদ। ইমানের ন্যায় স্বার্থশূন্যা প্রেমিকাই চঞ্চলাকে বলিতে পারে—

"প্রেম কি, তা জাননা। যদি জান্‌তে তা হ'লে তারে কারাগারে দিতে পার্‌তে না! যদি জান্‌তে তাঁর সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে হেথায় আমায় আন্‌তে না। যারে ভালবাসি তারে ভেবে সুখ, তারে দেখে সুখ, তার কথায় সুখ, তার দুঃখে সুখ, তার সুখে সুখ, তার অসুখে দারুণ অসুখ! তোমার আপনার সুখ চাও, তুমি কার সুখে সুখী নও।"

৩য় অ ৫ গ।

চঞ্চলা—তুমি কি আপনার সুখ খোঁজ না? তুমি কি তারে চাও না?

ইমান—না। কেন জান? আমি আপনার সুখ চাই ব'লে, আমি তাঁর অসুখে অসুখী ব'লে, তাঁর ভাল শুনে ভাল থাকি ব'লে। একথা তুমি যখন বুঝবে, আমি তোমাকে কলিজার রক্ত দেব।

চঞ্চলা—তুমি তারে চাও না, যদি না চাও, আমায় দিতে পার না কেন?

ইমান—ঐ তো বল্লেম, তুমি তার সুখে সুখী নও ব'লে—

৩য় অঙ্ক, ৫ম গ।

এই নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্যই ইমান তাহার প্রেমাস্পদ কালাপাহাড়ের ধর্ম্মনাশের ভয়ে তাহাকে বিদায় দিয়াছিল।

এই তো গেল মানব মানবীর কথা। প্রেমে অপ্সরা **মেনকা**

স্বর্গ ছাড়িয়া বিশ্বামিত্রের সেবাধিকার পাইতে ধরায় আসে—কেন না স্বর্গে——

নাহি হৃদয়-বন্ধন
কামক্রিয়া-হেতু সম্মিলন,
সত্য কহি ধিক্কার জন্মেছে প্রাণে
ত্রিদিব মণ্ডলে
ক্রীতদাসী আমরা সকলে,
ধরা-নিবাসিনী
ভাগ্য মানি যতেক রমণী!
প্রেমে দেহ বিতরণ ধরার নিয়ম।

মেনকা স্বর্গ হইতে ধরায় আসিয়াছিল প্রেমের জন্য, বিশ্বামিত্রকে ভুলাইবার জন্য নয়, তাই অপ্সরাগণকে বলিতেছে—

স্বর্গ-সুখ—প্রেমহীন কামক্রিয়া!
প্রণয়ের বিমল আস্বাদ—
পেতে সাধ হ'তেছে হৃদয়ে;
পূজি বিশ্বামিত্র, চিত্ততৃপ্তি করিব, সজনি!

কন্যা-প্রসবান্তে বিশ্বামিত্রের কাছে সে এই কথাই প্রকাশ করিয়া যায়—

"প্রভু, আমি আপনাকে ছল ক'র্‌তে আসি নাই; দেবরাজও আমায় প্রেরণ করেন নাই। আমি আপনার গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ হ'য়ে আপনার পদসেবার নিমিত্ত পুষ্করে এসেছিলাম।"

গুরু-প্রেমে কন্যাস্বরূপিণী **রঙ্গিণী** ভাবিত "তাহার ভালবাসা কালীকিঙ্করের ভালবাসার একটী ক্ষুদ্র বীজ মাত্র, সেই বীজ তাঁহার যত্নে অঙ্কুরিত হ'য়ে হৃদয়ে অমৃত ফল ফলেছে।" রঙ্গিণীর ভালবাসায় কালীকিঙ্কর উন্মাদ-রোগ-মুক্ত হয়।

মন্মথের প্রেমে **ফুলীর** আত্মবিসর্জ্জন!

বাস্তবিক প্রেম পরশমণি, ইহার স্পর্শে জড়ও কাঞ্চনত্ব লাভ করে, ইহার অমৃত পান করিয়া নরও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। যার প্রথম অঙ্কুর

রূপরস-গন্ধ-স্পর্শে, আত্ম-বিসর্জ্জনে তাহার পূর্ণ পরিণতি। এ আত্ম-বিসর্জ্জনেই পরম নিবৃত্তি—পরম আনন্দ—ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া, মানুষ বিশ্ব-প্রেমের আস্বাদ পায়।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন নরনারীর রূপরস-জনিত অন্ধকার গণ্ডীতে যে অয়স্কান্ত-মণি আবরিত, সেই প্রেমরত্নই দেহসম্বন্ধ ঘুচাইয়া অন্তরের ধ্যানে তাহাকে জ্যোতিষ্মান্ করে, বিশ্বকে প্রেমময় করিয়া তোলে। নদী যেমন মহাসিন্ধুতে বিলয় পায়, নিস্বার্থ প্রেমও ক্রমে ভাগবত প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এই চরমাবস্থায়ই বন্ধন-মুক্তি বা নির্ব্বাণ। গিরিশচন্দ্র "স্বপ্নের ফুলে" প্রেমকাহিনী বলিবার পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছেন:—

"হওরে নির্ব্বাণ, যাব শান্তি-নিকেতন।"

দেহবুদ্ধি-লোপেই নির্ব্বাণ, পরমানন্দের অবস্থা।

এই প্রেমেই প্রেমিক **বিল্বমঙ্গল** প্রেমধামের নামে প্রেমরস-প্লুত হইয়া উঠে:—

"রজে লুটাইয়ে, রজ মাখি কায়;
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি ডাকি উভরায়
প্রেমধারে ভেসে যায় কায়;
প্রেমের পুলক কম্প ঘন ঘন ;
উন্মাদ নর্ত্তন,
কভু হাসি—কভু কাঁদি।

বিল্বমঙ্গল ৪ অঙ্ক, ৪ গ।

প্রেমের পরিণতিতে চিন্তামণির যে 'রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাক্ ফুরিয়ে যেত', আজ ভাবাবেশে তাহা রাসরসময়ী রাধার অনন্তরূপে পরিণত হইল। হীনা বারবিলাসিনী এখন "গুরু, প্রেম-শিক্ষা-দাতা, বিশ্ব-বিমোহিনী।"

এই ভাগবত প্রেমবলেই বিরজার প্রতি **অনাথনাথের** প্রেম জগদ্ব্যাপী, প্রাণমনব্যাপী হয়; যাহা এতদিন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ছিল প্রেমের সম্বন্ধে প্রাণে প্রাণে গোলোক-বিহারে পরিণত হয়।

প্রেমে দেওয়ানা **জোবিন্** ও পতীপ্রেম মধুসূদনের পদাশ্রয়ে পরিণতি লাভ করে।

প্রেমিকা **ইমানের** ও প্রেম ঈশ্বরে আত্ম-বিসর্জ্জন। ক্ষুদ্র মানবীয় প্রেমধারা অনন্ত প্রেম-সাগরে মিশিয়া গেল। মহাকবি প্রকৃত প্রেমের তত্ত্ব প্রেমিকা ইমানের কথায় আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন—

বিনা প্রেমময় ধ্যানে,
প্রেম কেবা জানে, মোহমাত্র ভালবাসা
ভাণ! স্থির চিত্তে হের, অন্তর নেহার,
প্রেম নহে কামের বিকার;

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই প্রেমতত্ত্ব এই ভাবেই বলা হইয়াছে—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদ, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করিয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করয়ে করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ-ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

অন্যত্র—

রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর
আসক্তি হৈতে জন্মে চিত্তে রতির অঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥

এই প্রেমেই মত্ত হইয়া **সনাতনের** "ধূলোয় গড়াগড়ি, গৌরাঙ্গ ব'লে চীৎকার, একেবারে উন্মত্ত।" এই প্রেমেই **গৌরাঙ্গের** সন্ন্যাস, 'অবিরাম বহে প্রেমধার।' **নিত্যানন্দ** এই প্রেমেরই ভিখারী। তাই প্রেম-পরিপূর্ণ-কণ্ঠে আকুলভাবে তিনি গাহিয়া বেড়ান—

আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে।
বিকে গেছি প্রেমের দায়ে ॥

সংসারও প্রেমের সংসার জ্ঞান হইলে ফকীর ও বাদসা দুইই সমান। অবধূত আর গৃহস্থে পার্থক্য থাকে না।

"প্রেমডুরি সৃষ্টির বন্ধন।"
তাই প্রেমে সকলকে বশীভূত কর।

নারী চরিত্র

বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ প্রেমের ভিত্তির উপরই ভারতীয় সতীর চরিত্র প্রতিষ্ঠিত। তাই ভারতীয় সতী ও ইউরোপীয় হিরোইনে এত পার্থক্য। ভারতবর্ষের সতী জানে "সতীরাণী মা জানকী তাহার আদর্শ। স্বর্ণলঙ্কা রাবণের ঐশ্বর্য্য প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগপাশে আবদ্ধ রামচন্দ্রকে দেখিয়াও তিনি সতীত্ব বিস্মৃত হন নাই। সতীর নিকট রাজার মুকুটও তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, রাজ্য তুচ্ছ।" এই সতীত্বের আদর্শই গিরিশচন্দ্রের নাটকে পরিস্ফুট। এই দিক্ হইতে গিরিশচন্দ্রের নারীচরিত্র অনুধাবন করিলেই আদর্শ হৃদয়ঙ্গম হইবে। "মনের মতনে" পড়িয়াছি "সতীত্ব পরম রত্ন যার আছে তার পাপপুণ্য নাই।" সর্ব্বত্রই সেই একই

সুর বাজিতেছে। ভারতীয় নারীর প্রতি গিরিশচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা তাঁহার নিজের কথায়ই ব্যক্ত করিব—

"একটী রত্ন বাঙ্গালীর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয় নাই—এ রত্ন নারীরত্ন। যাহারা পতির সহিত সহমরণে যাইত, তাহারা আজও আছে; প্রকাশ্যে পতির সহিত দগ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু পতি আর বাঁচিবেনা নিশ্চয় জানিয়া বিনারোগে বস্ত্রাচ্ছাদনে, ধরণী-শয়নে মৃত্যুমুখে পতির অগ্রগামিনী হয়। অতি প্রগল্ভাও পরপুরুষ-দর্শনে মস্তক অবনত করে। ইংরাজী নভেলের 'হিরোইন্' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিতা। যে কুৎসিত, লম্পট, পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বারবিলাসিনীর গৃহে লাঞ্ছনাভাজন হইয়া বাস করে, সেও আজও জানে যে, সে পত্নী তাহার প্রত্যাখ্যানে রন্ধন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে বটে, তথাপি দারুণ সংক্রামক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিত্যক্ত দুঃখিনীর নিকট আশ্রয় পাইবে, শত শত দুর্ব্যবহার করিয়া সীতাসাবিত্রী-আদর্শ-দীক্ষিতা দুঃখিনী, পরিত্যক্তা, মর্ম্মপীড়িতা রমণী যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, এ বিশ্বাসে সন্দেহ জন্মে না, এই নারীরত্ন বাঙ্গালীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই গৃহলক্ষ্মী সন্তাপিতা হইয়াও চঞ্চলা হন না।"

পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন বা পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যতই এই আদর্শে দোষ ধরুন, পাঠক দেখিবেন "এই তেজোদৃপ্তা রমণীর মহত্ত্ব আপনার গৃহে আছে, আপনি তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই।" এই আদর্শেই স্বামীর চিরসঙ্গিনী জ্ঞানদা, হৈমবতী, পার্ব্বতী, সরস্বতী; এই আদর্শেই সরস্বতী ভৃত্যের বেশে বারাঙ্গণা-গৃহে 'বিষাদ,' এই আদর্শে মিরকাশিমের বেগম রাজধানীতে, রাজপথে, যুদ্ধক্ষেত্রে, বিশ্রামে, প্রবাসে ও মৃত্যুকালে স্বামীর চিরসঙ্গিনী; এই আদর্শেই সুশীলা গৃহে সাকার মূর্ত্তির (স্বামীর ফটো) পূজা করিয়া গৃহত্যাগী স্বামীর সান্নিধ্য সর্ব্বদা উপলব্ধি করিত, এই আদর্শেই নির্ম্মলা বিধবা হইয়াও শ্বশুরঘরকে আপনার জানিত, অন্নপূর্ণা মহাপ্রস্থানের সময় স্বামীর অভিন্নরূপে বিষ্ণুমূর্ত্তির দর্শন পা'ন। আমরা ইতিপূর্ব্বে অধিকাংশ চরিত্রেরই আলোচনা করিয়াছি, কেবল এই স্থানে তিনটী নারীচরিত্র উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব—

শিবাজীর দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী **পুতলাবাই** চরিত্রের পরিকল্পনা অত্যন্ত অদ্ভুত, এইরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস ইতিপূর্ব্ব আমরা "ভ্রান্তির" অন্নদায়, "হারানিধির" সুশীলায় এবং "কালাপাহাড়ের" চঞ্চলায় পাইয়াছি। 'সুশীলা' ও 'চঞ্চলায়' কোন সামঞ্জস্য নাই বটে, কিন্তু পুতলাবাই, সেই তিনের সংমিশ্রণেরই পূর্ণবিকাশ। সুশীলা স্বামীর সাকার মূর্ত্তি পূজা করিয়া যখনই ধ্যানে বসে, তাহার জ্ঞান হয় স্বামী তাহার সম্মুখে, তাহার ফুলের মালা গ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহের পরে সুশীলা মাত্র পোনর দিন শ্বশুরঘর করে, তখনও স্বামী আসিয়াছেন মনে করিলেই স্বামীকে দেখিতে পাইত। এই সুশীলায় যাহা অঙ্কুর পুতলাতে তাহা মহীরুহ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রেম যে তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত করে চঞ্চলা ও অন্নদাতে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অন্নদা স্বার্থশূন্যা, আর স্বার্থ থাকিলেও চঞ্চলার প্রেমে তাহার ভূত ভবিষ্যৎ গোচরীভূত। পতিগতপ্রাণা পুতলার প্রেম ও সতীত্ব বলে পতির ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কেবল তাহার নখদর্পণে নয়, তাঁহার মানসক্ষেত্রে স্বামীর রাজ্য, পুত্র, আত্মীয়ের কথাই কেবল উদিত হয় না, সর্ব্বদা তাহার মঙ্গলবার্ত্তা ও শুভ ইচ্ছা স্বামীর অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বিজয়ী করে। এইস্থানে আমরা দুই একটী উদাহরণ দিব।

পুতলার স্বামীর কথার প্রতি এত প্রবল বিশ্বাস যে একদিন শীতল জল আনিলে স্বামী কৌতুক করিয়া বলেন 'পুত্‌লা, তোমায় জল আন্‌তে বলেছি, তুমি অনল আন্‌লে?' সেই বিশ্বাসে সেই শীতল জলেই পুতলার অঙ্গুলী দগ্ধ হয়। শিবাজী তদবধি আর তাঁহার সহিত পরিহাসও করেন নাই।

শিবাজী যখনই বাহিরে যুদ্ধক্ষেত্রে কি সপত্নী সইবাইকে সিংহাসনে বসাইয়া অন্যকাজে ব্যাপৃত, পুতলা স্বামীর যুগলরূপ দর্শন করেন, ফুল দিয়া পূজা করেন আর চোখ বুজিয়া হাসেন কাঁদেন। স্বামীর মানস পূজায় স্বামীকে যুদ্ধজয়ী দেখিয়া হাসেন, আর যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোন্মুখ দেখিয়া ভয়ে কাঁদেন। ভূত ভবিষ্যৎ এমনি তাঁহার গোচরীভূত যে স্বামীর আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বেই তিনি জানিতে পারেন, প্রেমবলে মানসমূর্ত্তিতে তিনি

রণক্ষেত্রে স্বামীর পদতলে বসেন। যখন প্রাণে ব্যথা, পুতলাও সন্তপ্তা হন—যেন যথার্থই শুনিতে পান রণ-ঝনঝনা, ঘোরতর ঝঞ্ঝা, আর শত্রুকরে মহারাজ শিবাজী শত্রুদমনে নিযুক্ত!

তাঁহার জড়দেহ প্রাসাদে স্বামীর অন্তঃপুরাধীন থাকে বটে, কিন্তু মন সর্ব্বদাই স্বামীর অনুবর্ত্তী।

শিবাজী যখন দিল্লীর প্রাসাদে আবদ্ধ, বিষণ্ন মনে পুতলা তানাজী প্রভৃতি সকলকে পত্র লিখিয়া একত্র করেন, আবার দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হন।

আফজলখাঁর দূত কৃষ্ণাজীপান্থ পুতলাকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে প্রকাশ করেন যে ইতিপূর্ব্বে শিবাজী যখন একাকী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন, এই রমণীমূর্ত্তিকেও রজনীযোগে তিনি শিবাজীর বামপার্শ্বে দেখিয়াছিলেন।

শিবাজী আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেন—বোধহয় 'এ জাতিস্মর'।

গিরিশচন্দ্র শিবাজীকে নরদেহে দেবদেবের অংশ-সম্ভূত, আর পুতলাকে নায়িকার মূর্ত্তি বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

সতীত্ব-বলে "পূর্ণচন্দ্রের" **সুন্দরা** প্রাণে প্রাণে পূর্ণচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াও—দাম্পত্য জীবন লাভ করিবার জন্য স্বামীকে সন্ন্যাসধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করেন নাই। তাঁহার সহচরী সারি সেবাদাসের নিকট হইতে মদিরা লইয়া আসিয়া পূর্ণচন্দ্রের মন মুগ্ধ করিবার জন্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, সুন্দরা বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন—

দূরে করহ নিক্ষেপ ;
ভেবেছ কি মনে,
পশুসনে করিয়াছি প্রণয়-বাসনা ?
চাহি প্রাণে প্রাণ বিনিময়,
নহে পশুক্রিয়া ;
রমণীর সাধ—
মনে মনে হৃদয়-আসনে
সযতনে রাখিতে পতিরে

হৃদয়-ঈশ্বর——
নিরন্তর তাঁর পদসেবা
উচ্চ-আশ নারী রাখে কিবা ?
বারনারী যত্ন করি চাহে প্রেমদাস।

সর্ব্বোপরি সতীত্বের উজ্জ্বলতম আদর্শ **সুনেত্রা**। প্রেমে তাঁহারও জ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত। রাজা বিশ্বামিত্র তাপসবেশে বনে প্রবেশ করিয়াছেন, রাণী স্বপ্নে তাহা অবগত; তিনি দেখিতেছেন——

"অন্তরে অন্তরে
তপাচারী নেহারি রাজন্।"

তিনিও তাই তপস্বিনীবেশেই বনগমন করিলেন, কেননা

পতি গৃহত্যাগী
কেমনে রহিবে সতী গৃহে ?
পারে যদি, পতি সনে ফিরিবে নগরে,
নহে তার কিবা রাজ্য—কিসের সংসার ?

তাপস-সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী অন্তরালে থাকিয়া পুষ্প আহরণ, বারি আনয়ন ও স্থান মার্জ্জনা করিয়া স্বামি-সেবা করিতেন। যখন সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার প্রভাববলেই বিশ্বামিত্র শরণাগত ত্রিশঙ্কুকে আশ্রয় দেন।

যখন তপোনিষ্ঠ ঋষি মেনকার মায়ায় আচ্ছন্ন, আবার স্বামী তাহাকে কুটীর ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, সুনেত্রা বুঝিলেন রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াও বুঝিবা স্বামীর কঠোর তপস্যা বিফল হয়। এই সঙ্কটসময়ে তিনি অবাধ্য না হইয়া স্বামিবাক্য রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু স্বামীর যাহাতে মোহ দূর হয় পতিধ্যানে তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। তিনি বেদমাতার পরামর্শে রম্ভার পাষাণত্ব মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন,——

"ব্রাহ্মণ, কুলটার আচার ঘৃণিত, সত্য! **কিন্তু যেই হ'ক—যে তাপিত, যথাসাধ্য তার তাপ বিমোচন করা, সকলেরই**

কর্ত্তব্য। পাপীর বিচার-কর্ত্তা আমরা নই কিন্তু সকল দেহেই নারায়ণ জ্ঞানে সকলের সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য।"

তাঁহার সতীত্ব ও আত্মত্যাগেই বিশ্বামিত্র অবশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। ঋষি বলিতেছেন—

"সাধ্বি, ধর্ম্মসহায়িনী, যদি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে তোমার অতুল পতিভক্তি-প্রভাবে! আত্মত্যাগিনি, নারীকুলে তুমিই ধন্য।"

৪র্থ অ, ৭গ।

শিক্ষিতা অভিমানিনী পত্নীর আদর্শ "**চন্দ্রা**"। ইতিপূর্ব্বে চন্দ্রার উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আভাস দিয়াছি। চন্দ্রা ডফ সাহেবের সর্ব্বপ্রধানা ছাত্রী, এরূপ উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ভারতবর্ষে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু চন্দ্রা সেই বিদ্রোহের বৎসর স্বাধীনতা-সংগ্রামে মরণোন্মুখ এক সুন্দর, বলিষ্ঠ, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী-যুবককে ভালবাসিয়া ফেলিল। যুবকের নাম সোমনাথ।

ভালবাসার ইতিহাস এই—চন্দ্রা একদিন জলমগ্ন হয়, যুবক তাহাকে সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গের মধ্য হইতে রক্ষা করিয়া শুশ্রূষায় জীবন দান করে। উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তখন ১৮৫৭ সন। ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে——সোমনাথ একজন বিদ্রোহী। চন্দ্রা তাহাকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিল, চন্দ্রার অসাধারণ প্রতিপত্তি,—স্বয়ং ডফ সাহেব তাহার ইঙ্গিতে চলেন। সোমনাথ অনেকবার মরিতে বসিয়া চন্দ্রার সহায়তাবলে প্রাণলাভ করিয়াছে। চন্দ্রা নিজের প্রাণভয় উপেক্ষা করিয়া অনেকবার তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

চন্দ্রা সন্ন্যাসীকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছে।

চন্দ্রা স্বাধীনা, কুলবধূর ন্যায় লজ্জা সরম নাই, সুন্দরী, কখনও বীণা বাজাইয়া গান করে।

সোমনাথ একবার আহত হইয়া জেলে বন্দী হয়, চন্দ্রা নিজে সেখানে আসিয়া তাহাকে শুশ্রূষায় প্রাণরক্ষা করে। একদিন মিথ্যা সন্দেহ করিয়া অন্যায়ভাবে 'ভ্রষ্টা' মনে করিয়া সোমনাথ চন্দ্রাকে রূঢ়-বাক্যে

তিরস্কার করে "এ স্থান হইতে যাও, তোমার সহিত কোন কার্য্যই নাই।"

কম্পিত-কলেবরে চন্দ্রা চিকিৎসালয়ের বাহিরে আসিল। আর সেখানে গেলনা, হৃদয়-মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা আসিল।

কিন্তু পরে যখন শুনিল সন্ন্যাসীর জীবন বিপদাপন্ন, চন্দ্রার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, চন্দ্রা অকুতোভয়ে গুপ্তচরের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। একদিন লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া বিপদের কথা বলিয়া তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু সন্ন্যাসী অচল!

চন্দ্রা দীনবচনে বলিতে লাগিল "তুমি জাননা, কথা শুন............"

সন্ন্যাসী অতি কর্কশ স্বরে বলিল—"তুমি যদি না যাও, তোমায় তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইব।"

চন্দ্রার চক্ষে জল আসিল, সে সংবরণ করিল। ধীরে ধীরে ফিরিল। যায়, আবার ফিরিয়া চায়। সন্ন্যাসী সমভাবেই আছে। আবার চায়, সন্ন্যাসীর সেই ভাব, একমনে আবার চায়, সন্ন্যাসীর সেইভাব, একমনে কি দেখিতেছে? ভাবিল "ফিরিয়া যাই, আবার নিষেধ করি," কিন্তু সন্ন্যাসীর কঠোর কটাক্ষ, কর্কশ বচন তাহাকে নিরস্ত করিল। যাইতে প্রাণ চায় না, তবু চলিল। পদ টানিয়া লইয়া চলিল। আর সন্ন্যাসীকে দেখা যায় না।

পট্! পট্! পট্! চতুর্দ্দিকে বন্দুকের আওয়াজ। কাহারও রক্ষা নাই। চন্দ্রা দ্রুতপদে আসিয়া বলিল :—

"সন্ন্যাসী, পালাও, গোরায় তোমার প্রাণবধ করিবে"।

বলিতে বলিতে সোমনাথের কাণের গোড়া দিয়া একটা বন্দুক গেল। চন্দ্রা আপনার দেহ দিয়া সোমনাথকে আবরণ করিল। গুলী আসিয়া চন্দ্রার গায়ে লাগিল, ছিন্ন স্বর্ণলতার ন্যায় চন্দ্রা ভূমিতলে পতিত হইল। সোমনাথ বন্দী হইয়া কলিকাতায় নীত হইল।

তিনদিনের পর চন্দ্রার চৈতন্য হয়। শুনিতে পাইল সন্ন্যাসী কলিকাতায়। ডাক্তারকে বলিল "ডাক্তার সাহেব, আমায় কলিকাতায় যাইতে দাও, নচেৎ বাঁচিব না।" ডাক্তার দেখিলেন—মনের অবস্থা

প্রবল, কাহিল অবস্থায় যাওয়ার আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু আটক করিলে আরও আশঙ্কা।

কলিকাতায় চন্দ্রা লর্ডক্যানিংএর প্রাসাদস্থ মেথরাণীকে মদ খাওয়াইয়া তাহার পোষাক পরিয়া রাত্রে কক্ষে প্রবেশ করিল, খাটের নীচে লুকাইয়া রহিল। দয়াবান্ ক্যানিংকে অনেক কাকুতি করিয়া সজল নয়নে সোমনাথের প্রাণভিক্ষা চাহিল। চন্দ্রার তাবার দক্ষতায় এবং তদপেক্ষাও ভাবের আবেগে—ক্যানিংএর অবিচলিত বদন বিচলিত হইল। স্বয়ং লেডী ক্যানিং মধুর স্বরে বলিলেন "কন্যা, তোমার স্বামী মুক্ত।"

এইবার কার্য্যোদ্ধার হইলে অভিমান প্রবল হইল, চন্দ্রা সন্ন্যাসীর সহিত আর দেখা করিল না।

এবার সোমনাথের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিল,—চন্দ্রা সতী, আবার চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। দ্বারে কার্ড পাঠাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—চন্দ্রা আপনি আসিয়া উপরে লইয়া যাইবে। কিন্তু—কেহই আসিল না।

অনেকক্ষণ পরে একজন দারোয়ান চন্দ্রার একখানি পত্র লইয়া আসিল। বজ্রাহতের ন্যায় সোমনাথ পড়িল ঃ—

"সন্ন্যাসী, আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার সহিত আর আমার কার্য্য নাই। জেলে তোমার নিকট শুনিয়াছিলাম—তোমারও আমার সহিত কার্য্য নাই। পত্রের দ্বারা এই শেষ দেখা—

চন্দ্রা—"

কিয়ৎকাল পরে সোমনাথ তাহার পাগলিনী মাতার দর্শনলাভ করিল। পাগলিনীর অঞ্চলে একখানি ছবি দেখিতে পাইয়া আরও স্তম্ভিত হইল—তাহারই ফটো ও নিম্নে চন্দ্রার স্বহস্ত-লিখিত নিজের নাম!

এই অভিমানও নারীত্বের ভিন্ন একটা দিক্, সতীত্বেরই অন্যতম আদর্শ। কোন সতী-নারীর অপেক্ষা চন্দ্রার সতীত্ব-গৌরব হেয় নয়।

মাতৃত্ব—সন্তানের প্রতি জননীর সে স্বর্গীয় স্নেহ ও প্রভাব তাহাই মাতৃত্ব এবং ইহারও ভিত্তি প্রেমে। গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল চরিত্রে দেখাইয়াছেন স্বামীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইলেও স্বামীর মঙ্গল সাধন সতীত্বেরই

নামান্তর মাত্র। আবার যাদবের প্রাণরক্ষায় প্রফুল্লের মাতৃত্বের বিকাশ। স্নেহে তাহার মধ্যে এত শক্তি সঞ্চারিত হয় যে নরকে যত পিশাচী আছে সব একত্র হইলেও "মায়ের কোল হইতে ছেলে কাড়িয়া লইতে পারে নাই"।

মাতৃত্বে **জনা** মহাশক্তিশালিনী।

অর্জ্জুনের অশ্ব ধৃত করিয়া মাহিষ্মতীপতি নীলধ্বজের বীরপুত্র প্রবীর যখন তাঁহাকে দ্বন্দে আহ্বান করিয়াছেন, পিতা আদেশ দিলেন "অশ্ব ফিরাইয়া দাও।" পুত্রের অভিমানের সীমা রহিল না। মায়ের কাছে আসিয়া মর্ম্মযাতনা জ্ঞাপন করিলেন, "মা, পিতৃ-আজ্ঞায় অশ্ব ফিরাইয়া দিব, কিন্তু আমার জীবনধারণে প্রয়োজন নাই, কারণ শত্রু সকলকে রণে আহ্বান করিয়াছে, আর আমি ভীরুর ন্যায় পরাজয় স্বীকার করিয়া লইব?"

জনা পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু পুত্রের রণসাধ, তিনি মাতাকে ক্ষত্রিয়রমণীর কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন—

কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে?

জনার মাতৃত্ব মাতৃস্নেহ অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ক্রমে এই নাটকে এই মাতৃত্বের বিকাশ পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বামীকে বারবার বলিতে লাগিলেন—

"চাহে পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন
মা হ'য়ে কি হেতু কহ করিব বারণ?"

বীরাঙ্গনা অন্ধস্নেহাপেক্ষা নিজ কর্ত্তব্য অধিক গণনা করিয়া উপযুক্ত মাতার ন্যায়ই বলিলেন—দাম্ভিক অরির সম্মুখীন হইয়া আমার পুত্রের মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, কিন্তু—তথাপি—

"উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব
তুমিও না নিবার রাজন্।"

যুদ্ধের আয়োজন চলিল, জনা পূজা ও স্তবে জাহ্নবীকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন কিন্তু অলক্ষ্য কারণে মন "থেকে থেকে কেঁদে উঠে।" ক্রমে

মন স্থির করিলেন, তাঁহার এক পণ রণ—বীরমাতা হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরবপথে কখনও কণ্টক হইবেন না।

এদিকে আবার পুত্রবধূ আসিয়া বাধা দিল, তিনি বুঝাইতে লাগিলেন—

বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে
উচ্চকার্য্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান :

কিন্তু বধূর উপর্য্যুপরি প্রতিরোধে তাঁহার মাতৃত্ব ফুটিয়া উঠিল, দৃপ্তস্বরে বলিলেন——

"এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হ'তে"

তিরস্কার করিলেন "তুমি অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত, তোমার নিকট তোমার পতিই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তুমি—

"কুলবালা কুলব্রত কর আচরণ
যুদ্ধপণ কভু মম না হবে বারণ"

এবং পুত্রকে সমরে পাঠাইয়া নিজেই শিথিল-মনোরথ সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। উচ্চপ্রেরণায় অন্যের নৈরাশ্য বিদূরিত হয়, শাশুড়ীর উদ্দীপনায় পুত্রবধূও বীরাঙ্গনার ন্যায় নিজহস্তে স্বামীকে যোদ্ধবেশে সুসজ্জিত করিয়া সমরে প্রেরণ করিলেন।

প্রবীরের মৃত্যুতে জনার মাতৃত্বের আরও বিকাশ, পুত্রের মৃত্যুসংবাদে তিনি বৃথাশোক বা প্রাণবিসর্জ্জন না করিয়া প্রতিবিধিৎসার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, অর্জ্জুন-সংহারের হেতু ভৈরব-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, শাবকের অন্বেষণে সিংহিনীর ন্যায় রাজধানী ছাড়িয়া পথে, ঘাটে, প্রান্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কন্যা স্বাহা মাতৃসম্বোধন করিলে তাঁহার ভীষণ উক্তি—

"কে রাক্ষসী মা বলিস্ মোরে,
ফুরায়েছে মা বলা—আমার"

মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপন করে। বীরপুত্র-নিধনে বীরাঙ্গনার মাতৃসম্বোধন ঘুচিয়াছে, ক্ষীণাঙ্গীর ক্ষীণাহ্বান তাঁহার মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটাইতে সমর্থ নয়।

রাজা যখন কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হ'ন, জনার তিরস্কার তাঁহার অপূর্ব্ব তেজস্বিতার পরিচায়ক।

"আনন্দ উৎসব,
দেখিলাম নগরে রাজন্!"

প্রভৃতি পংক্তিতে মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যের নীলধ্বজের প্রতি জনার স্পষ্ট প্রভাব প্রতীয়মান হয়। উভয় কবির ভাষা, ভাব ও তেজস্বিতা তুল্যরূপ হইলেও, গিরিশের জনার শোক ও প্রতিবিধিৎসা যেরূপ মহিমাব্যঞ্জক, মাইকেলে তাহার সম্পূর্ণ অভাব আছে। মধুসূদন কুন্তী, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবের প্রতি যে কটূক্তি করিয়াছেন, অনেকের মনে উহা পীড়াদায়ক হয়, কিন্তু গিরিশের জনার দুইটী একটী কথায়ই জনার বীরগর্ব্ব প্রকাশ পায়, এবং মনের অন্তস্তল সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে——

উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির,
পদ প্রান্তে ব'স গিয়ে তার!
হ'তো ভাল পারিতে যদ্যপি
আমাকে লইয়ে যেতে দ্রৌপদী-
সেবায়!

ভাষায়, ভাবে ও জাতীয়তার সম্পদে "জনার" এই অংশ বঙ্গভাষায় অমূল্যসম্পদরূপে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। পুত্রের প্রতি জননীর স্নেহ সম্বন্ধে "তুমি জান কি মায়ের প্রাণ" সহোদর উলুকের সহিত জনার কথোপকথনও বড়ই হৃদয়স্পর্শী।

"ছত্রপতিতে" **জিজিবাই**এর অতুলনীয় মাতৃত্বের আদর্শ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বারান্তরে উহার উল্লেখ করিব। একটী কথা এখানে মনে হইতেছে। শিবাজী দিল্লীর প্রাসাদে অবরুদ্ধ, শিবাজীর সহচর ও সেনাপতিগণ মোগলরাজ্য আক্রমণ করিবার পরামর্শ করিতেছে, কিন্তু জিজিবাই পুত্রের ক্ষমতা ও বুদ্ধি জানিতেন, পুত্রের জন্য তিনি বিচলিত হইলেন না। সামন্তগণকে রাজপুতগণের ন্যায় নিষ্ফল গৌরবে আত্মবিনাশ না করিয়া রাজধানী রক্ষারই উপদেশ দিলেন। কেননা

কার্য্যসম্পাদন ও উদ্দেশ্যসাধনই মহারাষ্ট্রের কার্য্য, বৃথা শক্তিক্ষয় নহে।

এই কঠোরতার অন্তরালে অসীম স্নেহের নিদর্শন পাওয়া যায় শিবাজীর যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান কালে মায়ের ব্যথায়। সত্যবটে তিনি বীরমাতা, কিন্তু বীরমাতার হৃদয় হইতেও স্নেহ অন্তর্হিত হয় না। জিজিবাইতে মাতার বীরত্ব, ধৈর্য্য ও স্নেহের পূর্ণবিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বদেশানুরাগ ও লোকসেবার ভিত্তিও প্রেমে, তাই **তারা** প্রেমে সকলকে বশীভূত করিতে চায়। আমরা অন্যত্র এবিষয়ে বিশদালোচনা করিয়াছি।

পতিতার প্রেম—কেবল সতী-চরিত্রেই প্রেম নিবদ্ধ, ইহাও মনে করা সঙ্কীর্ণতা। পতিত পতিতা ও প্রেমাধিকারী, নতুবা চিন্তামণির কৃষ্ণদর্শন আর কিরূপে সম্ভব হয়? এইখানে দুই একটী নারী চরিত্রের উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

হারানিধির **কাদম্বিনী** মোহিনীকে নারীর সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া পরে বিতাড়িত হয়। এইরূপ স্থলে প্রতিহিংসা স্বাভাবিক। গঙ্গাতীরে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে গিয়া নীলমাধবের উপদেশে প্রতিনিবৃত্ত হয়, নীলমাধবের উপদেশে বুঝিতে পারে "ভগবান্ কলঙ্ক-ভঞ্জন, পরোপকার-ব্রত মহৎ প্রায়শ্চিত্ত," কাদম্বিনী নূতন বল পায়, তাহার মাতৃত্ব জাগিয়া উঠে, নীলমাধবের উপদেশে কাদম্বিনী পরোপকারে দেহমন দেয়, মোহিনীকে ক্ষমা করে। তাহার স্নেহ ও পরোপকারে—সুশীলাও বুঝিতে পারে—"যথার্থই আমার দুঃখ দেখে ইনি কৈলাস থেকে এসেছেন।"

পতিতার মনে লোকসেবারূপ প্রেম উদ্দীপিত করিয়া তাহাকে মাতৃ-স্নেহের অধিকার দিয়া গিরিশচন্দ্র নীলমাধবের সহায়তায় সমাজ-পরিত্যক্তাকেও সমাজের হিতকারিণীরূপে পরিণত করিয়াছেন।

"নসীরামের" **সোণাও** পতিতা। দুষ্ট কাপালিকের ছলে তাহার সতীত্ব নষ্ট হয়, পরে রাজা যোগেশনাথের কাছে আবেদন করিলে তিনিও উহা উপেক্ষা করেন। সতী বিরজার সতীত্ব রক্ষা করিতে দুষ্ট কাপালিককে তাহার হত্যা করিতে হয়, পুত্রবধূর রূপ-পিপাসী রাজাকেও নিজে পুত্রবধূ সাজিয়া সোণা প্রতিশোধ দেয়।

সোনার প্রাণটী নির্ম্মল, রাজকুমার মা সম্বোধন করাতেই তাহার মাতৃত্ব জাগিয়া উঠে, শুষ্ক স্তনে ক্ষীর সঞ্চারিত হয়।

সোণাকে প্রতিহিংসার জ্বালা বিদগ্ধ করে কিন্তু নসীরামের প্রতি অপার প্রেমে তাহার পিশাচত্ব দেবীত্বে পরিণত হয়। সোণা বলিতেছে—

"কোথা থেকে পোড়ার মুখো নসে এলো? কিছুতেই যে আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছিনি, পোড়ার মুখোর মনে কি ঘৃণা নাই! সে যে আমায়ও ঘৃণা করেনা। সদাই মন চায় আমি তার কাছে যাই।"

প্রেমে সোণা রাধাকৃষ্ণের পুষ্পরথে নসীরামসহ স্বর্গে উত্থিত হয়।

ভাগবত প্রেম ছাড়া সংসারে, কর্ম্মক্ষেত্রেও মাননীয় প্রেম কিরূপ পতিতাকে সোণার মানুষে পরিণত করে, "ভ্রান্তি"র **গঙ্গা** তাহার আশ্চর্য্য নিদর্শন। গঙ্গা নাচ্‌ওয়ালী বেশ্যা, কিন্তু গঙ্গা রঙ্গলালকে ভালবাসিয়াছে। রঙ্গলাল বিশ্বপ্রেমিক, তাহার কাছে সব মানুষই সমান। গঙ্গা জানে তাহাকে কখনও পাইবে না, তথাপি তাহাকে ভালবাসে—

এ কি দায়,
মন কেন তায় চায়,
পায় কি না পায়,
ভাবেনা হায়, উধাও হয়ে যায়॥

রঙ্গলালই গঙ্গার স্বর্গ। গঙ্গা বলিতেছে—

"মন সত্যই ভালবাসলি? সত্যই দাসী হলি? এই বাউণ্ডুলেকে নিয়ে মজ্‌লি? ওর কথায় ঠিক নাই, কাজেও ঠিক নাই, ওকে কথনো পাবিনি, কিন্তু ও মর্‌তে বল্লে অনায়াসে মর্‌তে পারিস্‌? ছিঃ ছিঃ এ আমার কি হ'লো।"

এই প্রেমই গঙ্গাকে পরোপকারব্রতে দীক্ষা প্রদান করে! গঙ্গা বুঝিল "পৃথিবীতে আপনার সুখই সুখ নয়।" তাই রঙ্গলালের উচ্চাদর্শে প্রণোদিত হইয়া গঙ্গা অন্নদাকে খাওয়াইতে যায়, মাধুরীকে রক্ষা করে, এমন কি রণক্ষেত্রে বিভীষিকাময় স্থানেও গঙ্গা রঙ্গলালের সহিত আহতকে জল দেয়, ঔষধের দ্বারা প্রাণ রক্ষা করে, গুলীগোলা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বহিয়া লইয়া আসে।

প্রেমে কাদম্বিনী, সোণা ও গঙ্গা গরীয়সী নারী। প্রেমে উঁহাদের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, তাই তাহাদের নারীত্বের বিকাশ।

মহাকবি "পাণ্ডব গৌরবের" **সুভদ্রা** চরিত্রে আরও বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সুভদ্রাচরিত্রে নারীত্বের পূর্ণাদর্শ প্রদান করিয়াছেন—কতকটা পাশ্চাত্য উপাদানে। তাঁহার ব্রতই মানবহিত-সাধন—

জগতের সুখনীতি, সুখনীতি আমাদের
মানবের সুখ, সুখ তোমার আমার।
সেই মহাসুখ স্রোতে যাই তুমি আমি ভাসি,
পাইব অনন্ত-সিন্ধু সুখ পারাবার।

গিরিশের সুভদ্রা সম্পূর্ণ ভারতীয় নারী, কুলধর্ম্মরক্ষায় সতত যত্নশীলা। কুলরীতি-অনুসারে একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া জনার মতই পুত্রবধূকে বুঝান—

পতিপুত্র যায় রণে
বীরাঙ্গনা সাজায় সমর-সাজে,
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।

অভিমন্যুবধ।

কুলরীতিরক্ষার জন্যই স্নেহশীল ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও আশ্রিতকে রক্ষা করেন, আবার সন্ধির প্রস্তাবে রামজয়ী ভীষ্মদেবকেও কুলরীতি অনুযায়ী কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করেন না—

কব আমি অভিমন্যে
পিতামহ-হেতু চিতা করিতে প্রস্তুত।

পাণ্ডব গৌরব ৪র্থ অ, ৫ম দৃ।

এই নারী আদর্শই গিরিশ প্রতিভার সৃষ্টি ও বিকাশ।

পৌরাণিক নাটক

দশম পরিচ্ছেদ।

আমরা ঐতিহাসিক, সামাজিক, জাতীয়তা ও ধর্ম্মমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বহু নাটক সমালোচনা করিয়াছি। পৌরাণিক নাটকই এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয়। গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিণত হইয়া কিছুদিন অভিনয় চলিয়া পুরাতন হইয়া গেল। তৎপরে ক্রমে দীনবন্ধুর নাটকেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। অভিনয়োপযোগী নাটক প্রায়ই নিঃশেষিত হইয়া যায়। বিজ্ঞাপন দিয়াও অভিনয়-যোগ্য নূতন কোন নাটক পাওয়া গেল না। এই অবস্থায় গিরিশ স্বয়ংই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু নাটকের বিষয় লইয়া তাঁহাকে বড় বিব্রত হইতে হয়।

গিরিশের সর্ব্বপ্রথম নাটক—'আনন্দরহো' বা আকবর। ইহার মূল ইতিহাস অবলম্বন করিয়া। কিন্তু নাটক খানিতে রাণাপ্রতাপের স্বদেশের জন্য দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ, দেশপ্রাণতা প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গ থাকিলেও ঐতিহাসিক অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইলেও, "আনন্দরহো" সাধারণের সমাদৃত হয় নাই। গোড়াতেই গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন, "ঐতিহাসিক বা জাতীয়তা-মূলক নাটকের সময় তখনও আসে নাই। সার্ব্বজনীন না হইলে নাটক এখানে সমাদৃত হইবে না, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিবেন না। ঐতিহাসিক নাটক সমস্তই স্থানীয়; স্থানীয় প্রসঙ্গ স্থানেই চলিয়াছে। Wars of the Roses ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে জানে বলিয়াই সেখানে ঐসময়কার ঐতিহাসিক নাটক চলিয়াছে। নতুবা কেবল ঐসকল ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া সেক্সপীয়র সেক্সপীয়র হইতেন না।" তাই জাতীয়তা বিকশিত ও প্রসারিত না হইলে জাতীয় নাটক চলিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

তারপর সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র বলেন: "দোষগুণ লইয়া নাটক রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌউনসুলির জেরাতে হটে নাই, গৃহে অস্ত্রহীন দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এইমাত্র দোষের চিত্র: লাম্পট্যদোষের বিবরণ দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে, কেহ বা পড়সীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। গুণের কথা—বড়জোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙ্গালীভোজন করাইয়াছিল; রাস্তা নির্ম্মাণের জন্ত 'টাইটেল' আশে রাজাকে চাঁদা দিয়াছে। যাহারা বাঙ্গালায় বড় বড় চরিত্র, তাঁহারা পলিসিবাজ*, স্বয়ং গোপনে থাকিয়া একজন ১৫৲ টাকা মাহিনার প্রিণ্টারকে খাড়া করিয়া মানহানির কয়েদ খাটা তাহার উপর দিয়া কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচার বর্ণনা পূর্ব্বক প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল উচ্চ চরিত্র, অদ্যাবধি রাজদ্বারে সত্যকথা বলিতে কেহ সমর্থ হন নাই! যাহা কাগজে লিখিয়াছেন, তাহার থুতু খাইয়া মার্জ্জনা চাহিয়া দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন"।

এই অবস্থায় তাঁহাকে পৌরাণিক নাটক অবলম্বন করিতে হয়। "কেননা পৌরাণিক জাতীয় নাটক, আর—জাতীয়তা প্রণোদিত নাটক ছাড়া জাতীয় হিসাবে হিতকর হয়না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূলে ধর্ম্ম। ভারত ধর্ম্মপ্রাণ। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে ক্ষেতে পরিশ্রম করিতেছে তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে। তাহাদেরও মন কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সার্ব্বজনিকতার প্রয়োজন থাকে তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় ভাবে চিত্তগঠন করিয়াছে—তাঁহারা ভারতের বৈশিষ্ট্য, ভারতের মর্ম্ম বুঝেন না। সেই চিত্তবৃত্তিতে জাতীয় উন্নতি কখনই হইবেনা। **জাতীয় হৃদয়ের উপর উন্নতির ভিত্তি।** সেই ভিত্তি কতদূর অন্তর্গাঢ়—তাহা

---

* ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই প্রবন্ধ রচিত হয়।

ইতিহাস পাঠে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। হিন্দুধর্ম্মের উপর বহু বিদ্রূপ প্রবাহ বহিয়াছে। কোন কোন মুসলমান রাজার সঙ্কল্পই ছিল, কাফের দূর করিবে। দিগ্বিদিক্-ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুস্থানে রহিয়াছে, তবু আজও আবাস-স্থানের নাম হিন্দুস্থান! হিন্দুধর্ম্মমূল হিন্দু-হৃদয় হিন্দুধর্ম্ম এতই বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। অবস্থাগত প্রভাবে রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, তথাচ হিন্দু-হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের সমান আরাধনা। যাঁহারা নাটক হয়না বলেন, তাঁহারা বলেন এই যে, কে কোথায় কাকে মারিল, কাটিল, নাটকে ইহার বর্ণনা হউক। কোথায় কি সভাস্থাপন হইল, কোথায় কি বক্তৃতা হইল, তাহা লইয়া নাটক হউক। শক্তিমান পুরুষেরা একবার নাটক লিখিয়া দেখুন কতদূর তাহাতে কৃতকার্য্য হন; কদাচ হইবেন না। এক এক জাতির এক একটি বিশেষ মনোবৃত্তি নাটকের রসবোধের অনুকূল। সকলেই জানেন, ফরাসী বড় প্রফুল্ল জাতি, কিন্তু তাহাদের নাটক পাঠে দেখিবেন যে, নিষ্ঠুরতা পূর্ণ বিপ্লবে (Revolution) গঠিত ফরাসী হৃদয়, কঠোর নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নাটক ভালবাসে। অনুবাদে আমরা বুঝি যে, নিষ্ঠুর Spain এরও সেইরূপ। ষাঁড়ের নিষ্ঠুর (Bull fight) যুদ্ধ স্পেনের আমোদ; হাস্যোদ্দীপক, স্ফূর্ত্তিদায়ক মিলনান্ত নাটক স্পেনের বিশেষ প্রিয় হইবেনা। "ডনকুইকসট" লোকে বলে, যাহার তুল্য হাস্যোদ্দীপক রচনা আর নাই তাহার হাস্যও মানব-পীড়নে উদ্দীপিত হয়। হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারিধারে উচ্ছেদ হয় নাই। আকবরের রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে আছে। সমালোচকেরাও কে কাকে কাটিল, কে কাকে মারিল, এইরূপ রচনা দ্বারা মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।"

এই ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে বসিয়া গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং এই পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটকের শেষ পরিণতি 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'তপোবল' নাটক। শঙ্করাচার্য্যে বেদান্তধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য, আর তপোবলে ধর্ম্ম ও জাতীয়তার একত্র মিশ্রণ। জাতীয়তা যখন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়, তখন তাহা ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে।

কেননা জাতীয়তা ধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। আমরা জাতীয়তা অধ্যায়ে "সৎনামের" এইরূপ ধর্ম্ম ও জাতীয় প্রেমের সামঞ্জস্য আলোচনা করিয়াছি। মোট কথা, কি ধর্ম্ম, কি জাতীয়তা যাহা অবলম্বন করিয়াই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে, সমস্তই গিরিশের দেশভক্ত হৃদয়-প্রসূত, আর গিরিশেই জাতীয়তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্দীপিত ছিল তাই "জনা" ও "পাণ্ডবগৌরব," "শঙ্করাচার্য্য" ও "তপোবল" যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে, "সৎনাম," "ছত্রপতি" "মিরকাশিম" ও "সিরাজুদ্দৌলা" সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মভেদী হইয়াছে।—গিরিশ নিজেই বলিতেন "জাতীয় উচ্চ নাটক জাতীয় হৃদয়ে সম্পূর্ণ অধিকার যাহার আছে তিনিই লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন, নতুবা নহে। ইংরাজের শ্রেষ্ট নাটককার, যদি তিনি জার্ম্মান হইয়া জার্ম্মান ভাষায় সেই সকল নাটক লিখিতেন, জার্ম্মান-হৃদয়ে স্থান পাইতেন না, যথা—Schiller, Goethe ইঁহাদের দ্বারায় সেক্সপিয়ারের উচ্চপ্রশংসা সত্বেও জার্ম্মান তাহাদের নাটককার সিলারকেই উচ্চতর পদ প্রদান করেন; সিলারের কৃত Joan of Arc দেখাইয়া বলেন যে, সেক্সপিয়ার পৃথিবীতে বিচরণ করেন অর্থাৎ পার্থিব স্থূলভাব লইয়া তাঁহার নাটক রচনা; উচ্চ প্রতিভার চালনায় পার্থিব স্থূলভাব হইতে তিনি উড্ডীয়মান হইবার চেষ্টা পান, পার্থিব স্থূল আকর্ষণে ধড়াস করিয়া (Comes down with a thud) পৃথিবীতে পড়িয়া যান। কিন্তু সিলার, যিশুজননী কুমারী মেরী লইয়া মায়িক প্রেম অতিক্রম পূর্ব্বক মহাপ্রেমের কথা কহেন। সেই মহাপ্রেমে স্বদেশহিতকর প্রভা, ও তাহার অভাবে পতন। Joan of Arc এ সিলার অদ্ভুত মহিমা চিত্রিত করিয়াছেন।"

পৌরাণিক নাটক লিখিবার জন্য গিরিশচন্দ্রকে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু পুরাণ অবলম্বন করিয়া নাটকরচনার অন্যতম কারণ তিনি নিজেই নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"মারা কাটা লইয়া এমন কি নাটক লিখিব যাহা ব্যাস রচিত ভারতে নাই। এমন পাঁচ সাতটা সেক্সপিয়ারকে আসিয়া শিখিতে হইবে, ব্যাস রচিত ভারতে কি কি ভাব আছে। ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো,

লীয়ার প্রভৃতি সেক্সপিয়ার রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এসকল কঠোর নাটকেও পিত্রাদেশে মাতার মস্তকচ্ছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই এবং কোন জাতীয় নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্তা অশ্বত্থামারও মার্জ্জনা নাই। এই বিশাল ভাবাপন্ন কার্য্যক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত নাটকের যিনি ঘৃণা করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না।

"যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological—অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল, খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্‌টন; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গলার মাইকেল। কবিবর হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" পুরাণ অবলম্বনে; পৌরাণিক গীতা বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ভিত্তি। যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল জানেন না, তিনি কাগজ কলম, ও ছাপাইবার খরচ লইয়া সমালোচনা করেন। মনুষ্য-জীবনের দায়িত্ব তিনি জীবনে বুঝেন নাই।

"আগে বলিয়াছি, যাঁহারা Mythological—অর্থাৎ পৌরাণিক বলিয়া ঘৃণা করেন, কেবলমাত্র তাঁহারা জানেননা যে, পুরাণে যাহা আছে, তাহা কোন জাতীয় কবি-কল্পনায় অদ্যাপিও সৃষ্টি হয় নাই। রাম কল্পনা দেখিয়া যিনি নাটকের ঘৃণা করেন, তাহাকে সকলের জানা একটী গল্প বলিব। কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিল 'যদি তোমার সীতায় অভিলাষ ছিল রাক্ষসী মায়া প্রভাবে কেন রামরূপ ধরিলে না?' রাবণ উত্তর করিল—'আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু রামরূপ ধরিতে গেলে রামরূপ ভাবিতে হয়, সে ভাবনায়—তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূ-সঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কুতঃ। আরে মূঢ়; রাম ভাবনায় কি পরবধূর সঙ্গ ইচ্ছা থাকে?' বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল, 'মেঘনাদে' কবিগুরু বলিয়া বাল্মিকীকে নমস্কার করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূরতীর্থ দরশনে।'

"আমরা বলিয়াছি যে, কোন ভাষায় কোন উচ্চগ্রন্থ পৌরাণিক অবলম্বন ব্যতীত হয় নাই। মেরীকোরেলী, আধুনিক যাঁহার পুস্তক পাদরী বিদ্বেষিত হইয়াও এক সংস্করণে দেড়লাখ বিক্রয় হয়, খৃষ্টীয় পুরাণ বাইবেল

তাহার ভিত্তি। পৌরাণিক নাটক ভালমন্দ হয় বা না হয়, এ কথার সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু পৌরাণিক নাটক যে উচ্চশ্রেণীর নাটক হয়না, ইহা যিনি বলিতে চান, তাঁর তুলনা তাঁহাতেই থাকুক।"

'আনন্দরহোর' পরে গিরিশচন্দ্র প্রথম নাটক লেখেন "রাবণবধ"। দোষগুণে রাবণচরিত্রের পরিকল্পনা করিয়া প্রথম নাটকেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। রাবণ বীর, উদার, অভিমানী, ধার্ম্মিক, কিন্তু এমন কামুক ও পরদারলোলুপ যে মৃত্যুপথে অভিযান করিতে করিতেও সীতার প্রেমভিক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। দোষেও যেমন রাবণ বিরাট, বীরত্ব, স্বজাতিপ্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণেও তেমনি বিশাল। 'অতিদর্পে হতা লঙ্কা' এই প্রবাদ সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দর্প কবির লেখনীতে মনুষ্যত্বের দম্ভে ও বীরজনোচিত আত্মাভিমানে পরিণত হইয়াছে। আমরা দুই একটী কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দর্প—নিকষা রাবণকে বলিতেছেন "বৎস, তুমি স্বর্গের সোপান গড়িবে, নরককুণ্ড নাশ করিবে, তুমি কেন উচ্চ-আশা ভুলিয়াছ? তুমি প্রজা পালনে রত থাক, রামকে সীতা ফিরাইয়া দাও"।—কৃত্তিবাসের রাবণ উত্তর করে "মা সব পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে বিভীষণ হাসিবে, আমি কি শত্রু হাসাইব?"

যেন লোকভয়ে যুদ্ধে যাইয়া তাহাকে বীরত্ব দেখাইতেই হইবে! কৃত্তিবাসের কল্পনাও অস্বাভাবিক নয়, আজ যদি আমার ভাই শত্রুর পদানত হয়, এবং বরাবর শত্রুর সঙ্গে যুঝিয়া পরে অক্ষমতা প্রযুক্ত আমিও কাল আবার সেই শত্রুর শরণাগত হই, তবে সেই ভ্রাতার হাসিবারই কথা; কিন্তু এই পরিকল্পনা সাধারণ মানুষেই প্রযোজ্য, বিরাট মানবহৃদয়ে নয়। গিরিশের রাবণ ত অতিমানুষ, সামান্য লোকভয় তাহার কল্পনায়ও আসে না, তাহার ভাষা, ভাব ও যুক্তি সমস্তই বিজয়ী রাজোচিত ও মহিমাব্যঞ্জক। তিনি বলেন "মা লঙ্কার সমগ্র বীরকুল আজ ধরাশায়ী, আমার বীরপুত্র ইন্দ্রজিত হত, বীরশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ আর

নাই, বীরবাহু "ছিন্নবাহু সাগরের তীরে," আমি পুত্রশোকে সন্তপ্ত, ইহার প্রতিশোধ না দিয়া আমার দর্প বিসর্জ্জন দিব ?

আমি——

"ত্যজি মান এ ছার জীবন
রাখিব কি সুখে মাতঃ।"

বরং সেই দর্পে আমি বীরকরে অসি লইয়া নিজেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব, কেননা রণক্ষেত্রে আমার যেরূপ আনন্দ রাজ্যসুখে তাহা নয়—যে দর্পে আমি যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, চিরকাল পদানত করিয়াছি, আজি—

সেই দর্পে, সেই শরাসন করে,
সেই রণক্ষেত্রে—আনন্দ যথায় মম—
হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায়।

এই তো অভিমানী ও বীরের যোগ্য কথা!

বলিতে বলিতে রাবণের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি সৈন্যগণকে নরবানর সমরে সুসজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন এবং সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন—

"মরণ-সঙ্কল্প বীরগণে কে কবে
জিনেছে রণে ?

হয়, জয়ী হইয়া অরিশোণিতে আত্মীয়ের প্রেতাত্মা তর্পণ করিব, জয়নাদে পুরী প্রবেশ করিব, নতুবা—

বীরের বাঞ্ছিত শয্যা পাতা,
হউক রাক্ষসকুল নির্ম্মূল সমরে ;

রাবণ সকলকে বিভিন্ন কার্য্যের ভার দিয়া নিজেই পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতে চলিলেন, কেননা আজ তাঁহার আনন্দ হইয়াছে যে—

"সে ভিখারী,
যোগ্য অরি কিনা দেখিব পরীক্ষা করি।"

মন্দোদরীকেও বলিলেন——

"তুল্য অরি মিলেছে ঘরের দ্বারে।"

যুদ্ধের প্রারম্ভে সমস্ত কথোপকথনই মন্দোদরীর সঙ্গে হইত রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু গিরিশ নিকষার সহিত করাইয়াছেন। অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে নিকষাকে দিয়া কবি রাবণের চরিত্রসম্বন্ধে ইঙ্গিত করাইয়াছেন—তুই লক্ষ পুত্রের কথা বলিতেছিস্ কিন্তু তার মধ্যে—

'কে তোর শতাংশ ছিল গুণে' ?

পথে নানারূপ অমঙ্গলের কথা শুনিলেন—বুঝিলেন চণ্ডী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—কিন্তু তথাপি তিনি নির্ভীক—তিনি 'না চাহি সাহায্য কারো' বলিয়া একা রণক্ষেত্রে চলিলেন এবং রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাবণ-চরিত্রে, অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, বীরদম্ভ এবং বীরের শৌর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসও রাবণের যুদ্ধে নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এরূপ মহাপ্রাণোচিত বীরদম্ভ তেজস্বিতার সহিত মিশ্রিত হইয়া রাবণকে অসামান্য বীররূপে পরিণত করিয়াছে কি ? মন্দোদরী যখন নানারূপে স্বামীকে বুঝাইলেন, রাবণ তখনও তাহার একই কথা বলিতেছে "সব বুঝি,—

কিন্তু ছার প্রাণ হেতু
মান বিসর্জ্জন কদাচ করিব না"।

মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু—

"মরিয়ে অমর আমি হ'ব মন্দোদরী।"

আর আমরা—

"সমদর্পে জীবনে মরণে
করিব বিহার দুইজনে।"

এই মান হেতু প্রাণ বিসর্জ্জনই গিরিশের পরিকল্পনায় রাবণের দর্পকে খাঁটি মানুষের আদর্শ আত্মমর্য্যাদাবোধে—দম্ভে—পরিণত করিয়াছে। "প্রফুল্ল" নাটকে যোগেশও উমাসুন্দরীকে বলিতেছেন—"প্রাণের জন্য ? তুচ্ছ প্রাণ যেতোই বা,——মা তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ।" "দক্ষযজ্ঞে" দক্ষ যে সতীর প্রতি তীব্র

ব্যঙ্গোক্তি করেন—"অপমান—মান আছে যার; ভিখারীর মান কিরে ভিখারিনী ?" কথারও মান সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের ধারণা পরিস্ফুট হয়।

মন্দোদরীকে রাবণের সান্ত্বনা "তুমি অভাগিনী ?—পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী, যোগী যে চরণ ধ্যান করে, ব্রহ্মা যাহাকে ধ্যানেও লাভ করিতে পারেন না, পঞ্চানন পঞ্চমুখে যাঁহার গুণগান করেন, সেই ব্রহ্মসনাতন রাজীবলোচন

"ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে
গোলকে মিলিব দুইজনে"

ইহাও কৃত্তিবাসের অনুরূপই পরিকল্পনা। কিন্তু এখানে গিরিশ রাবণের তেজস্বিতা (দম্ভ) উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটাইয়াছেন—রাবণ বলিতেছে "আজ যে দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর"—রাম-সমরে সেই দর্প প্রদর্শন করিব। যদি

"ছিন্ন হও রামের সমরে
তথাপি ত্যজ না মুষ্টি।"

রাবণ-চরিত্রের বজ্রতেজ আরো জ্বলিয়া উঠে—রামের তিরস্কারে রাবণের বীরদৃপ্ত উত্তরে। রাম তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন "তুমি এতদিন ক্ষুদ্রজীব রণে পাঠিয়ে নিজে লুক্কায়িত ছিলে, এবার মানবের ভুজবল দেখ্‌বে।" রাবণের উত্তর

"হীনবীর্য্য আমার আত্মীয়!
হীনবীর কহিস্ কাহারে মূঢ়,"

আত্মীয়গণের গৌরব ও লক্ষণের শক্তিশেল প্রভৃতি বর্ণনা কবিলেখনী গুণে বড়ই তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছে।

রাবণের চরিত্রের বীরগর্ব্ব, শৌর্য্য ও বীরোচিত দম্ভ একসঙ্গে গিরিশের ন্যায় অন্য কোন কবি এ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন নাই। গিরিশ রামকে দিয়াও স্বীকার করাইয়াছেন—

"কভু নহে সামান্য রাবণ,
প্রাণ দিল পণরক্ষা হেতু।"

মাইকেলও রাবণ-চরিত্র খুব উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তবে

সে রাবণ অনুতপ্ত, বিবেচক, পুত্রের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত, কিন্তু তাহার বীরত্বে গৌরবান্বিত। গ্রীক হিরোর ছবি অবলম্বনে মাইকেলের রাবণ অঙ্কিত, আর গিরিশের রাবণ সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। গিরিশের রাবণও নিজ বুদ্ধিদোষের কথা না ভাবেন তাহা নয়, তাই মাতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন—

মাতঃ ক্ষমা কর মোরে।
নাশিয়াছি নিজবুদ্ধিদোষে ইন্দ্রজিতে
মহারথী কুম্ভকর্ণ মহাশূরে—

কিন্তু মাইকেলের রাবণ যখন মনস্তাপে জ্ঞানশূন্য, গিরিশের রাবণের অনুতাপ মুহূর্ত্তেই বীরদম্ভ ও মানের উত্তাপে শূন্যে মিশিয়া যায়। বীরত্ব যার আছে, দর্পী যে, মানই যাহার জীবনের প্রধান ভূষণ, প্রাণ যে তুচ্ছ করিতে পারে, অনুতাপ তাহার কতক্ষণ থাকে? আত্মীয় বিয়োগজনিত কাতরতাই বা কতক্ষণ স্থায়ী হয়? উভয় কবির নায়কে ইহাই প্রধান পার্থক্য।

এই বীর, দম্ভী অথচ স্নেহশীল চরিত্রের ভক্তির নিদর্শন আরও উজ্জ্বল। যদিচ কৃত্তিবাস তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, গিরিশ উহা আরও সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। রাবণ রামসমরে মূর্চ্ছিত, সম্মুখে রামচন্দ্রকে দেখিয়া ভক্তি গদ্‌গদ হইয়াছেন, রামের প্রাণও ভক্তের ব্যথায় বড়ই ম্রিয়মান হইয়াছে, তিনি বলিলেন "কাজ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে" ঠিক এই সময়ে রাবণের উক্তি তাহার অদ্ভুত ভক্তির পরিচায়ক—

"শুনিয়া মিনতি রঘুপতি
করেছেন দয়া;
এ রাক্ষস-দেহ-ভার কতদিন ব'ব আর।
করি কটু বাক্যে উত্তেজিত রোষ।"

তখনই রামকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এইখানে রাবণের প্রচ্ছন্ন ভক্তি কৃত্তিবাসের কল্পনা হইতেও গিরিশের ভাষায় প্রকটতর হইয়াছে। কৃত্তিবাস বর্ণিত দুষ্টা সরস্বতীর কোন উল্লেখ না থাকায় আমরা রাবণের শ্রেষ্ঠ মানবতার পরিচয় পাই।

আবার এই চরিত্রেরই হীনতার রূপ গিরিশচন্দ্র সমভাবে চিত্রিত করিতে বিস্মৃত হ'ন নাই। এই দোষবর্ণনায়ই রাবণের রাবণত্ব। রাবণ-চরিত্র এত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া তাহার বিরাট দোষের আলোচনা করিতে গিরিশ ভিন্ন অন্য কোন কবিকে দেখা যায় নাই। যে সময় তাহার আত্মীয় হত—চতুর্দ্দিকে সমরায়োজন, শত্রু রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু—এখনও

"সীতার লালসা আজও জাগে তার মনে।"

এখনও সীতাকে বলিতেছে—

"কর আলিঙ্গন দান
চাহ যদি পতির কল্যাণ।"

কৃত্তিবাসও এই সময়ে রাবণ-চরিত্রের এইরূপ কামপীড়া বর্ণন করেন নাই। কবিগুরু বাল্মিকী মানবের স্বাভাবিক অবস্থা বিকৃত করিয়াছেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে বিপদের মূল জানিয়া হত্যা করিতে যান— "সীতাং হন্তুং ব্যবস্থত"। আর সীতাও তাহাকে খড়্গহস্তে সম্মুখে দেখিলেন—"দদর্শ রাক্ষসং ক্রুদ্ধং নিস্ত্রিংশবরধারিণম্।"

আর মাইকেল মধুসূদনও রাবণকে hero করিতে গিয়া সে দিক্‌টা একেবারেই অনুক্ত রাখিয়াছেন। মহাযজ্ঞে এই সময়ে এই কল্পনা ভাবনায় আসে না। কিন্তু গিরিশের চক্ষু কোন দিকই এড়াইতে পারে নাই। কামের তাড়ণা চরিত্রে অস্বাভাবিক নয়, আর যে রাবণ পরস্ত্রী হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে রিরংসা প্রবৃত্তি আরো স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার লক্ষ পুত্র হত, রাজশ্রী অন্তর্হিত সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যে মরণের পথে অভিযান করিয়াছে, মৃত্যুর প্রাক্কালে তাহার পক্ষে পরস্ত্রীলালসা মনে জাগ্রত হওয়াও রাবণের মত রাক্ষসের পক্ষেই সম্ভব—মানুষের পক্ষে নয়। তাই বলিতেছিলাম দোষেও যেমন, গুণেও সেইরূপ রাবণ প্রকৃতই বিরাট্ পুরুষ। যে সময়ে গিরিশ রাবণ-বধ লেখেন, পাঠককে সেই সময়কার অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতে আমরা "গার্হস্থ্য জীবনের" অধ্যায়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"সীতা হরণের" রাবণও সর্ব্বত্র জয়ী, মৃত্যুর দূর ছায়াও তাহার সম্মুখে

উপস্থিত হয় নাই, সে যেন মূর্ত্তিমান দম্ভ। পৃথিবীতে এমন বীর নাই, যাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সে রণসাধ পূর্ণ করিবে, ধরায় এমন রমণী নাই যে তাহার বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারে। ত্রিভুবনে এমন রাজ্য নাই যাহা তাহার জয় করিতে বাকী আছে। সর্ব্বত্র তাহার বিজয়, দম্ভও তাহার তাই সমরূপেই বিরাট। রাবণের উচ্চারিত প্রথম কয়েকটী ছত্রই তাহার সৌভাগ্য ও তজ্জনিত দম্ভের পরিপূর্ণতা জ্ঞাপন করিতেছে—

এই হেতু—
যাচিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী !
নাহি নব রাজ্য, নূতন ভুবন ;
দিগ্বিজয়ে যাব পুনঃ।
নিত্য সেই কঙ্কণ ঝঙ্কার ;
লয়ে ফুলহার
নিত্য আসে পুরন্দর ;
স্বর্গে নাহি বিগ্রহ সম্ভব।
নাহি রমণী ভুবনে
প্রেম-আশে সাধি যারে,
দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমায় ভজে,
ক্রীড়া-রণে মন নাহি পূরে।
কহ নট-নটীগণে
নৃত্য গীত করিবারে
অস্ত্রাগারে যাইতে না উঠে মন
বীরহীন এ সংসারে।

সীতাহরণ ২য় অ, ২ গ।

এই সামান্য কয়টী পংক্তিতে প্রতিভাত রাবণের সুখকল্পনা গিরিশ চন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব। অন্যত্র রাবণ মারীচকে বলিতেছে—"আমি অমর নই সত্য, আমার মৃত্যুতে হয় ত আমি দুরাচার বলিয়াই পরিচিত হইব, কেহ বা আমাকে সদাশয়ও বলিতে পারে কিন্তু—

"এ সংসারে কেহ না বলিবে
ডরে কার্য্য ত্যজিল রাবণ।"

এই নির্ভীকতা ও দম্ভ সীতাহরণের রাবণে সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান।

শ্রীরাম চরিত্র

শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণের অবতার। রাবণের সংহারহেতু নবদেহ ধারণ করিয়া ধরায় আসিয়াছেন; সত্য রক্ষায়ই রামচরিত্রের বিশেষত্ব! কবিগুরু বাল্মীকি, নাট্যকার ভবভূতি ও কবিশ্রেষ্ঠ কৃত্তিবাস বিভিন্ন দিক দিয়া রাম-চরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন। মধুসূদন জাতীয় আদর্শের ধারণার বিরুদ্ধে রামকে কাপুরুষ চিত্রিত করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস প্রভৃতির সহিত এক মত হইয়া রামের অবতারত্ব যেরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, আবার কালের ধারা বিস্মৃত না হইয়া সম্পূর্ণরূপে উহা যুগোপযোগী করিতেও ক্রুটী করেন নাই। আজকাল অনেক লেখক মাইকেলের অনুকরণে পুরাণ-চরিত্রেও আধুনিকত্ব দেখাইতে গিয়া শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলেন। জাতীয় সংস্কারের সহিত যুগধর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য গিরিশের রামচরিত্রে সংরক্ষিত হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব—

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে সুগ্রীবের সাক্ষাৎ মাত্রই রাম অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। উভয়েই সম দুঃখে দুঃখী; তিনিও যেমন রাজ্যভ্রষ্ট, সীতাহারা, সুগ্রীবও সেরূপ 'ভ্রাতৃবলে ভার্য্যা-রাজ্যহীন'। প্রতিশ্রুত হইলেন।—"বালী-ভয় ঘুচাব তোমার।" উদ্দেশ্য—সুগ্রীবের সহায়তায় সীতার উদ্ধার করিবেন। উভয় ভ্রাতায় যুদ্ধ হইল, রামচন্দ্র 'চোরাবাণের' সহায়তায় বালীর নিধন সাধন করিলেন। মৃত্যু সময়ে বালী শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন "সত্যসন্ধ রাম, আপনি সত্য পালনের নিমিত্ত বনে আসিয়াছেন। আমাকে কেন বিনা অপরাধে ক্ষত্রিয়-বিরুদ্ধ উপায়ে বধ করিলেন—

"দয়াময় নামে কলঙ্ক ধরিলে কেন?"

বালীবধ সমস্যা এতই জটিল যে কোন কবি বা সমালোচকই

একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বাল্মীকি কারণ নির্দ্দেশ করেন যে—কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়া কন্যা-স্থানীয়া। বালী তাহাকে হরণ করিয়া গুরুতর অপরাধে অপরাধী। অতএব মনুর বিধানানুসারে তাহার প্রাণবধে ক্ষত্রিয়ের নিষেধ মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই।"

তদনং পরিতাপেন ধর্ম্মঃ পরিকল্পিতঃ।
বধো বানরশার্দ্দূল ন বয়ং স্ববশে স্থিতাঃ॥

তর্ক হিসাবে এ যুক্তি নিন্দনীয় না হইলেও আধুনিক মানব হৃদয় ইহা স্পর্শ করে না। কবি কৃত্তিবাসের যুক্তি তো স্পর্শ করা দূরে থাকুক, হৃদয়ে ব্যথাই জন্মায়। তিনি বলেন—"রাজার মৃগয়া করিতে পশুবধে অপরাধ কি? তুমি সুগ্রীবের রাজ্য অপহরণ করায় তোমার বধে উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে, এখন আমার প্রসাদে তুমি স্বর্গে গমন কর। এইরূপ পরুষ বাক্য ও দাম্ভিকতা রামচরিত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। গিরিশের রামচন্দ্র এখানে বিনয়ী। সত্যরক্ষা ও কোমল হৃদয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহাতে বিদ্যমান। তিনি বলিলেন—"বীরবর

শোকে মম আকুল হৃদয়,
হিতাহিত না বিচারি' মনে,
করিলাম অঙ্গীকার;
মিত্র-সত্যে ছাড়িয়াছি শর।

সুগ্রীবের দুঃখ ও ভাগ্যবিপর্য্যয় আমারই ন্যায়। হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া সীতার উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব বলিয়া সত্যে আবদ্ধ এবং সেই মিত্রসত্যে শর ছাড়িয়াছি।" অর্থাৎ কাজটা অন্যায় হইয়াছে সত্য, কিন্তু সত্যভঙ্গ করি নাই। সত্য-সন্ধ রামচরিত্রে এইরূপ অন্যায় কার্য্যের আর অন্য কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না। ঋষি যাহাকে বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি মৃদু চরিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন—কবি যাহাকে সেইরূপ মহামহিম করিয়া তুলিয়াছেন—অপরভাবে দোষস্খালন তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত হয় না। তাই বজ্রাদপি কঠোর রামচন্দ্র কঠোরতা ত্যাগ করিয়া কুসুমাদপি মৃদু হইয়া সবিনয় বালীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন—

বীর, ক্ষম অপরাধ,
অযশ রহিল মোর,
বীরগর্ব্ব গাইবে সংসার তব চিরদিন
সবে কবে,
'চোরাবাণে' বালীরে বধেছে রাম।"

বালীর মন তৃপ্ত হইল। কিন্তু রামচন্দ্র কি বাস্তবিকই অপরাধী? এ পর্য্যন্ত হইলে রামচরিত্রে কতকটা ভীরুতা আরোপিত হয়, তাঁহার অপরাধ হইয়াছে মনে হয়। কেবলমাত্র অপরাধ স্বীকারেই মহত্ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অন্যায়, দোষস্বীকৃতি স্বত্ত্বেও চিরদিনই অন্যায়। ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি যাহাই বলুন, রাম যে যুগপ্রবর্ত্তক তাহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাই কবি এখানে না থামিয়া রামকে দিয়া অতি কৌশলে বালীর দোষ সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিলেন। রাম মৃদুভাবে বলিলেন—

"আমি নিমিত্ত মাত্র সবই দীননাথের কার্য্য—তিনি দীনকে দয়া করিয়াছেন। কেন না—

'সুগ্রীব অধিক দীন কেবা ছিল আজি—'

তাহার রাজ্যে অর্দ্ধ অধিকার, তোমার বাহুবল বেশী, তুমি সম্পূর্ণ তাহার প্রতি নির্দ্দয়,

তাই—

"দীননাথ শুনিল দীনের দীর্ঘশ্বাস

আমিও দীন—"দীননাথ দীনে বন্ধু দিল"

এবে দীন তুমি
দীননাথ শুনে তব মনস্তাপ!

"হে বীর তুমি 'অতুল গৌরবে বীরগর্ব্বে ত্যজ ধরা' দীননাথের 'নিমিত্ত' অর্থে যেমন অবতারত্ব সংরক্ষিত হইল, সত্যরক্ষায় যেমন রামের ব্রত, (mission) সার্থক হইল, বিনয়োক্তিতে সেরূপ রামের মানবতার গৌরব রক্ষিত হইল। এই সমবায়েই গিরিশের রামের বিশেষত্ব। তবে রামের অন্যায় গিরিশ লক্ষ্মণের মুখেও সময়ান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। 'তারা'কে লক্ষ্মণ সুগ্রীব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

রাম বিষ্ণু-অবতার,
চোরা বাণে বালীরে নাশিল
এ পাপীর অনুরোধে,
ক্ষত্রিয় নিয়ম ঠেলি।

সীতাহরণ ৫ম অ, ১ গ।

তবে জানকীর উদ্ধারে রাম যখন প্রতিশ্রুত হ'ন—

"পথের কণ্টক ঘুচাইব বালীরে নাশিব চোরাবাণে"

সীতাহরণ ৪র্থ অ, ৩য় গ।

কবি বিস্মৃত হয়েন নাই যে মহদুদ্দেশ্যে সম্মুখস্থ বিঘ্ন দূর করা সর্ব্বদা নীতিসঙ্গত না হইলেও বিশ্বজনীন হিতের জন্য একান্ত আবশ্যকীয়। তাই বালীবধ।

রামের সম্পূর্ণ মানবত্ব দেখিতে পাই সীতার বিরহে তাঁহার বিলাপে। আবার খরদূষণসহ যুদ্ধ কালেও সীতাকে বলিতেছেন "সীতা, লক্ষ্মণের সহিত দূরে যাও—কেন না—

"অন্য মন হব তুমি রহিলে নিকটে".

আমি নিমিত্ত, দীননাথই সর্ব্বনিয়ন্তা; দীনের উদ্ধারের জন্য দীননাথ তাঁহাকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন—ইহাই শ্রীরাম সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের অবতারবাদ। দীনের রক্ষার জন্য বালীবধ, দীনের উদ্ধারের জন্য রাবণবধ, এবং দীনের রক্ষার জন্যই ভার্গবের শাসন। যাহা হইয়াছে সকলের মূলেই দীননাথ, তিনি নিমিত্ত মাত্র।

সীতার বিবাহের পরে পরশুরাম বলপরীক্ষার জন্য রামকে শরাসনে শরযোজনা করিতে বলায়, তিনি তাহাই করিলে জামদগ্ন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। রাম রামকে উত্তর করেন, "অত্যাচারী ক্ষত্রগণ ব্রাহ্মণের পীড়ন করিত। তাই দীননাথ দীনের রক্ষার জন্য তোমায় পাঠাইয়াছিলেন, আজ তোমার কাজ সমাপ্ত, এখন তুমি 'ব্রাহ্মণ-রক্ষক নহ, মানব পীড়ক'। হিংসায় তোমার ধর্ম্ম নষ্ট। আমার শরযোজনা বিফল হইবার নয়, বল, কোথায় শর নিক্ষেপ করিব?" পরশুরাম উত্তর করেন "স্বর্গপথ রুদ্ধ কর, আমি আর স্বর্গের প্রয়াসী

নই।" স্বার্থত্যাগ ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখিতে আবার রাম সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন—কেন না,—

'শক্তিসহ মিলি ক্ষমা অতুল শোভিবে।'

আর আমি ?—

আমি মাত্র নিমিত্ত ধরায়
দেবকার্য্যে শরীর ধারণ ;

সীতার বিবাহ ৩য় অ, ৯ গ।

পরশুরাম চরিত্রটীকে এখানে গিরিশ আরও মহত্তর করিয়া রামের ক্ষমা, বীরত্ব ও বিনয় একসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সত্যপালনই যে রামের অনুষ্ঠেয় কার্য্য, "রাবণবধে" আর একটী দৃষ্টান্ত পাই। 'জন্ম এয়ো হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদে বিধবা মন্দোদরী অনুযোগ দিলেন "রটাইব, ভবে মিথ্যাবাদী রঘুমণি।" রাম উত্তর করেন— "আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না—

"রাবণের চিতা,
কভু না নিভিবে সুলোচনে।
স্মরিলে তোমার নাম প্রাতে,
পাপহীন হবে নর।"

রামের সত্যাশ্রয়ই সকল কার্য্যের মুলে, (mission) গিরিশ পূর্ব্বাপর ইহা দেখাইয়াছেন।

"সীতার বনবাসেও" রামের সম্পূর্ণ মানবত্ব সংরক্ষিত হইয়াছে। রাজ-সম্মান ও কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য একদিকে যেমন তাহার মনে কঠোরতা, সীতাকে ধূলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া আবার তেমনি মমতা! এই অবস্থায় 'বহিব কলঙ্কভার, চন্দ্রানন হেরি!' যাহার দোলাচল চিত্তবৃত্তির জন্য মনের অবস্থা এইরূপ, 'প্রজারঞ্জন হেতু সীতা বিসর্জ্জন' এই যুক্তি দিয়া গিরিশচন্দ্র তাহার অসাধারণ অমানুষিকতা প্রদর্শন করেন নাই। অথবা বশিষ্ঠকে এই কার্য্যের 'নিমিত্ত' মনে করিয়া রামকে দিয়া তাহার প্রতি কঠোর বাক্যও প্রয়োগ করান নাই। তিনি নিজেই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের রাম প্রকৃত সন্দিগ্ধ

স্বামীর মতই সীতাকে চিত্রে রাবণের বুকে শায়িতা দেখিয়া স্থির করিলেন—

'কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী'

এবং তখনুই তাঁর দুর্ম্মুখের বাক্যে প্রত্যয় জন্মিল—পূর্ব্বে সীতা-প্রেমমুগ্ধপ্রাণে প্রত্যয় জন্মে নাই—

"দশে যাহা ঘোষে, মিথ্যা কভু নহে তাহা,
দশ মুখে ধর্ম্ম মানি।"

সীতাকে বনবাস দিতে হইবে শুনিয়া—লক্ষ্মণ যখন অত্যন্ত কাতর হন, রাম তাহাকে বুঝাইলেন "তুমি সরল প্রাণ, নারীরীতি জান না, এই কুলটা দোষে অহল্যা পাষাণী ছিল, বালীর মৃত্যুতে তারা কত 'কাঁদিল বিবশা', পুনঃ, 'হের আচরণ, মিলিল সুগ্রীব সনে'; আর রাবণের মৃত্যুতে যে মন্দোদরীর রোদনে 'অশনি ভেদিল'; সেও এখন 'বিভীষণ পাশে।' এইরূপই নারীচরিত্র, তুমি ছলে ভুলাইয়া সীতাকে বনে রাখিয়া আইস।"

সীতাকে বনে পাঠাইয়া রামের স্বাভাবিক কাতরতা ও মূর্চ্ছা আবার ঠিক মানবোচিতই হইয়াছে। কোন প্রকারেই মনস্থির করিতে না পারিয়া শেষে স্থির করিলেন—

রাখিব বংশের মান পালিয়ে প্রজায়

এবং একান্ত-কাতর লক্ষ্মণকেও প্রবোধ দিয়া শান্ত করেন।

কবিগুরু উল্লেখ করেন 'ভদ্র'প্রমুখ সভাসদ্‌গণের মুখে পুরবাসিগণের সন্দেহের কথা শুনিয়া রাম 'অপবাদভয়াদ্ভীতঃ' সীতাকে বনবাস দেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা জানিত সীতা 'শুদ্ধা'—

"অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।"

বাল্মীকি রামায়ণম্।

দুর্ম্মুখের কাছে শুনিয়া "ভবভূতির" রাম বলেন—

লোকরঞ্জনই একমাত্র ধর্ম্ম—

"সতাং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতম্—"

কালিদাসের রাম নিজনিন্দা ও নিরপরাধিনী ভার্য্যাবিসর্জ্জন—উভয়

চিন্তায় দোলাচলচিত্ত হইলেন—এবং অতঃপর "ত্যাগেন পত্নাঃ পরমাষ্টু মৈচ্ছৎ" পত্নীত্যাগেই অপবাদ দূর করিতে বাসনা করিলেন।

রাবণের চিত্রের উপরে সীতার শয়ন, কবি কৃত্তিবাসের মৌলিক কল্পনা। কিন্তু তাহাতে রামের সামান্য সন্দেহ নির্দ্দেশিত। গিরিশ কৃত্তিবাসের এই ভাবটিই সম্পূর্ণ ফুটাইয়া সন্দেহের জন্যই সীতার বনবাস—রামচরিত্রে সম্পূর্ণরূপে এই মানবতার আরোপ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণবর্জ্জনে রামচরিত্রের আরও নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। ইহলীলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছেন 'তিনি কে'। তাই চিত্তস্থৈর্য্য, ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিলেও রামের মানবতা সর্ব্বত্রই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সত্যবটে কালপুরুষ ও দুর্ব্বাসাকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণকে প্রস্তুত হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন—

"উচ্চ কর্ম্ম এ সবার
সত্যবান বুঝ সত্যস্রোত"

নিজের সত্যরক্ষা সম্বন্ধেও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—

"লক্ষণ বর্জ্জনে,
সত্যপূর্ণ করিব ত্রেতায়।"

এই সত্যরক্ষার জন্যই দুর্ব্বাসার নিকট আরও দৃঢ়তরভাবে আকিঞ্চন করিয়া বলিতেছেন——

"তপোধন, কর আশীর্ব্বাদ,
সত্যে যেন হই পার।"

নিজের বৃত্তিগুলিও সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত——

"প্রেমে জয় রিপু মম ;"

তথাপি তিনি গৃহী মানব, গৃহিজনসুলভ দুঃখ ব্যথা বিদায় দিতে পারেন নাই। বশিষ্ঠ যখন রামকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিধান-সঙ্গত হিতবাণী প্রয়োগ করিতেছেন—

"সত্যের সম্মান রাখ লক্ষণ-বর্জ্জনে—"

রামের উত্তর এক্ষেত্রে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। বলিলেন—"মুনিবর! তুমি তাপ দুঃখ সহ্য করিতে পার। কিন্তু জান না—

"গৃহীর অন্তর ব্যথা।"

লক্ষ্মণের গুণ বর্ণন করিতে করিতে একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণের চলিয়া যাইবার সময়েও সেই মানবীয় দুর্ব্বলতা-সূচক মোহ। বাস্তবিকপক্ষে গিরিশের রামচরিত্রে, দেবতা ও মানবের অপূর্ব্ব মিলন ঘটিলেও রাম সর্ব্বদাই মানব।

লক্ষ্মণবর্জ্জন প্রেমের নাটক। যে প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, লক্ষ্মণবর্জ্জনেও সেই প্রেমই উদ্ভাসিত। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই বীর, সহনশীল, ত্যাগী। কিসে তাহারা এত বল ধরেন? প্রেমে—সর্ব্বজয়ী প্রেমে। তাই রাম তাড়কাবধে যে প্রেমের প্রভাব বুঝিয়াছেন, যে প্রেম-প্রভাবে জনকনন্দিনী সীতাকে লাভ করিয়াছেন, যেই প্রেমবলে পরশুরাম পরাভূত, সেই প্রেমেরই বল সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে। তাই তিনি দুর্ব্বাসাকে বলিতেছেন——

প্রেমে পিতৃসত্য হেতু গমন গহনে,
হারাইনু জানকীরে,
রে নিন্দুক, তবু না নিন্দিনু বিধি;
সয়েছ কি কভু
রাজ্য ত্যজি সীতাহারা শোক?
প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেমে কপিসেনা সাথী
প্রেমে শিলা ভাসে জলে, ম'লে প্রাণ মেলে
প্রেমে দশানন-জয়ী খ্যাতি;
প্রেমের শাসনে রামরাজ্য অযোধ্যায়।
প্রেমহেতু সীতা ত্যজি
লঙ্ঘি অলঙ্ঘ্য সাগর
দুষ্কর সমর করিলাম যার লাগি।

লক্ষ্মণও আবার রামের প্রেমেই এত বড় বীর। তিনি ইন্দ্রজিতকে জয় করিয়াছেন, বুকে শক্তিশেল ধারণ করিয়াছেন—দৈহিক বলে নয়, ক্ষাত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় নয়, রজোশক্তিতে নয়—রামের প্রেমে। ইঁহাদের বীরত্ব প্রেম-প্রসূত বলিয়াই শ্রেষ্ঠ আখ্যা পাইবার যোগ্য। ধৈর্য্যশীলতা

ও বীরত্বের নূতন আদর্শ গিরিশ প্রেমের ভিত্তিতেই গড়িয়াছেন। লক্ষ্মণ প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছে—

"যবে ইন্দ্রজিত বরষিল শর,
ঢাকি মোরে আপন হৃদয়ে
রেখেছিলে দয়াময়,
দানি দেহ রাখিতে এ ছার দাসে ;
সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেম বলে ;
জিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু !
সেই প্রেম-বলে,
না টলিনু শক্তিশেল হেরি
উচ্চ হৃদে পেতে নিনু শেল।
রামপ্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ ;
গৌরব আখ্যান মহতী রহিল ভবে ;"

মানুষের দ্বারা অসাধ্যসাধন ঘটিলে প্রাকৃতজনের বিস্ময় জন্মে, কিন্তু এই প্রেমবলেই দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতও অতিক্রম করা যায়। প্রেম মানুষকে অপার শক্তি দান করে। এই প্রেমকল্পনা এক্ষেত্রেও প্রেমের কবি গিরিশ-চন্দ্রেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসে এরূপ কল্পনা দৃষ্ট হয় না।

ক্ষুদ্রাধারে প্রেমও মানুষকে কত শক্তি দান করে তাহা গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলে দেখাইয়াছেন। পবিত্র প্রেমের তো কথাই নাই। এই প্রেমেই লক্ষ্মণের আত্মবিসর্জ্জন, এবং এই ত্যাগেই তাহার রামসেবায় অসাধারণ শক্তি ও ধৈর্য্য। সত্যের নিজস্ব নিজশক্তিই প্রভূত, আবার তাহা যদি মহাপুরুষের দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তবে তাহার শক্তি সহস্রগুণ বাড়িয়া যায়। প্রেমের বলও বিপুল—সে প্রেমদীক্ষা যখন তাহার প্রেমাবতার রামচন্দ্রের নিকট ঘটিয়াছে তখন তাহার শক্তির কে পরিমাণ করিবে ? লক্ষ্মণ তাই বলিতেছে—

"সেবা মম পূর্ণ এতদিন,
আত্মবিসর্জ্জনে পূজা করি সমপূরণ ;"

ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপনা বঞ্চন।

বিদায়কালে রামকে মোহাচ্ছন্ন দেখিয়া বিলাপ করিতে করিতে লক্ষ্মণ ভরতকে বলেন—

"দাদা, তুমি রামচন্দ্রকে দেখিবে, হায়, আমার আর রামকার্য্যে অধিকার নাই, আমি—

'অশুচি-বর্জ্জিত দেহে ছোঁব না রাঘবে'

উপরের একটী কথায়ই লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, আত্মত্যাগ ও প্রেম একাধারে প্রকটিত। প্রেমের প্রভাবে মহিমান্বিত রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র এই নাটকে গিরিশের অদ্ভুত কলা-নৈপুণ্যে নূতনভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছে।

গিরিশের নাটকে রাম চরিত্র সর্ব্বত্রই এমন অক্ষুণ্ণ অথচ নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে যে বহুশতাব্দী পরে রামকেও কখনও প্রাচীন যুগের রাম মনে হইবে না। কেবল রাম-চরিত্র কেন, ইহাই গিরিশের রাম, রাবণ ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্রেরও বিশেষত্ব।

সীতা

সীতাহরণের সীতা, রাবণবধের সীতা ও সীতার বনবাসের সীতা একই ব্যক্তিত্বের বিচিত্র অভিব্যক্তি। সীতাচরিত্রের বিশেষত্ব সর্ব্বত্রই সমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। রাবণবধের সীতার কয়েকটী পংক্তিতেই চরিত্রগৌরব উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। রাবণের অন্তঃপুর হইতে উদ্ধারের পর রামের পরুষবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া কাহাকে তিনি তাহার সতীত্বের সাক্ষী করিবেন? সীতা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা সকলকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছেন "দেখ রাবণগৃহেও আমার—কাঙ্গালিনীর—বিরহিনীর অবস্থা দেখ—

সতীনারী আমি, কহি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি,
সাক্ষী মম দিবস শর্ব্বরী
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন
সাক্ষী শীর্ণ কায়া,

সাক্ষী আপাদ-মস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর,
ঝরিতেছে অবিরল,
সাক্ষী পবননন্দন হনু
সাক্ষী বিভীষণ, সাক্ষী নাথ, তোমার অন্তর।

"সাক্ষী তোমার অন্তর—তুমিও জান, তবে তুমি আমাকে কেন পীড়া দিতেছ—তবে যদি তুমি পায়ে ঠেল, আমার খেদ নাই, কারণ আমি পতিদরশন পাইয়াছি"—বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতা সাজাইতে অনুমতি করিলেন। হনুমান খেদ করিলে তিনি বলেন "অনল কি আমায় স্পর্শ করিতে পারে?—

বিদ্যমান দেখাব সবারে
অনল শীতল সতীতেজে।"

এইথানে সীতার তেজস্বিতা সতীত্বগৌরব ও অভিমান—সমভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

"সীতার বনবাসের" সীতা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঠিক বঙ্গবধূর ন্যায় অলসে অবশ কলেবর, নিদ্রার ভারে চলিতে অক্ষম, কেবল রামকে কাছে দেখিতে চাহেন। আবার রামকে প্রবোধ দেন—

"যবে নব শিশু দিব তব কোলে,
পবিত্র প্রণয়ফল—
সাধিব না থাকিতে নিকটে,
যাচিব না চরণ দর্শন,
নিশ্চিন্তে পালিহ প্রজাগণে গুণনিধি!"

কিন্তু এখন "না হেরি তোমারে পরাণ শিহরে মম"

বনবাসে তাহার কাতরতায়ও কবি যুগধর্ম্মের শাসন মানিয়াছেন, স্বাভাবিকতা বিসর্জ্জন দেন নাই, কিন্তু সীতার একমাত্র কাতরতা—"রাম হেন স্বামী মম বাদী।" অলক্ষিরাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন—

"কো ভাগ্যবতীন্ বসেছে রামের পাশে?"

তখনকার স্বাভাবিক ব্যাকুলতায় ও—ঈর্ষায় নহে—চিরন্তনতা দৃষ্ট হয়। "সীতার বনবাসে"—রামকথার শ্রবণমাত্রেই সীতার অশ্রুজল, লবকুশকে সান্ত্বনা, হনুমানকে বন্ধনাবস্থায় দেখিয়া তাঁহার কাতরতায় পৌরাণিক সংস্কার ও কালধর্ম্ম উভয়ই সমভাবে সংরক্ষিত। আর সীতার অভিমান—

"নাহি দিব পরীক্ষা অনলে।"

সীতার সতীত্বকে আত্মসম্মানের পরিবেশমণ্ডলে আরও উজ্জ্বল করিয়াছে। যখন রাম তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন, রামের সন্তান বাঁচাইবার জন্যই তাঁহার জীবন রক্ষা, নতুবা আর কোন বন্ধন নাই। কেবল চিন্তা,—সন্তান রক্ষা, সে অবস্থায় তাঁহার উচ্চারিত দুই একটী পংক্তিতে—

জগৎ মাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম——

স্নেহ, মাতৃত্ব ও পতিভক্তি সমভাবে প্রতিভাত।

"সীতাহরণেও" সীতার সর্ব্বদা রামের জন্য দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা, লক্ষ্মণের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ, পথে সীতার বিলাপ, অশোক বনে রাবণের অত্যাচারে তাঁহার তেজস্বিতা, হনুমানকে দেখিয়া রাক্ষস মায়া ভ্রমে সন্দেহ এবং চেড়ীগণের অত্যাচারে অসাধারণ ধৈর্য্য—সমস্তই পুরাণাবলম্বিত হইলেও গিরিশের নিজস্ব রচনায় স্বাতন্ত্র্য ও সজীবতা লাভ করিয়াছে।

মারীচের মৃত্যুকালীন ছলনাময় আর্ত্তনাদ—'হা লক্ষ্মণ, হা সীতে,' শুনিয়া সীতা লক্ষ্মণকে রামের সহায়তার জন্য যাইতে বলেন, লক্ষ্মণ রাক্ষস মায়া মনে করিয়া এবং রামের ক্ষাত্র শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস থাকায় যাইতে চাহেন না। তাহাতে সীতা যে লক্ষ্মণকে তিরস্কার করেন, গিরিশচন্দ্র বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের মতন তাহার স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াই গিয়াছেন। কিন্তু অনেকে বলেন ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী ও ভ্রাতৃগত-প্রাণ লক্ষ্মণের প্রতি সীতার যে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, একদিনে সে বিশ্বাস অপনোদিত হইয়া সত্যবতী বীরাঙ্গনা সীতার মুখ হইতে এরূপ হলাহল উদগীর্ণ হওয়া

স্বাভাবিক নয়। প্রসিদ্ধ সমালোচক যোগীন্দ্রনাথ বসু ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এরূপ মত পোষণ করেন। মাইকেল সীতাদেবীর অনুযোগ অন্য ভাবে লিখিয়াছেন——

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর! পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি ;
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি। যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে।"

যোগীন্দ্র বাবু বলেন মাইকেল এই পরিকল্পনায় সীতাচরিত্রকে সুরুচিসঙ্গত ও শোভন করিয়াছেন। কৃত্তিবাস বলেন, দুষ্টা সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া সীতাদেবী লক্ষণের প্রতি এরূপ ভাষা প্রয়োগ করেন।

যোগীন্দ্রবাবু বলেন রামসীতায় মানবত্ব আরোপ করিলে এই ধারণা সম্ভব নয়। গিরিশের সীতাও মানবী মাত্র, দেবতা নহেন, তাই তিনি দুষ্টা সরস্বতীর উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু স্বাভাবিকতা ধরিতে গেলে ঐরূপ কঠোর তিরস্কার অসম্ভব নয়। শ্রেষ্ঠ মানবেও সন্দেহ স্বাভাবিক। তাই রাম সীতার সতীত্বের অসাধারণ নিদর্শন পাইয়াও অহল্যা তারা মন্দোদরীর চরিত্র কল্পনা করিয়া সীতার চরিত্রে সন্দিহান হন। ভাল বাসার সহিতই সন্দেহ বিজড়িত। বিপদ কালে লক্ষ্মণকে রামের অনুগমন করিতে না দেখিয়া পতিপ্রাণা সীতা বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। চিত্তের প্রকৃতিস্থতা হারাইয়া বলিয়া ফেলেন——

"তুমি আমার প্রতি লোভবশতঃই রামের বিপদে উদাসীন আছ"। কারণ তাঁহার মতে লক্ষ্মণের না যাওয়ার আর কি কারণ থাকিতে পারে? তাঁহার রক্ষার জন্য যে লক্ষ্মণ সেস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন না, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে জ্ঞান তখন তাঁহার লুপ্ত। ক্ষত্রিয়কে ভীরু, বীরকুলগ্লানি অপবাদও কম কঠোর নয়। কিন্তু সীতার তৎকালীন অবস্থায় বাল্মীকি কথিত কঠোর

বাক্যই স্বাভাবিক মনে হয়। চিত্তস্থৈর্য্য হারান চরিত্রের একটি ক্রটী বটে, কিন্তু মানবীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। ক্ষণকালের জন্য চিত্তস্থৈর্য্য হারাইয়া নরনারী যাহা বলিয়া ফেলে—মূল চরিত্রকে তাহা ক্ষুণ্ণ করে না। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা বাদ দিয়াই চরিত্র বিচার করা কর্ত্তব্য। অতঃপর সীতা এইজন্য অনুতাপে দগ্ধ হন কিনা, তাহাই আলোচনার বিষয়। সীতার সহিত লক্ষ্মণের আর উদ্ধারের পূর্ব্বে দেখা হয় না। এই সময় মধ্যে দুইবার মাত্র গিরিশের সীতা একথার উল্লেখ করিয়াছেন। "সীতাহরণে" রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া বলিতেছেন—

"দেবর লক্ষ্মণ দেখ আসি,
ঠেকিয়াছি তোমারে নিন্দিয়ে ;
আসিয়া কর হে ত্রাণ!—"

৩য় অঙ্ক, ২য় গ—

"সীতার বনবাসে" তিনি উর্ম্মিলাকে বলিতেছেন—"তখন আমি 'জ্ঞানহারা রাম-অদর্শনে' এবং

শুনি সকাতর ধ্বনি
"কোথা ভাইরে লক্ষ্মণ"
আছিনু বিহ্বলা সম,"

হনুমানকে মাত্র তিনি বলিতেছেন—

"বল দেবর লক্ষ্মণে
কাঁদে সীতা অশোক কাননে"

কবি এই অনুতাপকে খুব নিদারুণ করিয়া দেখান নাই। কবি যাহায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহার আভাস দিয়াছেন—তাহা হইতেই অনুতাপের গভীরতা অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

মন্দোদরী

আধুনিক গৃহস্থ রমণীর সমস্ত সদ্‌গুণই মন্দোদরীতে দৃষ্ট হয়। বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতি স্বামিভক্তির ও পরদারলোলুপ স্বামীর পত্নীর পক্ষে যে স্বাভাবিক সন্দেহ ও আশঙ্কা তার সবই মন্দোদরী চরিত্রে গিরিশের নাট্যে

উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যখন সুর্পনখা আসিয়া নিজের লাঞ্ছনার বর্ণনা করে, সে বুঝিতে পারিল কেন

"অকারণে কাটে নাক কাণ?"

আর যে বীর খরদূষণকেও বধ করিয়াছে তিনি স্বয়ং রাম ভিন্ন আর কেহ নহেন।

রাবণের চরিত্র জানেন বলিয়াই সুর্পনখাকে সীতার কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। যখন রাবণ ও সুর্পনখা একত্র যুক্তি করিতে গেল তখন তাহার সন্দেহ স্বাভাবিক—

"কোথা যায় দুইজনে?"

তিনি বুঝিতে পারিলেন "কোন ছলে হরিবে রমণী" এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তান্বিতা হইলেন।

"ফুল শরাসন
বিষম সন্ধান তব।"

হনুমান কর্ত্তৃক রাজপুরীতে অগ্নি প্রয়োগের পূর্ব্বেই তিনি বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিলেন—

"অগ্নিশিখা আনিয়াছ ঘরে
জ্বলিবে সকল পুরী!"

"রাবণবধের," মন্দোদরী সর্ব্বযুগের নারীর বৈশিষ্ট্যেই গঠিতা।

রাবণকে বলিতেছেন "আমি রাজ্যসুখও চাহিনা, কেবল সর্পিনী রূপিনী সীতা প্রার্থনা করি, আমার ও তো গৌরব আছে—

তোমার কৃপায় লঙ্কার ঈশ্বরী আমি,
সুন্দরী রমণী
আমার সম্মুখে কি হেতু অশোক বনে?

এ গৌরব নারীজনোচিত আত্মমর্য্যাদাগত দম্ভ! মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যাইতে উত্তেজিত করিতেছেন আবার যুদ্ধের সময়ও সীতার প্রতি লোলুপ দৃষ্টির জন্য তিরস্কার করিতেও কুণ্ঠিতা নন—ছিঃ ছিঃ ইন্দ্রজিৎ অনন্তশয়নে, আর—

"সীতার লালসা আজো জাগে তব মনে!"

মন্দোদরী স্বামীর মৃত্যুতেও আধুনিক মহিলার মতই আক্ষেপ করিতেছেন—

"কার কাছে জানাব মনের জ্বালা,
নাহি স্বামী, কোথায় করিব অভিমান,
ফুরাল সকলি এতদিনে!"

মহাভারত

পুরাণ কিরূপ নাট্যসাহিত্যে বর্ত্তমান কালোপযোগী হইয়াছে গিরিশের মহাভারতীয় নাটকে আমরা বিশেষরূপে তাহা লক্ষ্য করি। "ষ্টার" থিয়েটারের দ্বার উদ্‌ঘাটনের সহিতই "দক্ষযজ্ঞ" অভিনীত হয়, এবং দক্ষের ভূমিকায় গিরিশ নিজেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। Satanএর আংশিক ছায়া দক্ষে পড়িলেও, দক্ষযজ্ঞ সম্পূর্ণ মৌলিক। বেনথাম, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের নীতিমূলক ধর্ম্ম (ethics) পৌরাণিক দক্ষ চরিত্রে সমারোপণ করিয়া গিরিশ অভিনব সৃষ্টিচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য হিতবাদিগণের (Utilitariansএর) একমাত্র লক্ষ্য জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলসাধন greatest good of the greatest number—অর্থাৎ আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনীতি-মূলক যাবতীয় অনুষ্ঠানই মানব-হিতের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে। (Bentham)। মহামতি মিলও বলেন যাহা হিতকর ও প্রয়োজনীয় তাহাই নীতি বা ধর্ম্ম (virtue)—যেমন যুদ্ধবিগ্রহে শান্তি অন্তর্হিত হয়, তাই সমাজ তত্ত্ববিদ্‌গণ শান্তিকামনা করেন, যেমন শিক্ষার প্রসারে, স্বাস্থ্যস্বস্তি বর্দ্ধনে প্রজাগণ সুখে থাকিয়া আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হয়, তাই নীতিবাদী দেশমুখ্যগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শান্তি প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। প্রজাবর্গের চরম মঙ্গল একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া এই মতবাদ (theory) ক্রমে বহু শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামিত হয়। এই নীতি অবলম্বন করিয়াই এক সময়ে ব্যবহার শাস্ত্র (Private, Public এবং International Law) গড়িয়া উঠে এবং সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিমূলক সভ্যতায় বিশিষ্ট উপাদানগুলিও প্রতীচ্যসমাজে পরিপুষ্টি লাভ করে।

গিরিশচন্দ্র পাশ্চাত্যনীতির উপকরণে এক নীতিজ্ঞ, তপোনিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম নূতন দক্ষপ্রজাপতি সৃষ্টি করিয়া উপরি-উক্ত মতবাদের ভ্রান্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার মানসপুত্র দক্ষের প্রতি প্রজাস্থাপনের ভারার্পণ করিয়াছেন চিন্তানিরত দক্ষ অবিরত চিন্তা করিতেছেন, কি প্রকারে তিনি আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। ইতিপূর্ব্বে বহু প্রজাপতি এই মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাই স্থির করিলেন—সমাজবন্ধনে "একতাবন্ধন!" ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বেও ধনী নির্ধনের মধ্যে সাম্য বা ঐক্য স্থাপনের জন্য দার্শনিক হবস্ Hobbes মানবের প্রথমাবস্থা man in the natural state প্রচার করেন, কিন্তু এই ঐক্যবাদেও একটা ভ্রান্তি ছিল বলিয়াই ঐক্যসংরক্ষণে এক প্রবল শক্তির প্রয়োজন হইল এবং প্রজাতন্ত্র (democracy) শেষে সাম্রাজ্যতন্ত্রে (Imperialism এ) পরিণত হয়। যাহা হউক দক্ষ একতার মূল নিরূপণে স্থির করিলেন—সাধারণ প্রয়োজন—unity of Interest অনুসন্ধান আবশ্যক। তাই ভাবিলেন—

"কোন সাধারণ প্রয়োজনে
একতা বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে?
একতার মূল প্রয়োজন।"

১ম অঙ্ক, ২য় গ।

কিন্তু—

"প্রয়োজন বিনা,
একতা বন্ধনে কভু না মানব রবে।"

কিন্তু সে প্রয়োজন কি মায়া? তাই তো ভাল—যদি সমস্ত মানবকুল এক মায়ায় (Illusion) আচ্ছন্ন রাখা যায় তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; কারণ সকলেই মায়াধীন—"তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া ব্যোম তরুলতাগণে,
তবে মায়ার বন্ধনে
কি হেতু না র'বে নর?"

কিন্তু, না—মায়ার বন্ধনই শিশুস্বপ্নবৎ।

সাঙ্খ্যদর্শনকার কপিলের ন্যায় দক্ষও মায়া অগ্রাহ্য করিলেন—

"মায়ার বন্ধন
শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা।"

তারপরে অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—

"হিত চিন্তা সবাকার
নিজ হিত হেতু—"

ইহাই সমস্ত মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। বেনথামের এই হিতবাদ, মিলের usefulness (প্রয়োজনীয়তা) এবং Cumberland এর Common good—the supreme law প্রভৃতিরই অনুরূপ।

এই 'হিতচিন্তা সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী করিবার জন্যই দক্ষ মৃত্যু দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। মৃত্যু বিভীষিকাপ্রদ, মৃত্যু, আজন্ম অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যের বিলোপ ঘটায়, আশ্রয়দাতার মৃত্যুতে আশ্রিত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, মৃত্যুভয় যেমন দার্শনিককে অভিভূত করে, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দুরও সময় সময় বিষাদ জন্মায়। তাই নচিকেতা যমকে মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন; মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত 'অমৃত' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দক্ষও তাই ভাবিলেন—

"ডরে নারে রহিতে সংসারে
যে সংসারে, মৃত্যুভয়
অনাচার মৃত্যুর কারণ—"

তাই দক্ষ প্রজাপতি মৃত্যুরূপ অনাচারকর্ত্তা শিবের দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন; নতুবা এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে মানব কি সুখে থাকিবে?

"অনাচার নিবারণ, শিবের দমন
অগ্রে প্রয়োজন
মৃত্যু-নিবারণ সংসারে উচিত আগে
নহে ক্ষণস্থায়ী পুরে
কি সুখে রহিবে জীব?

লয়কর্ত্তা শিব—
লয় নিবারণ না হবে কখন,
অনাচারী শিবনিবারণ বিনা।"

ঘটনাস্রোতও তাহার কার্য্যের সহায় হয়। এদিকে শিবের সহিত কন্যা সতীর বিবাহের সম্বন্ধ-প্রস্তাব তিনি উপেক্ষা করিয়া স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করেন। সমস্ত দেবসমাজই নিমন্ত্রিত, একমাত্র হর অনাহূত। দক্ষ ঘটনাস্রোত উপেক্ষা করিলেন বটে—

"কোথায় ঘটনা স্রোত
দৈববল না করিলে সৃজন?"

কিন্তু দৈববল লঙ্ঘন করে কার সাধ্য? মায়ার বন্ধন ব্যতীত শুষ্ক হিতবাদে কি সংসার চলে? তাই ব্রহ্মা দক্ষকে বলেন—

"মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়,
তাই মাতা উদয় তোমার গৃহে।"

সতীর হস্তস্থিত মাল্য শূন্যে উত্থিত হইল, প্রমথবেষ্টিত মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সতীমাল্য নীলকণ্ঠেরই কণ্ঠশোভা বৃদ্ধি করিল। দক্ষ এখন প্রকাশ্যে শিবের অবমাননা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এদিকে ভৃগুগৃহে শিবও তাঁহাকে দেখিয়া আসন পরিত্যাগ না করায় মানবের 'অনন্ত সুখের জন্য' শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন—

"মম প্রথা মতে
সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন।
অনন্ত এ স্থান
রহিব অনন্ত সুখে।"

এই দক্ষের দর্পযজ্ঞের পরিণাম ও সতী-দেহত্যাগ "দক্ষযজ্ঞে" বিস্তারিত-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকে দক্ষের অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সংহারকে যে চাই। পুরাতনের নাশ না হইলে নূতন সৃষ্টি সম্ভব নয়। দক্ষেরও প্রধান ভুল লয়নিবারণ চেষ্টা। কবি তাই বলেন—

"লয় বিনা উন্নতি না হয়
অধোগতি উন্নতি বিহনে
অমঙ্গল ফল তার"

দার্শনিক হিগেলেরও মত—"Life in death"—লয়ে নূতন জীবন গঠিত হয়। যেমন ধানের বীজ মাটিতে পুঁতিলে তাহার নাশে নূতন শস্য উৎপাদিত হয়, সেইরূপ খাঁটি মৃত্যুতে—আত্মোৎসর্গে—নূতন প্রাণ গজাইয়া উঠে। কবির কথায় "Old order changeth, yielding place to new." "হরগৌরীতে"ও গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন "সৃষ্টি স্থিতি লয় একই কার্য্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একে তিন, কেবল নামে পার্থক্য, সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। সংহার, জীর্ণ পুরাতন সৃষ্টির সংস্কার মাত্র—নব সৃজনের কারণ।"

তপঃশক্তিতে আত্মশ্লাঘা দক্ষের দ্বিতীয় ভ্রান্তি। কিন্তু স্বয়ং মহাশক্তি **তপোশক্তিতে** মুগ্ধ হইয়া যাহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন—

"স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যারে দিল আলিঙ্গন"

তাহার শক্তির নিকট দক্ষের তপ কত তুচ্ছ! শিবরহিত যজ্ঞে দক্ষের তৃতীয় ভ্রান্তি। প্রজার হিতসাধন অপেক্ষা শিবাপমানই তাহার অধিক লক্ষ্য ছিল। সমাজ বন্ধন হয় প্রেমে, দ্বেষে নয়, তাই কবি বলেন—

"প্রেমে, নহে অহংকারে, সৃষ্টির বন্ধন।"

French Revolution (ফরাসী বিদ্রোহ)

"শ্রীবৎস-চিন্তায়" গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের অন্তরালে অন্য একটী বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। 'রাজা ও রাণীতে,' ফরাসীর রাজদম্পতীর দুরদৃষ্ট ও ফরাসী প্রজাবিদ্রোহের ছায়া পড়িয়াছে। রাজা প্রজার সুখদুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; মনে করেন——

"কাল্পনিক দুঃখ সদা তার,
নিজ কর্ম্মদোষে দীনতা তাহার"।

প্রজা পীড়িত, কার্য্যের অভাব (Unemployment); এ দিকে

বণিক্ (Merchants) কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। রাজা ধর্ম্মযাজকদের দ্বারা শুষ্ক ধর্ম্ম প্রচার করেন কিন্তু শূন্যজঠরে ধর্ম্মকথা কে শুনিবে? নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়া যায়—

মন্ত্রী— "আবেদন অধিক নূতন।
শ্রমজীবী দীন কয়জন,
জানায় রাজন্,
অতি পরিশ্রমে দিনপাত হয় সবাকার,
নগরে বাহুক নামে বিখ্যাত বণিক্
যাহার অর্ণবতরী ভ্রমি ভূমণ্ডল,
নিত্য আনে কোটি কোটি ধন,
তার কার্য্যালয়ে,
আবেদনকারী দীনগণ,
পরিশ্রমে করে দিনপাত
কহে সবে, অতি পরিশ্রম—
অত্যল্প অর্জ্জন,
তাহে কষ্টে হয় দিনক্ষয়,
জানায় সবায় প্রহরেক ছয়,
কর্ম্মে রহে নিয়ত সকলে,
নিবেদন—মহারাজ করুন নিয়ম,
যাহে,
অল্প কষ্টে অধিক উপায় হয়।"

শ্রীবৎস— "দেহ ধন,—
কি উপায়ে বণিকেরে করিব বারণ?
ইচ্ছা নাহি হয়, স্থানান্তরে যাক্ সবে,
আছে অন্য উপার্জ্জন স্থল,
কি নিয়মে বণিকে শাসন করি?"

সভাসদ্— "মহারাজ, অধিক পীড়ন,
যার শ্রমে হয় উপার্জ্জন,

ক্ষুধায় কাতর তারা,
কোথা যাবে কোথা স্থল পাবে,—
প্রজাবৃদ্ধি রাজ্যে অতিশয়,
দিন দিন শ্রমের সময় বৃদ্ধি পায়,
উপার্জ্জন অল্প তত।
যদি কেহ করে অস্বীকার
বিদায় তখনি তায়,
অন্য শত শত জন করে আবেদন,
পাইতে তাহার স্থান।
নাহি কি মহারাজ,
যাহে সামঞ্জস্য হয় সবে?"

শ্রীবৎস— "অন্য কি নিয়ম,
নিয়োজিত রয়েছে ব্রাহ্মণ
ধর্ম্মকথা ঘরে ঘরে কয়,
দানে পুণ্য অতিশয়
জানাইছে জনে জনে।"

মন্ত্রী— "আছে বহু আবেদন পত্র আর,
শুন সমাচার
ধনবান নাহি করে অর্থ বিতরণ।"

শ্রীব— "পাঠের নাহি প্রয়োজন।"

প্রজারাও জানিল—"রাজা আমাদের কোন কথা শুনেনা—না খেতে পেয়ে সব মারা গেল!" বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল, শান্তির বিরোধী শনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল "ধানের গোলা লুট কর্, ঘর জ্বালিয়ে দে, বড়লোকের সর্ব্বনাশ কর্"। রাজার কাছে সংবাদ আসিল

"কোটালের কাটিয়াছে শির,
ঝুলিয়াছে উচ্চ তরুপরে।"

এবং ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহীরা (Jacobins) Bastille (দুর্গের) মোচন ও অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে—

"কারাগার করেছে মোচন
দুরাচারগণ,
ক্ষিপ্তপ্রায় যারে তারে বধে প্রাণে,
বলাৎকার, বালক বিনাশ—
ধনীর নাহিক ত্রাণ।"

ফরাসী-বিপ্লবের সমস্ত অবস্থা উপরোক্ত কয়পংক্তিতে বর্ণিত দেখিতে পাই, এবং অনুতপ্ত রাজা পরে বুঝেন—

"অতি যাতনায়, পেটের জ্বালায়,
উন্মত্ত হয়েছে প্রজা ;"

বিদ্রোহের অবস্থাও তাঁহার কথায়ই ব্যক্ত—

"শোন বিকট বিদ্রোহী-নাদ,
সৈন্য পরাজিত,
সৈন্যাধ্যক্ষ শত্রু-করগত ;
... ...
দুরন্ত বিদ্রোহীগণে,
বৃদ্ধ নারী শিশু নাহি মানে,
যুবতীর করে ধর্ম্মনাশ।"

প্রজার সুখদুঃখে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যে ফরাসীরাজ দম্পতীর (Louis XVI) যে দুর্দ্দশা হয়, দরিদ্রের দীনতা অবশেষে বুঝিতে পারিয়া শ্রীবৎস রাজারও নবচৈতন্যে নূতন জন্মই হয়। এই দারিদ্র্য-দীনতার শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হইলে লক্ষ্মী (অর্থ) কুফল আনিতে পারে না। শনি-লক্ষ্মীর বিবাদের অন্তরালে এই রূপকাবিষ্কারও মহাকবির নূতন সৃষ্টি। লক্ষ্মী শনিকে বলেন "শিক্ষা অন্তে তব অধিকার।"

মহাভারত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া গিরিশচন্দ্র অভিমন্যুবধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, ধ্রুবচরিত্র, নলদময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা, জনা, পাণ্ডব-গৌরব ও তপোবল প্রভৃতি বহু নাটক প্রণয়ন করেন। প্রতি নাটক বিশ্লেষণ করিলেই প্রতিভার অপূর্ব্ব স্ফূরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত নাটকের বিস্তারিত সমালোচনা এখানে সম্ভবপর নয়, পুস্তকের আয়তন-

বুদ্ধিরও বিশেষ আশঙ্কা; আমরা তাই এই স্থানে দুই একটী চরিত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

জনা—জনার মাতৃত্ব ও বিদূষকের বিশ্বাস নাটকীয় রসের অন্তরালে কিরূপে অদ্ভুতভাবে বিকশিত আমরা তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। প্রবীরের মাতৃভক্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাতৃপদধূলিতে প্রবীরের হৃদয়ে মহাশক্তি উদ্দীপিত হয় এবং সেই শক্তিতে সে অজেয়; তাই সে বলিতে পারে—

> "ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
> তারে নাহি ডরি
> মাতৃনাম কবচ আমার।"

নায়িকা প্রলুব্ধ হইবার পরও তাহার সহিত যখন কুরুক্ষেত্রজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় তখনও শ্রীকৃষ্ণের ভয়, যেন জনা সম্মুখে আসিয়া না পড়ে, তাহা হইলে অর্জ্জুনের রক্ষার আর উপায় নাই—কেননা—

> "মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর
> শিববল ফিরিবে আবার।"

মাতৃ-আশীর্ব্বাদের শক্তি কত বড়, গিরিশচন্দ্র স্বয়ং দীননাথ শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়াই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

"পাণ্ডবগৌরবের" **ভীম** কবিলেখনীতে কেবল বিচিত্র আকার ধারণ করে নাই, ভীম সম্বন্ধে জাতির সংস্কারও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পাণ্ডব-গৌরবের ভীম কেবল বীর নয়, সূক্ষ্মবুদ্ধি, ভক্ত এবং কোমলহৃদয়। কুলরীতি অনুসারে ভীমই সুভদ্রার অনুরোধ রক্ষা করিয়া দণ্ডীকে আশ্রয় দেয়, ভীমই আবার অর্জ্জুন এবং যুধিষ্ঠিরকেও ধর্ম্মরক্ষার জন্য (আশ্রিতে রক্ষা) কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উপদেশ দেয়। ভীমই বংশরক্ষার জন্য কৃষ্ণের সহিত দ্বৈরথ সমর প্রার্থনা করে।

নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরায় দেখিতে পাই কুরুক্ষেত্র সমরের আয়োজন হইতেছে, ভীমের আনন্দ শীঘ্রই কৌরব-কুল নির্ম্মূল হইবে, আনন্দে সে দ্রৌপদীকে বলিতেছে——

"দুঃশাসন-হৃদয় বিদারি লো সুন্দরি
বেণী তব করিব বন্ধন।"

কিসে তাহার এত সাহস? শ্রীকৃষ্ণের ভরসায়। শ্রীহরি অর্জ্জুনের রথের সারথি হইবেন। আর সে জানে——

"যেই লয় কৃষ্ণের আশ্রয়
তার কোথা ভয়?"

কিন্তু সুভদ্রা খবর দিলেন দণ্ডীকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও দণ্ডীর বিরোধী, আর তাঁহার ভয়ে বিধি, পুরন্দর, বরুণ, যক্ষরক্ষ, দানব গন্ধর্ব্ব কেহই দণ্ডীকে আশ্রয় দেন নাই। ভীম কৃষ্ণের সহিত বিরোধ জানিয়াও আনন্দিত চিত্তে সুভদ্রার কার্য্য অনুমোদন করিলেন। অতঃপর অর্জ্জুনও আসিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ভীমের কার্য্যে প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণ-বিরোধে সন্তপ্ত হইলেন——

"ভাবী বীর, নিষ্কণ্টক হ'ল দুর্য্যোধন!"

এইখানেই অর্জ্জুন ও ভীমের পার্থক্য দেখা যায়। ভক্ত অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সন্দিগ্ধ হইলেন কিন্তু ভীমের বিশ্বাস দৃঢ়, তিনি জানেন—

"শ্রীহরি ধর্ম্মের সখা,
স্মরি তাঁরে জিনিব তাঁহারে"

এই কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধ, কিন্তু ধর্ম্মের আশ্রয় করায় কৃষ্ণই তাঁহাদের সহায় হইবেন। কুন্তীকেও তিনি তাই বলিতেছেন——

"দণ্ডীরে অভয় দিছি তাঁর প্রীতি হেতু।"

এই বিশ্বাস ও ভক্তিতেই—যে শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বড়—ভীম এত বলীয়ান, আর এই বিশ্বাসেই ভীমের গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য

"শঙ্করাচার্য্য" ঠিক পুরাণমূলক নাটক নয়, ইহাকে দার্শনিক-নাট্য বলা যাইতে পারে। বেদান্তধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব এই নাটকের

অন্তরালে সন্নিবিষ্ট। শঙ্কর-দিগ্বিজয়, শঙ্কর-দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ অবলম্বনে এই নাটক লিখিত, কিন্তু গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যে **মূর্ত্তিমান বেদান্ত** দর্শন করেন, এই নাটক সেই পুণ্যদৃষ্টি ও অনুভূতির শুভফল। অতএব আমরা বিভিন্নগ্রন্থের সহিত ইহার ঐক্যানৈক্য না দেখাইয়া তিনি যে চলিত ভাষায় সহজবোধ্যভাবে বেদান্ত-দর্শন প্রচার করিয়াছেন, সংক্ষেপে আমরা সেই আলোচনাই করিব। সকলেই জানেন, শঙ্কর নীরস জ্ঞান প্রচার করেন, কিন্তু সেই কঠোর বেদান্তই গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব তুলিকায় সরস হইয়া উঠিয়াছে—শুষ্কজ্ঞান ভক্তিরসে সঞ্জীবিত হইয়া অমৃত বিতরণ করিতেছে।

প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন করেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, উচ্চ, নীচ, হিন্দু, অস্পৃশ্য ভুলিয়া যাই তবে বেদান্তের সারতত্ত্বলাভ হয়। আমরা "রামকৃষ্ণ" অধ্যায়ে বলিয়াছি যে পরমহংসদেব সম্পূর্ণ অভিমান-বর্জ্জিত ছিলেন। তিনি স্বহস্তে আবর্জ্জনা-স্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশ দ্বারা উহা মুছিয়া দিতেন। অভিমানত্যাগ ও বিদ্বেষ বর্জ্জনই প্রকৃত বৈদান্তিকের লক্ষ্য। এইভাবটী অতি প্রাঞ্জলভাবে গিরিশচন্দ্র একটী ছোট ঘটনায় এই নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 'শঙ্করবিজয়'াদি গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও এমন সহজভাবে ফুটাইবার জন্য গিরিশ যে ভাষা ও ভাব প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শঙ্কর বারাণসীর মণি-কর্ণিকা ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছেন। সহসা সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেব বেদরূপী কুক্কুর চারিটীসহ প্রবেশ করিয়া স্নানে বিঘ্ন জন্মাইলেন। শঙ্কর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, অস্পৃশ্য বলিয়া চণ্ডালকে সরিয়া যাইতে বলিলেন।

চণ্ডাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আরে কেমন ধারা বাৎ বলে রে? হাঁরে কেলো, তোর জাঁতের কথা জানেনা, সন্ন্যাসী হয়েছে! কে কাকে কোথায় সরতে বল্‌ছে রে? হাঁ কেলো, হাঁরে ধলো, অন্নময় কোষ ছেড়ে কোথায় যাবে রে? ওরে চৈতন্যকে জুদা করে রে! সৎচিৎ অখণ্ড আনন্দ রূপটা চেনে না, অজুদাকে জুদা করতে চায়! চৈতন্যকে ফারাক্ করবে! এ কেমন মানুষটা রে? এর আক্কেলটা ত দেখিনা!"

শঙ্কর। (স্বগত) "কে এ চণ্ডাল? এ যে বেদ-নির্ণীত বাক্য প্রয়োগ কচ্ছে! চণ্ডালের মুখে একি বার্ত্তা! সত্য—অসঙ্গ, সৎ, অদ্বিতীয় সুখরূপ ব্রহ্মবস্তুর ত ভেদ নাই!"

চণ্ডাল। "আরে থোড়া থোড়া আক্কেল বুঝি আস্‌ছে রে কেলো! আরে ধলো, তোর আঁতের বাতটা সমজ করিয়ে দে! বলতো—গঙ্গাজীতে সূর্য্যি আর হাঁড়িয়ার সরাপ যে সূর্য্যি চমকে, একি জুদা সূর্য্যি? এ বাতটা বুঝেনা! বুঝে না, সোনার কলসীর বিচে আর কাঁজীর হাঁড়ির বিচে আকাশটা জুদা জুদা বলুচে! ও তো ফারাক্ দেখে—এক দেখেনা। ও কেমন সন্ন্যাসী রে?"

স্ত্রীগণ—"আরে কে বটেরে—কে বটে?"

চণ্ডাল—"কি অভিমান রাখে রে! এ চণ্ডাল—এ সন্ন্যাসী, এ কি বলে রে? আঁধারে এককে নানান্ দেখে, শুক্তিকে রূপা দেখে, দড়িকে সাপ দেখে—এক জানেনা, জুদা জুদা জানে।"

শঙ্করের চৈতন্য হইল, বুঝিতে পারিলেন সন্ন্যাসী ও চণ্ডালে কোন পার্থক্য নাই, চৈতন্য এক। এক ব্রহ্মই সকল ঘটে অধিষ্ঠান করেন। চণ্ডালের দুইটী কথাতেই বেদান্তধর্ম্মের সারতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল, তিনি বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ চিনিলেন। দেবদেবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বুঝিলেন। ভক্তি-গদ্‌গদভাবে স্তব করিতে লাগিলেন।

এই স্তবে খণ্ডনীয় ও প্রতিপাদ্য ভিন্ন ভিন্ন বাদ—যথা দ্বৈতবাদ ঐশ্বর্য্যবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—অবতারবাদ, অংশবাদ, সবই যে এক ব্রহ্মবাদে নিমগ্ন হইতে পারে। এই বিষয়ে স্বামী সারদানন্দের "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" হইতে একটী উদাহরণ দিয়া আরও বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

"শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজদাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আমাকে কি ভাবে দেখ বা ভাবনা ও পূজা কর?' হনুমান তদুত্তরে বলেন—'হে রাম, যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি, তখন আমি এই দেহটা এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি সেব্য, আমি সেবক—তুমি পূজ্য, আমি পূজক; যখন আমি মন, বুদ্ধি ও আত্মাবিশিষ্ট,

জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ (বিশিষ্টাদ্বৈত) ; আর যখন আমি উপাধিমাত্র রহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি তুমিও যাহা আমিও তাহা—তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই।'—(অদ্বৈতবাদ)।

এই তিনটী ভাব উপরোক্ত শঙ্করাচার্য্য-স্তবে উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত—

"নমো নমঃ চরণে তোমার,
দেহজ্ঞানে আমি তব দাস,
অংশ জীব জ্ঞানে,
আত্মজ্ঞানে অভেদ, চৈতন্যে সংমিলিত।
দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে তব দরশনে।"

২য় অঙ্ক ১ গ।

দর্শনের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন দর্শনের (সাঙ্খ্য, ন্যায় প্রভৃতি) উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও "শঙ্করাচার্য্যে" বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। শঙ্করের প্রিয় শিষ্য সনন্দন যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "প্রভু, তর্কে কি মীমাংসা সম্ভব? দর্শনবিরোধী দর্শনে সন্দেহ কিরূপে যাইবে? ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে অর্জ্জন হইবে? সত্যমূর্ত্তি কিরূপে প্রকাশ হইবে?" গিরিশ শঙ্করের মুখে যে উত্তর প্রকাশ করেন, বেদান্তদর্শন তাহাতে স্বল্পায়াসে বোধগম্য হয়।

শঙ্কর—"বৎস, স্থির চিত্তে করহ শ্রবণ,
তর্ক যুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত ;
তর্কবুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন ;
শুন বৎস,
যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানবকল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।

বেদকর্ম্ম বর্জ্জিত কুতর্করত জন—
নিরাশকারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন! ৩য় অঙ্ক, ৪গ।

"তর্কবুদ্ধিনাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন";—তাই কুতর্ক নাশের জন্য দর্শনের প্রয়োজন; তবে দর্শনে সত্যমূর্ত্তি দর্শন হয় না, সত্যপ্রকাশ নির্ম্মল হৃদয়েই হইয়া থাকে—এরূপ সহজতত্ত্ব এপর্য্যন্ত আমরা শুনি নাই।

অদ্বৈত ভাব।

সনন্দনের প্রশ্নের উত্তরে অতঃপর শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতপন্থা সম্বন্ধে বুঝাইতেছেন—

শঙ্কর—"বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহাবাক্যত্রয়ে,—
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য সপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।
এই মহাসত্যের আভাস
যে মুহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।
'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সংশয়াঃ'
হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায়।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক প্রভাবে
আলোকিত হয় হৃদিস্থল।
তর্কযুক্তি দার্শনিক মীমাংসা সকল
স্থান নাহি পায়,
এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান ক্ষয়'

সনন্দনের ন্যায় ভক্ত এবং পণ্ডিতও এই তত্ত্ব বুঝিলেন না। তিনি আমি প্রভেদ ভাবেই দ্বৈত; অদ্বৈতভাব—একজ্ঞান—কিরূপে জন্মিবে? এইবার শঙ্করদেব এমন প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইলেন যে বালকেরও অদ্বৈতপন্থা নিরূপণে কোন সন্দেহ থাকে না। গিরিশ শঙ্করের মুখে বলিতেছেন—

"ধীরভাবে কর বৎস মন সন্নিবেশ,
আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার?
পুত্র পরিবার—প্রিয়বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় সম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয়জ্ঞানে একজ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।
এই প্রিয়জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্!
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোহং-ভাব অহং বর্জ্জনে!
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়,
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং-ক্ষয়ে।" ৩য় অঙ্ক, ৪গ।

এই ক্ষুদ্র অহং ক্ষয়—আত্মজ্ঞান—যে জ্ঞানে মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লোপ হয়—তাহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞান। ইহা সাধনাসাপেক্ষ। আর সাধনার উদ্দেশ্য নিবৃত্তিলাভ। তবে কার্য্য করি কেন? কর্ম্মের লোপই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে কর্ম্মে কি প্রয়োজন?

শঙ্কর উত্তর করেন—

দেহধারিমাত্রই মায়ার অধীন। কার্য্য দুইপ্রকার, সৎ ও অসৎ। অসৎকার্য্যে জ্ঞান আবরিত থাকে, আর সদনুষ্ঠানে কার্য্যক্ষয় হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বিদ্যাদান—কেননা বিদ্যাবলে অবিদ্যার নাশ, কার্য্যক্ষয় হয়। অবিদ্যায় ঐশ্বর্য্য, ভোগ, আর বিদ্যায় শান্তি, আনন্দ। এই বিদ্যামায়ায়

অবিদ্যামায়ার নাশ হয়—কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। তাই মহামায়া গাহিতেছেন—

"সোণায় লোহায় ঘ'সে ঘ'সে
তবে লোহার শেকল খসে।"

সোণালোহায় ঘসাঘসি হইলে, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যামায়ার বিরোধে অবিদ্যার নাশ হয়। কিন্তু—আমরা যে ইহা "হার ব'লে পরেছি গলে!"

তবে—

"লোহার শেকল মনে হ'লে,
তখন চায় সে শেকল খোলে।"

কিন্তু কাহার তাহা মনে হইবে? চক্ষুষ্মানের। তাই মহামায়া বলেন—

"চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ না পেলে, না।"

কিন্তু সোণার শিকল ত থাকিয়া গেল, তাহাও তো বন্ধন। প্রকৃত বৈদান্তিক সোণার শিকলও দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহেন। কেননা—

"স্বর্ণ লৌহ শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি
বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ
উভয়ই বন্ধন।"

প্রকৃত জ্ঞানী বিদ্যা ও অবিদ্যা—উভয় মায়ারই অতীত। তাহার নিকট উভয়ই শৃঙ্খল। তাই বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হইলে জীবের চৈতন্য লাভ হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে এই মায়াই একমাত্র অন্তরায়। ইহাই অহঙ্কার বা স্বপ্ন——

"কল্পব্যাপী সসীম ধরায়
চক্রাকারে মায়া প্রবাহিতা,
বাঁধে কত কার্য্য কারণের শ্রেণী,
গঠে আকাশে প্রস্তর;
'আমি' অহঙ্কার ক্ষুদ্র কীটের ভিতর,
প্রহেলিকা অনন্তের সসীম আকার গড়ে।

এই ঘোর প্রহেলিকা মাঝে
আত্মতত্ত্ব জীব নাহি হেরে ;
সূর্য্য যথা কুজ্ঝটিকাবৃত,
মায়া ঘোরে চৈতন্য ছাদিত।"

যেমন মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন রাখে, মেঘ কাটিলে সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ মায়া বিলুপ্ত হইলে চৈতন্যেরও বিকাশ হয়। তিনি আমি এক—

"মেঘাচ্ছন্ন হেরি দিবাকর,
প্রভাহীন রবিজ্ঞান করে মূঢ়জন
সেইরূপ চিৎবস্তু মায়া আবরণে
বদ্ধ জ্ঞান করে আপনায়,
সেই নিত্য চিৎরূপ স্বরূপ আমার"

এখন এই মায়া যায় কিরূপে ?

মায়াকে চিনিলেই মায়া সারিয়া যায়, কিন্তু লোক যে চিনিয়াও চেনে না। তাই মহামায়া গাহিতেছেন——

"যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপনি থাকে না।
সবাই জানে, জেনে-শুনে মনে রাখে না ॥
যে আমায় জানতে পারে, তার কাছে থাকি স'রে,
এই ধরে ধরে ধ'র্‌তে নারে, দেখে দেখে না।
ভালবাসি খেল্‌তে আসি, খেলার ছলে কান্না-হাসি
কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেখে না ॥"

২য় অঙ্ক, ২ গ।

এই—অবিদ্যা-বিনাশ, মায়ার বিলোপ, আত্মার প্রকাশ—ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মদরশনই বেদান্ত দর্শন।

"শঙ্করাচার্য্যে" গিরিশ সহজ ভাষায় তাহাই প্রচার করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসৃষ্টি কেবল কতকগুলি রঙ্গপ্রিয় লোকের মনোরঞ্জনের জন্য নহে। গিরিশ তাঁহার জীবনের মহাব্রত—তাঁহার আত্মার মর্ম্মবাণী নাট্যশিল্পে সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গিরিশের

মহাব্রত—ভারতেরই যুগযুগান্তরের এক সেই শাশ্বত ব্রত। গিরিশের ব্রতই ছিল মুখ্য,—জনমনোরঞ্জন ছিল গৌণ। দেশের লোককে 'চিরকল্যাণময় পরম সত্যটি শুনাইতেও কিছু প্রলোভনের প্রয়োজন হয়। তাই নাট্যের বহু ছলা কলা তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। গিরিশের এক একখানি নাটকে এক একটী মর্ম্মবাণী আছে—যাহা ভারতীয় সাধনার এক একটী অভিব্যক্তি। তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এক একখানি নাট্য রচিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক ভারতের পরাতত্ত্বের বাণী—যুগাবতার রামকৃষ্ণের প্রভাবের দ্বারা পবিত্রতর ও মহত্তর হইয়া গিরিশচন্দ্রের শঙ্করাচার্য্যে ফুটিয়াছে। এ বাণী যে অশাশ্বত ক্ষণিক সুখমোহের শিরে বজ্রসম—তাই ভোগাসক্ত অবিদ্যার মোহে অন্ধ মানব তাহা শুনিতে চায় না। বলিতে গেলে কাণে আঙ্গুল দেয়। তাই গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের রঙ্গপ্রলোভনে আকর্ষণ করিয়া সেই মহাবাণী শ্রুতিরঞ্জন ও রসস্বাদু করিয়া শুনাইয়াছেন।

"তপোবল"

তপোবল মহাকবির শেষ দান। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তপোবল প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিয়া যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, বাল্মীকির রামায়ণে তাহা বর্ণিত আছে। শবলাপ্রভাবে বশিষ্ঠের অতিথি সৎকার বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ, পরাজিত রাজার ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জনের জন্য তপস্যা, বিশ্বামিত্রের শক্তিতে গুরুঅভিশপ্ত ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ, অম্বরীষ যজ্ঞে শুনঃসেকের স্তবারাধনা, মেনকা ও রম্ভার ছলনা, প্রায়োবেশন ও মৃণালদান এবং অবশেষে বশিষ্ঠসহ সম্প্রীতিসংস্থাপন ও ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই রামায়ণে ও অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত আছে। গিরিশচন্দ্র উপরিউক্ত ঘটনাবলীর সুকুশল সমাবেশ ও সংযোজনায়, অপরাপর নূতন ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টি-চাতুর্য্যে এবং অভিনব ও সময়োপযোগী পরিকল্পনায় ইহাকে সম্পূর্ণ অভিনব যুগোপযোগী নাটকে পরিণত করিয়াছেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রধানতঃ নাটকের সৃষ্টি,

পুষ্টি ও রসের অবতারণা। উভয় চরিত্রই অতি বিরাট ও আদর্শ স্থানীয়। একদিকে বিশ্বামিত্র বিরাট মহৎ সঙ্কল্প বা উচ্চলক্ষ্যের জন্য প্রচুর অধ্যবসায় ও তপশ্চরণে নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, কামতাড়না, ক্রোধ, প্রতিহিংসা সময়ে সময়ে মোহাচ্ছন্ন করিলেও আবার সমস্ত মায়াজাল বিপুলশক্তিতে ছিন্ন করিয়া আদর্শের পথে ছুটিয়াছেন, অন্যদিকে আত্মত্যাগী, ধীর, অটলমেরুর ন্যায় অচঞ্চল ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। সত্ত্ব ও রজের অপূর্ব্ব সংঘর্ষ, শক্তি ও তিতিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রবৃত্তির উপরে আত্মিক শক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব। বিশ্বামিত্র অদম্যসাধনা, অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগপ্রভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বশিষ্ঠের সম্মুখীন হইয়াছেন—আর বশিষ্ঠ পূর্ণব্রহ্মাদর্শের মানদণ্ড ধরিয়াছেন, কিছুতেই, আত্মজয় না করিলে, তাহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিবেন না। একজন আপনার শক্তিতে অগ্রসর হইয়াছেন, আর একজন পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ধীর, স্থির, হিমাদ্রির ন্যায় অটল, সহিষ্ণু—উভয়েই উচ্চ, এবং উভয়েরই বল, অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু একজনের তপোশক্তি দেবারাধনায় অর্জ্জিত হইলেও সম্পূর্ণ রজোগুণ-বর্জ্জিত হয় নাই, আর একজনের ব্রহ্মবল সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণাশ্রিত। এই দুই চরিত্রের সংঘর্ষ নাটকখানিকে সর্ব্বযুগোপযোগী এবং অপূর্ব্ব করিয়াছে।

আজ এই সমাজ বিপ্লবের দিনে অনেকেই ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন কেবল যজ্ঞসূত্রধারী বলিয়াই হীনবৃত্তি কুকার্য্যরত ব্রাহ্মণসন্তানের নিকট কেন অবনত হইব? আবার জাতি-ভেদের বহুদোষ থাকিলেও উহা একদিনে সমাজ-দেহের অভ্যন্তর হইতে বিদূরিত হওয়া সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্র বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ-চরিত্রে এই সামাজিক প্রশ্নের দ্বন্দ্বসমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন ব্রাহ্মণত্বের সর্ব্বপ্রধান গুণ ক্ষমা। কেবল ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, ব্রাহ্মণপুত্র গৌতমও চণ্ডাল হইয়াছিল, তাহার কৃতঘ্নতার জন্য শৃগাল কুক্কুর তাহার মাংস ভক্ষণ করে নাই। **আত্মা সকলেরই সমান** যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে, 'সেই-ই ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-প্রভেদ—কার্য্যে নচেৎ ব্রাহ্মণের

ঘরে "জন্মে ছু'গাছা সুতো গলায় দিয়ে, 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ' ক'রলে কি ব্রাহ্মণ হয়?" ১ম অঙ্ক, ৩ গ।

"হইলে আচার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল
সদাচারী শবর—ব্রাহ্মণ" ২য় অঙ্ক, ৫ গ।

ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণে তবে কি কোন ফল নাই? তিনি বলেন "ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে তপস্যা শিক্ষা হয়, এই ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিলে গৌরব"। যে সকল সংস্কার ব্রাহ্মণত্ব লাভের সোপান—সম, দম, অহিংসা, অক্রোধ তিতিক্ষা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদি—পিতা এবং পিতৃবংশের আদর্শে শৈশব হইতে তাহা কতকটা অর্জ্জিত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণের মাহাত্ম্য—

"জন্ম যদি ব্রাহ্মণের ঘরে,
বাল্যাবধি সুদীক্ষিত হয় নিষ্ঠাচারে
এই মাত্র বিপ্রগৃহে জনম-গৌরব।"

৫ম অঙ্ক, ২ গ।

ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম প্রভাব এই মাত্র। যেমন স্বার্থত্যাগী, সত্যবাদী, স্বদেশানুরাগী, পরহিতসাধনরত পিতার পুত্রকন্যাগণে গৃহশিক্ষার প্রভাব, ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণেরও তাহাই ফল বা গৌরব। জন্মগত সংস্কারের মূল্য এইমাত্র! তবে অন্য সাধারণ বংশে জন্মিলে কি তাহার ব্রাহ্মণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? সাধনা ও নিষ্ঠাবলে নিশ্চয়ই সম্ভব, শুধু গ্রন্থপাঠে বা বাক্যে নয়। ব্রাহ্মণের গুণ ও কার্য্য সম্বন্ধে বশিষ্ঠ পরাশরকে বলিতেছেন——

"বৎস, তুমি শিক্ষা কর ব্রাহ্মণের জীবন কি কঠোরতাপূর্ণ! অন্যান্য বর্ণ, ব্রাহ্মণের ঈর্ষা করে, তারা জানেনা যে নিরবচ্ছিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রাহ্মণের গমনাগমন। বিরামহীন কার্য্য, আত্মত্যাগ-কার্য্য, পরহিতসাধন-কার্য্য, সে কার্য্যে কায়মনোপ্রাণ বিসর্জ্জন, ব্রাহ্মণের আজীবন ব্রত।"

এই সমস্ত গুণ অন্য কোন বর্ণের যে কোন ব্যক্তিতে বিদ্যমান সে কি ব্রাহ্মণ নয়? নিশ্চয়ই সে ব্রাহ্মণ, তাই মহাকবি বিশ্বামিত্রের মুখে বলিতেছেন—

"আকাঙ্খা আমার——
নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চপদ তঁপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে ;
প্রভাবে যাহার,
ঘুচে নীচ সংস্কার।
মলিনত্ব হয় বিদূরিত,
জন্মে আত্মবোধ,
ঘুচে তায় জনম-মরণ ভ্রম ;
উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে,
তপোবলে করে আরোহণ।
তপ অতুল সম্পদ,
দানে সেই উচ্চপদ,
যেই পদ আকাঙ্খা যাহার।
সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার,
পায় সর্ব্ব অধিকার,
হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।" ৫ম অ, ৬গ।

অন্যত্রও দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র প্রচার করিতেছেন—

"বর্ণান্তরে জন্মি, যদি উচ্চচেতা জন
করে আকিঞ্চন ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জ্জন,
তপের প্রভাবে তাহা লভিবে নিশ্চয়।" ৫ম অ, ২গ।

এখন আমরা বিশ্বামিত্রের অধ্যবসায় ও সাধনা আর বশিষ্ঠের ক্ষমা ও অহিংসার বল সম্বন্ধে এই দুই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করিব।

বশিষ্ঠ-চরিত্র ঃ

১ কল্মাষপাদ উপাখ্যান—রামায়ণে সংক্ষেপে বর্ণিত হইলেও,

বশিষ্ঠের ক্ষমাশক্তির বিকাশে গিরিশচন্দ্রের মৌলিকতা ও নূতন ঘটনার সমাবেশে বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। রাজা পুষ্পচয়ন-নিরত বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তিকে অহঙ্কারবশতঃ কশাদণ্ডদ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। একে পিতৃনিন্দা, তদুপরি এই প্রকার দুর্ব্ব্যবহার, শক্তি "রাক্ষস হও" বলিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা বিশ্বামিত্রের স্মরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্রের শতপুত্র বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে কামধেনু-নন্দিনী-প্রসূত যোধগণের দ্বারা নিহত হইয়াছে। তপস্যাবলেও রাজর্ষির প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হয় নাই। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে শতহস্তীর বল প্রদান করিলেন। এইবার রাক্ষসদেহী রাজা বশিষ্ঠের শতপুত্র ভক্ষণে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া শক্তির বিধবাপত্নী অদৃশ্যন্তীকে গ্রাস করিতে মুখব্যাদান করিয়াছেন। বশিষ্ঠ তাহাকে ইচ্ছামত বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাশীল ঋষি কমণ্ডলু হইতে জল নিক্ষেপ করিয়া তাহার রাক্ষসত্ব মোচন করেন। কল্মাষ আসিয়া বিশ্বামিত্রকে সেই কথা বলিয়া যান। এই নবসৃষ্ট ঘটনায় বশিষ্ঠের অদ্ভুত ক্ষমা ও অহিংসার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিশ্বামিত্রও বুঝিতে পারেন—"বশিষ্ঠই ধন্য! তার তুলনায় আমি অতি হীন! আমার তপস্যায় ধিক্! যোগৈশ্বর্য্যে ধিক্!"

৪র্থ অ, ২গ।

বশিষ্ঠ-মারণ যজ্ঞ—বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ক্রমে রাজর্ষিত্ব এমন কি মহর্ষিত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্বও লাভ করিয়াছেন এবং লোকশিক্ষার জন্য তপের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মা আদেশ দিলেন "তুমি বশিষ্ঠের নিকট গমন কর।" বশিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ, তিনি ব্রাহ্মণের লক্ষণ না দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বিশ্বামিত্র মনে করিলেন 'ঈর্ষাবশতঃই পূর্ব্বশত্রু আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেছে না'। তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-মারণযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে পুরোহিতপদে আহ্বান করিলেন। উদ্দেশ্য, বশিষ্ঠ নিজ সংহার-যজ্ঞে কখনও উপস্থিত হইবেন না, কাজেই ভীরু কপটাচারী ও প্রমাণিত হইবেন; উপস্থিত হইলেও শত্রুর আত্মনিপাতই হইবে। বশিষ্ঠ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কেননা তিনি মনে করেন "ক্ষণ-

ভঙ্গুর দেহবর্জ্জনে যদি তপস্যাচারী বিশ্বামিত্রের শিক্ষালাভ হয়, আমি শতবার দেহবর্জ্জনে প্রস্তুত।" বশিষ্ঠ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন, কাহারও প্রতিরোধ তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিরুৎসাহ উপেক্ষা করিয়া তখন তিনি—

"অগ্রসর আপন সংহারে
তৃণসম উপেক্ষা করিয়া প্রাণ"।

দ্বিতীয়বার আহুতি প্রদান করিলেন, বিশ্বামিত্র ভাবিলেন 'কি উন্মাদ!' বশিষ্ঠের কিন্তু——

"প্রফুল্ল বদন,
উদ্ভাসিত তেজোরাশি তায়,
হোমাগ্নি সদৃশ জ্যোতি বদনমণ্ডলে!"

তৃতীয় বার গ্রহণ করিয়াছেন, আহুতি প্রদানেই প্রাণবিয়োগ অবধারিত, কিন্তু তথাপি তিনি নির্ব্বিকারচিত্ত—

"অটল মেরুর সম নেহারি ব্রাহ্মণ
কি মহাপ্রভাবে হেন মহা আত্মত্যাগ!"

বশিষ্ঠের একাগ্রতা, প্রাণবিয়োগে সঙ্কল্প ও সত্যরক্ষায় অনুরাগ বিশ্বামিত্রের হৃদয় জয় করিল, তিনি বুঝিলেন——

"এ মাহাত্ম্য অভাব আমার,
হেন কার্য্যে নহি তো সক্ষম আমি!
জগদম্বে, বুঝিয়াছি কি ত্রুটী আমার,—
ক্ষমাহীন কঠোর হৃদয় মম!"

তিনি নিজ বধের জন্য আহুতি দিতে বলিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ তখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন—

"আমি পুরোহিত তব
আসি নাই অহিতসাধনে।"

বিশ্বামিত্র বারি নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞানল নির্ব্বাপিত করিলেন। বশিষ্ঠের এই ক্ষমায়ই বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারেন—

"যজ্ঞ-সূত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ,
অজ্ঞান অধম,
হয় নাই ধারণা আমার"।

নাটকের শেষ দৃশ্যে বর্ণিত এই বশিষ্ঠ-মারণ-যজ্ঞ সম্পূর্ণ গিরিশের নূতন সৃষ্টি। এইখানেই ক্ষমতা ও ক্ষমাশীলতার সংঘর্ষ এবং উভয় চরিত্রের চরম অভিব্যক্তি। আদর্শ সৃষ্টিনৈপুণ্য ও সার্ব্বজনীনতায় এই দৃশ্য অতুলনীয়। বশিষ্ঠের অহিংসা. ও ক্ষমায় রজোশক্তির উপর সাত্বিক শক্তির (Soul force) প্রভাব গিরিশচন্দ্রের "তপোবলে" যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত Soul force বা আত্মিক শক্তির প্রাধান্য স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমে যখন ক্রোধন-স্বভাব রাজা বিশ্বামিত্র শবলাকে আশ্রম হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার জন্য সেনাপতিকে আদেশ দেন, বশিষ্ঠের একটি কথায়ই ("মহারাজের জয় হোক্"), চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় পাই। একবারমাত্র তাঁহার আত্মবিস্মৃতি হইয়াছিল, আত্মরক্ষার্থ তাঁহার ব্রহ্মতেজ বিশ্বামিত্রে প্রয়োগজনিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সহধর্ম্মিণীর সংযুক্তিতে ক্রোধ সম্বরণ করেন এবং অতঃপর "আপনার পাপ কর্ম্মফল ভোগদ্বারা শান্তি করেন।"

বিশ্বামিত্র—

রামায়ণে বর্ণিত আছে শতপুত্র নিহত হইবার পরে বিশ্বামিত্র সহস্র বৎসর তপস্যাদ্বারা বহুবিধ অস্ত্রলাভ করিয়া পুনরায় বশিষ্ঠের সম্মুখীন হন। বশিষ্ঠ এবারও ব্রহ্মদণ্ডদ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করেন। বিশ্বামিত্র বুঝিলেন ব্রহ্মবলই বল। "তপোবল" নাটকে সৈন্য ও পুত্রনাশের পরে বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের একেবারে যুদ্ধ বাধিয়াছে, বশিষ্ঠ ব্রহ্মযষ্টিপ্রভাবে বিশ্বামিত্রকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অরুন্ধতীর সদুপদেশে তাঁহার চৈতন্যলাভ হয়; তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শবলার অধিকার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে উহা লইয়া যাইতে বলেন। বিশ্বামিত্র এই যুদ্ধে বুঝিয়াছিলেন—"কামধেনু বশিষ্ঠের শক্তিতে, নচেৎ কামধেনু ধেনুমাত্র।

ব্রহ্মশক্তিই শক্তি, শত ধিক্ ক্ষত্রিয় শক্তিতে!" তাই দান গ্রহণ উপেক্ষা করিয়া (যদিও পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট চাহিয়াছিলেন), আর রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া আশ্রম হইতেই তপস্যায় গমন করেন। যদি কথনও দিন্ পান, আবার তাঁহার সম্মুখীন হইবেন। এই কামধেনু ত্যাগ রামায়ণে উল্লেখ নাই। যাহার জন্য এত আয়োজন, তাঁহার শতপুত্র ভস্মীভূত, নিজেও সসৈন্যে পরাভূত, বিনা আয়াসে হাতে পাইয়াও উহা গ্রহণ না করিয়া পুরুষকারে লাভ করিবেন—এই দৃঢ়সঙ্কল্প বিশ্বামিত্রের তেজস্বিতা, চিত্তের দৃঢ়তা ও আত্মসম্মান-বোধ সূচিত করিতেছে।

সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র রাজর্ষিত্ব লাভ করিলেন। তিনি রাজর্ষি, আর বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি—অনেক পার্থক্য! কোন কোন সাধক যেমন অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া তাহা নিয়াই ভুলিয়া থাকে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও তপস্যায় প্রথমে যে শক্তি অর্জ্জন করেন, তাহা জড়শক্তি মাত্র। তাঁহার সৃষ্ট ফুলফল ও সপ্তর্ষি মণ্ডল—'জড়জ্ঞানে শক্তি-আরাধনা মাত্র'। গিরিশ বলেন——

"জড়শক্তি বিশ্বামিত্র ক'রেছে অর্জ্জন,
প্রকৃত সাধক যাহা না করে গ্রহণ;"

নবজ্যোতিষ্কমণ্ডল সৃষ্টির এই নূতন ব্যাখ্যা সাধক গিরিশই দিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনিও কিরূপে ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে এক সময়ে নানাবিধ উৎকট ব্যাধির উপশম করিতে পারিতেন।

শাপগ্রস্ত বিশ্বামিত্র যে ত্রিশঙ্কুর জন্য নূতন স্বর্গ-সৃষ্টি করেন, যদি তাহা জড়শক্তির প্রভাবই হয়, তবে বিশ্বামিত্রের পতন কেন হইল না? গিরিশচন্দ্র তাহারও কারণ দর্শাইয়াছেন। তিনি পরিকল্পনা করিয়াছেন —আশ্রিত-রক্ষণে শক্তি চালনায় পতন হয় না—কারণ পরহিত-ব্রত স্বার্থসিদ্ধি নয়। "শরণাগতে আশ্রয়দানই প্রধান তপস্যা"—গিরিশ ত্রিশঙ্কু-উদ্ধারে এই অভিনব সত্য সংযোজনা করিয়া জড়শক্তির সহিত নৈতিক শক্তির সামঞ্জস্য রাখিয়া বিশ্বামিত্রের উত্থানের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য রামায়ণ বা অন্য কোন পুরাণে "জড়শক্তি" বা "আশ্রিতরক্ষণ" প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই।

অতঃপরে বিশ্বামিত্র এই শক্তি লইয়াই ভুলিয়া রহিলেন না। রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়া তিনি আরও সঙ্কল্প করিলেন——

"মম সম তপে রত যে জন রহিবে,
ঋষিত্ব লভিবে,
ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্রহ্মা আসি করিবেন দান।"

এই ত পুরুষকার! মহৎ যাহার সঙ্কল্প, লক্ষ্য যাহার উচ্চ, উদ্দেশ্য যাহার লোকহিত, তাহার কার্য্যে কে বাধা জন্মাইতে পারে? স্বয়ং ভগবান নিজে আসিয়া তাহার কার্য্যের সফলতা দিয়া যান। কিন্তু পথে নানা বাধাবিঘ্ন। তাই বিশ্বামিত্র তপস্যাই করুন, এখনও প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও মন হইতে কাম উন্মূলিত হয় নাই; ক্রোধ, হৃদয় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে; অহঙ্কার ও যোগৈশ্বর্য্যে তিনি প্রতারিত হইতেছেন। গিরিশচন্দ্র পর পর সমস্ত ঘটনা বিশেষ সতর্কতা ও নৈপুণ্যের সহিত সংযোজনা করিয়াছেন। সমস্ত বাধাবিঘ্ন নাট্যকার জড়শক্তি-সাধক 'রাজর্ষি' বিশ্বামিত্রে আরোপিত করিয়াছেন—মহর্ষিতে করেন নাই। রামায়ণে অম্বরীষ-যজ্ঞ, তারপর মেনকার প্রলোভন, তৎপরে রম্ভার অভিশাপ সংযোজিত; আর গিরিশ প্রথমে কল্মাষপাদকে শক্তি প্রদান, তারপরে মেনকার প্রণয়, রম্ভার প্রতি ক্রোধ, পরে কল্মাষপাদের সহিত সাক্ষাৎ ও বশিষ্ঠের ঘটনার কথা শ্রবণ ও পরে অম্বরীষ-যজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সংযোজনায় ও সংঘটনায় যে সাধক-চরিত্রে ক্রমিক সোপানারোহণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। গিরিশ বলেন, বিশ্বামিত্র যে কল্মাষপাদকে শত হস্তীর বল প্রদান করেন ইহা তাহার পুত্রশোকজনিত প্রতিহিংসারই ফল। মেনকার প্রতি যে প্রণয়াকৃষ্ট হন এবং দশ বৎসর কামরিপুর দাসত্ব করেন, তাহা তাঁহার অহঙ্কারের ফল—"তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মেছিল, তিনি কামজয়ী মহাপুরুষ, কিন্তু দর্পহারী তো কারো দর্প রাখেন না! সেই জন্যই তাঁর পতন"। ক্রোধান্ধ হইয়া অবলা রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করেন। কিন্তু সাধননিরত বীরের পক্ষে এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন পথের কণ্টক মাত্র; দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি তাহা দূর করিতে সমর্থ হ'ন্।

এই সমস্ত মোহ দূর হয় অনুতাপ বা অনুশোচনায়। সেই অনুতাপ

আনিবার জন্ত গিরিশ কল্মাষপাদকে বিশ্বামিত্রের কাছে লইয়া আসিলেন। বিশ্বামিত্র রাজার মুখে বশিষ্ঠের ক্ষমার কথা শুনিলেন, বশিষ্ঠকে 'ধন্ত' 'ধন্ত' করিতে লাগিলেন, এবং দেহ, মন পবিত্র করিবার জন্য তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। কিন্তু অন্যায় কার্য্যের সংস্কার শীঘ্র যায় না—তাই নিদ্রাবস্থায় মেনকাকে পাশে দেখেন, রম্ভার কাতর মুখভাব চক্ষের উপরে ভাসিয়া উঠে এবং বশিষ্ঠের শত পুত্রনিধন-স্মৃতি অগ্নির ন্যায় মস্তিষ্কে জ্বলে। এই জ্বালা দূর হয় কার্য্যে। তাই ব্রহ্মণ্যদেব সদানন্দকে বলিতেছেন "তুমি ঐ ছেলেটার কাজে লাগিয়ে দাওনা। পাঁচটা কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে মন ফিরে যাবে"। অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে শুনঃশেফের উদ্ধারই এই কাজ। এই মহৎ কার্য্যসাধন করাইবার জন্যই এই যজ্ঞকাহিনী সর্ব্বশেষে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ এই কাজ পাইয়া বিশ্বামিত্র বলিতেছেন "বোধ হয় নারায়ণ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ উপস্থিত ক'রেছেন। কায়-মন-বাক্যে পরহিতসাধনই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। ছার ব্রহ্মর্ষিত্ব, পরহিত-সাধন ব্রতই শ্রেয়ঃ ব্রত! যে ব্যক্তি পরহিতে রত, তার মত উচ্চস্থানীয় আর কে আছে? আমি সেই উচ্চ ব্রত সাধন ক'র্‌বো, আমার ব্রহ্মষিত্ব-লাভের প্রয়োজন নাই"। বিবেকানন্দের এই মহদ্বাণী গিরিশ, নাটকের অন্তরালে অত্যন্ত মৌলিক ভাবে সংযোজিত করিয়া বিশ্বামিত্রকে সর্ব্বযুগোপযোগী কর্ম্মবীরে পরিণত করিয়াছেন।

রামায়ণে বর্ণিত আছে বিশ্বামিত্রের আদেশে শুনঃশেফ বাসবের উদ্দেশ্যে একটী স্তব পাঠ করে, আর ইন্দ্র ছাগশিশু ফিরাইয়া দেন। নাটকে নারায়ণের উদ্দেশ্যে স্তব পাঠেও যখন রাজার মন পরিবর্ত্তিত হয় না তখন বিশ্বামিত্র"যদি পশুর পরিবর্ত্তে বালক দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তবে এই বালকের পরিবর্ত্তে ঋষির মেদ দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ করুন"—বলিয়া যূপকাষ্ঠে মস্তক আরোপিত করিলেন। যখন বিশ্বামিত্রকেই বধ করার জন্য খড়্গ উত্তোলিত হইল, ব্রহ্মণ্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবরাজ সুনেত্রা দ্বারা, অপহৃত ছাগশিশু প্রেরণ করেন। এই সমস্ত ঘটনার সৃষ্টি ও সংযোগ নাটকে রসবৃদ্ধি করার জন্য। স্পর্শে রম্ভাকে উদ্ধার করার জন্য ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়া সুনেত্রাকে ছাগশিশু দিয়া যজ্ঞে উপস্থিত হইতে বলেন,

আর বিশ্বামিত্রের ও যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদানে তাঁহার আশ্রিতবাৎসল্য ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। এই আত্মত্যাগেই ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে মহর্ষিত্ব প্রদান করেন।

মহর্ষিত্ব লাভ হইতে ব্রহ্মর্ষিত্ব অর্জ্জন পর্য্যন্ত রামায়ণে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে—মেনকা ও রম্ভার উপাখ্যান, সহস্র বৎসর ব্রতানুষ্ঠানের পর অন্নগ্রহণেচ্ছা ও ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে অন্নদান প্রভৃতি। তাহার পর তপোনিরত বিশ্বামিত্র ঋষির ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অগ্নিতেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঐ তেজে বিশ্বসংসার সন্তাপিত হইল, তখন দেবতাগণ ব্রহ্মাকে আসিয়া বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং চতুর্ম্মুখ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন। কিন্তু গিরিশ এই সময়ে এক মৃণালদান ভিন্ন অপর কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি ব্যাপার জড়শক্তিসম্পন্ন রাজর্ষিতেই অধিক সম্ভবপর, অধিকতর সংযমী মহর্ষিতে নহে। মৃণালদান নূতন ঘটনায় সম্পূর্ণ মৌলিক।

বিশ্বামিত্র তপস্যারত, তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জলিত, সংসার যায় যায়, কিন্তু বিশ্বামিত্র দৃঢ়পণ, ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভহেতু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রায়োবেশনে বসিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ বলিয়া গেলেন 'আত্মহত্যা মহাপাপ'। মহর্ষি হিমালয় শৃঙ্গোপরি হ্রদে একটি কমল বিকশিত দেখিলেন, আজ ইহাই ভোজন করিয়া দৈহিক নিয়ম রক্ষা করিবেন। ভোজনে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্র উহা চাহিলেন। তনুত্যাগের সময়েও তাহাকে মৃণাল দান করিলেন। এ স্থানেও ত্যাগ অদ্ভুত হইলেও ব্রহ্মা তখনও তাহাকে ব্রহ্মর্ষিত্ব দিলেন না। গিরিশ এই দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন অপেক্ষা মনের মাৎসর্য্য-ত্যাগকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাই একটী নূতন আদর্শ উপস্থিত করিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া তখন ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্যতীত অপর বর চাহিতে বলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র প্রার্থনা করিলেন "তপস্যায় আমি যে যোগৈশ্বর্য্য লাভ ক'রেছি, সেই যোগৈশ্বর্য্য গ্রহণ ক'রে আমায় ঐশ্বর্য্যবিহীন করুন, আমি অভিমান-শূন্য হই, এই আমার একমাত্র বাসনা।"

হৃদয় বিশুদ্ধ হইল, অভিমানবর্জ্জনে ব্রহ্মা হৃষ্টমনে 'ব্রহ্মর্ষি' বলিয়া

তাহাকে সম্বোধন করিলেন। কিন্তু সংস্কার বা কর্ম্মক্ষেত্রের শিক্ষা ভিন্ন জ্ঞানলাভ কখনও ফলবতী হয় না। তাই বশিষ্ঠ-মারণ-যজ্ঞে বিশ্বামিত্রের শেষ পরীক্ষা হইল। এইখানেই তিনি বশিষ্ঠের সহিত পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন,—তপোবলেও তাঁহার ঘোরতম নাশ হয় নাই, তাহার হৃদয় ক্ষমাহীন কঠোর! ব্রহ্মর্ষিত্ব তুচ্ছ করিয়া অভিমান বর্জ্জন করিয়া শেষে বশিষ্ঠের পদতলে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন। এইরূপ উত্থান পতনে রাজর্ষি Materialistic বিশ্বামিত্র Spiritualist ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মবিদ-ক্ষমাশীল ঋষিতে পরিণত হন্।

সঙ্কল্পনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত ব্যক্তির আদর্শ বিশ্বামিত্র,—কি ধর্ম্মার্জ্জনে, কি জীবন-যুদ্ধে, কি জ্ঞানলাভে, কি স্বাধীনতার সংগ্রামে।

এই দেশ-ত্রাতা, জননেতা, রাষ্ট্রীয় সংস্কারক, জাতীয় গুরু বিশ্বামিত্রের একমাত্র পরাভব—বশিষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য—খ্রীষ্ট—ইত্যাদি অতিমানবের কাছে। এইখানে বিশ্বামিত্রের উপর কবি কালিদাস রায়ের একটি কবিতা তুলিয়া দিই—এই কবিতাটীতে মহাকবি গিরিশের বিশ্বামিত্র চরিত্রটি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত।

দেশে দেশে ব্রহ্ম ক্ষত্র বিশ্বহোত্রী বিশ্বামিত্র, তব জাগরণ
তব ঋক্-মন্ত্রে রথি সুপ্রতরা নদনদী বিজিত ভুবন,
জন্ম-বলে নহে তব, পুষ্করে দুষ্কর তপে ব্রহ্মপদ-লাভ,
রাষ্ট্র-জাতি নবনব যুগেযুগে গড়ে তব তপের প্রভাব।
তব যোগ-ভঙ্গফলে চতুঃষষ্টিকলা-শিশুজন্মে কালে কালে,
শিল্পি-শকুন্তেরা যারে বক্ষপুটে স্নেহসারে পক্ষছায়ে পালে।
প্রমূর্ত্ত পুরুষকার তোমার জৃম্ভ আজো অশিবে তাড়ায়,
তব রাজ-পরীক্ষার বহ্নিকুণ্ড জ্বলে শত মণিকর্ণিকায়।
অভিশপ্ত মুক্তি লভে যজ্ঞ-দ্রোহী মহাহবে পুড়ে দলে দলে,
দেশবৈরী সৃষ্টি-ত্রাস মাতৃহা-র দর্পনাশ তোমারি কৌশলে।
আজো গায়ত্রীর সহ অতিবলা বিদ্যা কহ তরুণ-শ্রবণে,
সত্যশিব-সুন্দরসতী-মিলনের প্রজাপতি রাজর্ষি আশ্রমে।

গিরিশ বিশ্বামিত্র চরিত্রকে যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা এক

হিসাবে অমর। এ বিশ্বামিত্র যুগে যুগে দেশে দেশে জন্ম লাভ করিয়া সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া গড়িতেছে; যুগে যুগে এ বিশ্বামিত্র অধ্যবসায়, সাধনা ও পুরুষকারের দ্বারা নিম্নস্তর হইতে আপনাকে উচ্চতর স্তরে আরোহিত করিতেছে; এবং এক একটি বিরাট জাতিকে গড়িতেছে—দেশকে ত্রাণ করিতেছে—নব নব সৃষ্টির দ্বারা মানবের সৃষ্টির সংস্কার করিতেছে। মহামানবের রজঃ শক্তির বিরাট প্রতীক হইতেছে—বিশ্বামিত্র।

তপশক্তি।

এই নাটকের তপোবল কবি আরও প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইতেছেন। যাহার প্রভাবে মানব এইরূপ দুরক্রমণীয় শক্তিলাভ করে তাহাই তপঃ। 'নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'। ইহাই তপ নাম অভিহিত মহাশক্তি পূজা। কিন্তু সংযম ব্যতীত তপস্যা কখনও সুসিদ্ধ হয় না, মন সর্ব্বদাই সুখ ও দুঃখের মধ্যে দোদোল্যমান থাকে—তাই ইন্দ্রিয়দমন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়—

"ইন্দ্রিয়াদি না হ'লে দমন
সুখ দুখ মাঝে দোলে মন
সংযম না হয় তায়।"

এই চঞ্চল মন স্থির করিবার জন্য প্রথমে বাহ্যিক নিয়মেরও প্রয়োজন—কেননা যেই মনে শীততাপ ঝঞ্ঝাবাত বিকার আনিতে পারে না, সেই মনের পক্ষেই স্বাভাবিক—ক্রমে কামক্রোধাদি রিপুর দ্বারা বিকৃত না হওয়া।

তরু সম কঠোর আচারে
হয় বৎস তপস্যার পথে অগ্রসর।

কিন্তু দেহে ও মনে কি এত ক্লেশ সহ্য হয়? গিরিশ বেদমাতার মুখে বলিতেছেন—

মনের প্রকৃতি, বৎস, অজ্ঞাত তোমার,
সেই হেতু হয় তব ডর।
ভ্রমবশে ভাবে মন আমি অতি ক্ষীণ,
সুখ-দুখ-শীত-তাপাধীন;

কিন্তু যবে হয় উদ্বোধন
আপনারে জানে যবে মন,
বুঝে—আমি মহাশক্তিমান।
সে শক্তি প্রভাবে
অসম্ভব সকলি সম্ভব।
মনের প্রভাবে—তরুর প্রকৃতি লভে দেহ।
শীত তাপে না হয় কাতর,
আত্মজ্ঞানে বহে নিরন্তর,
নারায়ণে প্রত্যক্ষ হৃদয়ে হেরে।

১ম অঙ্ক, ৬ গ।

"তপোবল" নাটকে কয়েকটি অধুনা পরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক বিষয়ও কৌশলে সংযোজিত হইয়াছে।

১। ফলপুষ্প সৃষ্টি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের প্রতি ক্রোধবশতঃ নানাবিধ নূতন বৃক্ষলতা ফল পুষ্প সৃষ্টি করেন। ক্ষুব্ধ মনে ইন্দ্র আসিয়া ব্রহ্মাকে হৃদয়ের বেদনা জানাইলেন——

সুমিষ্ট রসাল ফল, সুগন্ধি কুসুম
অগণন করেছে সৃজন
তুলনায় তব সৃষ্ট ফল পুষ্প আদি
নরগণ হীনজ্ঞান করিবে যাহায়।

গিরিশচন্দ্র এইখানে Theory of Evolution বুঝাইতেছেন। কত কত পণ্ডিত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়া দ্বারা জগতের হিতসাধনই করিতেছেন। স্যার জগদীশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পাশ্চাত্য জগৎও স্তম্ভিত। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Hybredes সেদিনও নূতন ফলপুষ্প সৃষ্টি করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহারা সৃষ্টি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই নব নব সৃষ্টি বিকাশ করেন। কিন্তু ইহা জড় বিজ্ঞান মাত্র, প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রম বিকাশের ফল। কে তাড়িতের অসাধারণ

বিকাশ জড়বিজ্ঞান সাধন করিয়াছে প্রাকৃতিক বজ্র ও বিদ্যুতের তুলনায় তাহা কত তুচ্ছ! ব্রহ্মা তাই বলিতেছেন——

বিষণ্ণ হয়োনা অকারণ,
আমা বিনে অন্যে আর
কার অধিকার করিতে সৃজন?
সৃষ্ট বস্তু আমার রয়েছে যে সকল
বিশ্বামিত্র সৃজিত ফুল ফল
যেন মাত্র তাহারি বিকাশ।
ক্রম বিকাশের ক্রম শক্তির নিয়ম
কলিযুগে রহস্য হেরিবে, বিজ্ঞান প্রভাবে
নব ফল পুষ্প কত মানব সৃজিবে
সে বিজ্ঞান জড়জ্ঞানে শক্তি আরাধনা।

২। নবস্বর্গ সৃজন।

জড়শক্তির পূর্ণবিকাশ "সপ্তর্ষিমণ্ডল" সৃষ্টিতে। এখন এই নক্ষত্ররাশি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বামিত্র ইহাও ত্রিশঙ্কুর জন্য সৃষ্টি করেন। এই স্বর্গসৃষ্টিতে ইন্দ্র আসিয়া ব্রহ্মাকে বলেন——

সুরপুরে সত্য সেই না পাইল স্থান,
কিন্তু শত গুণে বর্দ্ধিত সম্মান,
হইল নির্ম্মাণ নূতন ত্রিদিব তার হেতু।
সৃষ্টি হৈল সপ্তর্ষি মণ্ডল,
অখণ্ডের আরাধনা স্থান।
পরব্রহ্ম উপাসক ব্রহ্মবিদ্‌গণ,
তার স্বর্গে করিবে ভ্রমণ,
স্বর্গ হ'ল গৌরব-বিহীন!

গিরিশচন্দ্র এইখানে Aurora Borealis নামক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা ও এই নবস্বর্গকে ভোগসুখরত নরনারীর কাম্যস্থান এবং ব্রহ্মার

স্বর্গ অপেক্ষা ইহাকে অনেকাংশে নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Aurora Borealis or Aurora Polaris দৃশ্যটী উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে প্রকাশ পায়। নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকাপেক্ষাও উত্তর মেরু ও উত্তর নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের কতক অংশ এই উজ্জ্বলদৃশ্যে আলোকিত হয় এবং এই আলো-প্রভাবে উত্তরমেরুর প্রদেশসমূহ অর্দ্ধবৎসর-ব্যাপী নৈশ অন্ধকারেও বাসের অযোগ্য হয় না। এখন দেখা যাউক, এই সমস্ত স্থানের সহিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের কি ঘনিষ্ঠতা আছে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল (Great Bear) ও ধ্রুবতারা Pole-star—এতদুভয়ের পৃথিবী হইতে কৌণিক দূরত্ব (Angular Distance) প্রায় এক, অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর মেরুর পক্ষে ইহারা উভয়েই "এক সরল রেখায়"; তাই প্রায় সমদূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। এখন Aurora Boralis-এর যে সকল উদ্ভব-কারণ (theories) নির্দ্দেশ আছে তাহার মধ্যে একটি এই—পৃথিবী এবং ধ্রুবতারা উভয়েই এক একটী তাড়িতচুম্বক (Electro Magnet) এবং উভয়ের স্ব স্ব Pole (দিকের) আকর্ষণে পৃথিবীর কাছে ধ্রুবতারাটী নিশ্চল বোধ হয় এবং পৃথিবীর North Pole ও সর্ব্বদা ইহার দিকে নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাই পৃথিবী উহার Axis এর উপর সর্ব্বদা উত্তর মেরুকে ধ্রুবতারার দিকে নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। এই উভয় Electro Magnet এর আকর্ষণে যে তেজ ও আলো স্ফুরিত হয়, সেই দৃশ্যেরই নাম Aurora Polaris। এই তেজ ও আলো সপ্তর্ষি মণ্ডলের Great Bear দিক হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয় যেন পৃথিবীর উত্তরমেরু ও উত্তর নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ সমূহ সপ্তর্ষিমণ্ডলের আলোতেই আলোকিত। গিরিশচন্দ্র এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়া নবস্বর্গের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছেন এই সমস্ত প্রদেশ সমূহে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের অভাব এবং জড়শক্তির প্রভাব থাকিবে। বর্ত্তমান উত্তর আমেরিকায় জড়বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক অবনতি দেখিয়াই বোধ হয় গিরিশ ব্রহ্মার মুখে আরোপ করেন—

হের এই অগণন নক্ষত্র সৃজন
হইয়াছে মানবের হিতের কারণ,

এ সকল নক্ষত্র মণ্ডল
যেই স্থল করিবে উজ্জ্বল
রহিবে তুষার পূর্ণ সদা,
আলোকিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে
নরের বসতি যোগ্য হবে,
নহে অর্দ্ধ বর্ষ ঘোর অন্ধকারে
মরিবে, যে রবে এই স্থানে।
জড়-বল হইবে প্রবল,
তপ-জপে রত কেহ না হবে এ স্থানে। ২য় অঙ্ক, ৮ গ।

ত্রিশঙ্কুও এই স্থানের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া লজ্জিত হইতেছেন। কেননা ধরণীতেও যেইরূপ অতৃপ্তি, এই স্বর্গেও সেইরূপ অতৃপ্তি। তাই তিনি ব্রহ্মদূতের নিকটে নিঃশঙ্ক ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া ব্রহ্মলোকে চিত্ত নিয়োগ করিবার প্রার্থনা করেন।

"তপোবলে" বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রও অত্যন্ত জীবন্ত এবং জ্বলন্ত। ব্রহ্মণ্যদেব যেমন হৃদয়ে রসের বৃদ্ধি করেন, তেমনি বেদান্ত প্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞানও দান করেন। 'রসোবৈ সঃ'—এই মহাবাণীর সার্থকতা তাহাতে সম্পাদিত হয়। বেদমাতাও যেন সত্যই বেদান্তমাতা। ব্রহ্মণ্যদেব বলিতেছেন—"আত্মা সবারই সমান। তপস্যায় আত্মদর্শন কর।" অন্যত্র ব্রহ্মণ্যদেব বলিতেছেন——

আপনাকে চেন আগে, চিনবে আমায় তারপরে।
দেখ্‌ছ কি এদিক্ ওদিক্, দেখ' কে আছে ঘরে।
গরবে চোখ ঢেকেছ, মুখে তাই পাঁক মেখেছ,
দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ;
মনের ভুলে মূল খোয়ালে, কাঁচ নিলে সোণার দরে॥
মনকে ঠেরোনা আঁখি, বুঝলে কি আর আঁখির ফাঁকি?
মিলে আঁখি, ভাব দেখি, আছে কি আর বাকী!
অকূলে আর ভেসোনা, ওঠ কূলে জোর করে॥

৩য় অঙ্ক, ৭ গ।

বেদমাতাও বলিতেছেন——

"অজ্ঞানতায় তোমার নয়ন আবদ্ধ, তাই আপনাকে চিন্‌তে পাচ্ছনা—

মনে-মুখে একই বলে, সদে পথে সদাই চলে,

চিন্‌তে পারে সরল প্রাণ হ'লে ;

তার কাছে তফাৎ থাকি, ভাবের মিলে যার গোঁজা ॥"

তপোবনের মত আধ্যাত্মিক রচনা সাধক কবির শেষ বয়সের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। গিরিশ তপোবনের তত্ত্বকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াই নাট্যপ্রচার করিয়াছেন।

সুনেত্রা ও অরুন্ধতী সম্বন্ধে অন্যত্র সামান্যভাবে আলোচনা করিয়াছি। চতুর্থ অঙ্কের ৫ম গর্ভে বেদমাতার সহিত সুনেত্রার কথোপকথনে রূপযৌবন, ভোগবাসনা, সাধ্বীর গৌরব ও মেনকা-রম্ভার কথোপকথনে প্রবৃত্তির বিশেষত্ব খুব হৃদয়গ্রাহী।

"তপোবন" গিরিশ-প্রতিভার শেষ দীপ্তি, কিন্তু মধ্যাহ্ন ভাস্কর অপেক্ষাও অস্তগামী ভাস্করের স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় হৃদয়ে তপোবনের প্রভাব অনুভূত হয়। নাটকখানি গিরিশচন্দ্র কন্যাসম স্নেহভাগিনী শ্রীযুক্তা নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রও অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। নিবেদিতা তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে অল্পদিন পূর্ব্বেই মায়াময় কায়া ছাড়িয়া স্বর্গবাসে গিয়াছেন।

"অশোক" নাটক শঙ্করাচার্য্য ও তপোবনের পূর্ব্বে রচিত। কিন্তু বিশ্বামিত্র ও অশোক চরিত্রে কিছু সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া উল্লেখ আবশ্যক। অশোক নাটকেও বেদান্তের তত্ত্বই ওতপ্রোত। বিশ্বামিত্র যেমন সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দুর্ব্বার অধ্যবসায় বলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, রাজা অশোকও ক্রমে ক্রমে কাম, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি রিপুর দুরন্ত কবল অতিক্রম করিয়া বুদ্ধদেবকে দর্শন করিবার দিব্যচক্ষু লাভ করেন। তবে একজন গৃহী, আর একজন তাপস। গিরিশচন্দ্র নাটকে চণ্ডাশোক,—নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, রাজ্যলোলুপ; ও ধর্ম্মাশোক—রিপুজয়, পরাজ্ঞানোন্মেষ ও ত্যাগের গৌরবে মহিমামণ্ডিত,—উভয় অবস্থাই বর্ণন করিয়াছেন।

ইতিহাস হইতে যাবতীয় উপাদান সংগৃহীত হইলেও নাটকখানি ধর্ম্মমূলক এবং তত্ত্বাদর্শে অনুপ্রাণিত—ধর্ম্মবলের নিকট জড়শক্তির পরাভব, বিদ্যামায়ারূপী উপগুপ্তের প্রভাবে অবিদ্যাশক্তিরূপী মারের শক্তিক্ষয় এই নাটকে প্রকটিত। নানারূপ পরীক্ষাচক্রে কামক্রোধাদি রিপু পূর্ব্বেই ধর্ম্মাশোকের অন্তর হইতে দূরীভূত হয়। কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধসঙ্ঘকে সসাগরা পৃথিবী দান করেন, সেই দান-গৌরব হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। উপগুপ্ত রাজ্য ফিরাইয়া দেন। ক্রমে আত্মচিন্তায় বুঝিতে পারেন "রাজ্য, ধন, কীর্ত্তিলাপ কিছুই আমার নয়। সকলই বুদ্ধদেবের, আমি নিমিত্ত মাত্র।" এই দান-গৌরব বা অভিমান পরিত্যাগেই তাঁহার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। এই যে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া অশোক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি পরিত্যাগ করিয়া 'আত্মত্যাগ' শেখেন, নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে যেমন নাটকীয় রস পুষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ নাটকের অন্তরালে পাঠক দিব্যজ্ঞানও লাভ করিতে সমর্থ হন। কুনালের গানটীতে এই নাটকের বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়——

বিনা তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন
কিবা প্রয়োজন——
যদি বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন
সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন,
মধুর মোহিনী স্বরে সদা বিমোহন,
পরম শত্রু দেহে রয়েছে শ্রবণ।
কবে ধনজন মান, দিবে মোরে ত্রাণ
হবে বুদ্ধদেব-পদে লুণ্ঠিত প্রাণ;
দীন-ভাবে কবে ভ্রমিব ভবে,
ঘোর অভিমান নাশ হবে,
তৈলধারাবৎ, বুদ্ধ দেবে চিত
হবে শ্রীপাদপদ্মে লীন জীবন।

আরও দুই একটি গানের উল্লেখ করিয়া পাঠককে নাটকের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিব। নিষ্ঠুর হত্যার আদেশে

অশোক উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক, চিন্তা-অনুতপ্ত ; বৌদ্ধভিক্ষুগণ তাঁহার সমক্ষে গাহিতেছেন——

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি।
যত্ন করি ধরি হৃদয়ে অহি,
কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি,
একি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি!
ভ্রান্ত চিত নাহি বাহিরে অরি,
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,
ঠেকিয়ে শেখ, আর বিবেকে দেখ,
আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,
বিমল হৃদে হের শান্তি,
অমৃতময় কিবা কান্তি,
কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি!

কুণালের আর একটী গানেও নাটকের উচ্চভাব প্রকটিত——

কায় বাক্য মন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি
শ্বাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ
নাথ হর অহমিতি অভিমান
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে
চাহে চাহে যায় বিশ্বে মিলাইয়ে
বিস্তৃত জীবন, বিস্তৃত প্রাণ মন
ভুবন বিহারী, শুদ্ধ বোধোদয়, মোহ-তমোহারী
মাগে ভিখারী!

অশোকের এই 'অহমিতি অভিমান' বিসর্জ্জন ও কুণালের বিশ্বে মিলিবার কাতর প্রার্থনা, "শঙ্করাচার্য্য" ও "তপোবলেরই" পূর্ব্বাভাস।

সদানন্দ

হাস্যরসাবতারণায় গিরিশের অদ্ভুত কৃতিত্ব সামান্য দুই একটী কথায় উল্লেখ করিব। দুলালচাঁদ, রমানাথ, হীরুঘোষাল, বরুণচাঁদ, জগন্নাথ (বাসর), টুকুরো, মদনদাদা, অঘোর, হলধর, প্রভৃতি বহু চরিত্র বিশেষভাবে হাস্যরস উদ্রেক করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রসের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই বিদূষক চরিত্রে। নলদময়ন্তীর বিদূষক, জনার বিদূষক ও তপোবলের বিদূষক—সকলেই রহস্য ও মোণ্ডাপ্রিয়। বিদূষকের ঔদরিকতা কবি-সময়-প্রসিদ্ধ, সংস্কৃত নাট্যকারগণও* বিদূষকগণকে ঔদরিক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত পরিকল্পনায় ইহারা নাটকীয় সৃষ্টি পুষ্টির সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত——যে, সংস্কৃত নাটকের তুলনায় গিরিশের বিদূষক সরল, ত্যাগী ও ভক্তরূপে নাটকের সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। কালিদাস, ভাস, প্রভৃতি কবিদিগের বিদূষকের ন্যায় নলদময়ন্তীর বিদূষকও প্রেমমন্ত্রী, কিন্তু অপর দুই বিদূষক-চরিত্রে বৈচিত্র্য, চমৎকারিতা ও স্বাতন্ত্র্য আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা জনার ভক্ত বিদূষক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বিশ্বামিত্রের বিদূষক রহস্যপটুতায় যেন নল-সহচরাপেক্ষা আরও চতুর। সৌহার্দ্দ্যে যেমন সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, প্রবাসে, যুদ্ধে, বনে, পার্ব্বত্য দেশে, রাজার হিতকারী সহচর, আত্মত্যাগেও সেরূপ মহান্। অম্বরীষ-যজ্ঞে বালকের প্রাণ-রক্ষার্থ যখন সে বিশ্বামিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল, তখনকার দৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। তখন সে পুরোহিতের বলির ব্যবস্থাও করিতেছে, যজ্ঞের তণ্ডুলও ভোগে লাগাইতেছে, আবার যূপকাষ্ঠে মুণ্ড স্থাপন করিয়াও বলিতেছে——

"পেটের জ্বালায় সন্ধ্যা-আহ্নিক তত পারি আর না পারি, বাপ

---

* কুসুম বসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বৈশ ভাষাদ্যৈঃ
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ।
বিশ্বনাথ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ।

পিতামহের মর্য্যাদা ভুলি নাই। বালকরক্ষা, ঋষিরক্ষার্থে দেহদানে আমি কাতর নই। আমি বিস্মৃত নই যে, ব্রাহ্মণই লোকহিতার্থে ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণের জন্য অস্থি প্রদান ক'রেছিলেন। যে বজ্রে বৃত্রাসুর বধ হয়! আমিও সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ধারণ করি। আমিও রাজর্ষি-রক্ষার্থ, বালক-রক্ষার্থ মুণ্ড প্রদান ক'রবো"।

এই বিদূষকেরই কাতর আহ্বানে ব্রহ্মণ্যদেব আসিয়া উপস্থিত হ'ন, রাজার খড়্গ ভাঙ্গিয়া যায়।

"বাতুল ও আকাল"

"শ্রীবৎস চিন্তার" বাতুল চরিত্রের ক্রম বিকাশই "অশোকের" আকাল। উভয়েই সঙ্কট-দীক্ষিত। বাতুলের দুঃখকাহিনী সম্বন্ধে সে বলিতেছে—"দুঃখের সঙ্গে আমার বহুদিনের প্রণয়; জল হ'লনা, খাজনা দিতে পারলেম না—বড় ছেলেটার বুক ডলে মেরে ফেল্লে, আর আমায় জেলে দিলে। মাগীটাকে টেনে নিয়ে গেল, ছেলে গুলোও অন্নাভাবে মারা গেল, জেলের পর ভিক্ষা। তারপর চুরী। তার পর ফের জেল। আর শেষটা মহারাজের দেখা।"

শ্রীবৎস রাজার সহানুভূতিতে তাহার দুঃখ দূর হয়। এবং কৃতজ্ঞতা-বলে সে শনিগ্রস্ত রাজার অবর্ত্তমানে অপর রাজার সহায়তায় রাজ্য চালায়। বহুদিন অনাহারের পরে চারিটী ভাত পেটে পড়ায় বাতুল বলিতেছে——

"না, বাবা, ঘুম হবার যো নাই, আজ রাস্তার সেই সুকোমল কাঁকর নাই, আর মাঝে মাঝে কোটাল সাহেবের হুঙ্কার নাই, আবার বিষমস্য বিষম্ উদরে অন্ন পড়েছে।"

অন্যত্র লক্ষ্মীকে বলিতেছে—

"কমলার করুণা একজনের উপর দেখাও দেখি, যে না উপকারীর মাথা কাটবে?"

বাতুল প্রাণ ভয় করে না; তাই বলিতেছে——

"যখন মরণ ভয় ছেড়েছি, মা কমলা, বাবা শনি, তোমাদের দু'জনের হাতই এড়িয়েছি।" ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গ।

"আকাল"ও বিপদে সমান দীক্ষিত—দেশে আকাল হইয়াছিল, সেই সময় পৃথিবীতে পদার্পণ করে বলিয়া পিতামাতা 'আকাল' নাম দেয়। অন্যান্য অবস্থা বাতুলেরই ন্যায়। অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছে "ছেলে বেলাকার অভ্যেস রাস্তার জঙ্গলে একধারে পড়ে থাকি, এই প্রধান দোষ; আর দ্বিতীয় দোষ—ক্ষীর সর নবনী আমার পেটে সয় না। তাই ভিক্ষান্নের চেষ্টা করি।"

আকাল স্পষ্টবাদী, মৃত্যুভয় নাই। তাই রাজকর্ম্মচারী যখন বলিতেছে——"এ ব্যক্তি চোর—দুইবার রাজদণ্ডে কোড়া প্রহারে দণ্ডিত হ'য়েছে"—আকাল উত্তর করে——

"আমি চোর নই, চোর কি এরা ধরেন? প্রহরীদের হুকুম দেন, গর্দ্দানাটা কেটে ফেলুক, ওঁদেরও আমোদ হবে, আমিও নিস্তার পাব।"

অবস্থায় দীক্ষিত বলিয়া আকাল সত্য কথা বলিতে ভয় পায় না এবং বিপদের বেত্রাঘাতে আজীবন শিক্ষা পাওয়ায় তাহার কথা রহস্যপূর্ণ কিন্তু জ্ঞানগর্ভ।

বাতুলের ন্যায় আকালও রাজগৃহে আশ্রয় লাভ করে এবং সেও অশোকের পরম উপকার সাধন করে। উভয়েরই মৃত্যুভয় নাই, কিন্তু বাতুল চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি আকালে। রাজা অশোকের প্রধান শত্রু সুসীমের নিপাত হয় আকালের বুদ্ধিকৌশলে, রাজাকে মারের দানবশক্তির (অবিদ্যা) কথা স্মরণ করাইয়া দেয় আকাল, এবং নিষ্ঠুর অশোকের ক্রোধ প্রতিনিবৃত্ত হয় আকালের স্পষ্টবাদিতায়। আকাল বলিতেছে——"রাজাকে লোকে দেখবে যেমন যমের মাস্‌তুতো ভাই।" অশোক যখন বলিল—"কি বুঝ্‌ছিস আমি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী নই?"—

আকাল নির্ভীকভাবে উত্তর করে——

"আজ্ঞে, তা জানিনে, তবে শুনেছি ইন্দ্র—অসুরারি, আপনি অসুরের সখা।"

অশোক—"অসুরের সখা?"

আকাল—"মহারাজ সহস্রলোচন হ'তে চাচ্ছেন, কিন্তু দুটী চক্ষু যা আছে, তাও অন্ধ।............এর নাম আধিপত্য নয়—সংহার।"

আকালের সদুপদেশে অশোকের তমসাচ্ছন্ন অন্তরে 'অরুণোদয়' হইল, এবং আকালের নির্লোভতার 'মানে' ও বুঝিতে পারিল "এইরূপ লোভ-বর্জ্জিত তুচ্ছ সামান্য লোকই জগতের বেশী উপকার করে।" তাহার বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাবলে সে বুঝিতে পারে রাজা ছলনাময়ী বারবিলাসিনীর ছবি তাহার নিকট গোপন করিয়াছে, আর নির্ভয়ে রাজাকে বলিয়া দেয়——

"মহারাজ, ভুঁয়েই শোন, আর এক সন্ধ্যেই খান, আমি রাস্তায় পড়িয়ে উপোষ ক'রে দেখেছি, ও মেয়ে মানুষের ফাঁড়া কাটে না। মহারাজেরও ফাঁড়া কাটে নাই বোধহয়।"

অশোক—এ কুলকামিনীর ছবি, তাই গোপন করলেন্!

আকাল—মহারাজ রুষ্ট হন হবেন, যিনি আপনার ছবি আঁকিয়ে দিলেন, তিনি কুলকামিনী নন, কুলের ধ্বজা!

বুদ্ধিবলে আকাল চণ্ডালিনী-ছদ্মবেশধারিণী রাণী পদ্মাবতীকে চিনিতে পারে——

"ছেলের কাছে মা লুকুতে পারে না, অন্ধকারে গায়ে হাত দিয়েই ঠাওর পায়, মা কিনা।"

আকাল সরল ভক্ত, তাই মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রাকে বলিতেছে—"তোমাদের আমি ছাড়ছি নি। তোমাদের বুদ্ধদেব কোন্ বেটা—আমাকে চিন্‌তে হচ্চে।"—— ৩য় অঙ্ক, ৮ গ।

আকালের প্রভুভক্তির চরম পরিচয় পাই যখন চিত্তহরার হাত হইতে ঔষধ কাড়িয়া লইয়া রাজার প্রাণরক্ষা করিল, আর সেই বিষ নিজে পান করিল, নতুবা মায়ামুগ্ধ অশোক কিছুতেই সেই পাপিনীকে অবিশ্বাস করিতনা। তাই মৃত্যু সময়ে আকাল বলিয়া গেল—

"আপনি আমার জীবন দান করেছিলেন, সেই জীবন আপনাকে পুনরর্পণ কচ্ছি। আমার মৃত্যুতে আপনি পিশাচিনীর হস্তে মুক্তিলাভ করুন।"

এই প্রভুভক্ত ও আত্মত্যাগী চরিত্রের সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক দক্ষতাই দৃষ্ট হয়।

কবির অদ্ভুত সৃষ্টি—"শঙ্করাচার্য্যের" **জগন্নাথ** চরিত্রে দেখিতে পাই মায়াতেই মায়ার বিলোপ। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি মায়ার লোপ না হইলে আত্মজ্ঞান আসে না, কিন্তু জগন্নাথের 'মায়িক স্নেহেই' মুক্তি। "শঙ্করাচার্য্যে" আমরা জ্ঞানে মায়ার লোপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আবার গুরুগতপ্রাণ শান্তিপ্রদ-চরিত্রে গুরুভক্তিতে অদ্বৈত পথের কথাও ১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। মায়িক স্নেহে অদ্বৈত জ্ঞান অসম্ভব হইলেও এই চরিত্রে প্রতিভাত।

জগন্নাথ শঙ্করাচার্য্যের বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য, অকৃতদার, বাড়ীতে কেহ নাই, 'ক্ষেত খামার' করে, কিন্তু এ বাড়ীই আপনার বাড়ী বলিয়া জানে, শঙ্করকে কনিষ্ঠ সহোদরাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করে, আর শঙ্করজননী বিশিষ্টা দেবীকে মায়ের অধিক জ্ঞান করে। বিস্তৃত আলোচনায় বিরত থাকিয়া উপসংহারে তাহার অদ্বৈত জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিব।

স্নেহময়ী, জ্ঞানবতী, শঙ্করের আদর্শজননী বিশিষ্টা দেবীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। পার্শ্বে দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য!

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃ প্রবেশ)

জগন্নাথ—ওই যা—আহা, ছেলে দেখবার জন্য মাগীর পরাণটা ছিল। আহা, জন্মদুখিনী গো জন্মদুখিনী। মিন্সে-মাগীতে পেটে খায়নি, ভাল একখানা পরে নি, পরের লেগেই পাগল। আমি চাষার ছেলে, মা বলেছিনু,—তা ও ক্ষুদেকে চেয়ে যত্ন ক'রে আমায় পেলেছিল গো!

শঙ্কর—জগা দাদা—জগা দাদা—আজ আমরা মাতৃহীন হ'লেম।

জগ—কাঁদিস্ নে,—কাঁদিস্ নে, মাগী জুড়িয়েছে, এখন বেটার কাজ কর্। আমি এখন কোন থান্কে যাই—কি করি? মাগীকে একবার দেখে যেতুম, মা ব'লে ডাকতুম—পরাণটা জুড়ুতুম। আমি এখন কি করি বলত্রে ক্ষুদে!

শঙ্কর—জগা দাদা, জগাদাদা—তুমি শিব-পারিষদ, চিরপূজ্য হয়ে থাক্‌বে।

জগ। আর পারিষদে কাজ নি! এখন কবে মরি, তুই একবার দাদা ব'লে মনে করিস্। (চমকিত হইয়া) হাঁরে ক্ষুদে—কি ভেলকী দেখাস্‌রে? ওরে গাছ পালা সব যে সাফ হয়ে যাচ্চে রে! ক্ষুদে ক্ষুদে তোরে চিনে নিয়েছি। (মহামায়ার প্রতি) মাগী মাগী, জেনেছি তুই কে! আমিই এক—আমিই অনেক! আমি—আমি নই, সেই—ই আমি—সেই—ই আমি।

মায়ায় আত্মজ্ঞান—অদ্ভুত ভক্তির নিদর্শন—ভক্তের লেখনীতেই এই চিত্র সম্ভব।

পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ব্যাস, বাল্মীকি, কাশীদাশ, কৃত্তিবাস রচিত চরিত্রের ঠিক ঠিক পরিকল্পনা গিরিশ লেখনীতে পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্রৌপদী, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, কুন্তী ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য্য সমালোচকের চক্ষু এড়াইতে পারেনা। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইলে প্রীতিলাভ করিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে মতামত

বঙ্গদর্শন ১৩২১, ভাদ্র "দীনবন্ধু মিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ (শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র Ex-Judge, Calcutta High Court.)

১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজার রাত্রে কলিকাতায় শ্যামবাজারের রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটিতে আমি "সধবার একাদশীর" প্রথম অভিনয় দেখি। সেই দিন আমাদের এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। নিদ্রাদেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়া আমি রামবাবুর বাটিতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলার নব্যধরণের নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা; সে দিন কবিবর "গিরিশ" স্বয়ং নিমচাঁদ। সধবার একাদশী পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষতঃ নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া—আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধিবশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নাম মাত্র স্মরণ আছে। **কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় কখন ভুলিব না।** সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল। অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। গিরিশবাবুর অতুলকৃষ্ণ আমার সহাধ্যায়ী ও চিরবন্ধু, সুতরাং অনতিপরেই গিরিশবাবুর সহিত সুপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন আমার পরম বন্ধু।

[Giris in the role of Mr. Wood, the Indigo Planter.]

The Native Performance at Town Hall.

On Saturday night, the members of the Calcutta National Theatre performed in the Town Hall the play of "Nildarpan" for the benefit of the Native Hospital. It is a great pity that so short a notice was given, as on that account, very few Europeans were present. However, the Natives mustered very strongly on the occasion and testified by their repeated plaudits how much they enjoyed the performance. The acting was exceedingly good throughout. We hope the management will give another performance.—[Englishman, Monday, 31st March 1873.]

Rabon-badh.

There was a grand performance at National Theatre last Saturday and we congratulate the management on the signal success achieved on the occasion. A new drama Rabon-badh—destruction of Ravana, written in verse by the "*Garrick of the Hindu stage*" and the new and splendid sceneries and dress to say nothi of the histrionic talents of the actors and actresses, called forth repeated and enthusiastic applause. We hope all lovers of Hindu drama will muster strong on the occasion. 30th July, 1881, Amrita Bazar Patrika.

Sir Edwin Arnold—on "Buddha"

Another singular pleasure was to witness a performance of the "Light of Asia" played by a native company to an audiance of Calcutta citizens, whose close attention to the long soliloquies and quick appreciation of all the chief incidents of the story gave an idea of their intelligence and proved how metaphysical by

nature these Hindu people are..............There was a refinement and imaginativeness in acting, as well as an artistic sense entirely remarkable and the female performers proved quite as good as the males.

[India Revisited, Page 250.]

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে "মেঘনাদ বধ।"

২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে 'মেঘনাদ বধের' অভিনয় দেখিতে গিয়া আমরা যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, অনেক দিন আমাদের ভাগ্যে সে প্রকার সুখ আর ঘটে নাই। রামচন্দ্র এবং মেঘনাদ এই দুইরূপে নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিনয় করেন। পাত্রদ্বয়ের চরিত্র, কার্য্য এবং ভাব সমস্তই বিভিন্ন, সুতরাং একই ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশ হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে! কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-দক্ষতায়, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখিয়াও আমরা মনে কিছু করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাঁহার 'রামরূপের' অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ যখন পূজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভব সৌম্যভাব দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই; আবার তৎপরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা রোষকষায়িতনেত্রে বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বক্ষ প্রসারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয়-পটুতার চরমসীমা দেখাইলেন। তাঁহার সে ভাব অদ্ভুত, বিস্ময়কর; তাঁহাতে আমরা মুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, **কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না।** গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন, আর এইরূপে আমাদের সুখবর্দ্ধন করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিতে থাকুন। গিরিশ বঙ্গের অলঙ্কার।" "সাধারণী" ৯ম ভাগ। ১৫ সংখ্যা। ১৮৭৯, ১০ ফেব্রু।

ভারতী, ১২৮৮, মাঘ।

গিরিশচন্দ্র কি তাঁহার 'রাবণবধ', কি তাঁহার "অভিমন্যুবধ"—এই উভয় নাটকেই রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে। এক খণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্য্যের আলোক ত প্রবেশই করিতে পারে না, কিন্তু একখণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, আবার স্ফাটিকাগুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশ-বাবুর কল্পনা সেই স্ফটিক খণ্ড—এবং তাঁহার "অভিমন্যুবধ" ও "রাবণবধ" প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ।

৫ই আশ্বিন (১৮৮৪) সশিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'চৈতন্যলীলার' অভিনয় দেখিতে ষ্টার থিয়েটারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেমন দেখলেন ?"—

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উত্তর করেন—

"আসল নকল এক দেখলাম"

[শ্রীমকথিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' দ্বিতীয় ভাগ]

বিল্বমঙ্গল—

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—

"বিল্বমঙ্গল সেক্সপিয়ারেরও উপরে গিয়াছে, আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।"

(Mr. Shambhoo Chandra Mukerjee, Editor, Reis and Rayat, after a performance of **Chaitanya-Lila**)

Defence of The Stage—Expostulation With The Puritywalahs.

In gratitude for one of the most pleasant and memorable nights we have enjoyed for a long time, we are bound to inform our readers that we have been to the

Theatre—even to that much anathematised Bengali Theatre, where, as a rule, men are men and women women and, on appropriate or desperate occasions, women personate beautiful young men, but never men, black men, venture on the preposterous game of looking like beautiful women. Of course, the men who play may not all be above the gentlemanly vices, while the women, it may at once be taken for granted, are not drawn from ladies of the bed-chamber, though doubtless they will compete with many of these, in natural parts or acquired graces or even in virtue. We know our risk, but duty must be done and the truth told. If the theatrical world of Beadon Street be Hell and no mistake, we have been to Hell and returned. We have returned, too, without a conscious taint; not only as we went but better. Yes, if our word is worth anything in the matter, we were not put up to auction directly we entered the precincts of the notorious Street and sold body and soul to the devil. We found no traces of Old Nick there, unless a young scapegrace, rather the worse for liquor, who lounged on a bench behind the orchestra and kept mocking at the players without power to make himself a formidable nuisance, was one of his camp-followers. Nor did the old gent appear to us since. Truth to confess, we are all the better for our visit. Physically it was exhausting in all conscience. For the curtain did not finally drop till a quarter past 2 in the morning, and we did not get our carriage and out of the crush of the street till a quarter to 3 O' clock—the Police arrangements being far from perfect. But spiritually we distinctly profited by the healthy recreation—the noble diversion. We wish the Puritywalahs—we shall not degrade the historic name of the stern, dreadfully-in-earnest if deeply misguided men who upturned monarchy in England or left in a huff for newer words—could be persuaded to follow our example. **Let the**

morality-mongers try a dose of the sublime Morality of the Chaitanya Lila. We would not care to discuss with them any proposition in morals if they could remain unmoved—if they did not come back sadder and wiser men—with the healthy sadness of earnest cheerfulness and the true wisdom of the heart. **The Chaitanya Lila indeed is a moral exercise alike for players and audience.** The play, a dramatisation of the Vaishnava Scripture, is scriptural without the alloy of the disgusting side of ancient manners. The language is chaste throughout. The make-up, in the gross as well as in every particular—the attitudes—the bearing and conduct—all were unexceptionable. What a contrast to the bawdy suggestiveness of the European stage! We wish European gentlemen would come and see how far acting may be effective without meretricious aids or the attraction of the naked female person. Probably the average play-goer will vote the Star Theatre too insipidly proper. The difference is characteristic. The contrast between the sober fully-dressed Baiji of sober motions, and the fighty ballet-girl with her insufficient or flesh-colored covering and her fighty leaps and curvets, is but a type of the contrast between the thorough respectability of the Hindu stage and the doubtful propriety of the European theatre. We can assure the reader that we particularly watched the Star Theatre in its moral side, and are bound to declare it irreproachable. We found not a single lapse in any particular or in any person at any point. Perhaps we ought to mention that for once, only in one scene, we observed an actor in the character of a religious Brahman expose his abdomen, but this was simply disgusting, without being suggestive. It was true to character, and it is not regarded with disgust in India where Mussulmans and Hindustanis, men and women, Nawabs and Begums, all habitually expose their paunch, so it might pass without remark. It sickens us, however, and as

Europeans often visit the Star Theatre, the Company had better avoid an unnecessary offence. **But, as we** *have said, it is not indecent in the sense of* **immoral—** of which kind there was absolutely nothing.

No man can sit for half an hour *in the Star Theatre without being struck by the general superiority—the* high tone—of the acting. The players are evidently experienced in their art. There is not to be seen a trace of 'prentice hand' in any particular. The firm grasp at once places the whole business decidedly above the level of faltering or halting amateur effort. **The genius of the people is suited to the stage.** Their perspicacity, their adaptability, their suppleness, their dexterity, all easily lend themselves to histrionic art. Nevertheless, we were surprised to see the number of good players. Comparisons are specially invidious where so many are excellent and most performed their respective parts so well. [Reis and Rayat, October 10, 1885]

Colonel Olcott on "Chaitanya Lila"

His reply to the above

"The Native Theatre"

Sir : I have read with approval and admiration your manly defence of the Indian Stage. I, too, while at Calcutta recently accepted an invitation to witness the performance of Chaitannya Lila and the impressions I brought away were the same as your own. There had been so much platitude written against it in certain papers, that I was glad of the opportunity to see and judge for myself. I have been for some years promoting a movement for the revival in our country of the ancient high standards of Aryan morals, and whatever affects the spiritual and moral interests of Indian youth has for me a deep interest. I have in this spirit for years been an ardent friend of the movement for reformation in Native music, as represented in the Bengal

Academy of Music and Poona Gayan Samaj, founded respectively by my friends Rajah Sir Sourendra Mohun Tagore and Mr. Bulwant Trimbak. Their aim is to replace the vile lascivious songs in vogue by the spiritualising classical hymns and other compositions of the Aryan forefathers. **A pure stage and pure music are among the most potent agencies for the philanthropist to employ.** It is too late in the day to argue this question : it has long ago been settled to the satisfaction of all but narrow Western bigots. Of course, the personal character of actors and singers is always an interesting, though subordinate question, and, cæteris paribus, right feeling persons always prefer to see and listen to performers who, like Mesdames Nillson, Mary Anderson, Ellen Terry and many others, enjoy the reputation of unblemished private lives, rather than to others in all walks of the dramatic profession whose lives are impure. Yet after all what the public principally go to see and hear is the play, the opera, or the concert, and the bad character of the artist is something quite apart from and subordinate to the ideal he or she personifies for the moment. I need but appeal to any travelled European in India for evidence that the above is true, and that, while female virtue, considering the enormous temptations to which actresses are subjected, is quite as common on, as off, the stage, the play-going public of all the countries of Christendom habitually tolerate, patronize and almost worship actresses and actors of flagrantly impure lives. As you say the Indian Stage has not come to that, and the only question of the moment is whether it will be impracticable to so elevate the profession in this country as to make the dramatic career inviting to respectable Native ladies by its honours and emoluments.

My official engagements since I came to India in 1879, have been so constantly exacting that only thrice

in India and once in Ceylon have I had the time to visit the theatre. At Bombay I saw Sitaram and Harischandra, at Calcutta Chaitanya Lila, at Colombo The Merchant of Venice, done badly on an open-air stage by a company of Sinhalese amateurs. I am free to say that the three Indian Dramas taught me more and made me more deeply admire and understand the stories they respectively illustrate than would have ten times the same number of hours spent over books. I think my enthusiastic apppreciation of Aryan character is to some extent due to the impressions thus conveyed. **As for the Chaitanya Lila I unhesitatingly affirm that it is impossible for any one** but a "civilized", peg-drinkinig Babu,like the one you say misbehaving himself on the front bench of the orchestra, **to witness the play without a rush of spiritual feeling and religious fervour.** The poor girl who played Chaitanya may belong to the class of unfortunates (alas : how unfortunate these victims of man's brutishness), but while on the scene she throws herself into her role so ardently that one only sees the Vaishnava saint before him. Not a lewd gesture, not a sensual glance of the eye, not the slightest suggestion of animal desire, like those which make up the attraction of nautches to their patrons. I am a psychologist and watch faces for signs of hidden emotion. At the Star Theatre in Beadon Street, there was not a symptom of any bad influence working in the audience ; while at every nautch the signs of lustful desire are but too evident, and by the dancer, encouraged by responsive look and gesture. So thoroughly does the Star actress feel the emotions of the saint she personates, so intensely arouses in her own bosom the religious ecstacy of Bhakti Yoya, she fainted dead away between the acts the evening I was there, and a medical man who shared my box had to go behind the scenes each time to administer restoratives.

Sir, I hate above all things cant and hypocrisy; and while I shall ever be among the first to denounce and oppose every agency I find working against public morals, I cannot withhold my expression of sympathy for the courageous defence you have made of the Native Stage in this week's paper. If we must have only virtuous women as actresses and singers, all right; but then in fairness to that helpless class we drive into absolute vice, let us be equally stern in the cases of European professionals, the priests of religion—the world over, not in India alone—and—of the writers and critics of sorts who are denouncing the drama from high pedestals. Hypocrites in religion, in virtue, in politics, in trade, in science—the world is full of them: And India included—from the sham loyalist, with his reception-hall full of political mottoes and portraits to the sham ascetic, who paints and dresses himself to play the part of the holy mendicants of yore. There is but one fit place for people of this class—Chaneph, the fabulous island of Rabelais—"wholly inhabited by sham saints, spiritual comedians, head-tumblers, numblers of avemarias, and such like sorry rogues who lived on the alms of passengers, like the hermit of Lormont".

Yours—

Adyar, the 17th October, 1885. H. S. Olcott.

Macbeth at Minerva.

Statesman—The performance of Macbeth marks an epoch in the annals of the Native Stage.

Englishman—8th Feb 1893. The second performance of Macbeth was shown before a large andience including several European gentlemen. Babu Girish Chandra Ghose, the manager, played the part of Macbeth and the play as a whole was well-rendered. A Bengali

Thane of Cawdar is a living suggestion of incongruity, but the reality is an astonishing reproduction of the *standard convention of the English Stage.*

Hindu Patriot—The representation of Macbeth in the Minerva Theatre on Saturday last as the opening piece marks a new departure in the dramatic history of Bengal …………Babu Girish Chandra Ghose, *the father of the modern stage of Bengal*, as he may rightly he called, had the whole of the work under his personal supervision, commencing with the translation of the master-piece and including the scenery and dresses which were as correct and effective as might be desired. The success therefore became a foregone conclusion, when Babu Giris Chandra took the leading character……………… It is difficult to predict whether translations of Shakesperean master-pieces will be favourably received as a rule. If this does not turn out to be the case, Macbeth bids fair to prove an exception.

Indian Nation—Girish Babu's translation of Macbeth has surpassed even the French rendering of the drama.

Sir Gurudas Banerjee
Sir C. M. Ghose
Sir K. G. Gupta
Mr. P. L. Roy

To translate the inimitable language of Shakespeare was a task of no ordinary difficulty, but Babu G. C. Ghosh has performed that difficult task very creditably on the whole and his translation is in many places quite worthy of the original.

Mukul munjura—

Indian Mirror—

… … … … …

The new comedy is the outcome of the imaginative brain of G. C.…………………………… ………………… The personations taken all round justified the selections

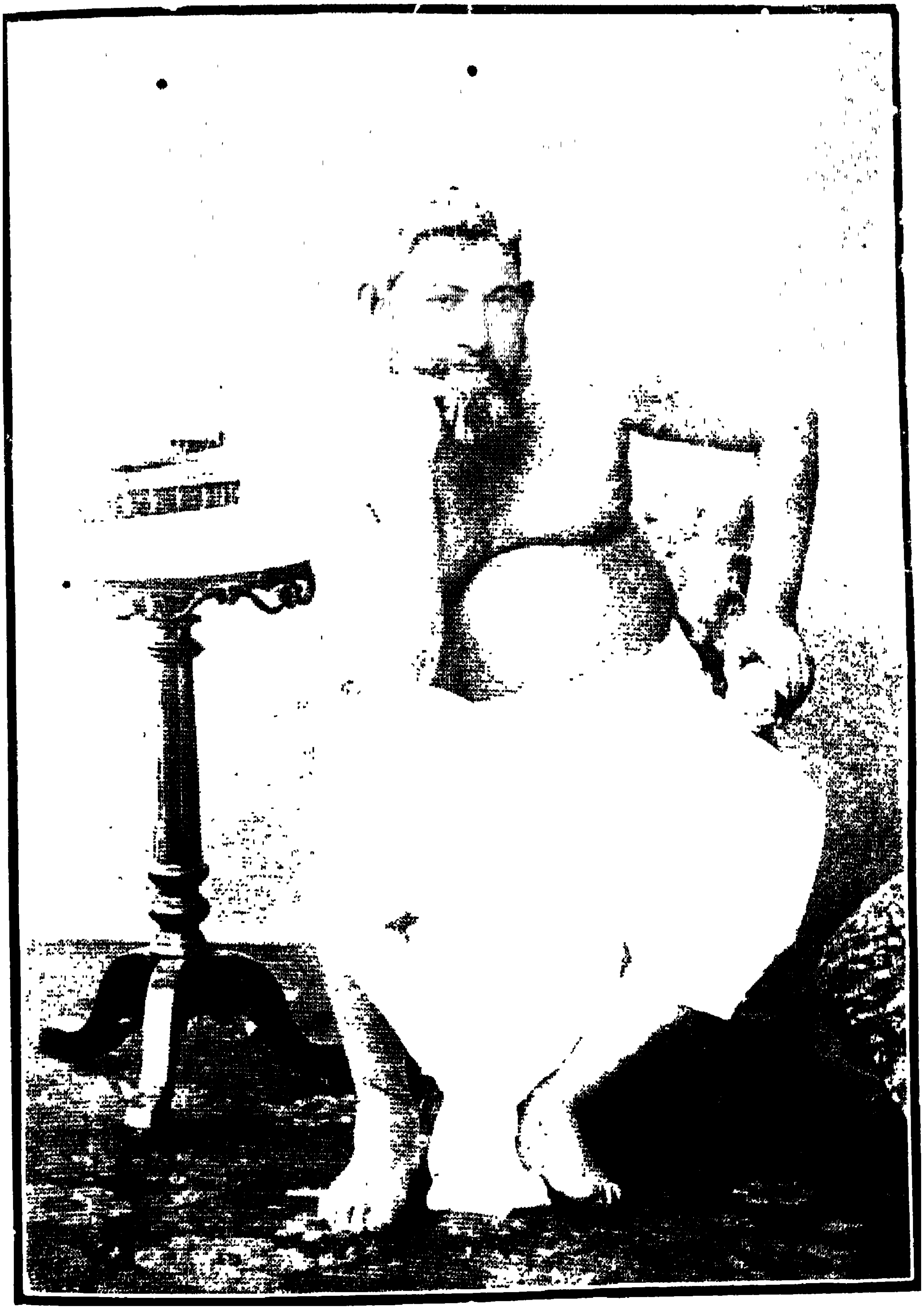

গিরিশচন্দ্র (যৌবনে

made of them......................and they all succeeded in interpreting the niceties of thought and the varieties of action which characterise this entertaining production.

Janmabhumi—Falgun, 1299. It is a unique production whether in language, ideas, art, grandeur, poetry and the object of the drama. [Translated from Bengali.]

Abu Hossen—

1. Mirror 4th April, 1893—In his combind capacity as manager and author G. C. has well succeeded in giving the light production a delightful turn.

Daksha Jajna—(Repeated).

Indian Mirror.—The dignified and difficult *panteur* of Daksha was capitally rendered by G. C. who from the fact of being the author of the piece was singularly well-justified to reflect the exact spirit of the role. His impersonation was, to apply the remarks of Victor Hugo on Lamaitre's Ruy Blass, " not a transformation, but a transfiguration."...................The other figures in the play would have done very well indeed if they had not labour ed under, what was undoubtedly to them, a serious disadvantage which penny candles must suffer in the presence of incandescent lamps.

Jana—"Patriot", 31st January 1895.

Jana was repeated last saturday before an overflowing house........................The character of Vidushaka was for the first time sustained by G. C. himself and he gave evident proofs of his abilities as a very good comic actor. He kept the house in capital humour and contributed largely to the success of the play.

Karameti Bai—

Indian Nation, 15th July, 1895.

Karameti Bai is the latest production of Babu G. C. G. The interest of the book lies in that it is pre-eminently a

national drama—a drama embodying the highest religious instinct and aspirations of the nation—a drama of light and faith. Babu G. C. G. was the first, we believe, to hit at the truth that nothing so moves the national mind as religion and to work thereupon in constructing all the great plays excepting Profulla and Haranidhi which have for their theme domestic incidients. In Karameti Bai he has selected the highest cult of Vaishnaba faith who from her childhood felt the rays of a higher and brighter world waiting around her and she became unmindful of her environments.

Profulla at Star and Minerva.

Indian Mirror—1st Aug, 1895.

"The concurrent representation of Profulla at the Star and Minerva during the last three weeks [from 13th July 1895] has created quite a stir among the patrons of the Bengali drama.

... ...

So far the advantages and disadvantages almost balance each other. Now comes the question of the claims of the two Jogeshes to superiority. The character of Jogesh is the pivot on which the whole mechanism of the play moves and the weight of its correct impersonation is therefore calculated to turn the scales one way or the other. Here is a case of Greek meeting Greek. It would, however, be no discredit to the original Jogesh (meaning Babu Amrita Lal Mitra) if he owns his inferiority to the new, nor would, we believe, the latter take it as anything but a matter of self- gratulation if he is beaten by the former whom he trained to the part some years ago. The former has the gift of a clear incisive voice and a roundness of delivery while the latter has the advantage of being the author of the piece (not necessarily an advantage in the case of all authors) and of **being possessed with the intuitive skill of probing into the depths of human thought and**

giving it feeling expression. The former voices the thunder, while the latter emits the lightening of the gloomy atmosphere of the character's life".

... ...

Star circulated a poem of the which the following are the closing lines.

"Impartial censure we request from all
Prepared by just decrees to stand or fall."

N. B.—It also put a couple in their notices from 'Mahabharata' as an apologium "Tomari Shikshita 'Vidya'. Dekhabo Tomare"—'the art you taught us will be shown you'. But unlike Drona, the Guru here came out triumphant. The Star played till the 17th August when they had to retire in the contest leaving the Minerva to continue for a month more with signal success.

... ...

Vranti—

বঙ্গবাসী ২১ ভাদ্র, ১৩০৯। 'ভ্রান্তি' নাটকের অয়স্কান্ত মণি······

বসুমতী ১৩০৯, ২৬ ভাদ্র : আর রঙ্গলাল, গঙ্গা কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি; এমন স্বার্থত্যাগ বাঙ্গালী একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবে কি? একদিকে স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ,—আর একদিকে স্বর্গের পবিত্রতা। দাঁড়াও রঙ্গলাল, এই অধঃপতিত বাঙ্গালীর সম্মুখে, তোমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিলে বাঙ্গালীর শ্রী ফিরিবে!···রঙ্গলাল নিজে গিরিশবাবু, চির প্রশংসিতের আবার কি বলিয়া প্রশংসা করিতে হয় জানিনা।

Balidan—

Indian Nation, 14th Aug, 1905.—The play is an intensely realistic tragedy. Babu G.C. Ghose, the talented author of the play, plays the part of Korunamoy to perfection. Most of the actors and actresses are up to the mark.

সাহিত্য সংহিতা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা—ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাংলা ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

Bengalee, 19th April, 1905. Babu Giris Chandra Ghose's latest social tragedy which is having a very successful run at Minerva deserves well of the Hindu Public of Bengal to whom it is addressed. Giris Chandra effectively plies the probing needle in the Lazar sore of the social heart and calls upon our social leaders to find the remedy.............................. G. C. mercilessly castigates the dowry system and if the function of the stage is to educate public opinion by object lessons, let us hope the distinguished play-wright's mirror of the ugly feature in our social fabric will produce the desired effect.

Do. 29th April. The consensus of opinion among the theatre-going public is that after a long time the veteran play-wright has tackled a theme which vitally affects the Bengali Society and his efforts have been attended with phenomenal success. He has done a great service in the direction of social reform.

Sir Chandra Madhob Ghose, Sir Gurudas Banerjee, Mr. Sarada Charan Mitra, and Mr. Bhupendra Nath Bose. witnessed the performance on the 6th May 1905, (5th night of Performance) and considered it as the unique piece for social reformers to stop dowry system.

Serajuddulla—

Bengalee 3rdFebruary, 1906.—Both from the dramatic and literary point of view Serajuddulla is destined to occupy a high and enduring place in our national literature. As a piece for the stage it is nonpareil; and it requires no mean talent to interpret the diverse and complex characters that the gifted author has marshalled in it.

Statesmen, 17th Febrnary, 1906.—The company has been playing Serajuddulla by G. C. Ghose for the past five months with unabated success. The author himself takes the part of Karimchacha.

Basumati, 5th Falgun 1312.—গিরিশবাবু ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; নিরঙ্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়া, কালি ঢালিয়া ইতিহাস বিকৃত করেন নাই…করিমচাচা এবং তাহার জহরা-চাচী কবি-কল্পনা হইয়াও, ইতিহাস ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"সময়", ১৮ ফাল্গুন ১৩১২।—সিরাজদ্দৌলা দেখিবার সময় পাশ্চাত্য নাট্য রাজ্যেশ্বর "দ্বিতীয় রিচার্ড" নাটক আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। সেই নাট্যেও বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়বর্গ, ইংলণ্ডের রাজা নিরীহ দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজ্যগ্রাস ও হত্যাসাধন করিয়াছিল। কিন্তু তদপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের কল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে।

Basar—

Hindu Patriot, 12th January, 1906.—The drama is well-written and successfully staged...... .... Basar may well be classed among the series of excellent pieces the enterprising and popular company has been recently producing in rapid succession.

Mirkaseem—

Bengalee 23rd June, 1906.—Babu Girish Chandra Ghose's new historical drama "Mirkaseem" which was put on the boards of the Minerva Theatre for the first time on Saturday last, has been a phenomenal success both from the histrionic and literary points of view. The tumultuous period that followed the accession of Mirkaseem to the throne, the strennnous fight that the ruler had with the East India Company for the protection of the indigenous industries and the various strategems resorted to by both sides to win their points have, with remarkable fidelity and consummate art, been portrayed by Bengal's greatest playwright. The piece abounds with diverse and complex characters, all of them very skilfully marshalled to produce an excellent stage-effect, which one must see to fully realise it.

Statesman—17th November, 1907. The exceedingly lavish manner in which Mirkaseem has been staged at the Kohinoor Theatre* assists materially in enhancing the enjoyment of the piece, which deals with the incidents of the tumultuous period that followed the accession of Mirkaseem to the throne and the strenuous fight the ruler had with the East India Company for the protection of indigenous industries. The acting all-round reaches a high water mark of excellence and the huge audience testified their appreciation in a most unmistakable manner.

Chhatrapati—

Bengalee—One of the best and most powerful dramas ever produced on the Bengali stage.

Statesman, 17th November, 1907.—Though it has been running for about ten weeks now at "Kohinoor", the large auditorium was crammed in every part and early in the evening the sale of tickets had to be stopped, the large overflow helping to fill the adjacent play-houses.

Sankaracharya—

Bengalee, 19th March, 1910.—Our Indian Garrick Girish Chandra when still in the vigour of youth, brought out his Chaitanya Lila and represented the life and teachings of Chaitanya. But it was an easy task comparatively, for Sri Gouranga's creed of love is in itself a fascinating subject and, treated by his masterly pen, it was destined to crown him with success. The creed of Sankaracharya is the creed of knowledge which is proverbially dry. A student of Hindu Philosophy can hardly guess how Shankar's life and doctrine can form the subject matter of a dramatic performance, specially in these times when levity on the stage is the order of the day. But our Girish Chandra has performed an apparently impossible task by infusing into the dry

bones of the subject, balmy liveliness which has made the drama quite agreeable to every variety of taste......... The play in short is an all-round master-piece which adds a fresh laurel to the already over-loaded brow of the dramatist.........

"Topobal"

Bengalee 2nd December, 1911 The Minerva Theatre has for the past few weeks commenced the representation of a new drama called Topobal composed by the veteran dramatist Babu Giris Chandra Ghose. The drama represents to the Indian audience the power of austerities as mentioned in the Vedas and Purans. How the power of spiritual acquisition enables the votary to raise himself to the highest dignity unsurpassed by all physical and intellectual acquisition is what the author presents before the audience.

............The play is a grand success, the scenes and songs are all novel and they are so very enchanting that without personal experience it is impossible to bring them home to the minds of all lovers of fine art. The audience is so carried away during the whole representation that they forget themselves and consider them really in the midst of these sights and scenes.

The Bengal Administration Report—1912-1913. Page 114, Para 587.

Dramas were many but on the whole poor ; the best of them was Grihalakshmi of the late Babu Girish Chandra Ghose whose recent death is a great loss to the Bengali Stage.

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

... ...

গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যাঁর কবিতায় ধর্ম্ম নাই, প্রাণ নাই, সে কবি অধিক দিন বাঁচে না! মহাকবি বলি কাকে? যাঁর

কবিতায়, গানে, রচনায় ধর্ম্ম আছে, জাতীয়তা আছে, জাতির বৈশিষ্ট্য আছে—তাহাকেই বলি মহাকবি। আমি আমার "নারায়ণ" পত্রে দেখাইয়াছি—কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান পতন হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এইভাব বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হইয়া যায়, পরে রামপ্রসাদে তাহা জাগিয়া উঠে, আবার মলিন হইলে গিরিশ ঘোষে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। গিরিশবাবুর কবিতায়, নাটকে ও গানে আমরা জাতীয়তা পাই, বাঙ্গলার প্রাণ পাই, দেশের একটা স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাই—আর ধর্ম্ম ও জাতীয়তার দিকে প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া পাই!

ইউরোপীয় শিক্ষার আদর্শে আমার আস্থা নাই। কলা—কলাই, ইহার অপর মহৎ উদ্দেশ্য নাই এই যাহাদের অভিমত—তাঁহারা ঘোর জড়বাদী, ভারতবর্ষের 'কালচার' সম্বন্ধে তাহাদের বলিবার অধিকার নাই। ধর্ম্ম ও জীবন অচ্ছেদ্য, যিনি একের সহিত অপরের পার্থক্য করেন, তিনি উভয় দিকই হারাইয়া ফেলেন। এই বৈশিষ্ট্যেই গিরিশচন্দ্রকে যশের অন্বেষণে ইউরোপ, আমেরিকা বা সমুদ্রের পরপারে যাইতে হয় নাই। তিনি দেশবাসীর যথার্থ পরিচয় পাইয়া দেশীয় ভাবে, খাঁটি দেশের ভাষায়, দেশে—বাঙ্গালায় বসিয়াই দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন, দেশবাসীর প্রাণের কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই গিরিশ মহাকবি—দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বেশী দেরী নাই, এমন দিন আসিবে যখন পাশ্চাত্যজাতি এই বাঙ্গলায় আসিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় আমাদের ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য ও নাটক আলোচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবে। তখনই তাহারা গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পাইবে—বুঝিতে পারিবে তিনি কত বড়!

একাদশ অধ্যায়

রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান

বর্ত্তমান অধ্যায়ে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে যত নাট্যাভিনয় হইয়াছে, তাহার স্থান ও প্রথমাভিনয় রজনীর তারিখ সন্নিবিষ্ট হইল। সমস্ত অধ্যায় পাঠ করিলে রঙ্গমঞ্চে গিরিশের অভ্যুদয়, গিরিশের প্রতিভার বিকাশ এবং গিরিশের অভাবে রঙ্গমঞ্চের ক্ষতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

তারিখ	থিয়েটার	নাটক
১৭৯৫—২৭ নভেম্বর শুক্রবার	বেঙ্গলী থিয়েটার (ডোমতলী)	ছদ্মবেশ*
১৭৯৬—২১ মার্চ্চ সোমবার	ঐ	ছদ্মবেশ ও Love is the best Doctor.
১৮২১—		কলিরাজার যাত্রা (প্রহসন)

---

*Lebedoff নামক একজন রুষিয়া দেশীয় পর্য্যটক (ভাগ্যান্বেষী) Calcutta Theatre-এর আদর্শে ও নিকটস্থ ডোম্‌লেনে (বর্ত্তমান এজ্‌রা ষ্ট্রীটে) গোলকনাথ দাসের সহায়তায় "Disguise" নাটকখানি বঙ্গানুবাদ করাইয়া তাঁহারই সহায়তায় "বেঙ্গলী থিয়েটার" বা লেবেডফের New Theatre রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয় উপরোক্ত দুই তারিখে করান। প্রথম রাত্রে থিয়েটারের মূল্য হয় ৮৲ ও ৪৲ এবং দ্বিতীয় রজনীতে প্রতি সিটের মূল্য ১০৲। স্ত্রীলোকের ভূমিকা স্ত্রীলোক দ্বারাই অভিনয় করান হয়, এবং গোলক বাবুই ৫।৬টী অভিনেত্রী জোগাড় করিয়া দেন। লেবেডফের থিয়েটারের পূর্ব্বে ইংরাজদের "Play House" পলাশীর যুদ্ধের সময় সময় অভিনয় করে এবং পরে Calcutta থিয়েটার ১৭৭৬ খৃঃ হইতে ১৮০৮ খৃঃ পর্য্যন্ত এবং মিসেস ব্রিষ্টোর থিয়েটার ১৭৮৭—১৭৯০ পর্য্যন্ত অভিনয় করে। লেবেডফের নিউ বা বেঙ্গলী থিয়েটার এই তিনটী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠানের পরেই স্থাপিত হয়।

[জনৈক ইংরাজের চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা আগমন।]

এই সময়ে নানারূপ কুরুচিপূর্ণ প্রহসন সর্ব্বত্র অভিনীত হইতে থাকে।

১৮৩২—প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুথিয়েটার কর্ত্তৃক ডাক্তার হোরেস হিমেন উইলসনের অনূদিত৹ ভবভূতির উত্তররাম-চরিত (ইংরাজী ভাষায়), জুলিয়াস সিজার (পঞ্চম সর্গ) ও Nothing Superfluous.

১৮৩৩—শ্যামবাজার "দি নেটিভ থিয়েটার" কর্ত্তৃক বাবু নবীনকৃষ্ণ বসুর উদ্যোগে ও বহু অর্থ ব্যয়ে ভারতচন্দ্রের **"বিদ্যাসুন্দর"*** অভিনীত হয়।

সুন্দর—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (বরাহনগর) বিদ্যা—রাধামণি।
মালিনী—জয়দুর্গা।

১৮৩৭—ডেভিড্ হেয়ার একাডেমিতে সংস্কৃত ও হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সেক্সপিয়রের কতিপয় নাটক অভিনীত হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে—মেট্রপলিটান একাডেমীতে জুলিয়াস সিজার।

☞ [টিকেটের মূল্য গ্রহণ করা হয়।]

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে—বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে—জুলিয়াস সিজার।

১৮৫৩—১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে—ওরিয়েণ্টল থিয়েটার কর্ত্তৃক—

ওথেলো, মার্চ্চেণ্ট অব্ ভেনিস, চতুর্থ হেন্‌রী অভিনীত হয়। মিঃ ক্লিঙ্গার শিক্ষাদান করেন, পোর্সিয়া—মিসেস্ গ্রে। প্রিয়নাথ দত্ত, দীননাথ ঘোষ, সীতারাম ঘোষ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং পরে কেশব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও যোগদান করেন।

১৮৫২—ভানুমতীর চিত্ত-বিলাস—(Merchant of Venice হইতে অনূদিত) [অভিনীত হয় না]।

---

*Chowringee Theatre ১৮১৩, ২৫ নভেম্বর হইতে ৩১শে ১৮৩৯।

সাঁসুচি থিয়েটার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৮৪০ পর্য্যন্ত থাকে।

শ্রদ্ধাস্পদ যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে লিখিয়াছেন সাঁসুচি থিয়েটারের আদর্শে হিন্দু-থিয়েটার ও নবীনবাবুর থিয়েটারের সূচনা, তাহা ঠিক নয়। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমরা মৎপ্রণীত "History and Development of the Bengali Stage" এ আলোচনা করিয়াছি।

১৮৫২—*ভদ্রার্জ্জুন নাটক (তারাচাঁদ শিকদার)—

১৮৫৭ মার্চ্চ—কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক (রামনারায়ণ তর্করত্ন)

[জোড়াসাঁকো—চড়কডাঙ্গা (বর্ত্তমান Tagore Castle Road) এ] কুলাচার্য্য—মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরবর্ত্তী বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় একটী স্ত্রী-ভূমিকায়। পণ্ডিতগণ—রাজেন্দ্র বানার্জ্জি, জগৎ দুর্লভ বসাক।

১৮৫৭—মার্চ্চ—(পরের দিন)—শকুন্তলা।

ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেবের বাড়ীতে),—নন্দকুমার রায় কর্ত্তৃক অনুদিত। শকুন্তলা—শরৎচন্দ্র ঘোষ (পরে বেঙ্গল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী), দুষ্মন্ত—প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, অনুসূয়া—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ঋষিকুমার—মহেন্দ্র মুখার্জ্জি, প্রিয়ম্বদা—বেহারী চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার—

১৮৫৭—৯ই এপ্রিল—কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত—

বেণী-সংসার—(রামনারায়ণ তর্করত্ন—ভট্টনারায়ণ হইতে)

ভানুমতী—কালীপ্রসন্ন সিংহ (বহুমূল্য পোষাকে)

১৮৫৭—সেপ্টেম্বর "বিক্রমোর্ব্বশী" কালীপ্রসন্ন ও উমেশচন্দ্র (Mr. W. C. Bonerjee) অভিনয় করেন।

রাজা পুরূরবা—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ঐ মালতীমাধব ও সাবিত্রী সত্যবান।

"Hamlet". Keshab Ch. Sen (Rev) as Hamlet. Rev. Pratap Ch. Mazumder as Laertes and Mr. Narendranath Sen (Editor, "Mirror") as Ophelia.

বেলগাছিয়া থিয়েটার

১৮৫৮—৩১ জুলাই, পণ্ডিত রামনারায়ণ অনুদিত—রত্নাবলী (শ্রীহর্ষ)।

☞ *[ইহাই প্রথম নাটক পদবাচ্য গ্রন্থ, বিস্তারিত আলোচনা History of the Stage এ করিয়াছি] [অভিনয় হইয়াছে কিনা প্রমাণ নাই]

কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী—বিদূষক। প্রিয়নাথ দত্ত—রাজা উদয়ন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ—সেনাপতি। গৌরদাস বসাক—যৌগন্ধরায়ণ। হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি—সাগরিকা। অঘোর চাগরিয়া—সুসঙ্গতা। নটী—চুনিলাল বসু।

১৮৫৯, ৩রা সেপ্টেম্বর—**শর্ম্মিষ্ঠা**…(মাইকেল মধুসূদন)

রাজা যযাতি—প্রিয়নাথ দত্ত। বিদূষক—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রাচার্য্য—দীননাথ ঘোষ। কপিল—শরৎচন্দ্র ঘোষ। সভাসদ্‌গণ—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা) (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পরে রাজা)। বকাসুর—রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। শর্ম্মিষ্ঠা—কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি। দেবযানী—হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি।

১৮৬০—একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ও পদ্মাবতী নাটক মাইকেল কর্ত্তৃক বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য রচিত হয় কিন্তু অভিনয়ের পূর্ব্বেই থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৬০ খৃঃ—(অনুমান) সিঁদুরিয়াপটিতে ৺গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে কেশব সেন মহাশয় কর্ত্তৃক অভিনীত নাটক—

(১) বিধবা বিবাহ (উমেশচন্দ্র মিত্র)।

(২) নব বৃন্দাবন—('চিরঞ্জীব শর্ম্মা' নামে কেশব রচিত)।

পাহাড়ী বাবা—কেশব বাবু।

নীলদর্পণ নাটক

দীনবন্ধু মিত্রের এই প্রসিদ্ধ জাতীয়তা-উদ্দীপক নাটক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথমাভিনয় রজনী——

১৮৬১—পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ঢাকা (East Bengal Stage)

পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার

[মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে]

১৮৬৬—৬ই জানুয়ারী—বিদ্যাসুন্দর (অশ্লীল অংশ বর্জ্জিত) যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, বুঝলে কি না (প্রিয়নাথ বসু মল্লিক) মালতী মাধব, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান (প্রহসন), মালবিকাগ্নিমিত্র, রুক্মিণীহরণ, [অধিকাংশই মহারাজা প্রণীত] রসাবিষ্কার-বোধক (সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর)।

গিরিশের রঙ্গমঞ্চে স্থান

পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটারের কথা শুনিয়াই গিরিশের অভিনয়ে লোকরঞ্জনের স্পৃহা জাগে। কেননা এই সমস্ত ধনাঢ্য (aristocratic) গৃহে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না।

জোড়াসাঁকো থিয়েটার [১৮৬৭ খৃঃ অঃ।]

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে]

১। নব নাটক (রামনারায়ণ)। ২। মানময়ী।

কুলীন বিবাহের দোষ দেখাইয়া "নব নাটক" রচিত হয়।

অক্ষয় মজুমদার—গবেশ বাবু।

ইহার বহুবৎসর পরে—অলীক বাবু, হঠাৎ বাবু, বাল্মিকী-প্রতিভা ও রাজা ও রাণী প্রভৃতি নাটক ঠাকুর বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছে।

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল

[শোভাবাজার রাজবাটীতে]

১৮৬৬— একেই বলে সভ্যতা } মাইকেল রচিত
১৮৬৭—১১ই ফেব্রুয়ারী—কৃষ্ণকুমারী নাটক }

ভীম সিংহ—বেহারী চট্টোপাধ্যায় [কালীপ্রসন্ন সিংহের অভিনয় করিবার কথা ছিল] বলেন্দ্র—প্রিয়নাথ বসু মল্লিক। কৃষ্ণকুমারী—কুমার ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ।

১৮৬৮—পদ্মাবতী—(মাইকেল)

বৌবাজার বেঙ্গল থিয়েটার

১৮৬৮—(দুর্গাপূজা) রামাভিষেক নাটক (মনোমোহন বসু)

কৌশল্যা—চুনীলাল বসু [বেলগাছিয়ার নটী]

১৮৭১—সতীনাটক—(মনোমোহন বসু)

দক্ষ ও শিব—চুনীলাল বসু, শান্তিরাম—মতিলাল বসু, নারদ—প্রতাপ ব্যানার্জ্জি।

১৮৭৪—হরিশচন্দ্র—(মনোমোহন বসু)।

এই অভিনয়ের পরেই চুনী বাবুর স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে থিয়েটার বন্ধ হয়। হরিশচন্দ্র—চুনীলাল।

কম্বলাঘাটা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে।

১৮৬৭ ২রা নভেম্বর—কিছু কিছু বুঝি (প্রহসন)—["বুঝলে কি না?"র প্রত্যুত্তর]।

দন্তবক্র—অর্দ্ধেন্দু শেখর। চন্দনবিলাসী—ধর্ম্মদাস সুর।

বাগবাজার এমেচিয়োর থিয়েটার

১৮৬৯—অক্টোবর—**সধবার একাদশী** [দীনবন্ধু মিত্র]

নিমচাঁদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অটল—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো। কেনারাম—অর্দ্ধেন্দুশেখর। কুমুদিনী—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), জীবনচন্দ্র—ঈশান নিয়োগী। রাম মাণিক্য—রাধামাধব কর। কাঞ্চন—নন্দলাল ঘোষ। নকুড়—মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৭০—বিয়ে পাগলা বুড়ো—(দীনবন্ধু)

রাজীব মুখুয্যে—অর্দ্ধেন্দুশেখর।

১৮৭১—জুলাই **লীলাবতী*** (দীনবন্ধু)

ন্যাসনেল থিয়েটার

প্রথম পাবলিক থিয়েটার

জোড়াসাঁকো মধুসুদন সান্যালের বাড়ীতে

১৮৭২—৭ই ডিসেম্বর— **নীলদর্পণ**

---

*কোন্ সময়ে ন্যাসনাল থিয়েটারের নামকরণ হয়, তাহা লইয়া অনেকটা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন নীলদর্পণ থিয়েটারের সময় ন্যাসনাল নাম দেওয়া হয়, আর গিরিশবাবুর সহিত ন্যাসনালের কোন সংস্রব ছিল না। "বিশ্বকোষ" এই মত সমর্থন করেন। অনেকে অনুমান করেন, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি (অর্দ্ধেন্দুবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) মহাশয়ই উহার "রঙ্গালয়" শীর্ষক প্রবন্ধের রচয়িতা। আবার অনেকে বলেন বাগবাজারের এমেচিয়ার থিয়েটারই ন্যাসনাল নাম দিয়া স্থায়ী ষ্টেজে লীলাবতী অভিনয় করে।

উড, গোলক বসু ও সাবিত্রী—অর্দ্ধেন্দুশেখর। সৈরিন্ধ্রী—অমৃতলাল বসু [নাট্যাচার্য্য]। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পদী—মহেন্দ্র বসু। তোরাপ—মতিসুর।

এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র নিজে কিছু বলেন নাই। আমরা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফি মহাশয়ের কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

["রঙ্গভূমি" ৬ই মাঘ ১৩০৭ শনিবার, "অর্দ্ধেন্দু বাবুর বক্তৃতা" শীর্ষক প্রবন্ধ]

"অনেক দিন রিহার্স্যালের পর ১৮৭১—১২৭৮ সালের বর্ষাকালে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে আমাদের 'নিজের ষ্টেজে' লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হ'ল। এই অভিনয়ে মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু আর হিঙ্গুল প্রথম অভিনয় করেন। রাজেন্দ্র নিয়োগীর কনসার্ট বাজে। এই সময় কোন কোন দিন রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর আমাদের দলে ঢোল বাজাতেন। এই সময় হিন্দুমেলার নবগোপাল মিত্র আমাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি অভিনয় করতেন না বটে, কিন্তু দেখাশুনার সাহায্য করতেন। একদিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী নগেন্দ্র, রাধামাধব, মতিলাল সুর, ধর্ম্মদাস, যোগেন্দ্র মিত্র আর আমি ব'সে আছি। কথা উঠল থিয়েটারের কি নাম দেওয়া হবে? নানা জনে নানা নাম প্রস্তাব করলে। নবগোপাল বাবুর ন্যাসনাল নামটার উপর ভারী ঝোঁক ছিল। তিনি যা কিছু করতেন তার নামে ন্যাসনাল নাম যোগ করে দিতেন। এই জন্য আমরা তাঁর নামই "ন্যাসনাল নবগোপাল" করে নিয়েছিলেম। নবগোপাল বাবু আমাদের থিয়েটারের নাম The Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন। শেষে মতিবাবুর প্রস্তাব মত Calcutta টুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয়। প্রথম দিন ঐ নামেই অভিনয় হয়।

"রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে পর পর তিনটা শনিবার তিনটী অভিনয় হয়। ঐ অভিনয়ে **গিরিশবাবু** ললিতের (হিরো), নগেন বাবু হেমচন্দ্রের, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র নদেরচাঁদের, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীনাথের, মহেন্দ্রবাবু ভোলানাথের, মতিবাবু মেজখুড়োর, হিঙ্গুল খাঁ রঘুয়া উড়ের, সুরেশচন্দ্র মিত্র লীলাবতীর, বেলবাবু সারদা সুন্দরীর, রাধামাধব বাবু ক্ষীরোদবাসিনীর,

বেলবাবু—ক্ষেত্রমণি। নবীনমাধব—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিন্দুমাধব—কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সরলতা—ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। রোগ সাহেব—অবিনাশ কর। গোপীনাথ দেওয়ান—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২১ ডিসেম্বর—জামাই বারিক (দীনবন্ধু)

পদ্মলোচন—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চোর—অর্দ্ধেন্দু বাবু।

১৮৭৩—৪ঠা জানুয়ারী—নবীনতপস্বিনী (দীনবন্ধু)

রাজা—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জলধর—মুস্তফী; বিজয়—অমৃতলাল বসু। কামিনী—ক্ষেত্রবাবু। বগী—মহেন্দ্রবাবু।

৮ ফেব্রুয়ারী—নয়শো রুপেয়া (শিশির কুমার ঘোষ)

ছাতুলাল—মুস্তফী। রঞ্জন—অমৃত বসু। সরলা—ক্ষেত্রবাবু।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—ভারত মাতা।

[ভারত মাতা—মহেন্দ্র বসু, ভারত সন্তান—অমৃত বসু]

মুস্তফী সাহেবকা পাক্কা তামাসা—(দেবকার্সনকে ব্যঙ্গ করিয়া)

২২ ফেব্রুয়ারী—কৃষ্ণকুমারী নাটক (মাইকেল)

ভীম সিংহ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বলেন্দ্র সিংহ—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনদাস—অর্দ্ধেন্দুশেখর। সত্যদাস—মতিলাল সুর। বিলাসবতী—অমৃতলাল (বেলবাবু)। কৃষ্ণকুমারী—ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। অহল্যা—মহেন্দ্র বসু। জগৎসিংহ—কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মদনিকা—অমৃতলাল বসু। নারায়ণ মিশ্র—গোপাল দাস।

ক্ষেত্রবাবু রাজলক্ষ্মীর অংশ, আর আমি ভরবিলাসের অংশ আর একটা ঝি এর অংশ অভিনয় করি। এই ঝি এর অংশ গ্রন্থকার যা রেখেছিলেন তা বাদ দিয়ে আমি মেদিনীপুর অঞ্চলে ভাষায় অভিনয় করি। ন্যাশনাল থিয়েটারে অবৈতনিক ভাবে এই শেষ অভিনয়।

☞ "অর্দ্ধেন্দু নাট্যপাঠাগারের" কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে "রঙ্গভূমি" পাইয়াছিলাম। এখনও সে কাগজ পাঠক দেখিতে পাইবেন।

এই সময়ে মিসেস্ লুই প্রথমে টাউনহলে অভিনয় দেখাইয়া ময়দানে (চৌরঙ্গী রোডের উপর) রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। তাহাই "লুইস্ থিয়েটার" নামে খ্যাত।

৮ই মার্চ্চ—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (দীনবন্ধু)

বুড়ো—অর্দ্ধেন্দু। বেলবাবু—কড়ি।

১০ই মে—**কপালকুণ্ডলা** গিরিশ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিণত

(রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে)

নবকুমার—মহেন্দ্রবাবু। কাপালিক—মতি সুর।

১৩ই ডিসেম্বর—হেমলতা নাটক (হরলাল রায়)

সত্যসখা—মহেন্দ্র বসু। হেমলতা—ক্ষেত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বিধবা—রাধাগোবিন্দ কর (পরে ডাক্তার আর, জি, কর)।

২০শে ডিসেম্বর—কমলে কামিনী (দীনবন্ধু)

বক্কেশ্বর—অমৃত বসু

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা

৯।১ বীডন ষ্ট্রীট

[শরচ্চন্দ্র ঘোষ ও বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে]

১৮৭৩—১৬ই আগষ্ট শর্ম্মিষ্ঠা—(মাইকেল)

দেবিকা ও দেবযানীর ভূমিকা মহিলা কর্ত্তৃক অভিনীত হয়।

২৩শে আগষ্ট—মায়াকানন (মাইকেল)। কবির মৃত্যু ২৯শে জুন।

২০শে অক্টোবর—দুর্গেশনন্দিনী

[জগৎ সিংহ—শরৎ ঘোষ On horse-back]

১৩ই ডিসেম্বর—ইস্, মোহান্তের এ কি কাজ ?

মোহান্ত—বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটার

৬ নং বীডন ষ্ট্রীট

১৮৭৩—৩১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা—

৩১শে ডিসেম্বর—কাম্যকানন। নায়ক—অমৃত বসু।

১৮৭৪—মোহান্তের অনুতাপ—

মোহান্ত—মহেন্দ্রবসু, এলোকেশীর বাপ—অমৃত বসু।

১৮৭৪

*১০ই জানুয়ারী—"আমি তো উন্মাদিনী" শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরী

*১৭ই জানুয়ারী—কুসুমকুমারী। (*Cymbeline*)

*২৪শে জানুয়ারী—প্রণয় পরীক্ষা, নাটক (মনোমোহন বসু)

১৪ ফেব্রুয়ারী—**মৃণালিনী**। †

[গিরিশ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিণত] পশুপতি—গিরিশ ঘোষ। মনোরমা—ক্ষেত্র গাঙ্গুলী। হৃষীকেশ—অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, হেমচন্দ্র—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগ্বিজয়—অমৃতলাল বসু, ব্যোমকেশ—অমৃত মুখোপাধ্যায়, মাধবাচার্য্য—মতিসুর, বক্তিয়ার খিলিজি—মহেন্দ্র বসু।

গ্রেট ন্যাসনাল

৬ বীডন ষ্ট্রীট্

৭ই মার্চ্চ **বিষবৃক্ষ**

(গিরিশ কর্ত্তৃক রূপান্তরিত)

নগেন্দ্র—গিরিশ।

১৯ সেপ্টেম্বর—

"সতী কি কলঙ্কিনী" গীতিনাট্য

(দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রাধা—রাজকুমারী, বৃন্দা—ক্ষেত্রমণি দেবী, কৃষ্ণ—মদন বর্ম্মন্।

৩রা অক্টোবর—পুরুবিক্রম

(জ্যোতিরিন্দ্র)

আলেকজাণ্ডার—নগেন্দ্রবাবু

পুরু—মহেন্দ্রবাবু

রাণী ঐলবিলা—ক্ষেত্রমণি।

বেঙ্গল

৯।১ বীডন ষ্ট্রীট্

১৪ মার্চ্চ—বিদ্যাসুন্দর

মালিনী—গোলাপসুন্দরী।

১১ এপ্রিল—রুক্মিণীহরণ

৬ই জুন—নবনাটক

গবেশ—অক্ষয় বাবু।

২২ আগষ্ট—পুরুবিক্রম

পুরু—শরৎ ঘোষ

রাণী ঐলবিলা—সুকুমারী

আলেকজাণ্ডার—হরিদাসবাবু।

☞ "শ্রদ্ধেয় অমৃত বসু বলেন "পুরু বিক্রম" গ্রেট ন্যাসনালে প্রথম অভিনীত হয়। বোধ হয় নির্দ্ধারিত দিনে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই"।

---

* এই তিনখানি পুরাতন জোড়াসাঁকোয় অভিনীত হয়।

† ১১ই ফেব্রুয়ারী শিশির কুমার ঘোষ রচিত "বাজারের লড়াই" "**বেঙ্গল থিয়েটারে**" অভিনীত হয়। এই সময়ে শীলেদের সহিত হগ্‌ সাহেবের বাজার লইয়া লড়াই ও দাঙ্গা হয়।

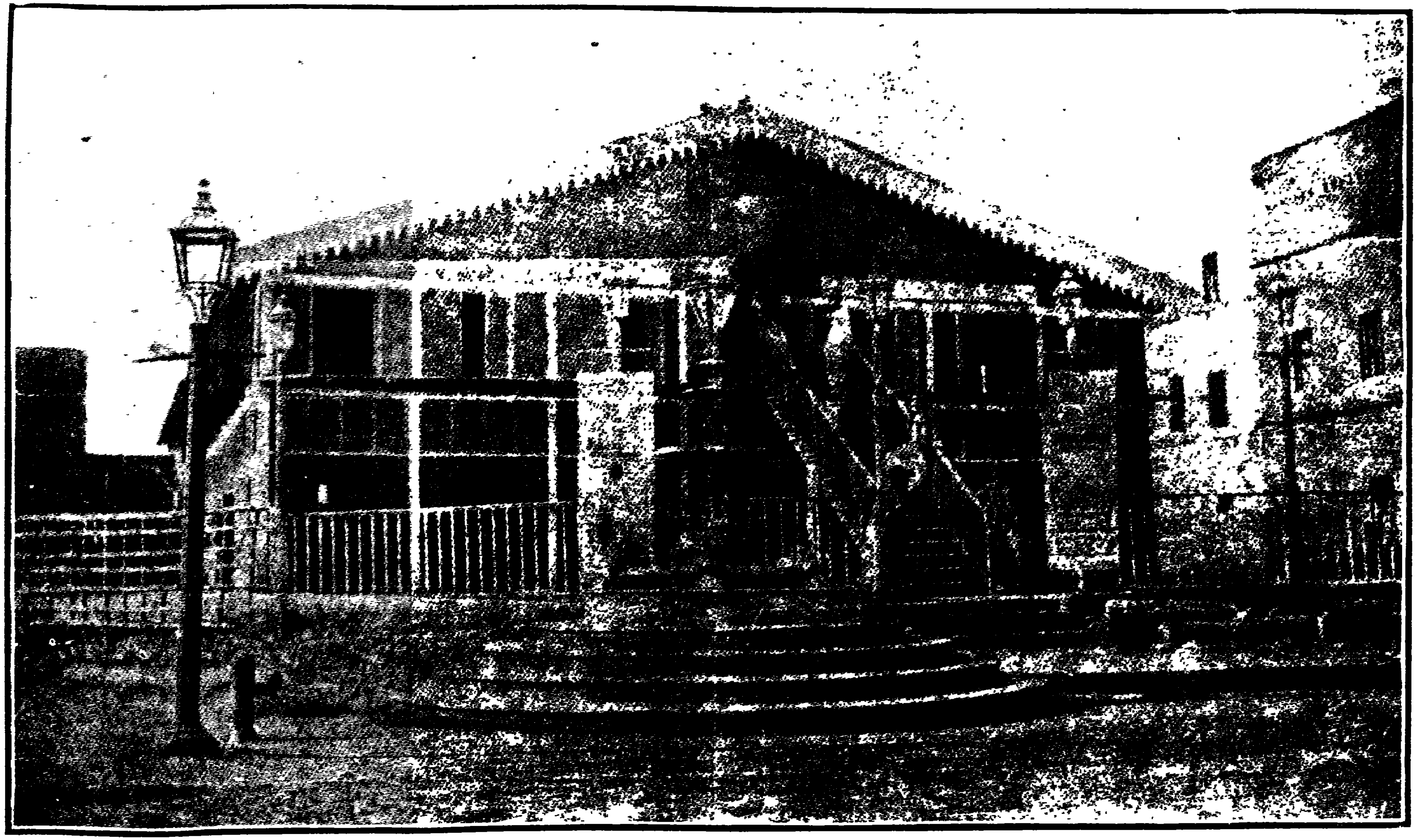

[শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সৌজন্যে।

গ্রেট ন্যাসনাল

১৩ অক্টোবর—রুদ্রপাল
[হরলাল রায় প্রণীত ম্যাকবেথের অনুবাদ]
ম্যাক্‌বেথ—নগেন্দ্র বন্দ্যো।
১৪ নভেম্বর—আনন্দ কানন (গীতিনাট্য)
(লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী)
১২ ডিসেম্বর—শত্রু সংহার বা বেণী সংহার (হরলাল রায়)
২৬ ডিসেম্বর—বঙ্গের সুখাবসান

বেঙ্গল

১২ সেপ্টেম্বর—কৃষ্ণপর্ণের ধন
১৮ " আজমীর কুমারী
অশ্বপৃষ্ঠে কুমারী—সুকুমারী।
১৪ নভেম্বর—বঙ্গের পরাজয়

১৮৭৫

২রা জানুয়ারী—শরৎ সরোজিনী (উপেন্দ্র দাস)
শরৎ—মহেন্দ্র বসু,
সরোজিনী—রাজকুমারী
সুকুমারী—গোলাপ
Scientific Man গোষ্ঠবিহারী দত্ত
২০ ফেব্রুয়ারী—নগনলিনী
১৭ এপ্রিল—তিলোত্তমা-সম্ভব (মধুসূদন)
২৪ এপ্রিল—সাক্ষাৎ দর্পণ
৮ মে—নন্দনকানন (গীতিনাট্য)
১৭ জুন—হীরকচূর্ণ বা গাইকোয়ার নাটক—[অমৃত বসু]
মলহর রাও গাইকোয়ার—অর্দ্ধেন্দু
লক্ষ্মীবাই—লক্ষ্মী
কুমার—জগত্তারিণী

২০শে ফেব্রু—অপূর্ব্ব কারাবাস (Lady of the Lake)
২১ ফেব্রুয়ারী—ওথেলো
২২ মে—মলহর রাও গাইকোয়ার
১৪ আগষ্ট—সুরেন্দ্র বিনোদিনী (উপেন্দ্রনাথ দাস)
[পুরাতন ন্যাসনাল "নিউ বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল ও গ্রেট ন্যাসনাল অপেরা কোম্পানী" নাম দিয়া বেঙ্গল ষ্টেজে অভিনয় করে]
লেসী—উপেন্দ্র বাবু
বিরাজমোহিনী—সুকুমারী।
৩রা নভেম্বর—রামাভিষেক নাটক।

গ্রেট্ ন্যাসনাল

Mr Scoble—Advocate General অমৃত বসু।

চোরের উপর বাটপাড়ী— (অমৃত বসু)

কর্ত্তা—অমৃত বসু, গিন্নী—ক্ষেত্রমণি, নারাণ—মহেন্দ্র বসু।

২৫ সেপ্টেম্বর—কনকপদ্ম (হরলাল রায়)

দুষ্মন্ত—অমৃত বসু, শকুন্তলা—জগত্তারিণী।

৫ নভেম্বর—বৃত্র সংহার

২৬ ডিসেম্বর—সরোজিনী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

লক্ষ্মণ সিংহ—মতিসুর, ভৈরবাচার্য্য—গোপালদাস, বিজয়—অমৃত বসু, রণধীর—মহেন্দ্র বসু।

৩১ ডিসেম্বর—সুরেন্দ্র বিনোদিনী (উপেন্দ্রনাথ দাস)

সুরেন্দ্র—মহেন্দ্র বসু, বিরাজমোহিনী—সুকুমারী, হরিপ্রিয়—ধর্ম্মদাস, ম্যাজিষ্ট্রেট—অমৃত বসু।

১৮৭৬

৮ই জানুয়ারী—প্রকৃত বন্ধু (ব্রজেন্দ্র রায়)

১৫ জানুয়ারী—গজদানন্দ* (প্রহসন), প্রস্তাবনা ও গান **গিরিশের**।

প্রিন্স—মহেন্দ্র বসু, পিসী—ক্ষেত্রমণি। গজদানন্দ—নগেন্দ্র।

---

* ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে যুবরাজ এডওয়ার্ড (তৎপরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতা পদার্পণ করেন। ভবানীপুরে খ্যাতনামা উকীল ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজকে নিজভবনে আহ্বান করিয়া কুলমহিলাদের দ্বারা বরণ করিয়া লয়েন। দেশে ভয়ানক হুলস্থূল হয় ও হিন্দুসমাজ এই সম্বর্দ্ধনার তীব্র প্রতিবাদ করে। হিন্দুপেট্রিয়ট্ বলেন "National feeling has been outraged." গজদানন্দ প্রহসন লিখিয়া ন্যাসনাল থিয়েটারও সাধারণের প্রতিবাদে যোগদান করে। গিরিশবাবু যে প্রস্তাবনা লিখিয়া দেন, তাহা কবি হেমচন্দ্রের "বাজীমাৎ" কবিতার অনেক পূর্ব্বে রচিত। অন্যান্য দুইখানি প্রহসনও ইহার নামান্তর মাত্র। বলা বাহুল্য গভর্ণমেণ্ট

গ্রেট ন্যাসনেল—

২৬ ফেব্রুয়ারী—হনুমানচরিত ও কর্ণাট কুমার (প্রহসন)

১লা মার্চ্চ—সুরেন্দ্র বিনোদিনী ও Police of Pig and Sheep

১লা এপ্রিল পদ্মিনী—

আদর্শ সতী বা সাবিত্রী সত্যবান (গীতিনাট্য)।

১৮৭৭

১৩ জানুয়ারী—পারিজাত হরণ (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)

[রামতারণ সান্ন্যাল মহাশয়ই এখন হইতে গানে সুর সংযোজনা করেন।]

৬ই অক্টোবর—**আগমনী** (গিরিশ)

গিরিরাজ—রামতারণ সান্ন্যাল, মহাদেব—কেদার চৌধুরী, উমা—বিনোদিনী, মেনকা—কাদম্বিনী।

'অর্ডিনান্সের' সহায়তায় গজদানন্দ, হনুমান চরিত ও Police of Pig and Sheep বন্ধ করিয়া দেন। শেষোক্ত প্রহসনে পুলিস কমিশনার স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ্ ও সুপারিন্টেডেন্ট Lamb সাহেবকে ব্যঙ্গ করিয়া নাম দেওয়া হয়।

ইহার পরেই 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' অভিনয়ের জন্য উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসু মহাশয়ের একমাস করিয়া বিনাশ্রম কারাবাস হয়, আপিলে মুক্তি পান ও 'ড্রামেটিক পারফরম্যান্স' বিল পাশ হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে "চাকর দর্পণ" নাটক প্রকাশিত হয়, কিন্তু অভিনয় কোথাও হয় নাই। সরকারের অভিমতে এই নাটকখানিতে নাকি চা-কর সাহেবকে রাক্ষসরূপে পরিণত করা হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গোষ্ঠবিহারী দত্তের সহিত গোলাপ সুন্দরীর বিবাহ। এখন হইতে তাহার নাম হয় সুকুমারী দত্ত। সুকুমারীর বিবাহেও অনেকে অসন্তুষ্ট হন। বিস্তারিত আলোচনা History of the Stageএ করিয়াছি। Forward কাগজেও অনেকবার এই আলোচনা হইয়াছে।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী ও গজদানন্দই ড্রামেটিক আইনের হেতু হয়। বিলটী আইনে বিধিবদ্ধ হয় ১৮৭৬ খৃঃ ১৬ই ডিসেম্বর।

১লা ডিসেম্বর—**মেঘনাদবধ**

(গিরিশ কর্ত্তৃক নাটকে পরিণত)

মেঘনাদ ও রাম—গিরিশ। রাবণ—অমৃত মিত্র। প্রমীলা—বিনোদিনী। নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা—ক্ষেত্রমণি। লক্ষ্মণ—কেদার চৌধুরী। মন্দোদরী—কাদম্বিনী দাসী। বিভীষণ—মতি সুর। কার্ত্তিক—বেল বাবু। মদন—রামতারণ সান্ন্যাল।

১০ অক্টোবর—**অকাল বোধন** (গিরিশ)

রামচন্দ্র—গিরিশ, ইন্দ্র—মহেন্দ্র বসু।

১৮৭৮

৫ জানুয়ারী—**পলাশীর যুদ্ধ**—গিরিশকর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত। ক্লাইভ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সিরাজদ্দৌল্লা—মহেন্দ্র বসু। জগৎ শেঠ ও ঘাতক—অমৃত মিত্র। মোহনলাল—কেদার চৌধুরী। বেগম—লক্ষ্মী। রাণীভবানী—কাদম্বিনী। বৃটেনেশ্বরী—বিনোদিনী।

৪ঠা মার্চ্চ—**দোললীলা** (গিরিশ)

১৩ জুন—**আলাদ্দিন** বা আশ্চর্য্যপ্রদীপ (গিরিশ)

২২ জুন—**দুর্গেশনন্দিনী** (গিরিশের দ্বারা রূপান্তরিত)

জগৎ সিংহ—গিরিশ বাবু, ওসমান—মহেন্দ্র বসু।

[প্রথম রাত্রে কেদার বাবু ও কিরণ বন্দ্যো]

তিলোত্তমা ও আয়েষা—বিনোদিনা, বিমলা—কাদম্বিনী।

১৮৭৯

১লা জানুয়ারী—কামিনীকুঞ্জ (কুঞ্জবিহারী বসু)।

২৬ জুলাই—নন্দনকুসুম [ন্যাসনাল সম্প্রদায় ঢাকায় যায়]

১৮৮০

ন্যাসানল থিয়েটার—

১লা জানুয়ারী—হামির* (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)

[গিরিশ গান সংযোজনা করেন।

---

* এখন হইতেই গিরিশ পার্কার সাহেবের কাজ ছাড়িয়া রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য প্রতাপচাঁদ জহুরির চালিত ন্যাসনালের স্থায়ী ম্যানেজার হন।

হামির—গিরিশ ঘোষ, লীলা—বিনোদিনী, জাল মন্ত্রী—অমৃত বাবু, ভাট—মহেন্দ্র বসু, বীলনদেব—অমৃত মিত্র।

১৮৮১

১২ জানুয়ারী—**রাসলীলা** (গিরিশ ঘোষ)

১৫ জানুয়ারী—**শিবের বিবাহ**

২২ জানুয়ারী—**মায়াতরু** (গিরিশ ঘোষ)

চিত্র ভানু—মহেন্দ্র বসু, সুরত—রামতারণ সান্ন্যাল, উদাসিনী—ক্ষেত্রমণি, ফুলহাসি—বিনোদিনী, ফুলধুলা—বনবিহারিণী।

১৬ এপ্রিল—**মোহিনী প্রতিমা** (গিরিশ)

সাহানা—বিনোদিনী, কুহকী—গিরিশ ঘোষ।

ঐ **আলাদিন**— (গিরিশ)

আলাদিন—রামতারণবাবু। ঐ মা—ক্ষেত্রমণি।

২রা এপ্রিল—**মাধবীকঙ্কণ**

[গিরিশকর্তৃক নাটকে রূপান্তরিত। গিরিশ সাজাহান, দর্জ্জি, মুদ্দফরাস (Grave digger), প্রভৃতি ৭টী ভূমিকায়।

২১ মে—**আনন্দ রহো** বা আকবর— (গিরিশ)

[এই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিরচিত "অশ্রুমতি নাটক" অভিনীত হয়।]

আনন্দ রহো—গিরিশ। আকবর ও প্রতাপ—অমৃত মিত্র। মানসিংহ—অমৃত বসু, যমুনা—কাদম্বিনী, মহিষী—ক্ষেত্রমণি, লহনা—বিনোদিনী।

৩০ জুলাই—**রাবণবধ**— (গিরিশ)।

রাম—গিরিশ। রাবণ—অমৃত মিত্র। লক্ষ্মণ—মহেন্দ্র বসু। নিকষা, কালী, দুর্গা ও ত্রিজটা—ক্ষেত্রমণি। সীতা—বিনোদিনী। বিভীষণ—অমৃত বসু। মন্দোদরী—কাদম্বিনী। ইন্দ্র—বেলবাবু।

১৭ সেপ্টেম্বর—**সীতার বনবাস** (গিরিশ)

রাম—গিরিশ। লক্ষ্মণ—মহেন্দ্র বসু। বাল্মিকী—অমৃত মিত্র।

বশিষ্ঠ—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী। সীতা—কাদম্বিনী। লব—বিনোদিনী। নিকষা—ক্ষেত্রমণি। অলিক্ষরা—বনবিহারিণী। ভরত—বেলবাবু।

২১ সেপ্টেম্বর—তিলতর্পণ (অমৃতবাবু)

বাপ্পারাও—অমৃত বসু।

২৬ নভেম্বর—**অভিমন্যু বধ** (গিরিশ)

যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অভিমন্যু—বেলবাবু, রোহিণী—কাদম্বিনী, উত্তরা—বিনোদিনী, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রোণাচার্য্য—কেদার চৌধুরী, সুভদ্রা—গঙ্গামণি, ভীম ও গর্গ—অমৃত মিত্র, অর্জ্জুন ও জয়দ্রথ—মহেন্দ্র বসু, দুঃশাসন—নীলমাধববাবু।

৩১ ডিসেম্বর—**লক্ষ্মণ বর্জ্জন** (গিরিশ)

রাম—গিরিশ ঘোষ, লক্ষ্মণ—মহেন্দ্র বসু।

১৮৮২

ন্যাসনাল

১১ মার্চ্চ **সীতার বিবাহ** (গিরিশ)

বিশ্বামিত্র—গিরিশ ঘোষ, রাম—বেলবাবু, সীতা—ছোটরাণী।

১২ এপ্রিল—**ব্রজবিহার** (গিরিশ)

১৫ এপ্রিল—**রামের বনবাস**—(গিরিশ)

দশরথ—অমৃত মিত্র, ভরত—অমৃত বসু, বশিষ্ঠ—নীলমাধব চক্র, রাম—মহেন্দ্র বসু, কৈকেয়ী—বিনোদিনী, সীতা—ভূষণ, লক্ষ্মণ—বেলবাবু, মন্থরা—ক্ষেত্রমণি।

২২ জুলাই **সীতা হরণ**—(গিরিশ)

রাম—মহেন্দ্র বসু, রাবণ ও বালী—অমৃত মিত্র, মন্দোদরী ও তারা—কাদম্বিনী, লক্ষ্মণ—বেলবাবু, সীতা—বিনোদিনী, সুগ্রীব—অমৃত বসু, শূর্পণখা, উগ্রচণ্ডা ও চেড়ী—ক্ষেত্রমণি।

৭ অক্টোবর—**ভোট মঙ্গল** (গিরিশ)

২৮ অক্টোবর—**মলিনমালা** (গিরিশ)

২৫ ডিসেম্বর—ডিস্‌মিস্ (অমৃত বসু) [☞ "বেঙ্গল থিয়েটারে"]

১৮৮৩

৩রা ফেব্রুয়ারী—**পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস** (গিরিশ)

ভীম, ভীষ্ম ও ব্রাহ্মণ—অমৃত মিত্র, দ্রৌপদী—বিনোদিনী, কীচক ও দুর্য্যোধন—গিরিশ, বৃহন্নলা—মহেন্দ্র বসু, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য্য—কেদার চৌধুরী, হাড়িণী—ক্ষেত্রমণি, অভিমন্যু—বনবিহারিণী (ভুনী)।

☞ প্রতাপ জহুরির সহিত গিরিশের মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি চলিয়া যান। কেদারনাথ চৌধুরী ম্যানেজার হয়েন। "আনন্দমঠ" অভিনীত হয়। জীবানন্দ—মহেন্দ্র বসু, শান্তি—বনবিহারিণী। কেদার-বাবুর "ছত্রভঙ্গ" নাটক প্রতাপের 'ন্যাসনালে' শেষ অভিনয়। দুর্য্যোধন—কেদার চৌধুরী, দ্রৌপদী—বনবিহারিণী, ধৃষ্টদ্যুম্ন—মহেন্দ্র চৌধুরী।

"ষ্টার"

৬৮ বীডন ষ্ট্রীট (গুর্ম্মুখ প্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমান মনোমোহনে)

২১ জুলাই—**দক্ষযজ্ঞ** (গিরিশ)

দক্ষ—গিরিশ, নন্দী—অঘোর পাঠক, ভৃঙ্গী—প্রবোধ ঘোষ, প্রসূতি—কাদম্বিনী, তপস্বিনী—ক্ষেত্রমণি, মহাদেব—অমৃত মিত্র, সতী—বিনোদিনী, দধিচি—অমৃত বসু।

১১ আগষ্ট—**ধ্রুবচরিত্র** (গিরিশ)

ধ্রুব—ভূষণ, উত্তানপাদ—অমৃত মিত্র, সুরুচি—বিনোদিনী, বিদূষক—অমৃত বসু, সুনীতি—কাদম্বিনী।

১৫ ডিসেম্বর—**নলদময়ন্তী** (গিরিশ)

নল—অমৃত মিত্র, দময়ন্তী—বিনোদিনী, বিদূষক—অমৃত বসু, কলি—অঘোর পাঠক, পুষ্কর—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।

২৫ ডিসেম্বর—**চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে** (অমৃত বসু)

চাটুয্যে—উপেন্দ্র মিত্র, বাঁড়ুয্যে—নীলমাধব, ঝি—ক্ষেত্রমণি।

১৮৮৪

২৬শে মার্চ্চ—**কমলেকামিনী** (গিরিশ)

শ্রীমন্ত—ভূনী, খুল্লনা—বিনোদিনী, ধাত্রী—যাদুমণি।

১৯ এপ্রিল—**বৃষকেতু** (গিরিশ)

কর্ণ—উপেন্দ্র মিত্র, বৃষকেতু—ভূষণ, পদ্মাবতী—বিনোদিনী।

ঐ —**হীরারফুল** (গিরিশ)

৭ই জুন—**শ্রীবৎস চিন্তা** (গিরিশ)

শ্রীবৎস—অমৃত মিত্র, চিন্তা—বিনোদিনী, বাতুল—অমৃত বসু, লক্ষ্মী—গঙ্গামণি, শনি—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।

☞ বৎসরেক পরেই অমৃত মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃত বসু, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু, দাসুচরণ নিয়োগী ষ্টারের সত্বাধিকারী হয়েন।

২রা আগষ্ট—**চৈতন্যলীলা** (গিরিশ)

চৈতন্য—বিনোদিনী, নিতাই—বনবিহারিণী, প্রতিবেশী—অমৃত বসু, জগাই—প্রবোধ ঘোষ, মাধাই—অমৃত মিত্র, লক্ষ্মী—প্রমদা, বিষ্ণুপ্রিয়া—কিরণবালা, মালিনী—ক্ষেত্রমণি দেবী।

২২শে নভেম্বর—**প্রহ্লাদ চরিত্র*** (গিরিশ)

হিরণ্যকশিপু—অমৃত মিত্র, প্রহ্লাদ—বিনোদিনী।

ঐ তারিখে—বিবাহ-বিভ্রাট (অমৃত বসু)

মিঃ সিং—অমৃত বসু, মিসেস্ কারফরমা—বিনোদিনী, ঝি—ক্ষেত্রমণি, কর্ত্তা—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, পরে বেলবাবু, নন্দ—অঘোর পাঠক, পরে প্রবোধ ঘোষ।

৩১ ডিসেম্বর—আদর্শসতী [অতুলকৃষ্ণ মিত্র] (অপেরা)

আদর্শসতী—বনবিহারিণী, সত্যবান—রামতারণ সান্যাল।

১৮৮৫

১০ জানুয়ারী—**নিমাই সন্ন্যাস** (গিরিশ)

নিমাই—বিনোদিনী, কেশবভারতী—অমৃত মিত্র।

৯ই মে—**প্রভাসযজ্ঞ** (গিরিশ)

১৯ সেপ্টেম্বর—**বুদ্ধদেব চরিত** (গিরিশ)

---

* এই সময়ে "বেঙ্গল থিয়েটারে" রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত প্রহ্লাদচরিত্র অভিনীত হয়। হিরণ্যকশিপু—যোগেন ঘটক, প্রহ্লাদ—কুসুম। অভিনয় খুব জমে। এই কুসুমের নাম হয় 'প্রহ্লাদ-কুসুম'।

বুদ্ধ—অমৃত মিত্র, গোপা—বিনোদিনী, ছন্দক—বেলবাবু, শিষ্য ও গণক—অমৃতলাল বসু, পুত্রহারা-রমণী—ক্ষেত্রমণি।

[অভিনয় দেখিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার খুব কাঁদেন]

বেঙ্গল থিয়েটার

২১ নভেম্বর—দুর্ব্বাসার পারণ। ১৯ ডিসেম্বর—রাজসূয় যজ্ঞ।

ন্যাসনাল

১২ সেপ্টেম্বর—কুমারসম্ভব (হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য)। রতি—সুকুমারী।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুলাই রাজা বসন্ত রায় [বৌ ঠাকুরাণীর হাট হইতে কেদার চৌধুরী কর্ত্তৃক রূপান্তরিত]। বসন্ত রায়—রাধামাধব কর ;

প্রতাপ—মতিসুর, উদয়—মহেন্দ্র বসু, বিভা—সুকুমারী, পরে হরি (বিভাহরি), সুরমা—ছোটরাণী।

এই বৎসর মহেন্দ্র বসু অপেরা হাউসেও ২।৩ মাস অভিনয় করেন।

১৮ জানুয়ারী—মহাশ্বেতা (নগেন্দ্র ঘোষ)

২৯ মে—বিমুক্তবেণীবন্ধন [নগেন্দ্র ঘোষ]

অর্জ্জুন—মহেন্দ্র, দ্রৌপদী—কাদম্বিনী।

১৮৮৬

ষ্টার

২৪ ফেব্রুয়ারী—বাল্মিকী-প্রতিভা (রবীন্দ্রনাথ)

In aid of আদি ব্রাহ্মসমাজ]

১২ জুন—**বিল্বমঙ্গল** (গিরিশ)

বিল্বমঙ্গল—অমৃত মিত্র, সাধক—বেলবাবু, ভিক্ষুক—অঘোর পাঠক, সোমগিরি—প্রবোধ ঘোষ, থাক—ক্ষেত্রমণি, চিন্তা—বিনোদিনী, পাগলিনী—গঙ্গামণি, অহল্যা—বনবিহারিণী, রাখাল বালক—পুঁটুরাণী।

২৫ ডিসেম্বর—**বেল্লিকবাজার** (গিরিশ)

দুকড়ি সেন—অমৃতবাবু, পিসি—ক্ষেত্রমণি, ললিত—কাশীবাবু।

বেঙ্গল

৩০ জানুয়ারী—স্বাধীনজেনানা

১২ জুন—ভীষ্ম-শরশয্যা (রাজকৃষ্ণ রায়)

১৮ সেপ্টেম্বর—শিশুবধ (রাজকৃষ্ণ রায়)

৬ নভেম্বর—সুরুচির ধ্বজা

১৮৮৭

ষ্টার

২১ জুন—**রূপ সনাতন** (গিরিশ)

সনাতন—অমৃত মিত্র, সুবুদ্ধি—অমৃত বসু, চৈতন্যদেব—বেলবাবু, অলকা—বনবিহারিণী, বিশাখা—কিরণবালা।

☞ এই মঞ্চেই গোপাললাল শীলের **এমারেল্ড** আরম্ভ হয়।

৮ই অক্টোবর—পাণ্ডব নির্ব্বাসন (কেদার চৌধুরী)

ভানুমতী—ছোটরাণী, দ্রৌপদী—ভুনী, দুর্য্যোধন—মহেন্দ্র বসু, ধৃতরাষ্ট্র—মুস্তফী, শকুনি—রাধামাধব কর, যুধিষ্ঠির—মতিসুর।

১৩ই নভেম্বর—বিধবা সঙ্কট

বেঙ্গল

২২ জানুয়ারী—পাণ্ডব নির্ব্বাসন (বেহারী চট্টো)

৯ই এপ্রিল—শ্রীবৎস চিন্তা (ঐ)

৩০ মে—রুক্মিণী রঙ্গ। ২৯শে অক্টোবর—প্রভাস মিলন।

বীণা

১০ই ডিসেম্বর—"চন্দ্রহাস" (রাজকৃষ্ণ রায়)

চন্দ্রহাস—জনৈক বালক।

১০ই ডিসেম্বর—প্রহ্লাদচরিত্র (ঐ)

হিরণ্যকশিপু—রাজকৃষ্ণবাবু।

১৮৮৮

এমারেল্ড

৬৮ বীডন ষ্ট্রীট

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—সুভদ্রা হরণ—

সুভদ্রা—সুকুমারী।

১৭ই মার্চ—**পূর্ণচন্দ্র** (গিরিশ)

রাজা—মহেন্দ্র বসু, পূর্ণ—সুকুমারী, লুনা—বনবিহারিণী, সুন্দরা—কিরণশশী (ছোটরাণী), ইচ্ছা—ক্ষেত্রমণি, গোরক্ষনাথ—দাসুবাবু।

২রা জুন—তুলসীলীলা—

১৫ জুলাই—যেমন কর্ম্ম তেমন ফল—

মুন্সেফ—মতিবাবু।

২১ জুলাই—নন্দবিদায় (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)। গান বাঁধেন **গিরিশ**

নন্দ—মতিসুর, যশোদা—ভবতারিণী, কংশ—হরিভূষণ, কৃষ্ণ—কুসুম (বিবাদ), রাধিকা—বিড়াল হরি।

৫ই অক্টোবর—**বিষাদ** (গিরিশ)

অলর্ক—মহেন্দ্রবসু, মাধব—মতিসুর, বিষাদ—কুসুম, উজ্জলা—ছোটরাণী, সোহাগী—ক্ষেত্রমণি, শিবরাম—হরিভূষণ।

৫ই ডিসেম্বর—গাধা ও তুমি—[You and Ass], বীণার "দাদা ও আমি"র প্রত্যুত্তর।

ষ্টার

(বর্ত্তমানে ষ্টার)

২৩শে মে—**নসীরাম** (গিরিশ)

নসীরাম—অমৃত বসু, অনাথ নাথ—অমৃত মিত্র, বিরজা—কাদম্বিনী, পাহাড়িয়া বালক—তারা, সোণা—গঙ্গামণি, কাপালিক—অঘোর পাঠক, যোগেশনাথ—উপেন্দ্র মিত্র, শম্ভুনাথ—বেলবাবু।

২২শে সেপ্টেম্বর—সরলা (অমৃত বসু কর্ত্তৃক রূপান্তরিত)

সরলা—কিরণবালা, শ্যামা—গঙ্গামণি, প্রমদা—কাদম্বিনী, শশিভূষণ—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, বিধুভূষণ—অমৃত মিত্র, গদাধর—বেলবাবু, নীলকমল—পরাণ শীল।

বীণা

—হরধনু ভঙ্গ (রাজকৃষ্ণ রায়)

১১ই ফেব্রুয়ারী—ভণ্ড দলপতির দণ্ড (রাজকৃষ্ণ রায়)

১০ মার্চ্চ—কুমার বিক্রম— ঐ

১৭ জুন—হরিদাস ঠাকুর (রাজকৃষ্ণ রায়)

২৫ আগষ্ট—ভ্রান্তি বিলাস (Comedy of Errors)

৮ই ডিসেম্বর—নিউ ন্যাসনাল কর্ত্তৃক "দাদা ও আমি" (উপেন্দ্র দাস)

দাদা—বিনোদ সোম, আমি—উপেনদাস (U. N. Das)

বেঙ্গল

১৯ মে—গোলেবোকলি (কুঞ্জ বসু)। ভগুবীর—

২৯ জুন—নন্দবিদায় (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)

৩০ নভেম্বর—পরীক্ষিৎ

১৮৮৯

ষ্টার

১৭ এপ্রিল—**প্রফুল্ল** (গিরিশ)

যোগেশ—অমৃত মিত্র, রমেশ—অমৃত বসু, উমাসুন্দরী—গঙ্গামণি, জ্ঞানদা—কিরণবালা, সুরেশ—কাশীবাবু, শিবনাথ—রাণু বাবু, প্রফুল্ল—ভূষণকুমারী, কাঙ্গালীচরণ—শ্যামাচরণ কুণ্ডু, ভজহরি—বেলবাবু, যাদব—তারাসুন্দরী, ইতর স্ত্রীলোক—বনবিহারিণী, জগমণি—তুন্নামণি, মদন ঘোষ—নীলমাধব বাবু, জনৈক লোক—অঘোর পাঠক।

৭ই সেপ্টেম্বর—**হারানিধি** (গিরিশ)

হরিশ—অমৃত মিত্র, অঘোর—বেলবাবু, কমলা—কিরণবালা, হেমাঙ্গিনী—তারা, কাদম্বিনী—গঙ্গা, হৈমবতী—জগত্তারিণী, সুশীলা—নগেন্দ্রবালা, নব—মহেন্দ্র চৌধুরী।

এমারেল্ড

৮ই জুন—রাসলীলা (মনোমোহন বসু)। কালিন্দী—সুকুমারী।

১৩ই জুলাই—সরোজা (রাধামাধব কর)

২১শে জুলাই—বক্কেশ্বর। বক্কেশ্বর—মুস্তফী।

১৯শে অক্টোবর—কিরণশশী (মনোমোহন বসু)

১৩ই ডিসেম্বর—গোপীগোষ্ঠ (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)

আয়ান—হরিভূষণ, কৃষ্ণ—কুসুম, রাধিকা—বিড়ালহরি, জটিলা—ক্ষেত্রমণি, কুটিলা—গুলফনহরি।

২৫শে ডিসেম্বর—ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

১৮৮৯

বীণা

৪ঠা আগষ্ট—মীরাবাই (রাজকৃষ্ণ রায়)

কুম্ভ—অক্ষয়কালী কোঁয়ার, মীরা—তিনকড়ি।

১০ই আগষ্ট—পরীলীলা

হিরণ্ময়ী (ভবানীপুর হইতে)

১৪ই সেপ্টেম্বর—শ্রীকৃষ্ণের অন্ন ভিক্ষা।

বেঙ্গল

২রা মার্চ্চ—শৈলজা

১লা জুন—জন্মাষ্টমী

১৬ই নভেম্বর—শকুন্তলা [অপেরা] [কুঞ্জবসু]

দুষ্মন্ত—মথুর চট্টোপাধ্যায়।

২৫শে ডিসেম্বর—নাট্যবিকার (বৈকুণ্ঠ বসু)

১৮৯০

এমারেল্ড

১৮ই জানুয়ারী—আনন্দকুমার (অতুল মিত্র)

৭ই জুন—রাজা ও রাণী (রবীন্দ্রনাথ)

বিক্রম—মতিসুর, কুমার সেন—মহেন্দ্র বসু, দেবদত্ত—হরিভূষণবাবু, রাণী—গুলফন হরি, ইলা—কুসুম (বিষাদ)

যণ্ড—

১৩ই ডিসেম্বর—অনুপমা (সামাজিক)

গোবর্দ্ধন—মতিসুর, অনুপমা—ভূষণ।

ষ্টার

১লা জানুয়ারী—তাজ্জবব্যাপার or 20th Century. (অমৃত বসু)

২৬শে জুলাই—**চণ্ড** (গিরিশ), ঐতিহাসিক নাটক—

চণ্ড—অমৃত মিত্র, পূর্ণরাম ভাট—অমৃত বসু, রঘুদেব—দানীবাবু, মুকুলজী—তারাসুন্দরী, গুঞ্জমালা—নগেন্দ্রবালা, বিজুরী—গোলাপ সুন্দরী (সুকুমারী), রণমল্ল—টুন্নামণি।

১৩ই সেপ্টেম্বর—**মলিনাবিকাশ** (গিরিশ)

বিকাশ—সুকুমারী, মলিনা—মানদা।

১৩ই সেপ্টেম্বর—বাঞ্ছারাম (অমৃত বসু)

বাঞ্ছারাম—নীলমাধব।

২০শে ডিসেম্বর—তরুবালা (অমৃত বসু)

ঠাকুর দা—নীলমাধব, তরুবালা—প্রমদা, অখিল—অমৃত মিত্র, 'বেহারী খুড়ো—অমৃত বাবু, শান্তা—নগেন, ঠানদিদি—গঙ্গা, পারুল—মানদা, হীরালাল—অক্ষয়বাবু।

২৪শে ডিসেম্বর—**মহাপূজা** (গিরিশ)

বীণা

২৬শে জুন—চন্দ্রাবলী (রাজকৃষ্ণ রায়)

১৫ই নভেম্বর—জটিল (ঐ) । লোভেন্দ্র গবেন্দ্র।

বেঙ্গল

১লা মার্চ্চ—সীতার স্বয়ম্বর

১৮৯১

এমারেল্ড

২৮ জুন—মণিপুর যুদ্ধ [দীনবন্ধু মিত্রের কমলেকামিনী অবলম্বনে]

২৬ সেপ্টেম্বর—নিত্য লীলা বা উদ্ধব-সঙ্গীত (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)

৩রা সেপ্টেম্বর—লালা গোলকচাঁদ [সুরেন্দ্রনাথ বসু]

মাতাজী—বিষাদ কুসুম, লালা—মহেন্দ্র বসু।

ষ্টার

২১ মার্চ্চ—কনসেণ্ট ডিলেমা (সম্মতি সঙ্কট)

১৩ জুন—নরমেধ যজ্ঞ (রাজকৃষ্ণ রায়)

সিদ্ধার্থ—অমৃত মিত্র, মণিদত্ত—তারা, কাত্যায়নী—গঙ্গা, যযাতি—উপেন্দ্র মিত্র, মহানন্দ—অমৃত বসু।

২২ আগষ্ট—বিদ্যাসাগর-বিলাপ (অমৃত বসু)

৫ই ডিসেম্বর—লয়লামজনু (রাজকৃষ্ণ রায়)

মুন্নাবাদী—তারা, লয়লা—নগেন্দ্রবালা, মজনু—কাশীবাবু।

২৫ ডিসেম্বর—রাজাবাহাদুর (অমৃত বসু)

মিঃ ফিস—অমৃত বসু, রাজাবাহাদুর—উপেন্দ্রবাবু।

বীণা *

দেবী চৌধুরাণী। ২৫ ডিসেম্বর—পয়জারে পাল্কি

যাদুকর—নীলমাধববাবু, পাল্কা—শ্যামাচরণ কুণ্ড।

বেঙ্গল

৩রা এপ্রেল—গোবর গণেশ। ২রা মে—পর্ম্মিষ্ঠা (কুঞ্জবিহারী বসু)

১৩ জুন—বাণযুদ্ধ (বিহারী চট্টোপাধ্যায়) ১৯ ডিসেম্বর—বসন্তসেনা।

(প্রিন্স ভিক্টারের সম্মুখে অভিনয় করার জন্য অতঃপর "রয়্যাল বেঙ্গল"।)

১৮৯২

এমারেল্ড

৩রা জানুয়ারী—বিধবা কলেজ চাবুক (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)

১৭ ডিসেম্বর—কৃষ্ণকান্তের উইল

কৃষ্ণকান্ত—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দলাল—মহেন্দ্র বসু, রোহিণী—সুকুমারী দত্ত, ভ্রমর—হরিসুন্দরী (ব্লাকী)।

ষ্টার

২৬ নভেম্বর—বনবীর (রাজকৃষ্ণ রায়)

বনবীর—অমৃত মিত্র, উদয়—তারা, পান্না—গঙ্গা।

২৪ ডিসেম্বর—ঋষ্যশৃঙ্গ (রাজকৃষ্ণ রায়)। ঋষ্যশৃঙ্গ—নরসুন্দরী।

২৫ ডিসেম্বর—কালাপাণি (অমৃতবাবু)। ন্যায়রত্ন—হরি ভট্টাচার্য্য।

বীণা

৭ই ফেব্রুয়ারী—লক্ষহীরা (রাজকৃষ্ণ রায়)

বেঙ্গল

১৭ ডিসেম্বর—শ্রীরামনবমী (কুঞ্জবাবু)

---

* গিরিশবাবুর সহিত দুর্ব্যবহার করিবার জন্য ষ্টার হইতে পৃথক্ হইয়া বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী সিটি সম্প্রদায় ঠিক করিয়া এইখানে ষ্টারের নাটকাদি অভিনয় করেন। দেবী চৌধুরাণী। ভবানী পাঠক—নীলমাধববাবু।

১৮৯৩

মিনার্ভা

২৮ জানুয়ারী—**ম্যাকবেথ** (গিরিশ)

ম্যাকবেথ—গিরিশ, লেডিম্যাকবেথ—তিনকড়ি, মুস্তফী—Witch, Porter, Doctor, Murderer, Old gentleman। ম্যাকডাফ্‌ হিকেট—অঘোর পাঠক, ম্যালকমম্—দানীবাবু, ম্যাঙ্গাস্—বটব্যাল, ডোলেনবেন—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, Bleeding Soldier—চূণীবাবু।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—**মুকুলমুঞ্জরা** (গিরিশ)

তারা—তিনকড়ি, মুকুল—দানীবাবু, চন্দ্রধ্বজ—চূণীলাল দেব, মুঞ্জরা—কুসুমকুমারী, চামেলি—বিড়ালহরি, বরুণচাঁদ—মুস্তফী, অচ্যুত-আনন্দ—অঘোর পাঠক, রাজা—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

২৫মার্চ্চ—**আবুহোসেন** (গিরিশ)

আবু—মুস্তফী, রোসেনা—বিড়ালহরি, দাই—তিনকড়ি, হারুণ উল্‌রসিদ—দামু বসু, আবুর মা—গুলফনহরি।

১১ অক্টোবর—**সপ্তমীতে বিসর্জ্জন** (গিরিশ)

মামা—মুস্তফী, বিরাজ—তিনকড়ি।

২৩ ডিসেম্বর—**জনা** (গিরিশ)

জনা—তিনকড়ি, প্রবীর—দানীবাবু, বিদুষক—মুস্তফী, অর্জ্জুন—চূণীবাবু, মদনমঞ্জরী—ভূষণ, বৃষকেতু—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, স্বাহা ও রতি—শরৎকুমারী, ব্রাহ্মণী ও গঙ্গা—গুলফনহরি।

২৪ ডিসেম্বর—**বড়দিনের বখ্‌সিস** (গিরিশ)

থিয়েটারের ম্যানেজার—মুস্তফী, গুলজার—তিনকড়ি, মিঃ ডশ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, লেবু ওয়ালী—শরৎকুমারী, প্রেমদাসী—গুলফনহরি, ফুলওয়ালী—ভূষণকুমারী।

১৮৯৩

ষ্টার

২৭ মে—**রামাশ্বমেধ**

[গিরিশের সীতার বনবাসের হিন্দী সংস্করণ।]

২৬ আগষ্ট—বিজয় বসন্ত (অমৃত বসু)

রাজা—উপেন্দ্র মিত্র, বলবন্ত—অমৃত মিত্র, বিজয়—তারা, বটুকচাঁদ—রাধামাধব কর, দুর্জ্জয়মণি—নগেন্দ্র, শ্যালা—অক্ষয়কালী কোঁয়ার।

২৫ ডিসেম্বর—বেনেজির বদ্‌রেমণি (রাজকৃষ্ণ রায়)

২৫ মার্চ্চ—আমোদ প্রমোদ (অতুল মিত্র)

১৯ আগষ্ট—"রাজাবাবু"। ২৫ ডিসেম্বর—আজব কারখানা।

রয়্যাল বেঙ্গল

১লা এপ্রিল—তাঁতিয়া ভীল। ২১ জুন—"রামপ্রসাদ"।

১ জুলাই—ব্যাস কাশী। ২২ জুলাই—খণ্ড প্রলয়।

১১ নভেম্বর—নাগযজ্ঞ

২৫ ডিসেম্বর—মুই হাঁদু। Mrs Dutt—সুকুমারী দত্ত।

সিটি

৯ ডিসেম্বর—আনন্দ-লহরী (হরিলীলা)

১৮৯৪

মিনার্ভা

২৮ জানুয়ারী—বেজায় আওয়াজ [দেবেন্দ্রনাথ বসু]

৫ মে—**হীরার ফুল** (গিরিশ)

১৭ নভেম্বর—**স্বপ্নের ফুল** (গিরিশ)

অধীর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধীর—রাণু বাবু, মনহরা—তিনকড়ি, মনধরা—হিঙ্গলবালা।

২৫ ডিসেম্বর—**সভ্যতার পাণ্ডা** (গিরিশ)

ষ্টার

১লা জানুয়ারী—বাবু (অমৃত বসু)

ষষ্ঠীকৃষ্ট বটব্যাল—অক্ষয়কালী কোঁয়ার, শ্যালা—মাধুবাবু, তিনকড়ি মামা—অমৃত বসু।

৪ঠা আগষ্ট—অন্নদামঙ্গল

৮ সেপ্টেম্বর—চন্দ্রশেখর (অমৃত বসু)

কৃপসম—গঙ্গা, চন্দ্রশেখর—অমৃত মিত্র, শৈবলিনী—তারা, ফষ্টর—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দলনী—নরী।

২৫ ডিসেম্বর—একাকার (অমৃত বসু)

এমারেল্ড

২২ সেপ্টেম্বর— মা (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)

৮ ডিসেম্বর—মান—"রাধাকৃষ্ণ লীলা"

রয়্যাল বেঙ্গল

২৮ জুলাই—হরি-অন্বেষণ। মায়া—সুকুমারী।

বীণা

১লা জানুয়ারী—বেহদ্দ বেহায়া (সিটি কর্ত্তৃক)।

১৮৯৫

মিনার্ভা

১৮ মে—**করমেতিবাই** (গিরিশ)

করমেতি—তিনকড়ি, আলোক—দানী বাবু, টুকরো—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, অম্বিকা—গুলফন, আগমবাগীশ—হরিভূষণবাবু।

২৫ ডিসেম্বর—**ফকীরমণি** (গিরিশ)

বিরাগ—দানীবাবু, শিখা—তিনকাড়ি, ফকুরে—নৃপেন বসু, ফকুরের মা—ক্ষেত্রমণি, ধাওর-কন্যা—কুসুমকুমারী, বেদিনী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী)।

ষ্টার

৫ অক্টোবর—শ্রীবৃদ্ধি (নৃত্যগোপাল কবিরাজ)

রয়্যাল বেঙ্গল

২রা ফেব্রুয়ারী—রজনী (বঙ্কিমচন্দ্রের) (বেহারী চট্টোপাধ্যায়)

শচীন্দ্র—মহেন্দ্র বসু, রজনী—সুকুমারী দত্ত।

২৫ জুন—দানলীলা (এন-এন ঘোষ)। ৭ সেপ্টেম্বর—রক্তগঙ্গা

এমারেল্ড

৩১ আগষ্ট ফুলশয্যা—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

১৮৯৬

মিনার্ভা

১লা জানুয়ারী—“পাঁচকনে” (গিরিশ)

কালোচাঁদ—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, অমূল্য—দানীবাবু, ননীলাল—শ্যামাচরণ কুণ্ডু, বিপিনকুমারী—তিনকড়ি।

৩০ মে সিটিকর্ত্তৃক—“মোহমুক্তি” বা সুধন্ববধ।

ষ্টার

১১ জানুয়ারী—“রাজসিংহ” (অমৃত বসু কর্ত্তৃক রূপান্তরিত)

রাজসিংহ—অমৃত মিত্র, দরিয়া—নরী, আওরংজেব—মহেন্দ্র চৌধুরী।

২৬ ডিসেম্বর—কালাপাহাড় (গিরিশ)

কালাপাহাড়—অমৃত মিত্র, চিন্তামণি—গিরিশ, ইমান্—নগেন্দ্রবালা, দোলেনা—নরী, দুলাল—অসিভূষণ বসু, চঞ্চলা—প্রমদাসুন্দরী, লাটু—দানীবাবু, মুকুন্দদেব—অক্ষয়বাবু।

রয়্যাল বেঙ্গল

১৮ জানুয়ারী—রাজসিংহ। ৮ আগষ্ট—ধ্রুব।

বীণা

কিছুদিন গেটি অভিনয় করে। “প্রলয়ঙ্করী”, ষ্টারের “স্ত্রী-বুদ্ধির” অনুকরণে।

১৮৯৭

মিনার্ভা

ল বাবু—(দুর্গাদাস দে), ছবির বাজার (দুর্গাদাস দে), জুবিলি-রঙ্গ (দুর্গাদাস দে)।

ষ্টার

৯ জানুয়ারী—বৌমা (অমৃত বসু)। উপেন্দ্রমিত্র—বামাদাস।

২২ জুন—হীরক জুবিলি (গিরিশ)

নট—অমৃত মিত্র। মাতাল—দানীবাবু।

১১ সেপ্টেম্বর—**পারস্য-প্রসুন** (গিরিশ)

হারুণউল রসিদ—অঘোর পাঠক, পরিসানা—নরী।

১৮ সেপ্টেম্বর—**মায়াবসান** (গিরিশ)

কালীকিঙ্কর—গিরিশ, গণপতি—অক্ষয়কালী কোঁয়ার, হলধর—সুরেন্দ্র ঘোষ (দানীবাবু), মাধব—সুরেন মিত্র, অন্নপূর্ণা—তারা, রঙ্গিণী—নরী, বিন্দু—নগেন্দ্রবালা।

২৫ ডিসেম্বর—গ্রাম্য-বিভ্রাট (অমৃতবাবু)

রয়্যাল বেঙ্গল

২৭ ফেব্রুয়ারী—দেবী চৌধুরাণী।

১২ জুন—কৃষ্ণকান্তের উইল। ৬ নভেম্বর—পরশুরাম।

ক্লাসিক (In Emerald Stage)

ক্লাসিক

২১ জুন—হরিরাজ (নগেন্দ্র চৌধুরী)

হরিরাজ—অমর দত্ত, অরুণা—তারা, শ্রীলেখা—ছোটরাণী, জয়াকর—মণ্টুবাবু।

২০ নভেম্বর—আলিবাবা (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

মজ্জিনা—কুসুম, আলিবাবা—পূর্ণ ঘোষ, আব্দালা—নৃপেন বসু, হোসেন—অমরদত্ত। **গিরিশচন্দ্রের** কয়খানি গান ছিল।

২৫ ডিসেম্বর—কাজের খতম (অমর দত্ত) All's well that ends well.

১৮৯৮

ক্লাসিক

১৯ ফেব্রুয়ারী—দেবী চৌধুরাণী,

মার্চ্চ—শিবরাত্রি (অমর)

২৪ সেপ্টেম্বর—ইন্দিরা

(বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস অমরবাবু কর্ত্তৃক নাটকে পরিণত।)

১৮৯৮

ষ্টার

কিরণশশী—(রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

১০ সেপ্টেম্বর—হরিশচন্দ্র (অমৃত,বসু)

হরিশচন্দ্র—অমৃত মিত্র, শৈব্যা—তারাসুন্দরী, বিশ্বামিত্র—অমৃত বসু, বিদূষক—অক্ষয়বাবু, পরাহু—ঘনশ্যাম দে, ঝিমন—জীবনকৃষ্ণ সেন, বটুক—উপেন্দ্র মিত্র।

মিনার্ভা

৮ জানুয়ারী—জীবন্তপ্রতিমা (বাজেন সরকার)

ফটিকচাঁদ—(চূণীদেব)। ৩১ ডিসেম্বর—সুন্দরী।

রয়্যাল বেঙ্গল

১৯ ফেব্রুয়ারী—দরফ খাঁ। মাইমুনী—সুকুমারী।

২৫ সেপ্টেম্বর—প্রমোদরঞ্জন (ক্ষীরোদপ্রসাদ)। চঞ্চল—নৃপেন্দ্র বসু।

১৮৯৯

ক্লাসিক

১ জানুয়ারী—নির্ম্মলা (অমর দত্ত)

কিশোর—অমর, নির্ম্মলা—প্রমদা।

২৫ মার্চ্চ—সিন্ধুবধ (অমর)। সিন্ধু—কুসুম, দশরথ—অমর।

১০ জুন—**দেলদার** (গিরিশ)

দেলদার—নৃপেন বসু, পিয়াসা—কুসুমকুমারী, ধারা—ভূষণকুমারী, রেখা—প্রমদাসুন্দরী, সরল—দানি, গহন—অমর।

২৬ আগষ্ট—শ্রীকৃষ্ণ (অমর)

১৬ সেপ্টেম্বর—ভ্রমর। [কৃষ্ণকান্তের উইল, অমরবাবু কর্ত্তৃক নাটকে পরিণত]

গোবিন্দলাল—অমর দত্ত, ভ্রমর—কুসুম, রোহিণী—প্রমদা, কৃষ্ণকান্ত—মহেন্দ্র বসু, ব্রহ্মানন্দ—পূর্ণ ঘোষ, নিশাকর—দানিবাবু।

ষ্টার

২৬ আগষ্ট—মৃচ্ছকটিক (বসন্ত সেনা)

২৩ সেপ্টেম্বর—সাবাস্ আঠাস্ (অমৃতলাল)

৪ নভেম্বর—বিরহ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)। গোবিন্দ—কাশীবাবু।

২৫ ডিসেম্বর—যাদুকরী (অমৃত বসু)। ["ধীবর ও দৈত্যের" বৰ্দ্ধিত-সংস্করণ—পূর্ব্বে এইখানি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ন্যাসনালে অভিনীত হয়।]

মিনার্ভা

২৯ মে শ্রী—সুশীলা। ১২ আগষ্ট—মদালসা (নরেন্ সরকার)।

৩০ সেপ্টেম্বর—কিশোরী সাধনা।

১৯০০

ক্লাসিক

১লা জানুয়ারী—মজা (অমর)।

১৭ ফেব্রুয়ারী—**পাণ্ডব গৌরব** (গিরিশ)

কঞ্চুকী—গিরিশ, ভীম—অমর দত্ত, ভীষ্ম—মহেন্দ্র বসু, সুভদ্রা—তিনকড়ি, কৃষ্ণ—প্রমদা, উর্ব্বসী—কুসুম।

২৫ আগষ্ট—থিয়েটার (অমর)

ষ্টার

২৮ এপ্রিল—আদর্শবন্ধু (অমৃত বসু)। ২৬ মে—কৃপণের ধন (ঐ)।

২৫ ডিসেম্বর—অবতার (অমৃত)। হলহলানন্দ স্বামী—অক্ষয়বাবু।

মিনার্ভা থিয়েটার

২৩ জুন—**সীতারাম** [গিরিশ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিণত]

সীতারাম—গিরিশ, শ্রী—তিনকড়ি, জয়ন্তী—সুশীলা, গঙ্গারাম—দানিবাবু, নন্দা—সরোজিনী, রমা—ছোটরাণী, মুরলা—সুধীরবালা (পটল) ধাত্রী—হিঙ্গনবালা (হেনা), চন্দ্রচূড়—পাঠক, মৃণ্ময়—প্রিয় ঘোষ।

২২ জুলাই—**মণিহরণ** (গিরিশ)

১৫ আগষ্ট—**নন্দ দুলাল** (গিরিশ)

আয়ান—দানিবাবু, দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণ—তিনকড়ি, রাধিকা—সুশীলা, বলরাম—পুঁটুমণি।

৬ সেপ্টেম্বর—স্বর্ণ গোলক (দেবেন্দ্র বসু কর্ত্তৃক)।

১লা ডিসেম্বর—জেরিণা।

রয়্যাল বেঙ্গল

১০ ফেব্রুয়ারী—অমর সিংহ ১১ এপ্রিল—ফিরোজা।

৮ সেপ্টেম্বর—বভ্রুবাহন। ৮ ডিসেম্বর—প্রতিমা (বেহারীবাবু)।

২৫ ডিসেম্বর—আক্কেল সেলামী।

১৯০১

ক্লাসিক

১লা জানুয়ারী—চাবুক (অমর)

২৬ জানুয়ারী—**অশ্রুধারা** (গিরিশ)

(মহারাণীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে) ভারতমাতা—কুসুম, দুর্ভিক্ষ—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, প্লেগ—নটবর চৌধুরী, অরাজকতা—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ভারত-সন্তান—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২৩ এপ্রিল—**মনের মতন** (গিরিশ)

মির্জ্জান—সুরেন ঘোষ, কাউলফ—অমরেন্দ্র দত্ত, ফকির—অঘোর পাঠক, গোলেন্দাম—তারা, দেলেরা—কুসুম, পরিয়া—রাণীমণি।

৩১ আগষ্ট—গুপ্তকথা (অমর)

২৮ সেপ্টেম্বর—**অভিশাপ** (গিরিশ)

বিষ্ণু—প্রমদা, অম্বরীষ—প্রবোধ ঘোষ, চণ্ডীদাস—দানিবাবু, দুষ্টা সরস্বতী—তারা, শ্রীমতী—কুসুমকুমারী, তমঃ—বিনোদিনী (হাঁদি)।

৭ ডিসেম্বর—তোমারই [প্রফুল্ল মুখুয্যে]

মিনার্ভা

৬ই এপ্রিল—বসন্ত রায়। ১লা জুন—সাধের বাসর।

৬ই অক্টোবর—প্রাণের হাসি। কুব্জ ও দরজী (চুনীদেব)।

রয়্যাল বেঙ্গল

১৬ ফেব্রুয়ারী "যমুনা"

১৬ মার্চ্চ—নীশ্বর (সামাজিক)

[বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন ১৯০১, ২৪ এপ্রিল। বেঙ্গল উঠিয়া যায়।]

অরোরা থিয়েটার, ম্যানেজার নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।

১৭ আগষ্ট—দক্ষিণা (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

৫ই অক্টোবর—সাধনা। ১৪ ডিসেম্বর—"শরসুন্দরী"।

২৫ ডিসেম্বর—"মাধবী" বা পশুশাসন।

১৯০২

ক্লাসিক

১৮ জানুয়ারী—"বহুত আচ্ছা" (দ্বিজেন্দ্র)

চম্পটি সাহেব—অমরবাবু, রেবেকা—কুসুমকুমারী।

৯ জুন—**শান্তি** (গিরিশ) [বুয়র যুদ্ধাবসানে]

১৯ জুলাই—**ভ্রান্তি** (গিরিশ)

রঙ্গলাল—গিরিশ, গঙ্গা—কুসুম, নিরঞ্জন—অমর, পুরঞ্জন—দানী, অন্নদা—প্রমদা, শালিগ্রাম—হরিভূষণ, উদয়নারায়ণ—অঘোর পাঠক।

৮ই আগষ্ট—অভিষেক। অনাথিনী—রামলাল বন্দ্যো।

৪ঠা অক্টোবর—ভক্তবিটেল (অমর)

২৭ সেপ্টেম্বর—লাটগৌরাঙ্গ (অমর)

২৫ ডিসেম্বর—**আয়না** (গিরিশ)

"সৃষ্টিধর" ভূমিকায় গিরিশ ৩।৪ রাত্রি অভিনয় করেন।

ষ্টার

১লা জানুয়ারী—নবজীবন (অমৃত বসু)

১৯ জুলাই—সপ্তম প্রতিমা (ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ)

৫ই অক্টোবর—সাবিত্রী (ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ)

মাণ্ডব্য—অমৃত মিত্র।

২৫ ডিসেম্বর—ক্ষীরোদপ্রসাদের "বেদৌরা" (অপেরা)

অরোরা (বেঙ্গল ষ্টেজে)

১৫ মার্চ্চ—কালপরিণয় (রামলাল বন্দ্যো)

শম্ভু—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, মোক্ষদা—তারা, জগদীশ—নীলমাধব চক্র, মণীন্দ্র—প্রিয়নাথ।

১৭ মে—"রিজিয়া" মনোমোহন রায় (স্যার ওয়ালটার স্কটের কেনিল

ওয়ার্থ অবলম্বনে), রিজিয়া—তারাসুন্দরী, ঘাতক—মুস্তফী, বক্তিয়ার—প্রবোধ ঘোষ, ইন্দিরা—হরিমতী।

১লা আগষ্ট একাদশ বৃহস্পতি (নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন) দালাল বালক—তারাসুন্দরী।

১৩ ডিসেম্বর—পরিতোষ (রামলাল বন্দ্যো)। সোহাগ—তারা।

মিনার্ভা

১৯ জুলাই—তোফা (নলিনীবালা অভিনেত্রী)

১৫ নভেম্বর—চুণীবাবুর "আস্‌মান"।

১৯০৩

ক্লাসিক

১৪ই ফেব্রুয়ারী—**ফণিরমণি** (গিরিশ)

২৯শে আগষ্ট—প্রতাপাদিত্য (হারাণ রক্ষিতের বঙ্গের শেষবীর অমর বাবুর দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত)

প্রতাপ—অমরেন্দ্র, শঙ্কর—দানিবাবু, রাজলক্ষ্মী—তিনকড়ি, ফুলজানি—কুসুমকুমারী।

২১শে নভেম্বর—"হিরণ্ময়ী" (অতুল মিত্র কর্ত্তৃক)।

☞ গিরিশ এই বৎসরে "সাধক" ও "হরিশের" ভূমিকায় নামেন।

মিনার্ভা

৭ই নভেম্বর—**রঘুবীর** (ক্ষীরোদ)

রঘুবীর—অমর দত্ত, তুলিয়া—প্রিয় ঘোষ, শ্যামলী—পুঁটুরাণী।

[অমরবাবু দুইটি থিয়েটার এক সঙ্গে চালাইতে মনস্থ করেন।]

ষ্টার

১৫ই আগষ্ট—প্রতাপাদিত্য (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

প্রতাপাদিত্য—অমৃত মিত্র, বিক্রমাদিত্য—মুস্তফী, বিজয়া—নরী।

২৫শে ডিসেম্বর—বৃন্দাবন বিলাস (ক্ষীরোদ বাবু)

রয়্যাল [illegible]ল

ইউনিক—লেসী (গিরিমোহন মল্লিক)

২১শে জুন—রত্নমালা

মন্দারমালা—তারা, রত্নমালা—সুশীলা।

১৬ই সেপ্টেম্বর শ্মশান—Fall of Mewar

১৯০৪

ক্লাসিক

৩০শে এপ্রিল—"সৎনাম" (গিরিশ)

রণেন্দ্র—অমর, বৈষ্ণবী—কুসুম, আওরঙ্গজেব—দানিবাবু, ফকির রাম—হরিভূষণ ভট্টা, চরণ দাস—অনুকুল বটব্যাল (য়্যাঙ্গাস্)।

১লা জুন—"দাতা"। দাতা—কুসুম, রঙ্গরাজ—অমর।

৯ই জুলাই—শ্রীরাধা (অমর)।

২৭শে নভেম্বর—চোখের বালি (রবীন্দ্র হইতে রূপান্তরিত)

মিনার্ভা

১লা জানুয়ারী—হিতে বিপরীত

[অমরবাবু মিনার্ভা ছাড়িয়া দেন।]

২৩ এপ্রিল—সংসার (মনোমোহন গোস্বামী)

প্রিয়নাথ—গ্রন্থকার, হারুমাষ্টার—হাঁদু বাবু, নরখুড়ো—সতীশচন্দ্র বন্দ্যো, বড়সাহেব—চুনীবাবু, ছোটসাহেব—ক্ষেত্র মিত্র।

১২ জুন—মুরলা (মনোমোহন গোস্বামী)।

৩০ জুলাই—শান্তিধারা (বৈকুণ্ঠনাথ বসু)

৫ নভেম্বর—"ঐন্দ্রিলা" (মনোমোহন রায়)

ঐন্দ্রিলা—তারা, বৃত্র—চুনীবাবু, কার্ত্তিক—ক্ষেত্রবাবু।

ডিসেম্বর—ভগবানভূত (অর্দ্ধেন্দুবাবু)। নসীব (চুনীবাবু)।

ষ্টার

৩০ সেপ্টেম্বর—রঙ্গাবতী (ক্ষীরোদ)

দলুই সর্দ্দার—অমৃত মিত্র, বলাই—দানিবাবু।

২৫ ডিসেম্বর—বাহবা বাতিক (অমৃত বসু)

ইউনিক (বেঙ্গলে)

মার্চ্চ—তারাবাই (দ্বিজেন্দ্র রায়)

পৃথ্বীরাজ—দানিবাবু, তারাবাই—তারাসুন্দরী, তমসা—প্রকাশমণি, রায়মল—তারক পালিত, জয়মল—ক্ষেত্র মিত্র, সূর্য্যমল—চুনীবাবু।

১৯০৫

মিনার্ভা

৪ঠা মার্চ্চ—**হরগৌরী** (গিরিশ)

হর—গিরিশ, (প্রথম রাত্রে তারক পালিত অভিনয় করেন) গৌরী—তারাসুন্দরী, নন্দী—মুস্তফী।

৮ এপ্রিল—**বলিদান** (গিরিশ)

করুণাময়—গিরিশ, দুলাল—দানী, রূপচাঁদ—মুস্তফী, কিশোর—অপরেশ মুখোপাধ্যায়, মোহিত—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, রমানাথ—মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু), সরস্বতী—তারাসুন্দরী, জোবী—সুশীলা, কিরণ্ময়ী—কিরণবালা, কালীঘটক—জীবন পাল, ঘনশ্যাম—মণীন্দ্রনাথ পাল(মণ্টুবাবু), রাজলক্ষ্মী—নগেন্দ্রবালা, মাতঙ্গিনী—সুধীরাবালা, হিরণ্ময়ী—চারুবালা, ঝি—চপলাসুন্দরী, নলিন—ধীরেন্দ্রনাথ, ইন্‌স্পেক্‌টার—নগেন্দ্র ঘোষ।

৭ সেপ্টেম্বর—**সিরাজেদ্দৌলা** (গিরিশ)

সিরাজ—দানিবাবু, করিমচাচা—গিরিশচন্দ্র, দানসা—অর্দ্ধেন্দুশেখর, জহরা—তারাসুন্দরী, বেগম—সুশীলা, মোহনলাল—তারক পালিত, ক্লাইভ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, (গিরিশচন্দ্রের মাতুল নবীনকৃষ্ণের দৌহিত্র। ইনি ক্লাইবের ভূমিকায় বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।) মিরমদন—মণ্টুবাবু, মিরজাফর—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, জগৎ শেঠ—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, উমিচাঁদ—হরিদাস দত্ত, আমিনাবেগম—ভূষণকুমারী, উন্মত্ত্‌জহুরা—সুবাসিনী (পরে মালিনী), মীরদাউদ্—সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (নৃত্যশিক্ষক)।

২৬ ডিসেম্বর—**বাসর** (গিরিশ)

বিক্রমাদিত্য—পালিত, দ্বিতীয় রাত্রি হইতে গিরিশচন্দ্র। বিম্বাবতী—সুশীলা। জগন্নাথ—দানিবাবু। বিধাতা পুরুষ—মুস্তফী সাহেব।

ক্লাসিক

২১ অক্টোবর—পৃথ্বীরাজ (মনোমোহন গোস্বামী)

৪ঠা নভেম্বর—"হলো কি ?" (অমর)। মিঃ নেলর—(অমর)।

২৩ ডিসেম্বর—প্রণয় না বিষ ? (অমর)। রমা পাগলা—অমর।

২৫ ডিসেম্বর "এস যুবরাজ" (অমর)।

খুলনার বাবু অতুলচন্দ্র রায় রিসিভার হয়েন।

ষ্টার

১৫ এপ্রিল—নারায়ণী (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

২২ জুলাই—রাণাপ্রতাপ (ডি-এল রায়)

প্রতাপ সিংহ—অমৃত মিত্র, শক্তসিংহ—অমৃত বসু, মেহেরুন্নেসা—নরী, মানসিংহ—অক্ষয়বাবু।

২৩ ডিসেম্বর—"পদ্মিনী" (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

পদ্মিনী—বসন্তকুমারী, আলাউদ্দিন—মহেন্দ্র চৌধুরী, লক্ষ্মণ সেন—অমৃত মিত্র, নসীবন—নরীসুন্দরী। ঐ পিতা—অক্ষয়বাবু।

২৫ ডিসেম্বর—সাবাস বাঙ্গালী (অমৃত বসু)।

ন্যাসনাল থিয়েটার (বেঙ্গল ষ্টেজে)

২রা ডিসেম্বর—অদৃষ্ট (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৬ ডিসেম্বর—অবাক্ কাণ্ড

গ্রাণ্ড থিয়েটার [বর্ত্তমান এলফ্রেডে]

১৩ মে—পৃথ্বীরাজ (মনোমোহন গোস্বামী)। পৃথ্বীরাজ—অমরবাবু।

২০ মে—ঘুঘু (অমর)। ২৯শে জুলাই—বাপ্পারাও।

১৬ অক্টোবর—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ।

২১ অক্টোবর—প্রতিফল। জুমেলা—তিনকড়ি।

১৯০৬

মিনার্ভা

১৫ ফেব্রুয়ারী—**দুর্গেশ-নন্দিনী**

(গিরিশ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

বীরেন্দ্র সিংহ—গিরিশচন্দ্র, বিদ্যাদিগ্গজ—অর্দ্ধেন্দুশেখর, জগৎ-

সিংহ—তারক পালিত, ওসমান—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), বিমলা—তিনকড়ি, আয়েসা—তারাসুন্দরী।

১০ জুন—**মিরকাশিম** (গিরিশ)

মিরকাশিম—দানিবাবু, তারা—তিনকড়ি, মিরজাফর—গিরিশ, আলি ইব্রাহিম—পালিত, বেগম—সুশীলা, হেষ্টিংস—প্রকাশমণি, নমসের—হাঁদুবাবু, মণিবেগম—সুধীরবালা।

৮ সেপ্টেম্বর—শিরীফরহাদ (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)

শিরী—নগেন্দ্রবালা, ফরহাদ—হাঁদুবাবু, গুলাল—সুশীলা, হামজাদ—নৃপেন্দ্র বসু।

৮ ডিসেম্বর—দুর্গাদাস (মিঃ ডি, এল, রায়)

দুর্গাদাস—দানী, রাজিয়া—সুশীলা, দিলীর—পালিত, মহামায়া—প্রকাশমণি, তাহবর—হাঁদুবাবু।

২৫ ডিসেম্বর—**য্যায়সা কা ত্যায়সা** (গিরিশ)

হারাধন—মুস্তফী সাহেব, রসিক—দানিবাবু, গরব—সুশীলাবালা।

ন্যাসনাল

১৪ জুলাই—বঙ্গবিক্রম (হরিসাধন মুখোপাধ্যায়)

কেদার রায়—চুণীবাবু, অনিতা—তারা (দ্বিতীয় রাত্রি হইতে)।

২৫ ডিসেম্বর—হাসির ফোয়ারা

রঙ্গিনী—তারা।

১৫ ডিসেম্বর—দুর্গাদাস (ডি, এল, রায়)

গুলনেয়ার—তারাসুন্দরী, দুর্গাদাস—চুণীবাবু।

ষ্টার

৯ জুন—**উলুপী** (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

৪ঠা আগষ্ট—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

মিরকাশিম—অমৃত মিত্র, মোহনলাল—অপরেশবাবু।

২৫ ডিসেম্বর—ক্ষীরোদবাবুর Monster and the maid.

১৯০৭

১৭ আগষ্ট—**ছত্রপতি** (গিরিশ)

শিবাজী—অমর, আওরঙ্গজেব—পালিত, পুতুলা বাই—সুশীলা, সুইবাই—কুসুমকুমারী, গঙ্গারাম—নৃপেন্দ্র বসু।

৩০ নভেম্বর—দলিতা ফণিনী (অমর)

কোহিনুর

[বর্ত্তমান মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে]

১১ আগষ্ট—চাঁদবিবি (ক্ষীরোদ)

[**গিরিশ** কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত]

চাঁদবিবি—তারা, যোশীবাই—তিনকড়ি, মালজী—অপরেশ বাবু, দেলোয়ার—পূর্ণবাবু (ঘোষ), ইব্রাহিম—ক্ষেত্রবাবু, রঘুজী—হাঁছুবাবু, তাজ—কিরণ, মরিয়ম্—ভূষণকুমারী।

২২ ডিসেম্বর—দাদা ও দিদি (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

দাদা—হাঁছুবাবু, দিদি—কিরণবালা।

ন্যাসনাল

১১ মে—সমাজ (মনোমোহন গোস্বামী)

১১ আগষ্ট—রহিম সা (মনোমোহন রায়)

রহিম—গোস্বামী।

২১ সেপ্টেম্বর—ছত্রপতি

শিবাজী—মনোমোহন গোস্বামী।

৭ই ডিসেম্বর—দেলেরা

দেলেরা—নগেন্দ্রবালা (বুঁচি)।

ষ্টার

২৪ আগষ্ট—নন্দকুমার (ক্ষীরোদ)

নন্দকুমার—নগেন্দ্র মুখার্জ্জি, বাপুদেবশাস্ত্রী—মহেন্দ্র চৌধুরী, হেষ্টিংস—অক্ষয়কালী কোঁয়ার, প্রমুদা—বসন্তকুমারী, রাধিকা—তারাসুন্দরী, দস্যুসর্দ্দার—ননীলাল দত্ত।

১৯০৮

মিনার্ভা

১৪ মার্চ্চ—নুরজাহান (দ্বিজেন্দ্র),

নুরজাহান—প্রকাশমণি, রেবা—সুধীরাবালা।

১৮ জুলাই—তুফানী (অতুল মিত্র)

জাফর—মুস্তফী, তুফানী—অহীন্দ্র দে।

১৮ জুলাই—হিন্দাহাফেজ (অতুল মিত্র)

হিন্দা—সুশীলা, হাফেজ—মিঃ পালিত।

☞ ১৫ সেপ্টেম্বর—অর্দ্ধেন্দুর পরলোক গমন, মিউনিসিপাল আইন (Bye-law) পাশ ও **গিরিশের** "অর্দ্ধেন্দু" প্রবন্ধ।

১৯ সেপ্টেম্বর—সোরাব রোস্তম (ডি, এল রায়)

সোরাব—পালিত। রোস্তম—দানিবাবু।

৭ নভেম্বর—**শাস্তি কি শান্তি** (গিরিশ)

প্রসন্নকুমার—দানী, হরমণি—সুশীলা, পাগল—এন, বানার্জি, হেবো—হীরালাল চক্রবর্ত্তী, প্রকাশ—পালিত, ঘেঁচি—সত্যেন্দ্রনাথ দে, ভুবনমোহিনী—সরোজিনী, চিত্তেশ্বরী—তিনকড়ি (ছোট), শুভঙ্কর—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী।

২৬ ডিসেম্বর—মেবার পতন (দ্বিজেন্দ্রলাল)

অমর—দানী, গোবিন্দ সিং—পালিত, মানসী—সুশীলা।

৭ই মার্চ্চ—রাজা অশোক (ক্ষীরোদ)

অশোক—দানিবাবু, ধারিণী—তিনকড়ি, কুণাল—প্রমদা, অনিতা—ভূষণকুমারী।

১১ জুলাই—বরুণা (ক্ষীরোদ)

বরুণা—বিষাদকুসুম, রাজা—পূর্ণবাবু, অভিরাম—হাঁদুবাবু, পুণ্ডরীক—ক্ষেত্রবাবু।

১৭ অক্টোবর—মহিলা মজলিস (দুর্গাদাস দে)

২১ নভেম্বর—দৌলত দুনিয়া (ক্ষীরোদ)

ভূতের বেগার (ক্ষীরোদ), বাসন্তীমেলা—(ক্ষীরোদবাবু)।

ষ্টার থিয়েটার

২০ জুন—যৎকিঞ্চিৎ (সৌরীন্দ্র)। সুকুমার—অমরেন্দ্র।

২২ আগষ্ট—কামিনীকাঞ্চন (অমর) উপন্যাস হইতে অমর কর্ত্তৃক নাটকে পরিণত।

২১ নভেম্বর—(জীবনসন্ধ্যা) মিঃ রমেশ দত্তের উপন্যাস হইতে অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত।

তেজ সিংহ—অমরবাবু, দুর্জ্জয় সিং—মনোমোহন গোস্বামী, ডালিয়া—কুসুমকুমারী, পুষ্প—বসন্তকুমারী।

ন্যাসনাল

২১ মার্চ্চ—প্রেম প্রতিমা (ললিতমোহন চাটার্জ্জি) অপেরা

১৯ সেপ্টেম্বর—মেহেরারা (ননীলাল সুর)

১৪ নভেম্বর—কল্যাণী [হরিপদ চট্টোপাধ্যায়]

সাঁওতাল সর্দ্দার—চুণীলাল দেব।

১৯০৯

মিনার্ভা

২৩ জানুয়ারী—দম্‌বাজ (অতুল মিত্র)

রঙ্গিয়ানন্দ—দানিবাবু, বেলেসিয়া—সুশীলা।

৫ জুন সাহজাদী—অতুল মিত্র

২৯ আগষ্ট—সাজাহান [ডি, এল রায়]

সাজাহান—প্রিয়নাথ ঘোষ, আওরঙ্গজেব—দানিবাবু, জাহানারা—তারাসুন্দরী [প্রথমে সরোজিনী], পিয়ারা—সুশীলা, মহম্মদ—বাবু সত্যেন্দ্র নাথ দে, দারা—মিঃ পালিত।

২৫ ডিসেম্বর—ভগীরথ [ক্ষীরোদ]

ভগীরথ—বাবু নগেন ঘোষ, নন্দ—অহীন্দ্র দে।

কোহিনুর

৩০ জানুয়ারী—বীরপূজা (হরনাথ বসু)

মাখমলাল—হাঁদুবাবু।

৮ই মে—ময়ূর সিংহাসন (হরনাথ)

৩রা জুলাই—প্রতিফল [যোগেন্দ্র বসুর গ্রন্থ হইতে রূপান্তর]

স্বার্থশরণ—পূর্ণ ঘোষ, নেড়া—হরিদাস, বামা পাগলা—হাঁদুবাবু।

২১ আগষ্ট—সোনার সংসার [দুর্গাদাস দে]

২৫ ডিসেম্বর—দুর্গাবতী [হরিপদ মুখোপাধ্যায়]

বজবাহাদুর—ক্ষেত্রবাবু, দুর্গাবতী—প্রমদা, মতিবিবি—ভূষণ, জগন্নাথ—হাঁদুবাবু।

ষ্টার

৩রা জানুয়ারী—কর্ম্মফল (মনোমোহন গোস্বামী)

২০ নভেম্বর—কুসুমে কীট (অমর)

১লা মে—**ভারতগৌরব** (গিরিশ)

"সৎনাম"ই এই নামে হয়। বৈষ্ণবী—তিনকড়ি, রণেন্দ্র—চুণীবাবু।

১১ সেপ্টেম্বর—শাসুজা (চুণীবাবু)

২৪ ডিসেম্বর—"মায়া" (হরিসাধন মুখো)

বিশ্বনাথ—চুণীলাল দেব

১৯১০

মিনার্ভা

১৫ জানুয়ারী—**শঙ্করাচার্য্য** (গিরিশ)

শঙ্কর—দানিবাবু, জগন্নাথ—নৃপেন্দ্র বসু, বিশিষ্টা—হেমন্তকুমারী, শিশুশঙ্কর—সরোজিনী, মহামায়া—সুশীলাসুন্দরী।

২রা জুলাই—বাঙ্গলার মস্‌নদ (ক্ষীরোদ)

সরফরাজ—দানিবাবু, আলিবর্দ্দি—প্রিয়নাথ ঘোষ।

৩রা সেপ্টেম্বর—পাষাণে প্রেম (অতুল মিত্র)।

সাধু সুভদ্র—অক্ষয় চক্রবর্ত্তী।

১লা অক্টোবর—ঠিকে ভুল (অতুল মিত্র)

৩রা ডিসেম্বর—**রাজা অশোক** (গিরিশ)

অশোক—দানিবাবু, পদ্মাবতী—তারাসুন্দরী, কুণাল—সুশীল

বীতশোক—অপরেশ বাবু, আকাল—তারক পালিত, মার—প্রিয়নাথ ঘোষ, উপগুপ্ত—পণ্ডিত হরিভূষণ।

ষ্টার

২৬ ফেব্রুয়ারী—দশচক্র (সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

ফটিকচাঁদ—অমর, মুরলা—কুসুম।

৬ আগষ্ট—রাণীভবানী অমরবাবু দ্বারা নাটকে রূপান্তরিত।

রামকান্ত—অমর, সবিতা—নরীসুন্দরী, কামিনী—ব্লাকী, দয়ারাম—কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, কৃতান্ত—কাশীবাবু।

১১ সেপ্টেম্বর—গুরুঠাকুর (ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১০ ডিসেম্বর—বেহুলা (হরনাথ বসু)

চন্দ্রধর—অমর, বেহুলা—বসন্ত।

কোহিনুর

২৯ অক্টোবর—আকবরের স্বপ্ন (হরিসাধন মুখোপাধ্যায়)

ন্যাসনাল

১৬ জুলাই—বনবালা।   ৬ আগষ্ট—বুদ্ধি কার।

১৭ ডিসেম্বর—তুলসীদাস।   ২৪ সেপ্টেম্বর—স্বর্ণপ্রতিম।

১৯১১

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—পলিন (ক্ষীরোদ)

আলমামুন—দানিবাবু, পলিন—সুশীলা।

৮ এপ্রিল—ঝকমারি (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

[সমস্ত গান **গিরিশচন্দ্রের**]

বড়বৌ—সরোজিনী, ছোটবৌ—চারুশীলা।

১৭ জুন—রকম ফের (অতুল মিত্র)

২২ জুলাই—চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিজেন্দ্র)

চাণক্য—দানিবাবু, চন্দ্রগুপ্ত—প্রিয়নাথ ঘোষ, হেলেন—সরোজিনী, ছায়া—নরীসুন্দরী।

১৬ সেপ্টেম্বর—পুনর্জন্ম (দ্বিজেন্দ্র)

১৮ নভেম্বর—**তপোবল** (গিরিশ)

বিশ্বামিত্র—দানিবাবু, বশিষ্ঠ—হরিভূষণ, সদানন্দ—হাঁদুবাবু, ব্রহ্মণ্যদেব—নীরদা সুন্দরী, বদরী—তিনকড়ি, সুনেত্রা—তারাসুন্দরী, বেদমাতা—নরীসুন্দরী। ত্রিশঙ্কু—প্রিয়নাথ বাবু।

ষ্টার

৩০ এপ্রিল—সুলতান—ক্ষীরোদ, নাগেশ্বর—ক্ষীরোদ।

১১ নভেম্বর—সৎসঙ্গ (ভুপেন্দ্র নাথ)

প্রবোধ—অমর দত্ত, হেমাঙ্গিনী—সুশীলা।

২৫ নভেম্বর—হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা (দ্বিজেন্দ্র লাল)

হরিনাথ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৩ ডিসেম্বর—জীবনসংগ্রাম (নরেন সরকার)

কোহিনুর

৮ এপ্রিল—সখের জলপান (শৈলেন্দ্র সরকার)

৩রা জুন—মধুর মিলন (ঐ)

২৬ আগষ্ট—বিশ্বামিত্র (হরিপদ সান্যাল)

বশিষ্ঠ—অপরেশবাবু, বিশ্বামিত্র—তারক পালিত, শতক্রমী—কুসুমকুমারী, অক্ষমালা—প্রমদা সুন্দরী।

১১ নভেম্বর—গ্রহের ফের

২৫ নভেম্বর—জেনোবিয়া (অতুল মিত্র)

জেনোবিয়া—কুসুম, ফরমাজ—অপরেশ বাবু।

গ্রেট ন্যাসনাল

১৭ জুন—জীবনে মরণে (অমর)। আহা মরি—(অমর)।

১লা জুলাই—বেজায় রগড় (ভুপেন্দ্র নাথ)

২৯ জুলাই—বাজীরাও (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

বাজীরাও—অমর, গৌতমা—সুশীলা, রণজী সিন্ধিয়া—ক্ষেত্র মিত্র, মস্তানী—বসন্তকুমারী, মলহাররাও—মনোমোহন বাবু।

৯ ডিসেম্বর—রাজলক্ষ্মী (বাবু চুণীলাল দেব)

ম্যাজিষ্ট্রেট—চুণী দেব।

১৯১২

মিনার্ভা

৬ই এপ্রিল—দরিয়া (সৌরীন্দ্র)

৬ই জুলাই—মিডিয়া (ক্ষীরোদ প্রসাদ)

আলমাস্থর—দানী, মিডিয়া—তারা।

১৩ই জুলাই—অম্ল মধুর (মোনিয়ারের Le Medicina)

২১শে সেপ্টেম্বর—"**গৃহলক্ষ্মী**" (গিরিশ)

উপেন—দানিবাবু, শৈলেন—এন্ ব্যানার্জ্জি, হীরুঘোষাল—অপরেশ বাবু, বিরজা—তারা, নীরদ—ক্ষেত্রবাবু, তরঙ্গিনী—প্রকাশমণি, সরোজিনী—সরোজিনী, অবধূত—হরিভূষণ, নিতাই উকীল—প্রিয়নাথ, বৈদ্যনাথ—নগেন ঘোষ, শিবু উকীল—পালিত, শরৎ—হীরালাল, কুমুদিনী—চারুশীলা, ফুলী—নীরদাসুন্দরী।

২৮শে ডিসেম্বর—উজ্জ্বলে মধুরে (দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী)

ষ্টার

৩০শে মার্চ্চ—খাস দখল (অমৃত বসু)

নিতাই—অমৃত বসু, মোহিত—অমরবাবু, ঠাকুর্দ্দা—কুঞ্জবাবু, সুরেশ—ক্ষেত্রবাবু, লোকেন—গোপাল ভট্টাচার্য্য, মোক্ষদা—বসন্ত, গিরিবালা—সুশীলা, বিধু—মৃণালিনী. আহ্লাদী—কুমুদিনী।

১৫ই জুন—রূপকথা (মনোমোহন গোস্বামী)

১৭ই আগষ্ট—পরপারে (দ্বিজেন্দ্রলাল)

বিশ্বেশ্বর—অমর দত্ত, শান্তা—সুশীলা, সরযূ—বসন্ত, হিরণ্ময়ী—নরীসুন্দরী, মহিম—কুঞ্জবাবু।

১৬ই নভেম্বর—আনন্দ বিদায় (দ্বিজেন্দ্র)

কোহিনুর

৩০শে মার্চ্চ—মোহিনীমায়া (অতুল মিত্র)

২৯শে জুন—খাঁজাহান (ক্ষীরোদ),

নারায়ণ—ক্ষেত্রবাবু, খাঁজাহান—অপরেশ বাবু,

গ্রাণ্ড ন্যাসনাল

৩০শে মে—গুলরু জোরিণা (চুণীবাবু)

১৪ই সেপ্টেম্বর—"জয়দেব" (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়)

জয়দেব—চুণীবাবু, নিরঞ্জন—হাঁদুবাবু, বিমলা—সরোজিনী, অরুণা—কুসুম, পরাশর—পণ্ডিত অবিনাশ, পদ্মা—হরিমতি, রাজা—নিখিলবাবু।

১৪ই ডিসেম্বর—নবাব নন্দিনী [দামোদর মুখোপাধ্যায় হইতে]

ব্রহ্মতেজ—(হরিপদ চট্টো)। পরশুরাম—চুণীবাবু।

১৯১৩

মিনার্ভা

১০ই মে—ভীষ্ম (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

ভীষ্ম—দানিবাবু, অম্বা—নেড়ী, (সরোজিনী), পরে তারা। পরশুরাম—পালিত, সত্যবতী—হেমন্তকুমারী।

৯ই আগষ্ট—বিদায়াভিসাপ (রবীন্দ্র)

২০শে সেপ্টেম্বর—রূপের ডালি (ক্ষীরোদ)

১৫ই নভেম্বর—ভাগ্যচক্র (প্রমথ রায় চৌধুরী)

২০শে ডিসেম্বর—নব যৌবন (অমৃত বসু)

বসন্ত কুমার—অমৃতবাবু, আলোক—তারা।

ষ্টার

২৯শে মার্চ্চ—ধর্ম্ম বিপ্লব (মনোমোহন গোস্বামী)

কালাচাঁদ—অমরেন্দ্র নাথ, মস্তানী—বসন্ত।

৩রা মে—কিসমিস (অমর)। ৮ই নভেম্বর—রোক্‌শোধ (অমর)।

২০শে ডিসেম্বর—জয়পতাকা (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

পিয়ারী লাল রায়—অমর, দর্প নারায়ণ—ক্ষেত্রবাবু।

গ্রাণ্ড ন্যাসনাল

১৭ই মে—ভীষ্ম (হরিশ সান্যাল)

পরশুরাম—চুণীবাবু, জিতবতী—কুসুম।

জুন—আলুবখ্‌রা (চুণীবাবু)

১৯১৪

মিনার্ভা

১৪ই মার্চ্চ—হেস্তনেস্ত (দেবকণ্ঠ)

২১শে মার্চ্চ—নিয়তি (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

ভাড়ু দত্ত—দানিবাবু, কালী—তারা।

৩০শে মার্চ্চ—প্রেমের পাথার (নিত্যবোধ)

৬ই জুন—নাস্তানাবুদ (প্রসাদদাস গোস্বামী)

৫ই সেপ্টেম্বর—ক্লিও প্রেট্রা (প্রমথ ভট্টাচার্য্য)

ক্লিট পেট্রো—তারা, এন্টণি—দানিবাবু।

২৪শে অক্টোবর—রুমেলা (সৌরীন্দ্র)

২৫শে ডিসেম্বর—রঙ্গিলা (অপরেশ)

২৬শে ডিসেম্বর—আহেরিয়া (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

দেবরায়—দানীবাবু, কমলা—তারা, মূলরাজ—অপরেশ, কেতু—নীরদা, রেবা—চারুশীলা, জয়সিংহ—সত্যেন্দ্রবাবু।

ষ্টার

১৭ই জানুয়ারী—মায়াপুরী (রামলাল)

৩০শে মে—বড় ভাল বাসি (অমর)

১৫ই আগষ্ট—অহল্যাবাই (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

মালহার রাও—অমর, অহল্যা—কুসুম, তুলসী—বসন্ত।

৩১শে অক্টোবর—অকলঙ্ক শশী (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

জয়গোপাল দত্ত—অমর, শশী—কুসুম, তারা—বসন্ত।

৫ই ডিসেম্বর—ক্ষত্রবীর (ভুপেন)

কর্ণ—হাঁদুবাবু, ধৃতরাষ্ট্র—ভুনী (অমৃত) বাবু।

২৫শে ডিসেম্বর—অভিনেত্রীর রূপ (অমর)

গ্রাণ্ড ন্যাসনাল

সেপ্টেম্বর—ভিখারিণী (অমলাদেবী, **দেশবন্ধুর** ভগিনী)

ম্যাজিষ্ট্রেট—পূর্ণ ঘোষ, ভিখারিণী—হরিমতি, মাধব—হাঁদুবাবু।

১৯১৫

মিনার্ভা

৭ই মার্চ্চ—আহুতি (অপরেশ) সাইনস্ অব দি ক্রস অবলম্বনে

২৬শে জুন—বীর রাজা (নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়)

রস্তম—দানি, বীর রাজা—প্রিয় ঘোষ, রুমেলা—তারা।

২৪শে এপ্রিল—হুলস্থুল—। ২৮শে আগষ্ট—মানে মানে।

(বাবু উপেন্দ্র মিত্র বি-এ, সত্ত্বাধিকারী হয়েন)

২রা অক্টোবর—সিংহল বিজয় (দ্বিজেন্দ্রলাল)

বিজয় সিংহ—পালিত, সিংহবাহু—অপরেশ বাবু, কুবেনী—তারা, লীলা—নরীসুন্দরী, রাণী—প্রকাশমণি।

৪ঠা ডিসেম্বর—শুভদৃষ্টি (অপরেশ)। মিস্ ডোরা—তারা।

২৫শে ডিসেম্বর—সোণায় সোহাগা (মনোজমোহন বসু)

মেহেরা—তারা, নবাব—অপরেশ।

ষ্টার

২৭শে জানুয়ারী—সাইনস্ অব দি ক্রস্ (ভূপেন্দ্র)

মার্কাস—অমর, মার্সিয়া—কুসুম।

৬ই ফেব্রুয়ারী—বেলোয়ারী ও প্রেমের জেফ্লিন্ (অমর)

১৭ই এপ্রিল—মাধবরাও (মণিলাল)

মাধবরাও—কুঞ্জবাবু, নারায়ণ—অমরবাবু, রমাবাই—কুসুম।

২১ আগষ্ট—রাজা চন্দ্রধ্বজ (রায় জগচ্চন্দ্র সেন বাহাদুর)

চন্দ্রধ্বজ—অমর, অলকা—কুসুম।

১৮ই সেপ্টেম্বর ব্রত-উদ্‌যাপন—ঐতিহাসিক (মণিলাল)

চন্দ্রকেতু—অমর, গোবিন্দগিরি—হরিভূষণ।

২রা অক্টোবর—রত্ন মঞ্জরী (হরনাথ)। সনাতন—অমর।

৪ঠা ডিসেম্বর সওদাগর (ভূপেন্দ্র)

কুলীরক—অমরবাবু, প্রতিভা—কুসুম।

১৮ ডিসেম্বর—গোসাইজী (ভূপেন্দ্র বন্দ্যো)

২৫শে ডিসেম্বর—ভীলেদের ভোম্‌রা (মনোমোহন গোস্বামী)

মনোমোহন থিয়েটার

৫ই সেপ্টেম্বর—রূপের ফাঁদ (সুরেন রায়)

২৫শে সেপ্টেম্বর—কণ্ঠহার (দাশরথি মুখোপাধ্যায়)

রণলাল—দানিবাবু, নবীনকৃষ্ণ—মিঃ এন্ বানার্জ্জি, নরেন্দ্র—হীরালালবাবু।

২রা অক্টোবর—"রাত্ দুপুরে" (কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু)

৬ই নভেম্বর—শ্যামসুন্দর (মৃণাল চট্টোপাধ্যায়)

১১ই ডিসেম্বর—বাদসাহজাদী (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

আজিজ—দানি, হামিদা—তিনকড়ি, জোবেলা—বসন্ত।

২৫শে ডিসেম্বর—"মুকুরে মুস্কিল"

"থেস্পিয়ান টেম্পল" (গ্রাণ্ড ন্যাসনাল ষ্টেজে)

৭ই আগষ্ট—"নূরমহল" (হরিসাধন মুখোপাধ্যায়)

যোধাবাই—তিনকড়ি, সেলিম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র (ম্যানেজার)।

১১ই সেপ্টেম্বর—"রমা" (ইষ্টলীন) বা অদৃষ্ট (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

হামির (নারায়ণ বসু)। লছমী—হরিমতী (ছোট), জালমেহতা—ক্ষেত্রবাবু, হামির—রামকালী বন্দ্যো, রুক্মা—ভূষণ।

১৯১৬

মিনার্ভা

১লা জানুয়ারী—হাতের পাঁচ (সৌরীন্দ্র মুখো)

২৫শে মার্চ্চ—বঙ্গনারী (দ্বিজেন্দ্র লাল) posthumous

উপেন্দ্র—কার্ত্তিক বাবু, দেবেন্দ্র—অপরেশ বাবু, বিনোদিনী—তারা, কেদার—হাঁদুবাবু, সুশীলা—চারুশীলা।

১৫ই জুলাই—রামানুজ (অপরেশবাবু)

রামানুজ—তারা ও হাঁদুবাবু। ঐ স্ত্রী—নীরদা, লক্ষ্মী—চারুশীলা, যাদব প্রকাশ—প্রিয়নাথ ঘোষ, গোবিন্দ—সত্যেন্দ্র দে, গুরু—অপরেশ বাবু।

২৩শে ডিসেম্বর—মণিকাঞ্চন (অতুল মিত্র)

২৫শে ডিসেম্বর—আক্কেল সেলামী (প্রমথনাথ চৌধুরী)

ষ্টার

৮ই এপ্রিল—"হেমেন্দ্রলাল" (ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

হেমেন্দ্রলাল—কুঞ্জবাবু, ফৈজী—কুসুমকুমারী।

৩রা মে—বল্লাল সেন (যোগেন্দ্র দাস)

২৪শে জুন—জড়ভরত (হারাণ রক্ষিত)

ভরত—মনোমোহন বাবু, মহামায়া—কুসুম।

৯ই সেপ্টেম্বর—বারাণসী (মণিবাবু)। ৪ঠা ডিসেম্বর—রামধেনু।

২৩শে ডিসেম্বর—সাধনা বা কর্ম্মফল (মনোমোহন গোস্বামী)

দেবেন—গ্রন্থকার, সুষমা—কুসুম।

মনোমোহন থিয়েটার

২৬শে ফেব্রুয়ারী—বাপ্পারাও (নিশিকান্ত বসু)

বাপ্পারাও—দানিবাবু, লছমিয়া—তিনকড়ি।

৮ এপ্রিল—কবীর (হরনাথ বসু)

কবীর—দানিবাবু, সন্ন্যাসিনী—তিনকড়ি।

১৫ এপ্রিল—বাহাদুর (নির্ম্মলশিব বন্দ্যো)

৮ জুলাই—মোগল পাঠান (সুরেন্দ্র বন্দ্যো)

সের সা—দানিবাবু, হুমায়ুন—চুণীবাবু, চাঁদ—বসন্তকুমারী।

১৯১৭

মিনার্ভা

৩১ মার্চ্চ—কল্পতরু (রাখালদাস রায়)

২রা জুন—রাতকাণা (নির্ম্মলশিব) গোবর্দ্ধন—হাঁদুবাবু।

৮ সেপ্টেম্বর "বঙ্গে রাঠোর" (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

রঙ্গলাল—প্রিয়নাথ ঘোষ, সাহাবাজ খাঁ—অপরেশবাবু, নন্দলাল—কার্ত্তিকবাবু, বড় বৌ—তারাসুন্দরী, গোপাল—সুবাসিনী (মালিনী)।

১০ নভেম্বর—সীতিমা (মিসেস্ কামিনী রায়)

২২ ডিসেম্বর—মতিরমালা (বরদা গুপ্ত)

ষ্টার

১৪ এপ্রিল—দেববালা (যোগেন্দ্রনাথ বসু)

দেববালা—কুসুমকুমারী, সন্ন্যাসিনী—আশ্চর্য্যময়ী।

২৩ সেপ্টেম্বর—রূপের নেশা

মনোমোহন

৮ এপ্রিল—সতীলক্ষ্মী। রঘুনাথ—চুণীবাবু।

৬ অক্টোবর—পাণিপথ (সুরেন্দ্র বন্দ্যো)

বাবর—দানিবাবু, সংগ্রাম সিংহ—চুণীবাবু, কর্ণদেবী—কুসুমকুমারী, দেলেরা—আশ্চর্য্যময়ী। ২৫ ডিসেম্বর—চাঁদে চাঁদে।

প্রেসিডেন্সি থিয়েটার

১৩ অক্টোবর—বাঙ্গালী পলটন্। ২০ অক্টোবর—নিশার স্বপন।

৩রা নভেম্বর—বাবর সা। ৮ ডিসেম্বর—হাস্না হানা।

১৯১৮

মিনার্ভা

১২ জানুয়ারী—ছবির বাজার (দেবকণ্ঠ) নটবর—নৃপেন বসু।

২০ এপ্রিল—চিতোরোদ্ধার (প্রমথনাথ রায় চৌধুরী)

কৃষ্ণা—তারাসুন্দরী।

১৭ আগষ্ট—কিন্নরী (বিদ্যাবিনোদ)

কিন্নরী—নীরদা, সুধন—কুঞ্জবাবু, উৎপল—নৃপেন বসু, ধনপতি—কালীচরণ বন্দ্যো (স্বর্গীয়), মকরী—চারুশীলা, কিন্নররাজ—নগেন্দ্র ঘোষ।

২৯ নভেম্বর—বিজয় উল্লাস (রাখালদাস রায়) জার্মান যুদ্ধাবসানে।

৮ ডিসেম্বর—রঙ্গবাহার (যতীন্দ্রনাথ পাল)। দুর্গাদাস—কার্ত্তিকবাবু।

ষ্টার

১২ জানুয়ারী রণভেরী (দাসরথি মুখো)

১৯ জানুয়ারী—বঙ্কিমের মুচিরাম গুড়। মুচিরাম—কুসুম।

৩রা আগষ্ট—শরচ্চন্দ্রের বিরাজ বৌ (ভূপেন্দ্র বন্দ্যো)

যদু—অমৃত বসু, নীলাম্বর—মিঃ পালিত, পিতাম্বর—ক্ষেত্রবাবু, বিরাজ—কুসুমকুমারী, সুন্দরী—বসন্ত।

বিদ্যাধরী—(ভূপেন বন্দ্যো) ৮ অবলারঞ্জন—বসন্তকুমারী।

২রা নভেম্বর—"আরব অভিযান"

মনোমোহন

২৩ মার্চ্চ—কিস্‌মত্‌। ২৫ মে—জয় পরাজয় (প্রমথ চৌধুরী)।

১৭ আগষ্ট—দেবলাদেবী (নিশিকান্ত বসু)

খিজির খাঁ—দানিবাবু, মন্তিয়া—আশ্চর্য্যময়ী, আলাউদ্দীন—চুনীবাবু, কমলা—সোনামণি, কাফুর—হীরালালবাবু।

২৫ ডিসেম্বর—পরদেশী।

প্রেসিডেন্সি থিয়েটার (বেঙ্গল ষ্টেজ)

১৬ মার্চ্চ—কর্ম্মবীর (রণেন্দ্র গুপ্ত)

কার্ত্তবীর্য্য—প্রফুল্ল সেন, পরশুরাম—পালিত।

১৭ মার্চ্চ—ধর্ম্মপথ (সতীশ চট্টোপাধ্যায়) ত্রিলোচন—পণ্ডিত অবিনাশ।

২৩ জুন—রয়েল রিসর্ম্মড থিয়েটার কর্ত্তৃক মোতফরাক্কা (ধীরেন মিত্র)

১৯১৯

মিনার্ভা

২৫ মে—হীরার নথ (দাশরথি)

৫ জুলাই—মিশরকুমারী (বরদা গুপ্ত)

আবন—কুঞ্জবাবু, রামেশিশ—হাঁদুবাবু, নাহেরিণ—সুশীলাসুন্দরী, সামন্দেশ—প্রিয়নাথ ঘোষ, বুলা—সুবাসিনী, কাকাতুয়া—অনুকুলবাবু।

ষ্টার

৮ মার্চ্চ—ওথেলো (শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক অনূদিত)

ওথেলো—পালিত, ইয়েগো—অপরেশবাবু, ডেস্‌ডিমনা—তারা।

৩০ মার্চ্চ—মুখেরমত (নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৭ মে—উর্ব্বশী (অপরেশ)। বসন্তক—তারা।

৯ আগষ্ট—দুমুখো সাপ (অপরেশবাবু)

২৪ ডিসেম্বর—বৈবাহিক (ভূপেন্দ্র)

মনোমোহনে ৩১ ডিসেম্বর—ওলট্‌পালট্‌

১৯২০

মিনার্ভা

১১ জানুয়ারী—মনীষা—(মিঃ জে, এন গুপ্ত আই, সি, এস্‌)

মনীষা—কুসুমকুমারী।

২৮ ফেব্রুয়ারী—রবিবাবুর বশীকরণ

৩রা জুলাই—লক্ষ্মণ সেন (নিত্যবোধ)

২৫ ডিসেম্বর—রেশমি রুমাল (মনোঃজমোহন বসু)

ষ্টার

৩রা এপ্রিল—হরিদাস

৫ জুন—রাখীবন্ধন (অপরেশ মুখোপাধ্যায়)

ধারা—তারাসুন্দরী, চন্দ্রাবত—পালিত।

১৭ জুন কুহকী—(দেবেন্দ্রনাথ বসু)।

২১ জুন—ছিন্নহার (অপরেশ)। লীলা—তারা।

মনোমোহন

১০ জানুয়ারী—হিন্দুবীর (সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

হিমু—দানিবাবু, মেহের—আশ্চর্য্যময়ী, মুবারিজ—ক্ষেত্রবাবু।

৩১ জুলাই—বিষবৃক্ষ (নাটকওবায়স্কোপ একত্রে)

১৯২১

মিনার্ভা

১৪ মে—কেলোর কীর্ত্তি (ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়)

কেলো—হাঁদুবাবু, কর্ত্তা—কুঞ্জবাবু, মঘা—কার্ত্তিকবাবু।

২৫ ডিসেম্বর নাদির সাহ—(বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত)

নাদির সাহ—হাঁদুবাবু, আকবরী—চারুশীলা, সয়তান—কার্ত্তিকবাবু।

ষ্টার

১৫ জানুয়ারী—বাসব দত্তা (অপরেশ)

অমরক—তারা, সুসঙ্গতা—নরী।

২রা এপ্রিল "মন্দাকিনী"—ক্ষীরোদপ্রসাদ

৩রা ডিসেম্বর—অযোধ্যার বেগম—(অপরেশবাবু)

মিরকাশিম—চুনীবাবু, হাফেজরহমান—অপরেশবাবু, বেগম—তারা,

ছায়া—কৃষ্ণভামিনী, জিন্নত্—নীহারবালা।

মনোমোহনে ২৫ ডিসেম্বর—প্রাণের টান

বেঙ্গলী থিয়েট্রিকেল কোম্পানী

১৪ মে—অপরাধী কে ? (হিন্দি 'আগা হাসার' হইতে)

১০ ডিসেম্বর—"আলমগীর" (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

আলমগীর—**শিশির ভাদুড়ী**।

উদীপুরী বেগম—কুসুমকুমারী।

১৯২২

মিনার্ভা

১৮ জুন—প্যালারামের স্বদেশিকতা (ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্যালারাম—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মিঃ জেকব—নরেশচন্দ্র মিত্র

১লা অক্টোবর—ফুলশর (ভূপেন্দ্র)

মদন—সুবাসিনী, রতি—নবতারা।

১৮ অক্টোবর—মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়িয়া যায়।

ষ্টার

১লা জুলাই—নবাবী আমল (নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়)

রামপ্রসাদ—পূর্ণ ঘোষ, খতিজা—তারা, হোসেন—হাঁদুবাবু, রাঘব—চুনীদেব, চিন্ময়ী—কৃষ্ণভামিনী।

১৯ আগষ্ট—অপ্সরা (অপরেশবাবু)

২৩ সেপ্টেম্বর—"সুদামা" (অপরেশবাবু)

মনোমোহনে

১০ ফেব্রুয়ারী—বঙ্গে বর্গী (নিশিকান্ত বসু রায়)

ভাস্কর পণ্ডিত—দানিবাবু, মোহনলাল—ক্ষেত্রবাবু, মাধুরী—শশিমুখী, গৌরী (ভাস্করের কন্যা)—আশ্চর্য্যময়ী।

বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল

২রা ডিসেম্বর—মুক্তার মুক্তি (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)।

২২ ডিসেম্বর—রত্নেশ্বরেরমন্দির (বিদ্যাবিনোদ)

রত্নেশ্বর—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, সরমা—প্রভা।

১৯২৩

মিনার্ভা

৩০ মে—রকমারি (বরদাপ্রসন্ন)

ষ্টারে' আর্ট থিয়েটার লিমিটেড

৩০ জুন—কর্ণার্জ্জুন (অপরেশবাবু)

কর্ণ—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, অর্জ্জুন—অহীন্দ্র চৌধুরী, পদ্মাবতী—
কৃষ্ণভামিনী, নিয়তি—নীহারবালা, শকুনি—নরেশ মিত্র,
পরশুরাম—অপরেশ মুখো, দুর্য্যোধন—প্রফুল্ল সেন ।

মনোমোহনে

১০ ফেব্রুয়ারী—নজরে নাকাল । ৩রা মার্চ্চ—আশা প্রতীক্ষা ।

১৮ আগষ্ট—আলেকজাণ্ডার (সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

আলেক্‌জাণ্ডার—দানিবাবু ।

১০ মার্চ্চ—বিদুরথ (বিদ্যাবিনোদ) [বেঙ্গল থিয়েট্রিকেলে]

বিদুরথ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, অম্বালিকা—কুসুম ।

২১ এপ্রিল—সতীলীলা । কস্তূরী—কুসুম ।

১৯২৪

মিনার্ভা

৯ সেপ্টেম্বর—জীবনযুদ্ধ (মনোমোহন রায়)

মেঘনাদ—কার্ত্তিকবাবু, ইন্‌স্পেক্টার—সত্যেন্দ্রবাবু, রমানাথ—
(থেনাডিয়ার) হাঁদুবাবু, ঐ পত্নী—নগেন্দ্রবালা ।

৮ নভেম্বর—জোরবরাত (ভূপেন্দ্র)

জয়শঙ্কর—কুঞ্জবাবু, ব্যারিষ্টার—কার্ত্তিকবাবু ।

২৫ ডিসেম্বর—কৃতান্তের বঙ্গদর্শন (ভূপেন্দ্র)

কৃতান্ত—কুঞ্জবাবু, মহাবীর—হাঁদুবাবু, চিত্রগুপ্ত—কার্ত্তিক ।

ষ্টার

১লা জানুয়ারী—ইরাণের রাণী (অপরেশ) । রাণী—কৃষ্ণভাবিনী ।

৩রা ডিসেম্বর—রূপকুমারী (নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়) ।

২৫ ডিসেম্বর—বন্দিনী (অপরেশবাবু)

ইসকিবস—গ্রন্থকার, তাবেজ্—আশ্চর্য্য, ম্যামসিস—অহীন্দ্রবাবু, বন্দিনী—ফিরোজা, মিতানীর রাজা—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, নাহেরীণ—নীহার।

মনোমোহন

ফেব্রুয়ারী—ললিতাদিত্য

ললিতাদিত্য—দানিবাবু, গৌড়েশ্বর—ক্ষেত্রবাবু, বিজয় সেন—দুর্গাপ্রসন্ন বসু (গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য দৌহিত্র), গৌড়েশ্বরী—কুসুমকুমারী, রট্যা—শশিমুখী।

মনোমোহনে ভাদুড়ীর নাট্যমন্দির

৬ই আগষ্ট—সীতা (যোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

রাম—শিশির ভাদুড়ী, সীতা—প্রভা, দুর্ম্মুখ—অমিতাভ বসু, বাল্মিকি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শম্বুক—গ্রন্থকার, বশিষ্ঠ—ললিত লাহিড়ী।

১৩ ডিসেম্বর—পাষাণী (দ্বিজেন্দ্রলাল)

ইন্দ্র ও গৌতম—শিশিরবাবু, অহল্যা—প্রভা, চিরঞ্জীব—মনোরঞ্জন।

১৯২৫

মিনার্ভা

১৮ এপ্রিল—ঠকেরমেলা (ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন)

ঠক—হাঁদুবাবু।

১৫ জুলাই—"ডালিম" (চিত্তরঞ্জন দাশ হইতে বরদা গুপ্ত)

মিনার্ভার নবনির্ম্মিত নিজ বাটীতে

৮ আগষ্ট—আত্মদর্শন (মহাতাপচন্দ্র ঘোষ)

মনরাজা—হাঁদুবাবু, সুখ—রেণুবালা, ক্রোধ—সত্যেন্দ্র দে, কাম—তুলসী বন্দ্যো, রতি—সুবাসিনী, বিবেক—আঙ্গুরবালা।

২৫ ডিসেম্বর—সত্যভামা (বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত)

সত্যভামা—সুবাসিনী, নারদ—হাঁদুবাবু, শ্রীকৃষ্ণ—তুলসীবাবু।

ষ্টারে

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—গোলকুণ্ডা (বিদ্যাবিনোদ)

ঔরঙ্গজেব—অহীন্দ্র চৌধুরী, মিরজুমলা—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, হাসান—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, সেলিমা—সুবাসিনী।

১৮ জুলাই—চিরকুমার-সভা (রবীন্দ্রনাথ)

চন্দ্র—অহীন্দ্রবাবু, অক্ষয়—তিনকড়িবাবু, রসিক—অপরেশবাবু, পূর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরবালা—নীহার।

৫ই ডিসেম্বর—গৃহপ্রবেশ (রবীন্দ্রনাথ)। যতীন—অহীন্দ্র।

২৫ ডিসেম্বর—ঋষির মেয়ে (ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন)

শাশ্বতী—সুশীলা, অগ্নিবর্ণ—অহীন্দ্রবাবু, আপস্তম্ব—রাধিকাবাবু।

মনোমোহনে নাট্যমন্দির

১৩ আগষ্ট—পুণ্ডরীক (মিঃ শ্রীশচন্দ্র রায়, ব্যারিষ্টার)

পুণ্ডরীক—শিশিরবাবু, সাকী—তারা, রুস্তানা—চারুশীলা।

১৯২৬

মিনার্ভা

২০ মার্চ্চ—বাঙ্গালী (ভূপেন্দ্র)

দীনদাস—কুঞ্জবাবু, ভিখারিণী—সুবাসিনী, রামলোচন—কার্ত্তিকবাবু।

৯ই জুলাই—ব্যাপিকা বিদায় (অমৃত বসু)

সঞ্জীবচৌধুরী—কুঞ্জবাবু, ব্যাপিকা—নগেন্দ্রবালা, ঘনশ্যাম—হীরালাল চট্টো। ঐ—নারীরাজ্যে (ভুপেন্দ্রবাবু)।

১৩ নভেম্বর—ধর্ম্মঘট (কৃষ্ণ চৌধুরী)

২৪ ডিসেম্বর—যুগমাহাত্ম্য (Parody on Rabi Babu) (ভূপেন্দ্র)।

ষ্টারে (আর্ট থিয়েটার)

১৫ মে—শ্রীকৃষ্ণ (অপরেশ), শ্রীকৃষ্ণ—তিনকড়ি, ভীষ্ম—দানিবাবু।

৭ই জুলাই—লাখটাকা (সৌরীন্দ্র মুখো), রক্তবীজ—অহীন্দ্র চৌধুরী।

২০ জুলাই—শোধবোধ (রবীন্দ্রনাথ)

সতীশ—অহীন্দ্রবাবু, মেশোমশায় ও মিঃ নন্দী—রাধিকাবাবু, মিঃ লাহিড়ী—কুমার কনকেন্দ্র নারায়ণ, নেলী—নীহার।

১০ নভেম্বর—বন্দেমাতরম (অমৃত বসু)

২৫ ডিসেম্বর—চণ্ডীদাস (অপরেশবাবু)

চণ্ডীদাস—তিনকড়ি, রামী—নিহার, হারাধন—সন্তোষবাবু।

মিত্র থিয়েটার (আলফ্রেডে)

২রা এপ্রিল—শ্রীদুর্গা (বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত)

শ্রীদুর্গা—তারা, কামকলা—কুসুম, মহিষাসুর—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

২৪ জুলাই—জয়শ্রী (ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ)

ডারবি টিকেট (ভূপেন)

নাট্যমন্দির (কর্ণওয়ালিশে)

২৬ জুন—বিসর্জ্জন (রবীন্দ্র নাথ)। রঘুপতি—শিশির।

১লা ডিসেম্বর—নরনারায়ণ (ক্ষীরোদপ্রসাদ)

কর্ণ—শিশির, পদ্মা—কৃষ্ণভামিনী, দ্রৌপদী—চারুশীলা।

১৯২৭

মিনার্ভা

২৩ এপ্রিল—"তুলসীদাস" (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়)

তুলসীদাস—আঙ্গুরবালা, রত্নাবলী—নগেন্দ্রবালা, রাম—রেণুবালা।

৯ই জুলাই—রামায়ণে আর্ট (শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়)

১০ডিসেম্বর—নর্ত্তকী (বরদাবাবু)

২৪ ডিসেম্বর—**ছুটাকী** (গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত গীতিনাট্য)

ষ্টার

১০ সেপ্টেম্বর—পরিত্রাণ (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ)। ধনঞ্জয়—তিনকড়ি, বসন্তরায়—নরেশ মিত্র, প্রতাপাদিত্য—তুলসী বন্দ্যো।

৩রা ডিসেম্বর—মগের মুলুক (অপরেশবাবু)। শাসুজা—তিনকড়ি।

মনোমোহনে আর্ট থিয়েটার

১লা জুলাই—রামায়ণ (অপরেশ)

দশরথ—অহীন্দ্র, রাম—দুর্গাদাস, সীতা—সুশীলাবালা।

১৪ সেপ্টেম্বর—চাঁদসওদাগর (মন্মথ রায়)

বেহুলা—সুশীলাবালা, চাঁদসওদাগর—অহীন্দ্র।

নাট্যমন্দিরে

৬ আগষ্ট—ষোড়শী (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) [সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক]
জীবানন্দ—শিশিরকুমার, ষোড়শী—চারুশীলা।

এই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের "মায়ার খেলা" ১৭ই আগষ্ট এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনীত হয় ও "নটীর পূজা" জানুয়ারী মাসে হয়।

১৯২৮

ষ্টার

১লা জানুয়ারী—পুষ্পাদিত্য (অপরেশ)
২৮ এপ্রিল—দেবাসুর (মন্মথনাথ রায়)
বৃত্র—অহীন্দ্র চৌধুরী।

মনোমোহনে আর্ট

১লা জানুয়ারী—আরবীছড়

মিনার্ভায়

৫ মে—**যাজ্ঞসেনী** (নাট্যাচার্য্য রসরাজ অমৃতলাল বসু)
শ্রীকৃষ্ণ—হাঁদুবাবু, দ্রৌপদী—শশিমুখী, অর্জ্জুন—কুঞ্জবাবু,
ধৃতরাষ্ট্র—**দানিবাবু**।

[গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র—[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ] প্রতিভাশালী অভিনেতা বয়স প্রায় ষাট্ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার যোগ্য—উপেন, প্রসন্নকুমার, করুণাময়, ভাস্কর, খিজির, গদাধর, দুলালচাঁদ, যোগেশ প্রভৃতি বহু ভূমিকায় আজও ইনি অপ্রতিদ্বন্দী।]

——:*:——

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-শিক্ষা ও পতিতার উদ্ধার

অভিনয়-নৈপুণ্য ও নাটক-প্রণয়ণে যেমন গিরিশের অদ্ভুত প্রতিভা ছিল, অভিনেত্রীবর্গের শিক্ষাপ্রদানেও তাঁহার তেমন অদ্ভুত দক্ষতা দেখা যাইত। এই ক্ষমতা "সধবার একাদশীর" সময় হইতে "তপোবন" পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ অমৃতবাবু বলেন, নিমচাঁদের অভিনয়েই "প্রথমে দেখিল বঙ্গ নটগুরু তার"। অমৃতবাবু নিজেও গিরিশচন্দ্রকে 'গুরুদেব' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন—

সাথী মিত্র **গুরু** তুমি, প্রণমি লুটায়ে ভূমি,
চিরশিষ্য তরে স্থান কিছু রাখিও চরণে।

স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) ও প্রথম হইতেই গিরিশচন্দ্রের সহযোগী হইলেও অভিনয়-ব্যাপারে তাঁহাকে গুরুর সম্মান দিতেন। ষ্টারের প্রথিতযশা অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রও গিরিশের হাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা পান। অমৃত মিত্র পূর্ব্বে যাত্রার দলে অভিনয় করিতেন, গিরিশচন্দ্র তাঁহার সুন্দর গুরুগম্ভীর স্বর শুনিয়া তাঁহাকে থিয়েটারে লইয়া আসেন। ক্রমে গিরিশের সুশিক্ষায় তাঁহার নাটকের প্রধান প্রধান ভূমিকা ইনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিতেন। পূর্ব্বে গিরিশের নাটকের নায়কের ভূমিকায় তিনি নিজেই অবতীর্ণ হইতেন, কিন্তু পরে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রায় নাটকে তিনি অমৃতলালকেই প্রধান নায়কের ভূমিকা দিতেন।

স্ত্রীভূমিকায়ও কিরণবালা, প্রমদাসুন্দরী, তারাসুন্দরী, নগেন্দ্রবালা, কুসুমকুমারী, সুশীলাসুন্দরী প্রভৃতি সর্ব্বদা তাঁহার শিক্ষায় উচ্চাদর্শ লাভ করিলেও বিনোদিনী ও তিনকড়িই বিশেষরূপে গুরুদত্ত শিক্ষার মর্য্যাদা

রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনকড়ির ন্যায় অশিক্ষিতা অভিনেত্রী যে গুরুর ঐকান্তিক সাধনায় লেডী ম্যাকবেথ, জনা, সুভদ্রা ও শ্রী প্রভৃতি ভূমিকায় অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা কম প্রশংসার কথা নহে। বলিতে কি তিনকড়ির যশ, অর্থ, খ্যাতি ও উন্নতি সবই শ্রীগিরিশের কৃপায়। গিরিশের মৃত্যুর পরে তিনকড়ি নিজেই শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন "পরমপূজনীয় গিরিশবাবুর আন্তরিক যত্ন ও শিক্ষাতেই আমার ন্যায় মূর্খা স্ত্রীলোক নাট্যামোদীগণের প্রীতিলাভে সমর্থ হইয়াছে।"

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষালাভ করেন শ্রীবিনোদিনী। বিনোদিনীর প্রণীত 'আমার জীবন' পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন "রঙ্গালয়ে আমি ৺গিরিশবাবু মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলাম, তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী বলিয়া একসময়ে নাট্যজগতে আমার গৌরব ছিল। আমার অতি তুচ্ছ আব্দারও রাখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।"

আমরা পতিতাকে ঘৃণা করি, হীন মনে করি কিন্তু তাহারাও যে রক্ত-মাংস-গঠিত মানুষ তাহা ভুলিয়া যাই। সমাজে এই সব দুর্ব্বল চরিত্র বা অবস্থার ক্রীড়নক পতিতাদের উন্নতির জন্য কে প্রয়াস পায়? আমরণ সাধনায় রঙ্গালয়ের উন্নতি করিয়া গিরিশচন্দ্র এই পতিতাদের জীবন অনেকাংশে উন্নত করিয়াছেন—তিনি জানিতেন সামান্য বনিতার ক্ষুদ্র জীবনেও মহান্ শিক্ষাপ্রদ উপাদান রহিয়াছে। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন "যাহারা বিনোদিনীর ন্যায় অভাগিনী, কুৎসিত পন্থা ভিন্ন যাহাদের জীবনোপায় নাই, মধুরবাক্যে যাহাদিগকে ব্যভিচারীরা প্রলোভিত করিতেছে, তাহারাও মনে মনে আশ্বাসিত হইবে যে, যদি বিনোদিনীর মত কায়মনে রঙ্গালয়কে আশ্রয় করি, তাহা হইলে এই ঘৃণিত জন্ম জনসমাজের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে পারিব। যাহারা অভিনেত্রী, তাহারা বুঝিবে—কিরূপ মনোনিবেশের সহিত নিজ ভূমিকার প্রতি যত্ন করিলে জনসমাজে প্রশংসাভাজন হইতে পারে।"

কিরূপ শিক্ষায় বিনোদিনী অভিনেত্রীকুল-শিরোমণি, তাহার আত্ম-চরিতে আমরা সে আভাস পাই। বিনোদিনী বলেন——

"সকল পুস্তকেই আমার, গিরিশবাবুর, অমৃত মিত্রের, অমৃত বসু মহাশয়ের এই সকল বড় বড় পাঠ থাকিত। গিরিশবাবু আমাকে পার্ট অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথমে পাঠগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পাঠ মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাড়ীতে বসিয়া অমৃত মিত্র, অমৃত বাবু (ভুনীবাবু), আরও অন্যান্য লোক মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি—সেক্সপীয়ার, মিলটন, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাবভাবের কথা এক একজন করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য্য শিখিতে লাগিলাম। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়াপাখীর চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তিদ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়-নির্ব্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী বড় বড় একট্রেস্ আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটারের অধ্যক্ষেরাও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজী থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাড়ী আসিলে গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেন "কি রকম দেখে এলে বল দেখি?" আমার মনে যেখানে যেমন বোধ হইত তাঁহার কাছে বলিতাম। তিনি আবার যদি ভুল হইত তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সদুপদেশগুণে আমি যখন ষ্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি, আমি যেন সেই চরিত্র। কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত............।

"আমার অন্য কথা বা অন্য গল্প ভাল লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন আমার তাহাই ভাল লাগিত। মিসেস্ সিডনস্

থিয়েটারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া দশ বৎসর বিবাহিতা অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন্ সমালোচক কোন্স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিল, কোন্ অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী ইত্যাদি পুস্তকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। কোন্ একট্রেস বিলাতে বনের মধ্যে পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত, তাহাও বলিতেন। এলেন্‌টারি কিরূপ সাজ-সজ্জা করিত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন হ্যামলেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' কোন্ পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, 'রজনী' কোন্ ইংরাজী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম—কত বলিব—গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ইংরাজী, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ জার্ম্মানি প্রভৃতি বড় বড় 'অথরের' কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম।

"নানাবিধ ভাব সংগ্রহের জন্য সদা সর্ব্বক্ষণ মনকে লিপ্ত রাখায় আমি কল্পনার মধ্যেই বাস করিতাম। কল্পনার ভিতর আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিতাম, সেই জন্য বোধ হয়, আমি যে পাঠ অভিনয় করিতাম, তাহার চরিত্রগত ভাবের অভাব হইত না। যাহা অভিনয় করিতাম তাহা যে অপরের মনোমুগ্ধ করিবার জন্য বা বেতনভোগী অভিনেত্রী বলিয়া কার্য্য করিতেছি ইহা আমার কখনও মনে হইত না। আমি নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতাম। চরিত্রগত সুখ দুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, আমি যে অভিনয় করিতেছি তাহা একেবারে বিস্মিত হইয়া যাইতাম।

"আমি অতি শৈশবকালে অভিনয়-কার্য্যে ব্রতী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির প্রথম বিকাশ হইতেই, গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষাগুণে আমায় যেন কেমন উচ্ছ্বাসময়ী করিয়া তুলিয়াছিল! কেহ কিছুমাত্র কঠিন ব্যবহার করিলেই বড়ই দুঃখ হইত।"

গিরিশচন্দ্রের সুশিক্ষাগুণে এই অভিনেত্রীতে নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ কিরূপ প্রকৃষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা গিরিশবাবুর কথায়ই পাঠককে নিবেদন করিব :—

"কোন ভূমিকায় চরমোৎকর্ষলাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকা কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে অঙ্গে কি কি পারিচ্ছদিক পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকা-কল্পিত আকার গঠিত হইবে তাহা মনঃক্ষেত্রে চিত্রকরের ন্যায় সেই আভাষ আনা আবশ্যক। অভিনয়কালীন ঘাতপ্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসজ্জিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে মনচাঞ্চল্য ঘটিবে, কি আপনার কথা কহিতে কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনিতে—সেই ক্ষণেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইবে। এ সমস্ত লক্ষ্য করিতে পারেন, এরূপ দর্শক বিনোদিনীর সময় বিস্তর আসিতেন; এবং সে সময় অভিনয় সম্বন্ধে অতি তীব্র সমালোচনা হইত। যথা 'পলাশীর যুদ্ধ' দেখিয়া 'সাধারণীতে' সমালোচনা,—"ন্যাসনাল থিয়েটারের অভিনেতারা সকলে সুপাঠক, যিনি ক্লাইভের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্গভঙ্গীও জানেন।" এইটুকু একপ্রকার সুখ্যাতি ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার পর সিরাজদ্দৌল্লার উপর এরূপ কঠোর লেখনী-সঞ্চালন যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌল্লা যেরূপ পলাশী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা সিরাজদ্দৌলা সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন "আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই।" কিন্তু তাৎকালিক সমালোচক যেরূপ কঠোরতার সহিত নিন্দা করিতেন, সেইরূপ অতি উচ্চ প্রশংসা দানেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল সমালোচক-শ্রেণী তাৎকালিক বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে চালক ছিলেন। বহুভূমিকায় বিনোদিনী ঐ সকল সমালোচকের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচায়ক। সতীর মুখে একটি কথা আছে, "বিয়ে কি, মা?" এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যজ্ঞকথা কহিবে, এইরূপ বয়স্কা স্ত্রীলোকের মুখে "বিয়ে কি, মা?" শুনিলে ন্যাকাম মনে হয়। সাজসজ্জায়, হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে অভিনেত্রীকে

হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যানমগ্ন বালিকা সংসারজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় মাতাকে "বিয়ে কি, মা?" প্রশ্ন করিয়াছে। পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত অতি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কহ, নাথ!
কি হেতু কহিলে—
"ধন্য, ধন্য কলিযুগ"?
ক্ষুদ্র নর অন্নগতপ্রাণ,
রিপুর অধীন সবে;
রোগ শোক সন্তাপিত ধরা,
পন্থা হারা মানবমণ্ডল
ভীম ভবার্ণব মাঝে;
কেন কহ বিশ্বনাথ,—"ধন্য কলিযুগ"?

যোগিনী বেশে যোগীশ্বরের পার্শ্বে জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা বিনোদিনীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হইত। তেজস্বিনীর মহাদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান,—

"শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর;
প্রজারক্ষা কেমনে গো হবে?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ওমা, পতিনিন্দা কেন সব?"

এ কথায় যেন সতীত্বের দীপ্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন অথচ দৃঢ়বাক্যে পূজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।"

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাগুণে বিনোদিনীর দক্ষতা কিরূপে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত

হয়, এইখানে তাহার বিস্তৃতালোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে তাঁহার চৈতন্যের অভিনয় দর্শনে পরমহংসদেব করকমলদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন "চৈতন্য হোক"।

ঋষিপ্রবর কর্ণেল অলকট যে বিনোদিনীর অভিনয়কালে ভাববিহ্বলতায় যেন সাক্ষাৎ চৈতন্যদেবকে সম্মুখে দর্শন করিয়াছিলেন এবং নটের প্রভৃতি অপেক্ষা তাহার চেহারা ও হাবভাবে কম গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহার কথায়ই পূর্ব্বে পাঠককে উপহার দিয়াছি। 'রেইস্ ও রায়তের' সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্যলীলা ও বিবাহবিভ্রাট অভিনয় দেখিয়া গিরিশ-চালিত ষ্টার থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিবার পরে বিনোদিনী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও কম প্রশংসা ও গৌরবের কথা নয়।—

But last not least, what shall we say of Binodini? She is not only the moon of the Star Company, but absolutely at the head of her profession in India. She must be a woman of considerable culture to be able to show such unaffected sympathy with so many and various characters and such capacity for reproducing them. She is certainly a lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace. On Wednesday she played two very distinct and widely divergent roles, and did perfect justice to both. Her Mrs. Bilashini Karforma, the girl graduate, exhibited, so to say, an iron grip of the queer phenomenon, the Girl of the period as she appears in Bengali society. Her Chaitanya showed a wonderful mastery of the subtle forces dominating one of the greatest of religious characters who was taken to be the Lord himself and is to this day worshipped as such by millions. For a young Miss to enter into such a being so as give it perfect expression, is a miracle. All we can say is that genius like faith can remove mountains.

ভাবার্থ—"সর্ব্বশেষে, বিনোদিনীর কথা আর অধিক কি বলিব? কেবল কি সে ষ্টারের অভিনেত্রীবৃন্দের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবময়ী! বলিতে কি ভারতবর্ষের সমস্ত অভিনেত্রীবৃন্দের সে শীর্ষ-স্থানীয়া। বিশেষ শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞা বলিয়া বহুবিধ চরিত্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেই সেই চরিত্রের অভিব্যক্তি সে অতি নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করে। আর তাহার রুচি বিশেষ মার্জ্জিত বলিয়া কোন অভিনেত্রীই এ পর্য্যন্ত তাহার মনোহারিত্ব অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। গত বুধবার সে দুইটি বিভিন্ন ও পরস্পর সম্পূর্ণ বিসদৃশ চরিত্রে অভিনয় করিয়া উভয় চরিত্রের সম্যক্ সম্মান রক্ষা করিয়াছে। শিক্ষিতা রমণী গ্রাজুয়েট্ বিলাসিনী কারফরমার চরিত্র অভিনয়ে সে 'আধুনিক বঙ্গসমাজের' শিক্ষিতা মহিলার আদর্শরূপা অদ্ভুত ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছে।

"চৈতন্যের ভূমিকায় আবার যে প্রেমবলে সকল ধার্ম্মিক চরিত্রের অগ্রগণ্য-রূপে গৌরাঙ্গদেব অসংখ্য নরনারীর নিকট আজও চিরপূজ্য, যে প্রেমে তিনি পূর্ণ কৃষ্ণাবতার সেই ভক্তি ও প্রেম সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিনোদিনীর ন্যায় স্বল্পবয়স্কা অভিনেত্রীর পক্ষে চৈতন্যের ভক্তি ও প্রেমের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখান নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাসের মতই প্রতিভা ও পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।"

গিরিশের শিক্ষা ও সহানুভূতিতে কেবল বিনোদিনী নয়, অন্যান্য অভিনেত্রীও উচ্চ আদর্শের আভাষ পাইয়া কিরূপে জীবনের ধারায় আশার আলোক দেখিয়াছিল, তাহা আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর নিজের কথাই পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব।

পরলোকগতা সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুশীলাসুন্দরী লিখিয়াছিলেন——

"আমরা গুরু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কথা জানি না, তাঁহার ন্যায় জগতে আর কেহ অত পুস্তক লিখিয়াছেন কিনা জানি না,—তাঁহার নাটকের দোষগুণের বিচার করিবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আমাদের নাই, তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম, দোষগুণ কখনও বিচার করি নাই বা সাধ্যও নাই! শুধু এইটুকু জানি, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন—তিনি আমাদের গুরু—পিতা

শিক্ষাদাতা—তিনি আমাদের হৃদয়ে সামান্য একটু জ্ঞানালোক দিয়াছেন, তিনি আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রমলব্ধ অর্থে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন—আর আমাদের ঘৃণা না করিয়া" যথেষ্ট আদর করিয়াছেন। তাই তাঁর বিয়োগে আমরা পিতৃহারা——

মিনার্ভা থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন—

"অভিনয়ে ভাব ফুটাইতে হইলে কিরূপ উচ্চারণ-শক্তি, যতি-জ্ঞান এবং অর্থ প্রকাশের জন্য বাক্যের মধ্যে কোন্ শব্দ কিরূপ স্বরভঙ্গীতে উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহার বিশেষ শিক্ষা গিরিশবাবু যেরূপ জানিতেন, সেরূপ আর কেহ জানিতেন কিনা সন্দেহ। কোনও ভূমিকার কোনও স্থান বুঝিতে না পারিলে তিনি ছাড়িতেন না; এক রকমে নয়, তাহার ভাব শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। এমনই তাঁহার শিষ্যবাৎসল্য ছিল। তিনি যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিতেন যে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া যাহা কিছু কথাবার্ত্তা—তাহা সহচর অভিনেতাদের সঙ্গেই কহিতে হইবে; দর্শকের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও থাকিবে না, কেবল তাঁহারা শুনিতে পাইবেন—এইটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে।"

শ্রীমতী নরীসুন্দরী লিখিয়াছিলেন,—'আমার জন্মের পর সাধুসমাজ আমায় বলিয়াছিলেন যে "পুণ্যের ছাপমারা কুলে যখন তোর জন্ম নয়, তখন তুই চিরদিন পাপই করিতে থাক্ আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে, ঘৃণা করিতে থাকি।" কিন্তু গিরিশবাবু অতটা পুণ্যবান্ ছিলেন না, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি আমার মত অভাগিনীর মুখ দিয়াও চৈতন্যলীলার নিতাইয়ের, বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর মধুময় কথা বলাইয়াছিলেন।"

বসন্তকুমারী লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার চরণতলে বসিয়া আমরা কেবল অভিনয় করিতে শিক্ষা করি নাই;······সেই মহাপুরুষ গিরিশবাবু এই দুঃখিনীদের প্রাণস্পর্শ করিয়াছিলেন, কন্যার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আদরে, যত্নে, আশ্বাসে এ জ্বালাময় জীবনে শান্তিজল ছড়াইয়া দিয়াছিলেন।"

এইরূপই ছিল গিরিশের অভিনয়শিক্ষা-প্রণালী। গিরিশ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজে নাটক লিখিয়া, নাটকের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ং অভিনয় করিয়া, অভিনয়ের উচ্চাদর্শ দেখাইয়া "রঙ্গালয়কে" জাতীয় শিক্ষামন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন।

শেষ

"গিরিশ প্রতিভায়" আমরা আগাগোড়া আলোচনা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছি যে গিরিশচন্দ্র বঙ্গনাট্যসাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ইংরাজ-জাতি যেমন সেক্সপিয়রের গর্ব্ব করিয়া থাকে, ফরাসী যেমন "মলেয়ারের" গর্ব্ব করিয়া থাকে, জার্ম্মাণী যেমন "গেটের" গর্ব্ব করে, আমরাও তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে "গিরিশচন্দ্রে"র গর্ব্ব করিতে পারি। শুধু তাই নহে—গিরিশের একটা বিরাট্ প্রতিভা ছিল,—তিনি একাধারে যেমন শ্রেষ্ঠ নট, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, বঙ্গরঙ্গালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, শ্রেষ্ঠ গীতরচয়িতা,—তেমন অদ্ভুত প্রতিভাশালী পুরুষ পৃথিবীর আর কোন জাতির ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ হয়তো আমরা তাঁহার প্রতিভার পরিমাণ করিতে অক্ষম, আজ হয়তো এই মহান্ প্রতিভার বিশালত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, কিন্তু একথা আমরা দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি যে এমন দিন আসিবে যেদিন এই বরেণ্য মহাপুরুষের দান আমরা সগৌরবে স্বীকার করিব এবং জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে তাঁহার প্রভাব অনুভূত হইবে। কারণ প্রকৃত মহাপুরুষেরা—জগতের শ্রেষ্ঠ-প্রতিভাশালী মনীষীরা, যুগকে গঠন করিয়া থাকেন—ইহাঁরা যুগপ্রবর্ত্তক। **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের** বাণীর সঙ্গে মিলাইয়া আমরা তাঁহার ভাষায় বলিব "অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ভারতেরই পদতলে বসিয়া গিরিশের নাটক, গীত ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবে। **তখনই তাহারা বুঝিতে পারিবে গিরিশ কত বড়।**"

—:*:—

সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ।

অঘোর—৪২, ৪৩, ৩৯০, ৪০৮,

অর্দ্ধেন্দুশেখর—৫৭ ৬২, ৬৩, ৬৪,
২১২, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৮,
৫৯৪, ৬০৯,

অমৃত বসু—৫৮, ৬৮, ৫৭৫, ৬২৮,

অশোক—২৭, ১৬, ১১, ১০৭

অমরেন্দ্র—৭২, ৭৩, ৫৯৮, ৬১৭

আনন্দরহো—৯২, ৪৮০, ৪৮৫

আকাল—১৬, ৪১০, ৫৪৫

ঈশ্বর গুপ্ত—২১

উপেন্দ্র—৩১৯—৩২৩, ৩৯১

কেদার চৌধুরী—৮, ৯, ৬৪, ৫৮৮

করুণাময়—৫২, ৩১৬—৩১৯

কিশোর—৪০৩, ২৪৭, ৩৩৭,

কৃত্তিবাস—২২, ৪৮৫, ৪৯০,
৪৮৭, ৪৯৩, ৫০৪

কালাপাহাড়—৮৯, ৯০, ১৯১,
৭১, ৮০, ৮১, ৮৮, ১০০,
১০১, ১০৭, ১১৬, ১৮৫

কালীকিঙ্কর—২০, ২৮, ২২২,
২৪৩, ২৪৭, ৩০৯, ৩১১,
৩১৫, ৩১৯, ২২৭, ২৪২

গুলসানা—২৩৪, ৪৬১

গুরুদাস—১৭, ২৪, ৫৬০

গোবরা—১৯, ১২, ৩৮৩,

চৈতন্যলীলা—৪৫, ৮৩, ৮৪, ৮৫,
৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৯,

চন্দ্রা—৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৫৭১

চিত্তরঞ্জন—১৫৮, ১৬৬, ২০৭,
২১৯, ২২৭, ২২৮, ২৭৯,
৬৫১, ৫৬৭, ৬৩৮

জনা—৫১৫, ২১০, ২১১, ৪৭৪

জহরা—৪৬১, ২৮১, ২৮৪

তারা—২৪০, ২৮৬,

দানী—৩০, ৫৯১, ৬২৮

দুলাল—৪৫৯, ৪১৪

দক্ষ—৬৮, ৪৮৭, ৫০৭, ৫০৮

দেবেন্দ্র বসু—৯, ৯১, ২৭৮, ৪০৭
৪২২, ৩২৩, ৫৭২, ৫৯৫, ৬২১

দীনবন্ধু মিত্র—৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০,
৬১, ৬২, ২১৯, ৪৮০ ৫৭২ ৫৭৪

নবীনকৃষ্ণ বসু—৩, ৪, ২২

নবীনচন্দ্র—২৫৫, ৪৭৯, ২৭৩

নীলকমল—১, ২, ৪, ৫, ১০,
১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

নসীরাম—১৮৪, ২০৪, ৭০

প্রকাশ—৩৩০-৩৩৪, ৩৩৮-৩৪৮,
২৯০, ৩৮৯

প্রফুল্ল—৩০, ৩৬২-৩৬৩, ৩৮৫
৩৮৪, ২৯১, ৪৭৫, ৩৯৩,

পূর্ণচন্দ্র—৬৯, ১৫, ১২, ৮৭,
১৭১, ১৭৮, ১৮১, ৩৮৩,
প্রসন্নকুমার—৩২৩-৩৩০
৩৬০, ৩৯৪
পাগলিনী—১৩৩—১৪৭
ফণী—৩৭৪—৩৮২, ৪৬৩
বিল্বমঙ্গল—৮১, ৮৫, ১০৯, ১১৪,
১১৭, ১৩৩-১৬০, ৪৬৪
বৈষ্ণবী—২২৯, ২৩৩-২৩৭
বুদ্ধদেব—৮২, ১১, ১০৮, ৫৫১
বিশ্বামিত্র—৫২৪-৫৪০, ২৫১
বিষাদ—২৭, ১৭৯, ১৮৩
৬৯, ৭০, ৪৫০-৪৫৪
বাল্মিকী—৪৮৪, ৪৯০, ৪৯৭,
৫০৪, ৪৯৩, ৫০০
বঙ্কিমচন্দ্র—২১৯, ২৮৪, ৪৮৪,
৬৭, ৬৪
বিবেকানন্দ—১১৫, ১৪৭, ১৯৪,
১৯৫, ২৩৭, ২৪১-২৫৩ ১২৫
১৩০, ১৩১,
বিনোদিনী—৬৮, ৬৩০, ৫৮১,
ভুবনমোহিনী—৩৩০-৩৪৯, ৩৮৬,
মহাত্মা গান্ধী—২২১, ৫৩০, ২৩৭
মধুসূদন—৬২, ৬৫, ৫৭,
৪৮৪, ৪৮৮, ২১৯, ৫০৪
মহেন্দ্র সরকার—৪৬, ১১৫, ৩০৯
মিরকাসিম—২৩৮, ২৪০, ২২০,
২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০
ভুবন নিয়োগী—৬০, ৬৬,
যোগেশ—২০, ২৮, ৪৩, ২৯২-
৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৫,
৪৮৭, ৩৯৮, ৪২৮, ৬৯০
যোগীন্দ্র বসু—৫৭০, ৫০৪
রাবণ—৪৮৪-৪৮৭, ৫০৬
রাম—৪৮৪, ৪৯২, ৫০১, ৫১৮,
৬৪, ৬৫, ৬৬,
রামদত্ত—১০৬, ১২২, ১২৪,
১২৬, ১২৭
রামকৃষ্ণদেব—২৭, ৪৩, ৪৫, ৪৭,
৫৩, ৯২—২১৩
লক্ষ্মণ—৪৯৮, ৫০০,
শঙ্করাচার্য্য—৯২, ৯৮, ১০৮,
১১২, ১১৭, ১১৬, ১১৯,
১২৭, ৫১৬, ৫২৪
শিশির ঘোষ—৪২, ৬৭, ৫৭৬
সারদা মিত্র—৫৮, ৩১৫, ৫৫০,
৫৬৪
সুন্দরা—১৭৪, ৪৬৯,
সুশীলা—৪৩, ৪২৬
সীতা—৪৩২, ৫০১-৫০৫
সেক্সপিয়র—১৮, ২৮০ ৩৬, ৩০৯,
৪৮০, ৪৮৩, ৪৮৪, ১৩১
সারদানন্দ—১২০, ১৩৪, ১৯৫
সিরাজ—২২০, ২৫৪—২৭৬
হরমণি—২৫১, ২৫২, ২৫৩,
৩৭৩, ৩৭৪